সৈয়দ শামসুল হক

উপন্যাস সমগ্র

৪

উপন্যাস সমগ্র ৪

সৈয়দ শামসুল হক

অন্যপ্রকাশ

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৫০৪২২৬, ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ২৫০ টাকা

Upanyash Samagra 4 | By Syed Shamsul Haq
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price : Tk 250 only
ISBN : 984 8160 162 3
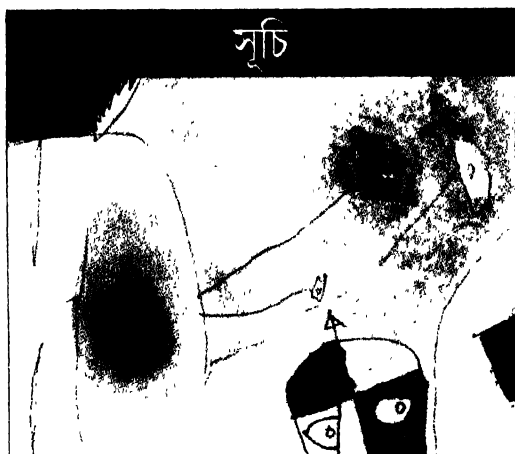
সূচি

সবিনয় নিবেদন

উপন্যাস মাধ্যমটিকে আমি বলি সৃজনশীল সাংবাদিকতা ; একটি বিশেষ সময়, এক বিশেষ স্থান সেই সময়কালে— এরই পটভূমিতে জীবন ও অস্তিত্ব অনুভবের বিবরণই হচ্ছে উপন্যাস। সময় এবং স্থান যখন হয় ভিন্ন, তখন একই গল্প লেখা হলেও তা আর এক থাকে না, ভিন্ন গল্প হয়ে যায়। যদি ওপর কাঠামোয় বাঁধা ঘটনার সার বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো— মানুষের গল্প অসংখ্য নয় ; হাতে গোণা আট দশটি গল্পই বটে ; কিন্তু তারা অজস্র হয়ে যায়, গণনার অসাধ্য হয়ে পড়ে, যখন একই গল্পের স্থান ও কাল বদলে যায়।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত আমার উপন্যাসগুলোর দিকে তাকিয়ে ওপরের কথাগুলো মনে এলো। 'নিষিদ্ধ লোবান'-এর কথাই ধরা যাক। প্রাচীন এক গ্রীক নাটকের গল্পের সঙ্গে এ উপন্যাসের গল্পভাগ মিলে যায় ; কিন্তু তারপরও এ দুই আলাদা দুটি রচনা— স্বাধীন ও ভিন্ন মার্গীয়— কারণ আমার রচনায় যে কালের কথা বলা হয়েছে, তা আলাদা এবং সেই কাল-ই ভিন্ন চেহারা দিয়েছে চরিত্রগুলোর।

'মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার' উপন্যাসের নাম এবং এর বীজ ভাবনাটি আমি পেয়ে যাই প্রয়াত ফজলে লোহানীর কাছ থেকে। তাঁর টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালার জনপ্রিয়তার কারণে এবং সাহিত্য থেকে বহু আগেই তাঁর সরে দাঁড়াবার কারণে তো বটেই— আমরা এখন ভুলে গেছি কী শক্তিমান লেখক ছিলেন তিনি একদা। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি একদিন এক সন্ধ্যায় পানাহার কালে তিনি বলছিলেন— কেমন হয়, যদি পরান মাস্টার নামে গ্রামের এক সাধারণ প্রাইমারি শিক্ষক হঠাৎ পৌঁছে যান অন্য কোনো গ্রহে, যেখানে আছে উন্নত সভ্যতা ?— এই বীজটিকে তিনি পরবর্তীকালে কোথাও ব্যবহার করেন নি, স্মরণ করিয়ে দিয়েছি বহুবার— তিনি হেসে বলেছেন, কী হবে লিখে ? খেদ নিয়ে এখন স্মরণ করি, পঞ্চাশের দশকেই তিনি ভেবেছিলেন— বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে কোনো লাভ নেই— ক'জন বাংলা পড়ে ?— তার চেয়ে ইংরেজিতে লিখলে বহু মানুষের কাছে পৌঁছুনো যাবে। না, ইংরেজিতেও তিনি কিছু লেখেন নি তখন কিম্বা পরে। কিন্তু অবিরাম আমাকে তাগাদা দিয়েছেন বাংলায় না লিখে ইংরেজিতে লিখতে। আমি না তখন না এখন বাংলাকে ত্যাগ করবার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভেবেছি।

এই সেদিনও কবি বেলাল চৌধুরী, ভারতীয় বহু লেখক যাঁরা ইংরেজিতে লিখছেন, তাঁদের গল্প করতে করতে হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করে বসলেন— আমি কেন ইংরেজিতে, কিম্বা ইংরেজিতেও লিখি না আমার উপন্যাস ? তাঁকে বলেছিলাম,

ইংরেজিতেই— দ্যাট উড বি আ বিট্রেয়াল। সেই আড্ডায় একটি পর্যবেক্ষণ আমি উপস্থিত করেছিলাম। অমিতাভ ঘোষ— বাঙালি, কলকাতার মানুষ, ইংরেজিতে উপন্যাস লেখক ; বিশ্ব তাঁকে প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক বলে জানে ; উপন্যাসের আন্তর্জাতিক উঁচু মান থেকে মোটেই দূরে নয় তাঁর রচনা। অমিতাভ কলকতায় মানুষ— একই কফি হাউসে আড্ডা, একই কলেজ স্ট্রীট পাড়া চষে বেড়ানো এই অমিতাভের মতো অপর যাঁরা বাংলায় উপন্যাস লিখছেন তাঁদের লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার গুণগত ভিন্নতা এতখানি কেন ? কেন বাংলা উপন্যাস আজো এত সামান্য, ক্ষীণ ও তরল, যেখানে বাঙালি অমিতাভেরই লেখা ইংরেজি উপন্যাস এত উন্নত, প্রবল ও কল্পনা প্রতিভামণ্ডিত ? এ কি ভাষার কারণেই শুধু ? অমিতাভ যদি বাংলায় লিখতেন তবে কি তাঁর রচনাও তরল-সরলের পর্যায়েই থাকতো ? খেদ করি, অমিতাভ বাংলায় লেখেন না। তুমুল উত্তেজিত বোধ করি, বাংলাকে যখন এভাবে কাউকে ছেড়ে যেতে দেখি। প্রাণিত হয়ে উঠি, বাংলা উপন্যাসকে আন্তর্জাতিক মানের অন্তর্গত করতে আমার এ কলমে।

সৈয়দ হক

বালিকার চন্দ্রযান

শনি আর রোববার ছুটির দিন হলেও মিস্টার আলির ছুটি নেই। তাঁকে কাজ করতে হয়। শনিবার দিন তো শাপলা ট্র্যাভেল এজেন্সি তাঁকে খোলা রাখতেই হয়, রোববারে বেরুতে হয় লন্ডনের বাইরে খদ্দের পটাতে, নতুন খদ্দেরের জন্যে জাল ফেলতে। ম্যানচেস্টারে বার্মিংহামে, কার্ডিফে। এসব জায়গায় বাঙালি আছে, ভারতীয় আছে, আছে পাকিস্তানি তবে মিস্টার আলি পাকিস্তানি পাড়ায় আর পা বাড়ান না; অথচ একাত্তর সালের জুন মাস পর্যন্ত লন্ডনে তিনি পি.আই.এ-তে চাকরি করা কালে বিস্তর পাকিস্তানির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বিলেতে এখন পাকিস্তানিরা বাঙালিকে ব্যবসা দেয় না। অথচ, মিস্টার আলি ক্রোধ অনুভব না করে পারেন না, বাঙালিরা দিব্যি ব্যবসা দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিদের। তাঁর এই ক্রোধ দেশাত্মবোধক হবে বলে মনে হতে পারে বাইরে থেকে। অনেক বাঙালি খদ্দের তার কাছে কিন্তু আসে তিনি বাঙালি বলে। তারা বলে, এক পাকিস্তানির কাছে কিছু সামান্য দর পেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার কাছেই এলাম, পয়সা যদি দিতে হয় তো বাঙালিকেই দেব। অথচ তারা জানে না, মিস্টার আলিকে খদ্দেরের মাল প্যাকিংয়ের জন্যে অন্তত পাকিস্তানি মিস্টার খানের কাছে যেতে হয়। এই তথ্যটি তিনি সযত্নে গোপন রাখেন এবং খদ্দেরকে বলেন তাঁর নিজস্ব ওয়ের হাউস আছে, প্যাকার আছে।

গতকাল এক বাঙালির হাজার তিনেক পাউন্ডের ব্যবসা অল্পের জন্যে তিনি পান নি। পেয়েছে মিস্টার খান। দেশমুখো বাঙালিটি যতরকম বিজলীর জিনিস বাজারে, প্রায় সবই নিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকবার মিস্টার আলির কাছে এসেছেন, তালিকা করেছেন, এক রকম কথাও দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই কিনবেন। শেষ পর্যন্ত কিনলেন তিনি মিস্টার খানের কাছ থেকে। আলিকে যেতে হয়েছিল খানের কাছে একটা কাজে, আর সেখানে গিয়ে দেখেন বাঙালিটা সওদা করছে। এমন নির্লজ্জ, লোকটি অপ্রস্তুত হয় নি। অবশ্য, সেটাও ভেবে দেখেছেন আলি, বিলেতে কষ্ট করে এক কামরায় রান্না-থাকা-খাওয়া করে জমিয়ে জিনিস কেনার সময় যেখানে সুবিধে, এক পয়সা সুবিধে হলেও সেখানে কিনবে বৈকি। বাংলাদেশে বাপের দৌলতেও যা কেনার মুরোদ হয় না বহু বড়ে খাঁর এখানে ইংরেজের মতো কামিয়ে আর বাঙালির মতো বাস করে, হেজিপেজিও ফ্রিজ টেলিভিশন রিকনডিশন্ড গাড়ি কিনে ফেলে। গরীবের জুতো হলে যা হয়, ঘুমোবার সময় পর্যন্ত জুতো বালিশের পাশে নিয়ে শোয়। চক্ষুলজ্জা থাকবে কেন?

তবু মনটা খিঁচড়ে ছিল আলির।

বসত বাড়িরই নিচের তলায় সমুখের ঘরে তাঁর কোম্পানির আপিস— শাপলা ট্র্যাভেলস এজেন্সি। কিম্বা বলা যায়, দোকানের ওপর তলায় তাঁর বাসা।

সকাল ন'টায় সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, স্ত্রী কামরুন্নাহার পেছন ডাকে।

এই শোন।

আলি বিরক্ত হন। পেছন ডাক মোটেই তিনি পছন্দ করেন না। তাও দিনের শুরু ভোর বেলায় খোদার নাম নিয়ে আপিস খোলার সময়।

মনটা আরো খিঁচড়ে গেল তার। পেছন ডাকার দোষ কাটাতে তিনি আবার ফিরে এলেন ঘরে।

কী হলো?

না, জিগ্যেস করছি, তুমি আবার বাইরে টাইরে যাচ্ছ না তো ?

যাবার থাকলে তো বলেই যেতাম।

বলেই তিনি যান সব সময়। কারণ, তিনি যখন বাইরে থাকেন, কামরুন্নাহারকে আপিসে বসতে হয়। স্বামীর কাজ সে ভালো গোছাতে পারে না, তবে ফোন ধরা, খদ্দের এলে প্রাথমিক আলাপ করা, লেনদেনের ব্যাপার থাকলে চেক নেয়া, রশিদ দেয়া, এ সব চালিয়ে নিতে পারে।

নাহার হেসে বলে, তোমাকে ডেকেছি একটা কারণে। একবার নিচে নামলে তো আর বাথরুমের দরকার ছাড়া দুটোর আগে ওপরে উঠবে না। বলছিলাম, কাজে যাবার আগে মিনার সঙ্গে একটু কথা বলে যাও।

মিনা, ইয়াসমিন, ওদের বড় মেয়ে।

এক্ষুণি বলার কী আছে ?

আলি ঠিক বুঝতে পারেন না, বিয়ের প্রস্তাবই হয় নি এখন পর্যন্ত, এর মধ্যে মেয়ের সঙ্গে কথা কীসের ? আজ একজন আসছে ইয়াসমিনকে দেখতে। আনুষ্ঠানিক দেখা নয়, তবু বাড়ির সবাই জানে, পছন্দ করতেই আসছে।

তোমার মেয়ে যদি বিগড়ে বসে ?

কেন ? বিগড়াবে কেন ? বয়স কম হয় নি। বিয়ে বসতে হবে না ? নাকি, সে তোমাকে কিছু বলেছে ?

এখনো বলে নি, তবে, সন্দেহ করি, বলবে। তোমার মেয়ে তো মেম সায়েব।

ভ্রু কুঞ্চিত করে রাখে আলি।

নাহার বলে, তুমি একটু বসো, মেয়েকে ডেকে দি। তুমি নিজে বলে দাও, শনিবার দেখে যেন আবার বেরোয় না। কাল রাতে পার্টি করেছে। আজ বাড়িতে থাক। একটু রেস্ট না নিলে চেহারাই বা কী দেখাবে ? আর ডাক্তার যখন আসবে, তার সঙ্গে যেন একটু ভালো করে কথাটা কয়।

স্কটল্যান্ড থেকে ইয়াসমিনকে দেখতে আসছে ডাঃ ভাইয়ান। মানে, ডাঃ ইউনুস ভুঁইয়া। ইংরেজের মুখে 'ভুঁইয়া' হয়েছে 'ভাইয়ান'। এখন সেটা নামের খোদ মালিক নিজেই ব্যবহার করে।

তোমার কি মনে হয়, মিনা গোলমাল করবে ?

স্ত্রীর কথায় আলি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। মেম সাহেব হয়ে যাবার উল্লেখটাও তাকে চিন্তিত করে তোলে। মুখের ওপর ছেলেটিকে 'না' বলে দেবে নাকি ? রীতিমতো শংকিত হয়ে পড়েন আলি। যদ্দুর যা শুনেছেন ডাঃ ভাইয়ানকে তাঁর পছন্দ হয়েছে, শুধু চোখে দেখতে বাকি। আর ডাক্তার পাত্র, কম লোভনীয় নয়।

নাহার বলে, কাল পার্টিতে যাবার আগে বলছিল, মা, সতের বছর বয়সে তো তোমারও বিয়ে হয় নি। বিলেতে এসে লোক সভ্য হয়, তোমরা আরো পেছন দিকে যাচ্ছ।

সব তোমার আশকারা।

নাহার সত্যি সত্যি অবাক হয়।

আমার আশকারা ?

নয়তো কী ? এই যে পার্টি, কাল সন্ধে বেলায় পার্টিতে গেল, কখন ফিরল, কার সাথে ফিরল, খোঁজ করে দ্যাখ ? ইংরেজ মা হয়েছ ? মেয়েকে নিশ্চিন্তে অজানা অচেনা জায়গায় ছেড়ে দিচ্ছ ?

খোঁজ নিলে রাগ করে যে।

কেন ? রাগ কীসের ?

খোঁজ নিলে নাকি অবিশ্বাস করা হয়। সভ্য সমাজে ছেলেমেয়েকে বিশ্বাস করা হয়।

রাখ তোমার সভ্য সমাজ।

নাহার রাগ করে এবার।

আমার হয়েছে যন্ত্রণার একশেষ। একদিকে তুমি. আরেক দিকে মেয়েরা।

মেয়েরা বোলো না। আমার মাহজাবীন অন্য রকম মেয়ে। আদব কায়দা আছে।

মাহজাবীন ইয়াসমিনের দুবছর ছোট। বারো বছর আগে যখন এ দেশে প্রথম এসেছিলেন আলিরা, ইয়াসমিন সাত, মাহজাবীন পাঁচ। লন্ডনে তাদের তৃতীয় মেয়ের জন্ম হয়। নাসরিন, সে এখন ন' বছরের।

আলি আরো বলেন, নাসরিন যদি নষ্ট হয় তো ঐ ইয়াসমিনের জন্যেই হবে।

ঝংকার দিয়ে ওঠে নাহার, বাড়িতে তুমি আছ কী করতে ? মেয়েকে শাসন করতে পার না ? যাও, মেয়েকে বল, ডাক্তার এলে যেন ভালো ব্যবহার করে।

মেয়েদের সঙ্গে একটা দুরত্ব বজায় রেখে চলেন আলি। সেই রকমই দেখে এসেছেন তিনি তাঁর বাপজানকে, সন্তানের সঙ্গে দূরত্ব রাখতে। আলি যখন মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, ইচ্ছে করেই সংক্ষিপ্ত এবং রুঢ় হন, পাছে স্নেহ প্রকাশ পেয়ে যায়। নাহার ভালো করেই জানে, আলি নিজে থেকে মেয়ের ঘরে যাবেন না, বা এ ঘরে ডাকবেন না। তাই চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিয়ে আলির অস্বস্তি সৃষ্টি করে তার এক ধরনের জিৎ হয়ে যায়। সোনালি সেই আভায় উজ্জ্বল হয়ে যায় সে। মনটাও স্বামীর অনুগত হয়ে যায় আবার কয়েক মুহূর্তের বিচ্যুতির পর।

নাহার বলে, তোমাকে আর মেয়েকে এক সঙ্গে চা দিচ্ছি। খেতে খেতে চট করে কথাটা বলে কাজে চলে যাও। বাকি আমি দেখব।

ডাঃ ভাইয়ানের কথা শুনে দেখার আগেই তাকে খুব পছন্দ হয়েছে নাহারেরও। তাছাড়া, তার মনের মধ্যে কিছুদিন থেকেই এ আশংকাটা দেখা দিয়েছে. ইয়াসমিন হয়তো লাগাম ছাড়া হয়ে যাবে। বয়স না হয় সতেরই হলো, বাড় কুড়ি-একুশের, এখন একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে নাহার নিশ্চিন্ত হতে পারে।

যাই, তোমার মেয়ে হয়তো এখনো ঘুমুচ্ছে।

ডাক্তার আজ আসছে যখন জান, কাল পার্টিতে যেতে দেয়া ঠিক হয় নি।

তাহলে আজ আর দেখতে হতো না।

নাহার মেয়ের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

শোন।

নাহার ফিরে দাঁড়ায়।

এক কাজ কর না হয়। আলি ইতস্তত করে বলেন, আমি আপিসে গিয়ে বসছি। তুমি মিনাকে চা দিয়ে পাঠাও। আপিস খুলতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক ক্লায়েন্ট আসবার কথা। বলে তিনি আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যান।

২

ওপরে, তিনটে শোবার ঘরের সবচেয়ে ছোট ঘরখানা বড় মেয়ের, মানে ইয়াসমিনের। মাঝারি ঘরে থাকে মাহজাবীন আর নাসরিন। আলিদের শোবার ঘরটা বড়, কেউ এলে সেখানেই বসবার ব্যবস্থা।

নাহার গিয়ে ইয়াসমিনের দরোজায় টোকা দেয়।

এই অভ্যাসটি বহু কষ্টে মাকে শিখিয়েছে ইয়াসমিন। আগে তো হুট করে ঢুকে পড়ত নাহার, প্রতিবারই ইয়াসমিন এমন করে উঠত যেন তার গায়ে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তিড়িং বিড়িং করে লাফাত আর চ্যাঁচাত। নাহার বুঝতেই পারত না, মেয়ের ঘরে মা ঢুকবে তার আবার নোটিশ কীসের? মেয়ে কি পর? না, মা পেটে ধরে নি তাকে? শেষে মেয়ের জেদে পড়ে অভ্যাসটা করে নিয়েছে সে। তাও মাঝে মধ্যে ভুল হতো। সেটা একেবারেই শুধরে যায়, যখন ইয়াসমিন তার এক জন্মদিনে ক্লাশের একগুচ্ছ বান্ধবীর সমুখে বলে বসল, তারা এখন নিজেদের ভেতরে গল্প করবে, মা যেন জানান না দিয়ে ঘরে না আসে, যেমন তার অভ্যেস।

দরোজায় আবার টোকা দেয় নাহার।

ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

কাল কত রাতে ফিরেছে? কাল ওর এক বান্ধবীর জন্মদিন ছিল। কয়েকজন মিলে সিনেমা দেখবে, তারপর চাইনিজ টেক-অ্যাওয়ে খাবার এনে বান্ধবীর বাসায় খাবে, একটু হৈ-চৈ করবে, ফিরে আসবে। কতই বা রাত হতে পারে? সাড়ে বারোটা পর্যন্ত নাহার নিজেই জেগেছিল। ইয়াসমিনের দেরি দেখে একটু ভাবনা হয়েছিল তার, কিন্তু প্রকাশ করলে স্বামী তুলকালাম করে ছাড়তেন। তাই সে ঘুমন্ত আলিকে আর জাগায় নি। তারপর নিজেও সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর আগেও কয়েকবার এ রকম দেরি করেছে, চাবি দিয়ে দরোজা খুলে পা টিপে টিপে ওপরে এসেছে। নাহার কিছু বললেই বলেছে, তাকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে, তার সব বান্ধবীই এ স্বাধীনতা পায়, তাছাড়া বয়স ষোল হয়ে যাবার পর মানুষের স্বাধীনতা আছে যতক্ষণ খুশি বাইরে থাকবার, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে মা কিম্বা যেই হোক মাথা গলানোটা অশালীন।

নাহার এবার নাম ধরেই ডাকে।

মিনা।

তবু সাড়া পাওয়া যায় না।

মেয়ের কাছে তিরস্কৃত হবার আশংকার চেয়ে উদ্বেগটাই লাফ দিয়ে প্রকাণ্ড হয়ে যায়।

হাতল ঘোরাতেই দরোজা খুলে যায়, দরোজা খুলে দেখা যায়, ইয়াসমিন বিছানায় নেই। নেই, তবু বিশ্বাস হয় না। চোখের ভুল বলে মনে হয়। ছোট্ট এতটুকু ঘর-- একবারেই

চোখে সবটা মেপে নেয়া যায়। ঘর শূন্য। বিছানা আগোছালো। হয়তো রাতে কেউ ঘুমিয়েছিল, হয়তো কেউ ঘুমোয় নি, বোঝা যায় না। ইয়াসমিন বিছানা করতে বড় আলসে। যেমন ঘুম থেকে উঠে যায়, তেমনি রাতে এসে বাসি বিছানায় শুয়ে পড়ে। নাহার কিছু বললে খেপে ওঠে। বলে, সে কি হলওয়েল কারাগারে বন্দি যে রোজ ভোরে ওয়ার্ডেনের রোদে বেরুবার আগেই তাকে বিছানা করে রাখতে হবে, রেখে বিছানার পাশে নিষ্পাপ সন্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ?

ইয়াসমিন কি তাহলে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেছে, নাহার টের পায় নি ?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বাথরুম দ্যাখে। কেউ নেই ভেতরে।

তখন মাঝের ঘর, অন্য দু মেয়ের যৌথ শোবার ঘরে আসে নাহার। ছোট মেয়ে নাসরিন শুয়ে শুয়ে চার্লি ব্রাউন কমিক বই পড়ছে। আর মাহজাবীন জানালার কাছে টেবিলের ওপর বসে, জানালার বাইরে মুখ করে নোখের রঙ ওঠাচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই। নাহারের পায়ের শব্দে দু মেয়ের কেউ ফিরে তাকায় না। ইয়াসমিনকে এখানেও না দেখে তার বুক হিম হয়ে যায়।

কিছুতেই সত্যি বলে মনে হয় না, ইয়াসমিন গত রাতে ফেরে নি।

মাথাটা ঘুরে উঠে একবার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে নাহার। শূন্য দৃষ্টিতে ইয়াসমিনের পিঠোপিঠি মেয়ে মাহজাবীনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর মাহজাবীন নোখের রঙ তুলতে তুলতেই বলে, মাম, আজ প্রাতরাশ খাইতে চাহি না। প্লিজ।

প্রায় ছুটির দিনেই মাহজাবীন ভোরে নাশতা করতে আপত্তি করে।

সপ্তাহের পাঁচদিন ভোরে ইস্কুলে যাবার আগে মায়ের কড়াচোখের নিচে বাটি ভর্তি দুধ সিরিয়েল গিলতে হয়, ছুটির দিনে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা দেখায় সে। এটা নতুন নয়। তবু, নাহারের মনে হয়, আজ এর বিশেষ একটা অর্থ আছে।

সে মেয়েকে বলে, কখন উঠেছিস ঘুম থেকে ?

মাহজাবীন আপন কাজে ব্যস্ত থাকে। নোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্যাখে। জবাব দেয় না।

নাহার কিছুটা কঠিনস্বরে জিগ্যেস করে এবার— উঠেছিস কখন ?

ছোট মেয়ে নাসরিন চার্লি ব্রাউনের বইয়ের দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে, আহ তোমরা কী শুরু করিলে বল তো ? আমাকে পড়িতে দাও।

নাসরিনকে পড়বার অখণ্ড নীরবতা দেবার জন্য নয়, ভিন্ন কারণে নাহার মাহজাবীনকে বলে, বীনা, এদিকে শুনে যাও।

মাহজাবীন ভ্রু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকায়।

প্রাতরাশ নয়, প্লিজ।

এসো এদিকে।

নাহারের গলায় কী ছিল, মাহজাবীন টেবিল থেকে নেমে আসে।

পাশেই ইয়াসমিনের ঘর, দরোজা খোলা, ভেতরে ঢুকে দরোজাটা বন্ধ করে নাহার সরাসরি প্রশ্ন করে, মিনা কোথায় ?

ঘরের চারদিকে ধীর চোখে মাহজাবীন তাকায়। নাহার রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। পিঠোপিঠি বোন, হয়তো ছোটটি বড়-র গতিবিধি জানে। তার এক প্রকার বিশ্বাসও হয়, মাহজাবীন নিশ্চয়ই জানে।

গুডনেস, সে কি ফিরিয়া আসে নাই?

তাহলে আর তোমাকে জিগ্যেস করছি কেন?

মাহজাবীন বড় বড় চোখে মায়ের দিকে তাকায়।

আমি জানিব কী প্রকারে?

তুমি জানবে না তো কে জানবে? রাতদিন তোমাদের কথাবার্তা, হাসাহাসি।

তাহাতে কী? তাহার গোপনীয়তা তাহার কাছে।

কাল কার জন্মদিন ছিল?

আমি জানি না?

কিছু বলে নি?

আমার স্মরণ হয় না।

কোথায় যেতে পারে জানিস?

তাহার বন্ধুরা আমার নহে। অমি সংবাদ রাখি না।

নাহার গুম হয়ে যায়। একবার মনের ভেতরে চমক দিয়ে যায়, মাহজাবীন জেনেও গোপন করছে না তো? কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে নিষ্পাপ মনে হয়। চোখের ওপর নোখ তুলে ধরে সে এখন নিরিখ করে দেখছে, রঙ ঠিকমতো উঠেছে কিনা।

ইয়াসমিনের শূন্য বিছানার ওপর বসে পড়ে নাহার।

বীনা।

মাহজাবীন মায়ের আতংকিত কণ্ঠস্বরে চোখ ফেরায়। রক্তশূন্য মুখটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে আন্দোলিত হয় সে। তারপর, আবার সে স্থিরতর হয়।

মাম, এমনও কি সম্ভব নহে ফিরিয়াছিল সত্য, প্রভাতে আবার বাহিরে গিয়াছে।

অনুমানটি লোভনীয় মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। বিশ্বাস করে নাহার, কিন্তু পর মুহূর্তেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

না, আমি খুব ভোরে উঠেছিলাম। বেরিয়ে গেলে টের পেতাম।

তবে আমি আর জানি না।

তোর বাবাকে এখন কী বলব?

বলিবে, প্রভাতে বাহির যায়; তোমাকে বলিয়া যায়। অথবা তুমি সাড়া পাইয়াছিলে।.

মাথা নাড়ে নাহার।

না, তাকে আমি বলেছি, মিনা ঘরে আছে।

ভ্রু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকায় মাহজাবীন।

ড্যাডি সহসা কেন সন্ধান করিলেন?

আজ সেই ডাক্তার আসবে, বিকেলের দিকে। মিনা তোকে কিছুই বলে নি ? তুই একটুও টের পাস নি ?

সত্য, মাম।

কিছু যদি বলে থাকে, আমাকে বল।

জানিলে বলিতাম।

বোন ঘরে ফেরে নি, শুনে এত ঠাণ্ডা আছ কী করে ?

নাহার তিরস্কার করে মেয়েকে।

মাহ্‌জাবীন ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বলে, তাহার জীবন তাহার।

৩

অনেকক্ষণ পরেও যখন ইয়াসমিন চা নিয়ে আপিস ঘরে এলো না, মিস্টার আলি বিরক্ত বোধ করেন। মেয়েটির কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই বাবা-মায়ের জন্য। বয়স সতের পুরো হয় নি, লেখাপড়া শেষ হয় নি, খাওয়া-পরা-জামা-কাপড়ের জন্য এখনো নির্ভরশীল, অথচ চলন দেখলে মনে হবে, কোনো এক অধিকার বলে বাবা মায়ের কাছ থেকে কর আদায় করে চলেছে, বাবা-মাকেই তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

আলি পেছনের দরোজার দিকে একবার তাকাল। দরোজার ওপারেই সিঁড়ি। সিঁড়িতে এখনো কোনো পায়ের শব্দ নেই।

যে বাঙালটি তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে, মিস্টার খানকে ব্যবসা দিয়েছে, তার জিনিসের খসড়া তালিকা টেবিলে কাগজপত্রের ওপরেই পড়ে ছিল। আলি এখন সেটা নিয়ে ফ্যাস করে ছিঁড়ে ফেলেন। বাঙালিদের দেশপ্রেম সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়ে, মনে মনে গোটা বাংলাদেশেরই ভবিষ্যত অভিশপ্ত বলে স্থির করেন।

তালিকাটি ছিঁড়ে ফেলবার পর দ্বিতীয় যে কাগজটি সমুখে মেলে থাকে, তাতে সব বড় হাতের অক্ষরে লেখা 'মি. বজলুল করিম, লন্ডন-ঢাকা-লন্ডন, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে যে-কোনো দিন।' প্রথমে মনে পড়ে না। তারপর হঠাৎ লক্ষ হয়। ভদ্রলোক আজই আসবেন টিকিট নিতে। দেশে যাচ্ছেন। আলি তালিকাভুক্ত এজেন্ট নন বলে তাকে নগদ টাকায় বিমান-আপিস থেকে টিকিট এনে খদ্দেরকে দিতে হয়। মিস্টার করিমের টিকিট এখনো আনা হয় নি। ভদ্রলোক বিকেলেই এসে হাজির হবেন। ঘড়ি দেখেন আলি। বিকেলে ডাঃ ভাইয়ান আসবে, কখন আসবে ঠিক নেই, ম্যানচেস্টার থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছে। টিকিট আনতে হলে এখন বেরুনোই ভাল। তিনি কি একবার ওপরে যাবেন ? নাহারকে বলবেন আপিস লক্ষ রাখতে ? অজুহাতটা ভালো লাগে তাঁর। ইয়াসমিন আসতে দেরি করছে কেন, ওপরে গিয়ে সেটাও যাচাই করা যাবে।

আলি উঠতে যাবেন, পেছনে শব্দ পাওয়া গেল।

নাহার।

জিজ্ঞাসু চোখে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকান। প্রশ্নটা এই, ইয়াসমিনের না চা নিয়ে আসবার কথা ?

নাহারকে ইতস্তত করতে দেখে আলির মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মেয়েটি নিশ্চয়ই বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিচে নামে নি।

ইয়াসমিন কই?

আলি প্রায় সব সময়ই মেয়েদের পুরো নাম ধরে ডাকেন। এখন তো ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন।

তুমি না বললে তাকে পাঠিয়ে দেবে?

সে নেই।

নেই?

মানে বাড়িতে নেই।

বাড়িতে নেই মানে কী? বাড়িতে থাকবে না কেন? এই ভোরে ভোরে আবার কোথায় গেছে?

বোধহয় সে বাড়িতেই ফেরে নি।

চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কথাটার অর্থ মর্মে প্রবেশ করে। নেতানো গলায় প্রতিধ্বনি করেন তখন, বাড়িতে ফেরে নি।

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন আলি। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকান। মুহূর্তের জন্যে নাহারকেও তার অচেনা মনে হয়।

নাহার প্রস্তুত হয়ে থাকে স্বামীর যে-কোনো অভিযোগ, যে-কোনো চিৎকার শুনবার জন্যে। সে জানে এক্ষুণি তিনি সমস্ত দোষ তাকেই দেবেন।

তার বদলে আলি দুঃখিত গলায় উচ্চারণ করেন, কোনো দিন তো এ রকম করে নি।

মেয়ের কুশলের চেয়ে পারিবারিক মর্যাদাহানীর আতংক আলির মাথায় বড় হয়ে থাকে। এবং ক্রমশ তা আরো বড় হয়।

এর অর্থ ভেবে দেখছ?

আমিও তো ভাবি নি, মিনা এ ভাবে।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে আলি উঠে দাঁড়ান। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে যান। ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ডাকেন, মাহজাবীন।

সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে আসে। আপাদমস্তক তাকে একবার দেখে নেন আলি। মেয়েটি এখনো রাতের শোবার পোশাক ছাড়ে নি। বুকের কাছে বোতামটা লাগিয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

আলি সরাসরি প্রশ্ন করে, ইয়াসমিন কোথায় বলিতে পার?

মাহজাবীন মাথা নাড়ে।

আমার সহিত আইস।

নিজের শোবার ঘরে আলি ঢুকে যান। মাহজাবীন তবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে যায়।

আসন লও।

মাহজাবীন কতটা ভয় পেয়েছে বলা যায় না। বড় বড় চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বসে পড়ে। বসবার পরও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না।

আলি কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে বলেন, আমার ধারণা তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ।

চমকে মাহজাবীন বাবার দিকে তাকায়।

মিথ্যা নহে।

লুকাইও না। তোমরা শিশু। তোমরা ভবিষ্যত জান না। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলিতেছি। আমাকে বল, ইয়াসমিন কোথায় গিয়াছে?

আমাকে বলে নাই।

সত্য?

সত্য বলিতেছি।

মাহজাবীনের দিকে আবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকান আলি। পনের বছরের এই মেয়েটির পক্ষে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলা সম্ভব কিনা, তাও বাবার জেরার মুখে, মনে মনে আলি আন্দোলন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হন, মাহজাবীন মিথ্যে কথাই বলছে।

মাহজাবীন আমার দিকে তাকাও।

মেয়েটি চোখ তুলে পরক্ষণেই নামিয়ে নেয়।

আমার বিশ্বাস, ইয়াসমিন হইতে তুমি ভিন্ন। তুমি তাহার মতো নও। পিতামাতাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, বাঙালি মেয়ের শালীনতাবোধ তোমার আচরণে আমি লক্ষ করিয়াছি। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার ভগ্নি আমাদের প্রত্যেকের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে?

মাহজাবীন চুপ করে থাকে।

তুই নিশ্চয় জানিস, ইয়াসমিন কোথায়? বল আমাকে, তোকে না বললেও, তুই নিশ্চয়ই কখনো কিছু শুনেছিস। একদিন হঠাৎ এ রকম কেউ করে না। বল আমাকে, কিছু মনে পড়ে তোর?

মাহজাবীন অন্তত এটুকু খুশি হয় যে, বাবা মনে মনে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে বলার অভিযোগটা তুলেই নিয়েছেন। নইলে এভাবে এখন মিনতি করতেন না।

মেয়ের পাশে এসে বসেন আলি।

কিছু কি মনে পড়িতেছে?

না ড্যাডি।

কিছুই কি মনে পড়ে না? ফোনে কোনো আলাপ? পত্র? অথবা, তাহার এমন কোনো বন্ধু যে এইরূপ বুদ্ধি জোগাইতে পারে?

বন্ধুর উল্লেখ করে নিজেই শিউরে ওঠেন আলি। তিনি একাধিক ইংরেজ তরুণের কণ্ঠ মনে করতে পারেন, যারা টেলিফোনে ইয়াসমিনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। বাড়ির টেলিফোনই আপিসের বলে, তিনি মেয়েদের কাউকে খুব বেশি ফোন ব্যবহার করতে দিতেন না। আলি জানেন, নির্দেশটা মেয়েদের বন্ধুরাও নিশ্চয়ই জানে। তা সত্ত্বেও যখন ফোন আসে, তখন খুব দরকারেই আসে, তা বোঝা শক্ত নয়। সেই দরকারটা কী? এমন

কিছু যা তিনি জানতে পারেন নি কখনো ?

মাহজাবীন ?

আমি কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না ?

গুরুত্ব উপলব্ধি কর ?

হাঁ, ড্যাডি ?

সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে ?

না, ড্যাডি ?

মাহজাবীন নিজেই খুশি হয়ে যায় উত্তরটা সাবলীলভাবে দিতে পারবার কৃতিত্বে। সমাজের উল্লেখে মাহজাবীনের সমুখে বাঙালি কিছু দম্পতির চেহারা ভেসে ওঠে, যারা, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, পাউন্ড জমায়, আনন্দ করে না, গান শোনে না, কারি রান্না করে, আঞ্চলিক বাংলা বলে যার অধিকাংশই তার বোধগম্য হয় না এবং যে-কোনো বাড়িতে গিয়ে বাড়ির দাম কতটা বাড়ল, কোথায় সুলভে কী পাওয়া যাচ্ছে, নতুন সামগ্রীটি কবে কত দামে কেনা হলো, এ আলোচনায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দুপুররাতে ঢেকুর তুলে বাড়ি ফেরে। এদের কাছে মুখ দেখাতে না পারল তো বয়েই গেল তার।

মনের ভেতরে খিক-খিক করে হাসে মাহজাবীন। বোধহয় তার কিছুটা চোখে মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

আলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তুমি এখনো শিশু। তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইয়াসমিন আমাকে সাগরে নিমজ্জিত করিল। ডাক্তার আসিলে তাহাকেই বা কী বলিব ? যথাসম্ভব করুণ ও দুঃখিত চেহারা তুলে মাহজাবীন বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

৪

ম্যানচেস্টার থেকে ন'টার দিকে রওয়ানা দিয়েছে ডাঃ ইউনুস ভাইয়ান। স্কটল্যান্ডের বেলশিলে কাজ করে সে, সেখানকার মাতৃসদন হাসপাতালে। একটানা চলে আসতে পারত লন্ডনে গাড়ি চালিয়ে। বহুবার লন্ডনে সে বেড়াতে এসেছে সোজা কোথাও না থেমে। এ যাত্রায় ম্যানচেস্টারে থেমেছিল ডাঃ বারীকে তুলে নেবার জন্যে। তার সঙ্গে শলা হয়েছে, দুজনে দুটো দিন লন্ডনে থাকবে, তারপর ভাইয়ান তাকে নামিয়ে দিয়ে বেলশিলে ফিরে যাবে।

আসলে, এ যাত্রায় মেয়ে দেখতে বেরিয়েছে, বারীকে তা বলে নি ভাইয়ান। বলেছে ছুটি করতে যাচ্ছে, সে আসবে কিনা।

মোটরওয়ে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক একটানা চলবার পর চায়ের তৃষ্ণায় এক সার্ভিস স্টেশনে ঢুকে পড়ে তারা। গাড়ি পার্ক করে রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাউন্টার থেকে চা আর স্যান্ডউইচ নিয়ে বসে তারা। মোটর পথের আরও বহু যাত্রী তাদেরই মতো চা কফি খেতে ভিড় করেছে। দুই বন্ধু চা খেতে খেতে তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, কিছুক্ষণ দ্যাখে, দৃষ্টি তৃপ্ত হলে, অথবা, তরুণীটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে আবার অন্য কাউকে সন্ধান করে। কাঁধে যাযাবর-পোঁটলা নিয়ে দুটি তরুণী কাউন্টারে খাবার কিনছে। দুজনের রুক্ষ লাল চুল। পরনে জীনস, অসংখ্য তালিমারা, গায়ে আর্মি সারপ্লাস সোয়েটার ঢল ঢল

করছে। একজনের হাতে গিটার। তরুণী দুটি চা গোল রুটি নিয়ে ঠিক ভাইয়ানদের পাশেই বসে।

কাছে এসে বসতেই প্রথম দুই বন্ধুই চোখ ফিরিয়ে নেয় দ্রুত। যেন— না, তোমাদের দেখছিলাম না। তারপর আবার তারা মনযোগ দেয় তরুণী দুটির দিকে। তারা স্তিমিত চোখে তাকিয়ে দ্যাখে পাটলবর্ণ মানুষ দুটিকে। চোখে চোখ পড়বার সংকোচ তাদের নাই। ডাঃ বারী নিজের টাকে হাত রাখে, দ্রুত টাক বুলিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নেয়। এই তার এক মুদ্রাদোষ। কেউ তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই টাকে হাত চলে যায়।

বারী বলে, ডাক্তার সাহেব, আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাইয়ান সেটা জানে। কিছুটা খুশিও হয়। বলে, দেখতে মন্দ না।

একটিকে তার পছন্দ হয়, যার হাতে গিটার নেই। বয়সটা অপরের তুলনায় কিছু বেশি, মুখটা পুরুষালি, হাতের পাঞ্জা শক্ত সমর্থ। তার সঙ্গিনীটি প্রায় ছেলেমানুষ, মেয়ে-মেয়ে ভাবটা তার অত্যন্ত স্পষ্ট। তাকে আবার ডাঃ বারীর বেশ ভালো লাগে। টাকের কথা ঘনঘন বেয়াড়া রকম মনে পড়ে যাচ্ছে দেখে নিজেই সে বুঝতে পারে, ভেতরে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

বারী আর ভাইয়ান একসঙ্গেই চায়ের কাপে মুখ নামিয়ে আনে। তারপর দুজনেই মুখ তুলে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

বারী বলে, কিছু বুঝতে পারলেন?

না।

কিচ্ছু না?

হিচ-হাইক শব্দটা উচ্চারণ করলে তরুণীরা বুঝে ফেলতে পারে, ভাইয়ান তাই বাংলা করে বলে— আঙুল দেখিয়ে গাড়ি থামায়, আর কী? গানটান গায়। বেড়াবে বেরিয়েছে। দেবেন নাকি লন্ডন পর্যন্ত একটা লিফট?

লিফট শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই ভাইয়ান সচকিত হয়ে পড়ে। বুঝে ফেলল না তো?

বারী বলে, দুর সাহেব, লিফট দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারছেন না? এরা সমকামী।

ভাইয়ান কৌতুক চোখে তরুণী দুটিকে দ্রুত দেখে নেয় একবার।

কী যে বলেন?

হাঁ, নির্ঘাত। বড়টি সক্রিয়, ছোটটি নিষ্ক্রিয়। কষ্ট করে বাংলা শব্দ হাতড়ে মনে করে বারী তার অভিমত জ্ঞাপন করে।

পেয়ালা নামিয়ে রাখে ভাইয়ান। বলে, নিন, উঠুন। পথে কেমন ভিড় দেখছেন না? পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।

বারী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, হাঁ, শনিবার তো! কী অপচয়!

শেষ কথাটি ঠিক বুঝতে পারে না ভাইয়ান।

কীসের অপচয়?

মেয়েটির কথা বলছি। সমকামী একটি রমণী অন্তত একটি পুরুষকে বঞ্চিত করিতেছে, দুইটি বঞ্চিত করিতেছে দুই জনকে।

নিরাপদ দুরত্বে এসে গেছে বলে বারী বাক্যটি ইংরেজিতে শেষ করবার সাহস পায়।

বেরুবার আগে কিছু চকোলেট আর চুয়িংগাম কেনে তারা। পথে গাড়ি চালাতে চালাতে খাওয়া যাবে। ভাইয়ান বলে, আপনার কি ফাঁকা যাচ্ছে নাকি ?

বারী হাসে। বেরুবার দরোজা খুলে ভাইয়ানকে আগে বেরুতে দেয়। বলে, এখন একটু সাবধান হতে হয়। সেদিন দেখলেন না, ইন্ডিয়ান এক ডাক্তার কীভাবে তার রেজিস্ট্রেশন হারাল ?

ভাইয়ানের মনে পড়ে যায় খবরটি। মহিলা এক পেশেন্টকে দেহ পরীক্ষার ছলে নাকি ডাক্তারটি দেহভোগ করেছে। তারপর নালিশ, মামলা। পরিণামে বিলেতে প্র্যাকটিস করা তার বন্ধ।

সার্ভিস স্টেশনের খোলা চত্বর পেরিয়ে গাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাইয়ান বলে, আপনি তো আর পেশেন্টের সঙ্গে কিছু করতে যাচ্ছেন না।

তবু বলা যায় কি ? এ দেশে আমাদের ওরা চায় না। কখন কে বলে বসবে, আমি পেশেন্ট ছিলাম, আমাকে ইয়ে করেছে, ব্যাস, হয়ে গেল। কিছু না হোক, বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে।

তো করবেন। আপনি তো বিয়ে করেন নি।

বারী বলে, ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে ? বারোজনের জিনিসকে বিয়ে করে কে সাহেব ? করলে তো কবেই করতে পারতাম।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে ডাঃ বারীর, এখনো অবিবাহিত। তার বক্তব্য, মনের মতো মেয়ে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। অন্য ডাক্তারেরা বলে, বারীর নিকষ কালো চেহারা, তার ওপরে ছেলেবেলার গুটি বসন্তের দাগ, কোনো মেয়ে পছন্দ করে নি তাকে। বারী যে বছরে একবার নিয়মিত দেশে যায় এক মাসের জন্যে, লোকে বলে, গোপনে সে মেয়ে দেখে বেড়ায়। প্রতিবারই হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

গাড়ির কাছে এসে বারী বলে, ডাক্তার সাহেব, এবার আমি চালাই।

ম্যানচেস্টার থেকে চালিয়ে এসেছিল ভাইয়ান, এবারে বারী গিয়ে হাল ধরে।

পথের ওপর আবার গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে লন্ডনের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাবার পর ভাইয়ান ইতস্তত করে বলে, বারী সাহেব, আপনি শুনলে তো আবার রাগ করবেন, আগে বলি নি কেন ?

পথের দিকে চোখ রেখে বারী ভ্রু কুঁচকে রাখে।

ভাইয়ান বলে, লন্ডনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

নতুন কোনো হাসপাতালে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন নাকি ? ও আশাও করবেন না। স্কটল্যান্ডের ডাক্তারদের ইংল্যান্ডে সহজে কাজ হয় না। সে ইংরেজই হোক, আর আমরাই হই।

ভেতরের কথাটা বলতে গিয়েও ইতস্তত বোধ করে ভাইয়ান। একটু লজ্জাও করে। তাই সে আপাতত সেটাকে চাপা দিয়ে নগদ প্রসঙ্গেরই জের টেনে বলে, জানি। পাকিস্তানিদের

আমরা বলতাম ইস্ট পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখে, এখানেও কম নয়। যতবার লন্ডন থেকে গাড়িতে করে ফিরে গেছি স্কটল্যান্ডে, বোঝাই যায় কখন স্কটল্যান্ডে ঢুকে পড়েছি। রাস্তাগুলো গরীব, সার্ভিস স্টেশানগুলো বাজে, বাড়িঘর সাধারণ। তফাতটা স্পষ্ট বোঝা যায় ইংল্যান্ড থেকে। তাই না?

স্কটল্যান্ড তো এখন স্বাধীন হবার কথা ভাবছে। নর্থ সি-তে তেল বেরিয়ে গেছে, আর ঠেকায় কে?

একটা জিনিসের জন্যে আমার অবাক লাগে, এদের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। স্বাধীনতার কথা এরা খোলাখুলি বলতে পারছে, আর আমাদের দেশে বললে ফাঁসি। মিথ্যে একটা মামলাই করে দিল শেখ মুজিবের নামে আইয়ুব খাঁ।

ইংরেজও করে। নিজের দেশে বলে মুখোশটা ঠিক রেখেছে। ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে কম করেছে সাহেব? আইয়ুব খাঁ তো তাদেরই ট্রেনিং পাওয়া। হঠাৎ মনে পড়ে যায় বারীর। মুহূর্তের জন্যে পথ থেকে চোখ ফিরিয়ে ভাইয়ানকে দেখে নিয়ে, আবার সমুখে চোখ রেখে বলে, কই বললেন না তো, লন্ডনে আপনার উদ্দেশ্যটা? তাহলে নির্জলা ছুটি নয়?

রুহুল কুদ্দুসকে চেনেন তো? সেই যে সেভেন্টি-ফোরে ডাবলিনে পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখা হলো। এক চান্সে এম-আর-সি-ও-জি হয়ে গেল?

খচ করে বুকের ভেতরে লাগল কথাটা। বারী বহু বৎসর ধরে পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হাঁ, মনে আছে।

রুহুল কুদ্দস এক মেয়ের খবর দিয়েছে।

মেয়ে?

বাঙালি মেয়ে। বাবা-মা অনেকদিন এদেশে আছে। বাবার ট্রাভেল এজেন্সি আর দেশে মাল পাঠাবার ব্যবসা।

দ্রুততম তৃতীয় লেন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ধীর গতির প্রথম লেনে গাড়ি সরিয়ে আনে বারী।

মেয়ে দেখেছেন?

না, সেই দেখতেই যাচ্ছি। আমিও আপনার মতো ডাক্তার সাহেব, বিয়ে বাঙালি ছাড়া করব না। রুহুল কুদ্দুস বলল, মেয়েটি নাকি ভালো। বাবা-মা দুজনে বহুদিন এসে থাকলেও এখনো পুরোদস্তুর বাঙালি। তা রুহুল কুদ্দুস আবার থাকতে পারছে না, তার কী কাজ আছে। তাই আপনাকে নিয়ে এলাম। একটা ওপিনিয়ন দিতে পারবেন। অনেকদিন তো আমাকে চেনেন, আমার সবই আপনার জানা। কী রকম বৌ চাই, আপনি ভালো বুঝবেন।

বারী আবার ধীরে ধীরে তৃতীয় লেনে গাড়ি নিয়ে যায়। যেতে যতক্ষণ লাগে সে কিছু বলে না। তারপর দ্রুত গতিতে স্থির হয়ে বলে সেই মেয়েটির কী হলো?

অ্যান?

চুপ করে থাকে বারী। অপেক্ষা করে উত্তরের জন্যে।

ভাইয়ান বলে, ডাঃ খলিলের কথা মনে আছে? হার্ট উড হাসপাতালে ছিল, সেখানে নার্স বিয়ে করেছিল, ক্যাথি নাম?

হাঁ।

বিয়ের পর খলিলের অবস্থা দেখে আমার আর ইংরেজ বিয়ে করবার সাধ নেই। দেশে টাকা পাঠান তো বন্ধই করেছে, দেশেও যায় না আজ তিন বছর। দেখলে আর চিনতে পারবেন না খলিলকে। পাকা ইংরেজ। আমাদের এখন যে সব শুনতে হয়, শুনে মনে হয়, বাংলাদেশে তার জন্ম নয়।

অ্যানের সঙ্গে তো বেশ ঘুরতেন। একবার বললেন না, ভালোবাসেন ?

ভাইয়ান লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে, পা সমুখে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বাধা পেয়ে, পা আবার গুটিয়ে বলে, সে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরলে ও রকম মনে হয় ডাক্তার সাহেব। তাছাড়া দেখুন না, দেশে কোনো ডাক্তার নার্স বিয়ে করলে ছি ছি পড়ে যায়, ডাক্তারেরাই যেন এক ঘরে করে রাখে। এখানে শাদা চামড়া বলেই নার্স উচ্চপদবাচ্য হয়ে গেল ? অনেক ভেবে দেখলাম বারী সাহেব, নাহ্, বিয়ে করলে বাঙালি। আমার অন্তত ও সব পোষাবে না। বিছানায় নিজের দুদিন ফুর্তির জন্যে সারা জীবন দেশ ছেড়ে, বাপ-মা ভাই-বোন ভুলে বেকড বীনস আর সসজে খেয়ে থাকতে পারব না।

সেই জন্যে বাঙালি মেয়ে খুঁজছেন ?

হাঁ, তাই আর কী। রুহুল কুদ্দুসও খুব করে বলল। ভাবলাম দেখেই আসি। দেখতে ক্ষতি কী ?

নিজের উদ্দাম আগ্রহ, বারীকে আগে থেকে জানান না দিয়ে টেনে আনবার জন্যে বিবৃতি, এক সঙ্গে সব চাপা দেবার জন্যে ডাঃ ভাইয়ান গলায় তাচ্ছিল্যের সুর আনে। যেন, নেহাত একটা মজা করতে যাচ্ছে, বিয়েটা কোনো কথাই নয়।

ডাঃ বারী হঠাৎ জিগ্যেস করে, আচ্ছা সেই রুহুল কুদ্দুস এখন কী করে ?

লন্ডনে কিং এডোয়ার্ড হাসপাতালের কনসালট্যান্ট।

বুকের ভেতরে আবার খোঁচা অনুভব করে বারী। ম্যানচেস্টার থেকে তাকে মেয়ে দেখার জন্যে না বলে নিয়ে আসার দরুণ ভেতরটা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে তার। নীরবে সে গাড়ি চালাতে থাকে।

৫

দুপুরের পর যে-কোনো সময় বজুলল করিম সাহেব আসবেন ঢাকার টিকিট নিতে। টিকিট আনতে এক্ষুণি না বেরুলে নয়। মিস্টার আলি আপিস ঘরে ফিরে এসে শূন্য দৃষ্টিতে করিম সাহেবের নাম লেখা চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতক্ষণ নাহার আপিস ঘরেই বসেছিল। ঘর খালি রেখে যেতে পারে না। এখন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে বুঝে নেয়, মাহজাবীনের কাছ থেকে কোনো কিছু জানা যায় নি।

দাঁড়িয়ে না থেকে বোসো। ভয়ে ভয়ে নাহার বলে।

চেয়ারে বসে আলি দুহাতে মাথার দুপাশ ধরে পাথরের মতো বসে থাকেন। কী করবেন, কোন পথে এগোবেন, কিছুই ভেবে পান না। তাঁর স্ত্রীও চুপ করে বসে। তার এই চুপ করে থাকাটা আলিকে বরং ক্ষিপ্তই করে তোলে।

বসে আছ কী করতে ? যাও সারা লন্ডনে বলে বেড়াও তোমার মেয়ের কীর্তি। তারা বাহবা দেবে।

নাহার কিছু বলে না।

বারবার বলেছি, দেশ থেকে বই আনিয়ে দিয়েছি, কতবার তোমাকে বলেছি, মেয়েদের নামাজ পড়া শেখাও, আদব কায়দা শেখাও। আরবি অক্ষর শেখাও, সপ্তাহে অন্তত একদিন বসে কোরান পড়ুক। মেয়ে সেয়ানা হয়ে যায়, তোমার হুঁশ হয় না। ছিছিছি। লোকে কী বলবে ?

নাহার মৃদুস্বরে বলে, কী জানি, বন্ধুর বাড়িতে রাত হয়ে গেছে বলে থেকে গেছে কিনা।

থেকে গেল বেলা দশটা পর্যন্ত ? তার হুঁশ নেই, একটা ফোন করত না ? আর ও রকম থাকবেই বা কেন ?

মেয়ের বাইরে রাতবাস করবার কথা ভেবেও শিউরে উঠেন আলি।

এখন আবার আমার বিমান আপিসে যাওয়া দরকার।

নাহার উঠে দাঁড়ায়। বলে, মেয়ের দায়িত্ব আমার একার ছিল না।

তা কার ছিল ? তোমার কাজটা কী শুনি— মেয়ে লেহাজ-তমিজ মায়ের কাছ থেকে শিখবে না কার কাছে শিখবে ? ছেলে হলে আমাকে বলতে পারতে। মেয়ের দায়িত্ব মায়েদের। ছেলে তো জন্ম দিতে পার নি। তিনটে মেয়ে জন্ম দিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছ।

নীরবে নাহার আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শোন।

নাহার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আছ না গেছ ?

শুনছি।

মেয়ের বন্ধু বান্ধব যারা আছে টেলিফোন কর। জিগ্যেস কর, কেউ জানে কিনা, কারো কাছে আছে কিনা। অন্তত এ কাজটা কর। যত দায়িত্ব আমার ? মানসম্মান গেলে আমার যাবে, না, তোমারও যাবে ?

মিস্টার আলি আপিসের দরোজা বন্ধ করে 'ক্লোজড' লেখাটা সমুখে ঝুলিয়ে দেন। তারপর হঠাৎ করে মনে পড়ে করিম সাহেব যদি আসেন ?

দরোজা আবার খুলে 'ক্লোজড' লেখা সরিয়ে আলি বলেন, আপিসে বোসো। ফোনটোন যা করতে হয় এখান থেকে কর। আমি ঘুরে আসি। এবার ব্যবসাটা লাটে উঠলেই মা-মেয়েতে শান্তি পাও।

হল থেকে কোট হাতে নিয়ে আলি দুমদাম করে বেরিয়ে যান।

নাহার নিচের তলা থেকেই ডাকে, বীনা।

মাম।

নিচে এসো।

মাহজাবীনের আগে নাসরিন নেমে আসে। আলির চেয়ারে নাহার এখন বসেছে। চেয়ারের হাতল ধরে নাসরিন বলে, মাম, বুবু কি চিরদিনের মতো চলিয়া গিয়াছে ?

চুপ কর।

কেন চুপ করিব ?

বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করিতে শিখেছ ?

কী বলিতেছ ? বুঝি না।

বুঝবে কেন ? ভেতো বাঙালির মেয়ে বাংলা বুঝবে কেন ?

নাসরিন এ কথার একবর্ণ বোঝে না। তাঁর মাথায় যে কথাটা ঘুরছে, পরিষ্কার বলে ফেলে।

মাম, বুবুর ঘর আমাকে দিতে হইবে। বীনাবুবুকে আমি পছন্দ করি না। তাহার সহিত বাস করিব না।

ওপরে যাও, রিনা।

মায়ের গম্ভীর আদেশ শুনে একটু হকচকিয়ে যায় নাসরিন। তারপর সামলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, দায় পড়িয়াছে।

এখন ঠিক আলির মতো ভঙ্গিতে নাহার দুহাতে মাথা ধরে বসে থাকে। চোখ বুঁজে বাস্তবতার বোধ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে অনেকক্ষণ ধরে। সফল হয় না। হাল ছেড়ে দেয়। হঠাৎ মনে পড়ে মাহজাবীন সাড়া দিয়ে এখনো আসে নি।

বীনা।

সে ডাক ওপর পর্যন্ত পৌছুলো কিনা, সন্দেহ হয়। উঠে দরোজা খুলে নাহার চিৎকার করে বলে, তুইও কি বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিস, হারামজাদি ? তাই যা। ভালোমানুষ সেজে থাকিস, মনে করিস মা বোকা, মা কিছু বোঝে না ? এইবার আমি হাড়ে হাড়ে বোঝাব। নেমে এসো নিচে।

ধীর পায়ে নেমে আসে মাহজাবীন।

প্যাড পরিবর্তন করিতে ছিলাম। ডাকিলেই কিছু সঙ্গে সঙ্গে আসা যায় না।

নির্লজ্জ। দুনিয়াকে জানান দিয়ে প্যাড বদলাও। মুখে আনতে শরম নাই। বেহায়া মেয়ে।

মাহজাবীন বিস্মিত হয়।

ইহা জৈবিক ব্যাপার, ইহাতে লজ্জিত হইবার কী আছে ? তুমি নারী নও ? নারীত্বের কারণে তুমি লজ্জিত ? কেন ডাকিতেছিলে ?

রাগটা মনের ভেতরে পুষে রেখে দিতে হয়, একই সঙ্গে হতাশও বোধ করে নাহার। মেয়েদের মুখে হঠাৎ হঠাৎ এ সব কথা শুনে, একেক সময় তার মনে হয় না এরা তার পেটের মেয়ে।

নাহার বলে, মিনার বন্ধুদের ফোন নম্বরগুলো দে।

সে তাহার ঠিকানা-বহিতে আছে।

সে বই নিয়ে আয়।

সে উহা লইয়া গিয়াছে। উহা তাহার ঝুলিতে থাকে।

নাহার ভীষণভাবে পরাজিত বোধ করে।

মাম, তুমি কাঁদিতেছ ?

টপটপ করে চোখের পানি পড়ে নাহারের। মোছার চেষ্টা পর্যন্ত সে করে না। যেন তার হাতও তার নিয়ন্ত্রণে নয়।

তুমি কাঁদিতেছ কেন?

৬

ভিনসেন্ট প্রস্তাব করে, প্রকৃতপক্ষে ইয়াসমিন আজ নবজন্ম গ্রহণ করিল। সে আমাদের মধ্যে আসিল। আইস আমরা আনন্দ করি।

মেঝের ওপর বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পিটার তখন থেকে কোকোর গালে চুমো খাচ্ছিল। ভিনসেন্টের প্রস্তাব শুনে সে তার আনন্দময় কাজে ক্ষণকালের বিরতি দিয়ে বলে, তাহার পূর্বে জন্মগ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক।

কোকো পিটারের গালে চুমো দিয়ে সমর্থন জানায় এবং তার দুই উরুর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে বলে, শীত করিতেছে। উষ্ণতা ধার লইতেছি।

পিটার কোমল হাতে কোকোকে ছাড়িয়ে এবার উঠে দাঁড়ায়। উর্ধ্ববাহু হয়ে ঘুরে ঘুরে সে বলে, বন্ধুগণ, ইয়াসমিন এখন জন্মগ্রহণ করিবে।

সকলে এমনকি ইয়াসমিন নিজেও হাততালি দিয়ে ওঠে।

উত্তম, উত্তম প্রস্তাব।

অলবানি স্ট্রীটের এই বিশাল তেতলা বাড়িটি বহুদিন খালি পড়েছিল। লন্ডনে এমন বহু বাড়ি আছে, কোনো কারণে খালি। প্রধান একটা কারণ, মালিক বেশি ভাড়ার আশায় ফেলে রাখে। আরেকটা বড় কারণ, পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে নতুন বহুতল দালান ওঠানোর অনুমতি পাওয়া নিয়ে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে টানাহেঁচড়া চলে, সেই অবসরে বাড়িটি থাকে খালি পড়ে।

কিছুদিন থেকে একটা হাওয়া বইছে। কিছু তরুণ-তরুণী, কিছু দম্পতি একসঙ্গে মিলে এই সব বাড়ি দখল করে বিনাভাড়ায় বাস করছে। তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশই এক ধরনের আদিম ও মৌলিক জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। এরা যতদিন পারে সরকারের কাছ থেকে বেকার ভাতা নেয়। যখন বেশি চাপ আসে একটা কোনো কাজ জুটিয়ে নেয়, রেস্তোরাঁর কাজ, রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ, দেয়ালে রঙ বা কাগজ লাগাবার কাজ, বড়লোক বাড়ির বাগান পরিষ্কার রাখবার কাজ। বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবন-যাত্রার প্রতি এদের চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা। যে-কোনো আচার বা আনুষ্ঠানিকতা এদের চোখের বিষ। একে অপরের জিনিস ভাগ করে ব্যবহার করে, প্রায়ই জোড়া পাতিয়ে নেয়; স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে, কখনো খায় কখনো খায় না। নিয়মিত গ্রহণের ভেতরে গাঁজা বা চরস জাতীয় কিছু।

ইয়াসমিনের বন্ধু এবং বান্ধবীদের ভেতরে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যে কয়েকজন, তারা সকলেই একে একে লেখাপড়া ছেড়ে, বাবা বা মায়ের বাড়ি ছেড়ে অলবানি স্ট্রীটের এই বাড়ির তেতলায় এসে জায়গা নিয়েছে আজ বেশ কয়েক মাস। নিচের দুটি তলাতেও এ ধরনের কিছু দল আছে। আসলে, আগে থেকে যারা পরিচিত, তারা এখানে এসেও সূত্রটা রক্ষা করে বলে ছোট ছোট দলে তারা ভাগ করা মনে হয়। সবাই আবার এক সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন বসে বাড়ির ভালোমন্দ, পানি বিজলী নিয়ে আলোচনা করে। পুলিশি উৎখাত

উৎপাতের মোকাবেলা করা যায় কী করে, আলাপ করে।

মায়ের কাছে বন্ধুর জন্মদিনের কথা মিথ্যে বলে ইয়াসমিন সোজা চলে আসে অলবানি স্ট্রীটের তেতলায়। তাকে দেখে হৈচৈ করে ওঠে পিটার, ভিনসেন্ট, জো, গ্যাবি, কোকো, প্যাম, এমনকি স্বভাবতই যে চুপচাপ থাকে, রাতে গোরস্তানে গিয়ে গিটার বাজায়, সেই মার্ক পর্যন্ত খুশি হয়। এরা সকলেই এক ইস্কুলে পড়াশোনা করত। এদের দলে এতদিন নাম লেখায় নি কেবল ইয়াসমিন।

সন্ধে বেলায় এসে প্রথমে সে বলে নি, বাড়িতে আর ফিরবে না বলেই সে এসেছে। সমস্ত সন্ধে-রাত, দুপুর-রাত পর্যন্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যাবার পর, গ্যাবি আর ভিনসেন্ট, কোকো আর পিটার, প্যাম আর জো, একে অপরের কাঁধে মাথা রেখে জুটি বেঁধে যাবার পর ইয়াসমিন ভীষণ একা বোধ করতে থাকে। তার একবার মনে হয়, বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু এদের মুক্ত এই জীবন তাকে আয়নার মতো আকর্ষণ করে রাখে। দূরে, একা, আপনমনে গিটার বাজাচ্ছিল মার্ক। সে ধীরে এগিয়ে আসে ইয়াসমিনের কাছে এবং একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করে— বন্ধুদের সান্নিধ্যে নিঃসঙ্গ বোধ করিও না। তারপর আর কিছু না বলে গিটার নিয়ে কিছুক্ষণ টুংটাং করে খসখসে গলায় গান ধরে মার্ক। কথাগুলো ইয়াসমিনকে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

অদ্যই আগামীকাল, আগামীকালই অদ্য। জন্মই মৃত্যু এবং মৃত্যুই জীবন। সম্পদই দারিদ্র্য দারিদ্র্যই সম্পদ। বন্ধু উপলব্ধি করিলেই তুমি আমার বন্ধু। তোমারও স্থান আছে ছেঁড়াকোটের তলায়।

মানুষের চোখে চোখ— ইন্দ্রজাল। জলের গভীরে মাছ— ইন্দ্রজাল। শব্দের অতলে নীরবতা— ইন্দ্রজাল। বন্ধু, কোলাহল থামলেই তুমি আমার বন্ধু। তোমারও স্থান আছে হৃদয়ের আগুনের পাশে।

সারারাত ঘুমের ভেতরেও গানটি শুনতে পায় ইয়াসমিন। সকালে জেগে উঠে নিজেকে যখন সে আবিষ্কার করে তারা সকলে মেঝের ওপর গোল হয়ে ঘুমিয়ে আছে তখন সে আপন মনেই বলে ওঠে, ইহা সুন্দর, ইহা কী সুন্দর!

তারপর ঘুম থেকে উঠে সবাই গোল হয়ে যোগাসন করতে বসে। ইয়াসমিনের অভ্যেস নেই, তবু সেও তাদের অনুকরণ করে। ভিনসেন্টের নেতৃত্বে আধঘণ্টা ধ্যান শেষ হবার পর ইয়াসমিন সোজা উঠে গিয়ে তাকে বলে, এই আমার বাসগৃহ। আমাকে তোমরা গ্রহণ করিবে?

ভিনসেন্ট ঘোষণা করে, হাততালি থেমে যাবার পর, অতঃপর ইয়াসমিন জন্মগ্রহণ করিবে। আমরা সেই স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিব।

এই দলটির প্রধান হিসেবে ভিনসেন্টকে সকলেই মান্য করে। বয়সেও সে সকলের চেয়ে বড়। তার বাবার অবস্থাও অত্যন্ত ভালো. বাবা বিলেতের সবচেয়ে নামকরা স্থপতি। ভিনসেন্টের মতে, তিনি মানুষের জন্যে কারাগার নির্মাণ করেন। উন্মুক্ত আকাশ নির্মাণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

ভিনসেন্ট এখন অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব দেয়। দলনেতা হিসাবে সে তার জুটি গ্যাবিকেই জননী হিসাবে মনোনয়ন করে।

ভিনসেন্ট ঘোষণা করে, তোমরা দেয়াল ঘেঁষিয়া চক্রাকারে উপবেশন কর। পদ্মাসনে তন্ময় হও। অতঃপর, গ্যাবি, এই রমণী, বিশ্বজননী হইল। ইয়াসমিন, নিকটে আইস। তুমি কি এই রমণীকে চিনিতে পার?

ইয়াসমিন ঠিক বুঝতে পারে না, কী তার উত্তর হওয়া দরকার। সে নিজেকে তুচ্ছ ও অসহায় বোধ করতে থাকে।

ভালো করিয়া অবলোকন কর। অনুমান হয়?

গ্যাবি গোল চক্রের মাঝখানে ধ্যাননেত্রে বসে আছে। তার কাঁধের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে সোনালি দীর্ঘচুল। মুখখানি একই সঙ্গে কোমল ও কঠিন বলে মনে হচ্ছে। ইয়াসমিন হঠাৎ যেন এতদিনের চেনা গ্যাবিকে চিনে উঠতে পারে না। মুহূর্ত কালের জন্যে তার ভয় হয়। সে পাশে তাকাতেই মার্ক হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এসে তার কানে কানে বলে, বল, হাঁ, চিনিতে পারিতেছি। ইনিই আমার গর্ভধারিণী।

হাঁ, চিনিতে পারিতেছি, ইনিই আমার গর্ভধারিণী।

সন্দেহ নাই?

ইয়াসমিন অনুষ্ঠানের মাদকতায় প্রতিধ্বনি করে ওঠে, সন্দেহ নাই।

ভিনসেন্ট চোখ বুঁজে গম গম গলায় উচ্চারণ করে, তবে গর্ভে প্রবিষ্ট হও।

ইয়াসমিন আবার অপ্রতিভ বোধ করে। কী কর্তব্য অনুমান করতে পারে না। এদের উপযুক্ত সে এখনো নয়, তাকে ক্লিষ্ট করে ফেলে।

ভিনসেন্ট নিমিলীত চোখেই বলে, ক্ষণকাল অপেক্ষা করবার পর, বালিকাগণ, তোমাদের কি কর্তব্যবোধ নাই? তোমাদের ভগ্নীকে সাহায্য করিবার কোনো প্রেরণাই কি বোধ করিতেছ না?

চঞ্চল হয়ে ওঠে প্যাম, কোকো। তারা জো আর পিটারের পাশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে ইয়াসমিনের কাছে। ইঙ্গিতে তাকে উঠে দাঁড়াতে বলে। বসে থাকা প্রত্যেকের দিকে চোখ না ফিরিয়েও ইয়াসমিনের মনে হয়, সে ভীষণ লম্বা হয়ে গেছে। তার সংকোচ বোধ হয়। কিছুক্ষণ পর অতি ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ায় কোকো আর প্যাম। নিঃশব্দে তারা ইয়াসমিনের দেহ থেকে একে একে সোয়েটার, জামা, লম্বা স্কার্ট স্নেহের সঙ্গে খুলে ফেলতে থাকে। ইস্কুলে সাঁতার কেটেছে, যদিও বাবা জানলে তাকে সাঁতার কাটতে দিতেন না ঐ সংক্ষিপ্ত পোশাকে, এ ছাড়া প্রকাশ্যে অনাবৃত হবার অভিজ্ঞতা তার নেই। মুহূর্তের জন্য একবার মনে হলো, তার ভীষণ লজ্জা করবে। কিন্তু একে একে যখন সমস্ত কিছু পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, তখন বিন্দুমাত্র মনে হলো না, সে উলঙ্গ। নগ্নতার উপলব্ধি যদি কিছুটা হয়ে থাকে তো শীতবোধেই তা সীমিত। তার নিজের মনে হয়, লজ্জায় নয় শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দুহাত বুকের ওপর গুটিয়ে আনে এবং দু হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে দেয়।

সে কাঁধ গুটিয়ে বসে পড়তে গিয়েও, পাছে কিছু ত্রুটি হয়, বসে না।

ভিনসেন্ট নির্দেশ উচ্চারণ করে, প্রবিষ্ট হও।

তার সেই কণ্ঠস্বরের অভিঘাতেই যেন ইয়াসমিন উপুড় হয়ে বসে পড়ে। তার মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম করতে থাকে। ভোরে উঠেই এক প্রস্থ ধোঁয়া গেলার পর যা মনে হয় নি, এখন

নিজেকে অস্বভাবিক রকমে নির্ভার ও অবাস্তব বলে বোধহয় তার।

ইয়াসমিন কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। শিশুর মতো তার পা ভাঁজ হয়ে আসে বুকের কাছে, তার ফাঁকে দুহাত গুঁজে দেয় সে। ঠোঁট নীল হয়ে যায় শীতে ও উত্তেজনায়। ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে থাকে।

ইয়াসমিন প্রবিষ্ট হও।

ইয়াসমিন তার দুপাশে কিছু একটার উপস্থিতি অনুভব করে। চোখ খুলে দ্যাখে গ্যাবি যে এতক্ষণ পদ্মাসনে বসেছিল, এখন সে দুপা ছড়িয়ে ইয়াসমিনের দুদিকে মেলে দিয়েছে। তখন তার পাশ থেকে সরে গেছে প্যাম আর কোকো। তারা ফিরে গেছে জো আর পিটারের কাছে। যার যার জুটির হাত শক্ত মুঠোয় ধরে তারা বিস্ফারিত চোখে স্থির তাকিয়ে আছে ইয়াসমিনের দিকে।

ধীরে ধীরে গ্যাবি এগোয়। বসে বসেই সে এগিয়ে এসে দুপায়ের ভেতরে ইয়াসমিনের মাথাটা সম্পূর্ণ নিয়ে নেয়। তারপর নিজের লম্বা স্কার্ট দিয়ে ঢেকে দেয় তার মাথা, কাঁধ, পিঠ। ক্রমশ ইয়াসমিনের পুরো দেহে ঢাকা পড়ে যায় গ্যাবির ঢিলে স্কার্টের তলায়।

মার্ক তার গিটারে ঝন-ঝনাৎ করে অপ্রত্যাশিত এবং ক্ষণস্থায়ী আওয়াজ তোলে।

ইয়াসমিন, তুমি এখন কোথায় ?

এইখানে।

বিশ্বজননীর গর্ভে ?

সকলে একসঙ্গে মন্ত্রের মতো প্রতিধ্বনি করে, বল, হাঁ, বিশ্বজননীর গর্ভে।

হাঁ, বিশ্বজননীর গর্ভে।

তুমি কি গর্ভের উষ্ণতা বোধ করিতেছ ?

এবার সমবেত সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইয়াসমিন বলে— হাঁ, গর্ভের উষ্ণতা বোধ করিতেছি।

তোমার কি ভ্রূণাবস্থা ?

হাঁ, আমার ভ্রূণাবস্থা।

তোমার কি হস্তপদ আছে ?

না, আমার হস্তপদ নাই।

তোমার কি চক্ষু আছে ?

না, আমার চক্ষুও নাই।

ভিনসেন্ট এবার আদেশ করে, তুমি প্রার্থনা কর— আমাকে ভ্রূণ হইতে পূর্ণদেহ কর যাহাতে দেহের সমস্ত সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতে পারি, আমাকে হস্তপদ প্রদান কর যাহাতে নির্মাণ ও অতিক্রম করিতে পারি, আমাকে চক্ষু দাও যাহাতে বন্ধুকে অবলোকন করিতে পারি। তুমি ভূমিষ্ঠ হও।

সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসমিন টের পায় গ্যাবির পা দুখানা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। প্রথমে সে গুরুত্ব দেয় নি, ক্ষণকাল পরে কণ্ঠনালীর ওপর পায়ের সবল চাপ অনুভব করে সে। গ্যাবির

স্কার্টের ভেতর তার সমস্তটা শরীর, ফলে নিঃশ্বাস নেয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ে। সে ছটফট করতে থাকে। আর্তনাদ করে ওঠে। গ্যাবি আরো জোরে পীড়ন করতে থাকে তাকে। সে তখন নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, গ্যাবির স্কার্টের তলা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

মুহূর্তেই সে বেরিয়ে আসে গ্যাবির স্কার্টের ভেতর থেকে। বেরিয়ে মেঝের উপর নগ্নদেহে পড়ে থেকে সে হাঁপায়। সকলে একসঙ্গে 'আহ' ধ্বনি করে ওঠে। প্যাম একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয় ইয়াসমিনকে।

ভিনসেন্ট ঘোষণা করে— বালিকার জন্ম হইয়াছে। সে এখন শায়িত আছে। ক্ষণকাল পরে সে যৌবনপ্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের আনন্দে অংশগ্রহণ করিবে।

ইয়াসমিন উপলব্ধি করে, মায়ের পেট থেকে বেরুবার অভিনয় সে এইবার করে উঠল। গ্যাবি পা দিয়ে চেপে ধরায় অভিনয় যে জীবন্ত হয়, এতে সে আমোদ বোধ করে এখন। বন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করে।

ভিনসেন্ট বলে, আজ আমরা দিবস ও রজনী আনন্দ করিব। ইয়াসমিন, উঠ, বস্ত্র পরিধান কর। তুমি এখন যথার্থই আমাদের হইলে।

ইয়াসমিন উঠে বসে প্যামের দিকে হাত বাড়ায়— আমার শার্ট কোথায় রাখিয়াছ ?

উহা এখন পরিতে পারিবে না। ভিন্ন পোশাক পরিতে হইবে।

আমি যে দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে আনি নাই। মাহজাবীনকে বলিয়া আসিয়াছি, সে যদি পারে আমার কিছু কাপড় ও জিনিস দিয়া যাইবে।

তবে এখনকার মতো আমার জীনস পরিয়া লও।

ইয়াসমিন কম্বল গায়ে উঠে দাঁড়ায়। পাশের ঘরে গিয়ে প্যামের হাত থেকে জীনস নেয়।

প্যাম বলে, তোমার জন্মগ্রহণ সুন্দর হইয়াছে।

অদ্ভুত মনে হইলেও অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্য আছে।

ইহা ভিনসেন্টের উদ্ভাবনা। সে বলে, আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন দলীয় সংহতি নাই, আত্মার বন্ধনও স্থাপিত হয় না।

আমার তো এখন মজাই লাগিতেছে। বাড়ি হইতে পালাইয়া বাঁচিয়াছি। নইলে আজই হয়তো আমার বিবাহ দিয়া দিত।

জীনস পরে ইয়াসমিন বলে, নগ্নবক্ষ হইয়া থাকিব নাকি ? জামা দিবে না ?

নগ্নই তো সুন্দর। তোমার বক্ষের গড়ন অপূর্ব। বলতে বলতে প্যাম একটা লেবু-হলুদ শার্ট ধার দেয়।

ভারি সুন্দর শার্ট। কোথা হইতে কিনিয়াছ ?

পোর্টোবেলো মার্কেট হইতে চুরি করিয়াছি।

মাহজাবীন আমার পোশাকগুলি আনিতে পারিবে কিনা, কে জানে।

ইয়াসমিন যখন পাশের ঘরে ফিরে যায়, তাকে দেখেই পিটার শিস দিয়ে ওঠে। তার বান্ধবী কোকো সঙ্গে সঙ্গে আদরের কোমল চড় লাগিয়ে দেয় পিটারকে। শাসন করে— ভিন্ন ক্ষেতে ফসল বপন করিবে না।

পিটার চটপট উত্তর দেয়, শিস ক্ষেত দেখিয়া দিই নাই, ক্ষেতের গায়ে টাঙ্গানো নোটিশ দেখিয়া দিয়াছি।

পিটার আঙ্গুল দিয়ে ইয়াসমিনের পেছনটা দেখিয়ে দেয়। সেখানে, জীনসের ওপর সাটা স্টিকার। তাতে লেখা I'M A LUNATIK.

ভিনসেন্ট ইয়াসমিনকে কাছে ডাকে। তোমার সঙ্গে অর্থ কী পরিমাণ আছে?

গুনিয়া দেখি নাই। সামান্য আছে।

বৃদ্ধের কিঞ্চিত খসাইয়া আসা উচিত ছিল। উহারা পুঁজিবাদী। যে ভবিষ্যত আনবিক বোমার আতঙ্কে দ্বিখণ্ডিত, উহারা সেই ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে। অথচ কুসুমের সন্তানেরা ধ্যানের খোরাক পায় না। উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। ধরা পড়িলে কারাদণ্ড, তাও দীর্ঘমেয়াদী।

পাউণ্ড দশেকের মতো ছিল, ইয়াসমিন ভিনসেন্টের হাতে তুলে দেয়।

মাহ্‌জাবীন আসিলে বলিব, আমাকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবে।

ভিনসেন্ট উপদেশ করে, সরকারি আপিসে গিয়া বেকারভাতার জন্য নাম লিখাইয়া আসিবে। তুচ্ছ এই বাস্তব লইয়া কথা বলিতে আমার ভালো লাগে না। পিটার সিগারেট বানাইতেছে। তুমি আমার নিকটে থাক। আনন্দে তোমাকে দীক্ষা লইতে হইবে না?

গাঁজার অভ্যাস আমার আছে। পিটার জানে। গ্যাবি জানে। আজ প্রভাতেও গোটা তিনেক টান দিয়াছি।

ইয়াসমিনের বাহাদুরি নস্যাৎ করে দেয় ভিনসেন্ট। বলে, টানিলেই টানা হয় না। টানিবার মতো টানিতে হয়। নিজেকে প্রস্তুত করিতে হয়। তোমাকে দেখাইয়া দিলে বুঝিবে, পূর্বের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাই নহে।

ইয়াসমিন হঠাৎ লক্ষ করে মার্ক গিটারে টুংটাং করতে করতে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

কী মার্ক?

মার্ক আপন মনে টুং টাং করে চলে। উত্তর দেয় না। দৃষ্টিও ফিরিয়ে নেয় না। তখন ইয়াসমিন তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, ড্যাবড্যাব করিয়া কী দেখিতেছ? তোমাকে তো ভালো মানুষ বলিয়াই জানিতাম।

মার্ক টুংটাং করতে করতেই প্রশ্ন করে, ইয়াসমিন, তুমি কি কাহারো সহিত নিদ্রা গিয়াছ?

না।

আমারও তাই বোধ হইতেছিল।

যখন আমার দেহ নগ্ন ছিল, তুমি বুঝি এই দেখিতেছিলে?

হাঁ, সত্য বলিলাম।

দেখিলে, তো বুঝিলে কী করিয়া আমি কুমারী? এত অভিজ্ঞতা কাহার কৃপায় লাভ করিয়াছ, মার্ক। বল, আমাকে সত্য করিয়া বল। আমার কাছে লুকাইবে না। আমি সব শুনিতে চাই।

তুমি আমার সহিত নিদ্রা যাইবে?

ইয়াসমিন একটু চিন্তা করে বলে, প্রস্তাব করিতেছ, না ঠাট্টা করিতেছ ? যদি ঠাট্টা হয়, তোমার মুখে জলত্যাগ করিব।

আর যদি প্রস্তাব হয় ?

ভাবিয়া দেখিব, তোমার মতো অভিজ্ঞলোকের কাছে কুমারীত্ব বিসর্জন দিব, না কোনো অনিপুনকে বাছিয়া লইব। মার্ক ঠাট্টা রাখ। তুমি কি সত্যই এইসব ভাবিতেছিলে ?

তুমি হয়তো জান না ইয়াসমিন, নারীর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নাই। যদি চাহিতাম, গ্যাবির সহিত, কোকোর সহিত, প্যামের সহিত, এমনকি তোমার সহিত নিদ্রা দিতে পারিতাম। নিচের তলায় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও, তিন বালিকা আমার সহিত সম্পর্ক করিতে খেপিয়া রহিয়াছে।

তবু, মুখ খারাপ করিলে কেন ?

আমি যখন গান রচনা করি, ইয়াসমিন, তখন আমার চেতনার অভ্যন্তরে দুই শক্তি ক্রিয়া করে। এক, কাব্যশক্তি, দুই, দেহশক্তি। উভয়ই মূলত প্রজনন। রচনাকালে আমি নারী সঙ্গ কল্পনা না করিয়া পারি না। কখনো কখনো আমার স্খলনও হয়।

এখন ?

এখনও পরাজিত নহি ? তোমার জন্য এই মাত্র একটি গান রচনা করিতেছিলাম। যদি শুনিতে চাও, গাহিতে পারি।

আমি শুনিব। আমাকে লইয়া পূর্বে কেহ গান রচনা করে নাই।

ভিনসেন্ট এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল পিটারের সঙ্গে বসে সিগারেট বানানোয়। ইয়াসমিনকে মার্কের সঙ্গে, যে মার্ক স্বভাবতই কম কথা বলে, কথা বলতে দেখে সে দূর থেকেই হলা দেয়।

ইয়াসমিন সাবধানে থাকিও, কোনো কোনো জন্তুর বাকশক্তি নাই, কামড় দিতে দড়।

মার্ক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গান ধরে, মৃদু গলায়, ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার বাসায় আসিও না। ভুলিবার জন্য কেহ ভালোবাসিও না। ইহার চেয়ে শূন্যতা অনেক ভালো। ইহার চেয়ে শূন্য চোখে দূরের কোনো জামার দিকে দৃষ্টি করা অনেক ভালো। ও ইয়াসমিন, আসিও না, ভালো বাসিও না।

ভিনসেন্ট উঠে আসে ইয়াসমিনের কাছে। বলে, সিগারেট প্রস্তুত, দীক্ষা লইবে না ?

৭

রাগের মাথায় বললেও, কথাটা ঠিকই বলেছিল নাহার। মাহজাবীন আসলে ইয়াসমিনের চেয়েও ধুরন্ধর। বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় না, ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে। এমন চমৎকার তার অভিনয় যে মিস্টার আলির মতো দশ ঘাটের পানি খাওয়া লোক মাহজাবীনের সম্পর্কে একেবারে উলটো ধারণা নিয়ে বসে আছেন।

ইয়াসমিন যে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে মাহজাবীন তা গতকালই জানত। দুবোনে এ নিয়ে লম্বা পরামর্শও হয়েছে।

আমি কি গোবৎস, বীন, যে একজন কৃষক আমাকে কিনিবার জন্য দেখিতে আসিতেছে ? কাল তোমার বিবাহ দিবে, পরশু আমাকেও কাহারো হাতে তুলিয়া দিবে।

এই পিতামাতার হাতে পড়িয়া জীবন একশেষ হইল। হাত খরচের অর্থ পাই না চুরি করিতে হয়, বাহিরে গেলে তিরস্কার শুনিতে হয়, ফোন ব্যবহার করিলে পিতা সর্বস্বান্ত হইবার অভিনয় করেন।

আবার মায়ের বাঙালি বান্ধবীরা আমাদের চলন লইয়া যখন উদ্বেগ প্রকাশ করেন, কেন আমরা গা ঢাকিয়া পোশাক পরি না অনুযোগ করেন, কেন আমরা বাংলা বলিতে পারি না বলিয়া খুঁত ধরেন, তখন মা একেবারে আমাদের লইয়া পড়েন।

উহারা কেবল কারি রাঁধিতে জানে, জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই।

আমাদের আর-আর বন্ধুরা কী সুখে আছে!

তাই আমি চলিলাম। সাবধান, প্রকাশ না পায়।

পাইবে না।

প্রকাশ হইলে তোমারই মন্দ। তোমাকে আর বাহির হইতে সাহায্য করিতে পারিব না, বীন। ভান করিবে যেন তুমি কিছুই জান না।

তোমাকে আর শিখাইয়া দিতে হইবে না। আমার বয়স যদি ষোল হইত, আমিও বাড়ি ছাড়িয়া দিতাম। তোমার মতো স্বাধীন হইতাম।

সেদিন দেখিয়াছি, মালেকা, তোমার বয়সী, দিব্যি বাড়িতে সিগারেট খাইতেছে। তাহার মা কিছুই মনে করে নাই। আমরা বিয়ার লেমনেড দিয়া খাই, তাহার পরে কড়া ঝাঁঝের চুয়িংগাম খাই, তবু আশঙ্কা হয় মা ধরিয়া ফেলিবেন। কেন, আমার কি বয়স হয় নাই? আমি কি আপনার ভালোমন্দ বুঝি না।

খাঁটি কথা বলিয়াছ। তবে, আমাকে তো চুপ করিয়া সহ্য করিতেই হয়। পনের চলিতেছে। আর এক বছর পরে কাহারো তোয়াক্কা করিব না। অ্যালিসনের মতো আমিও সিনেমায় যাইব, জিনজার এল দিয়া হুইস্কি পান করিব, নাচিব, গাহিব, পায়ে হাঁটিয়া বিশ্বভ্রমণ করিব। তুমি ভাগ্যবতী, সতের বৎসর হইয়াছে, তুমি চলিলে, আমি পড়িয়া রহিলাম।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা কাছে কাছেই ছিলেন বলে ইয়াসমিন নিজের কিছু কাপড় আর দরকারি জিনিস দুটো ব্যাগে গুছিয়ে রেখেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। ব্যাগ দেখলেই প্রশ্ন হতো, এমনকি যেমন মা, তল্লাশীও হয়ে যেতে পারত। অবশ্য, একবার বেরিয়ে যাবার পর ফিরে এসে ব্যাগ এবং নিজের সব কিছু নিয়ে যেতে বাধা নেই। ষোল বছর বয়স কবেই পার হয়ে গেছে, এখন পুলিশও তাকে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করতে পারবে না, এমনকি এখন সে সোজা ডাক্তারের কাছে গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি চাইতে পারে, মা-বাবার অনুমতি লাগবে না। তবু বাড়ি ছেড়ে পরদিনই বাড়িতে ব্যাগ নিতে আসাটা সহজ নয়। মা-বাবা কান্নাকাটি করতে পারে, এবং হাজার হোক তারা মা-বাবা, যত সেকেলেই হোক তারা একেবারে বুকের ওপর দাঁড়িয়ে গলায় পা দেয়া যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত মাহজাবীনকে বলে যেতে হয়, সে যেন যে করেই হোক অলবানি স্ট্রীটে ব্যাগ দুটো না হোক অন্তত একটা আজ পৌঁছে দেয়।

দুটো নেয়া মুশকিল হবে। মাহজাবীন বোনের ঘরে ঢুকে, খাটের তলা থেকে ব্যাগ দুটো বের করে দ্রুত হাতে বিশেষ জরুরি জিনিস বেছে নেয়। নিয়ে, একটাতে ভরে ফেলে। তারপর, নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার লাইব্রেরি থেকে গত সপ্তাহে ধার করে আনা দুখানা বই

সেই ব্যাগের ওপরে সাজিয়ে রাখে।

ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দ্যাখে, মা কোথায়।

নাহার তখন আপিস ঘরেই। মিস্টার আলি বাইরে থেকে ফেরেন নি।

নিঃশব্দে দরোজা খুলে ঢোকে মাহজাবীন। ইতস্তত করে বলে, মাম, নাসরিন ক্ষুধার্ত।

চৈতন্য হয় নাহারের। সকালবেলায় এত বড় একটা ধাক্কায় ছোট মেয়েটির খাওয়ার কথা একবারেই ভুলে গিয়েছিল। উদ্বেগ আর অপরাধবোধ মিশে গিয়ে তাকে ঝাঁঝালো করে তোলে।

কেন, তুমি কিছু করে দিতে পার নি ? দেখছ না আমি আপিসে আছি ?

তুমি অহেতুক বকিতেছ। আমি খোঁজ নিতে আসিযাছি, তুমি কিছু খাইবে কি না। নাসরিন এবং আমার বিফবার্গার করিতেছি। তুমি খাইবে তো তোমাকেও করিয়া দিই।

মেয়েটির কথায় হঠাৎ কোমল হয়ে যায় নাহারের মন। আহা, পেটের মেয়ে তো, বড়টির মতো নিষ্ঠুর নয়, মায়ের মন খারাপ দেখে কোনোদিন যা করে না, আজ খাবার তৈরি করে দিতে চাইছে।

নাহার মেয়ের হাত ধরে কাছে টানে।

কাছে আয়।

মাহজাবীন ভেতরে ভেতরে খুশি হয়। মাকে রাজি করানো তাহলে শক্ত হবে না। চাইকি ঘণ্টা তিনেকের ছুটিও পাওয়া যেতে পারে। তাহলে সোজা অলবানি স্ট্রীট।

নাহার মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, মিনার মনে কি দয়ামায়া নেইরে ? বাবা-মা, ছোট ছোট দুটো বোন, কারো জন্য মন কাঁদল না ?

মাহজাবীন নাহারের গালে ছোট্ট করে চুমো দিয়ে বলে, আর ভাবিও না, মাম। এখন কিছু আহার কর। আমি আনিয়া দিতেছি।

পাখির মতো উড়ে যায় মাহজাবীন। নাহারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দুটো মেয়ে দু রকম হলো কেন ?

ছোটটিই বা কেমন হবে, কে জানে ? আল্লাকে স্মরণ করে নাহার। দেশের বাড়ির জন্য মন হঠাৎ আকূল হয়ে ওঠে। এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল ঢাকায় থাকা।

ও মা, এর মধ্যে সব করে ফেলেছিস ? আমার যে খিদে নেই মা। মিনার জন্যে কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

তোমার ভালো লাগিবে এবং তুমি আহার করিবে। নহিলে বুঝিব, তুমি আমাদের ভালোবাস না, বুবুকেই ভালোবাস।

অগত্যা খাবার তুলতেই হয় নাহারকে। নাসরিনকে কোলে নিয়ে খেতে থাকে সে।

মাম। মাহজাবীন সাহস করে ডাক দেয়।

কীরে ?

আজ শনিবার। পাঠাগারে বই ফিরাইয়া দিবার দিন।

নাহারের একটু খটকা লাগে। এর আগেও গত শনিবার মাহজীবন বই ফেরাতে গেছে, তার জন্যে ঘটা করে অনুমতি নেয় নি। বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বলেছে, লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।

মায়ের মুখে সহসা মেঘ লক্ষ করে মাহজাবীন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তোমাকে একা ফেলিয়া যাইতে চাহি না। অথচ, আজ বই না ফিরাইলে জরিমানা দিতে হইবে।

নাহারের মন থেকে মেঘ কেটে যায়। ইয়াসমিন অমন একটা কাণ্ড করেছে বলেই মেজ মেয়ে মায়ের কথা এত বেশি করে ভাবছে। মাহজাবীনের দিকে তার সমস্ত স্নেহ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বেশ তো, যা। দেরি করিস না। বাড়িতে মেহমান আসবে।

হাঁ, মাম, তাহাকে কী বলিবে ?

জানি না, কী বলব। সে রওয়ানা হয়ে গেছে, ফোন করে মানা করবারও জো নেই।

আমি না হয় একটা মিথ্যা বলিয়া দিব। তাহাকে গল্পে মাতাইয়া রাখিব। সে কেমন হয়, মাম ?

নাহার প্রীত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে— বুড়ির মতো কথা তোর!

মাম, পাঠাগারের নিকটেই চন্দনা পৌলদের বাড়ি। ফিরবার পথে চন্দনাকে দেখিয়া আসিব ?

উদ্বিগ্ন চোখে মাহজাবীন মায়ের দিকে তাকিযে থাকে। অনুমতি আদায়ের চেয়েও এই মুহূর্তে তার বড় ভাবনা, মা মিথ্যেটুকু ধরতে পারল কি ?

তাহলে নাসরিনকেও নিয়ে যা।

নাসরিন এখনো পড়ছে। সকালের চার্লি ব্রাউন শেষ হয়ে, আরেকটা শেষ হয়ে, তিন নম্বর চার্লি ব্রাউনের বই তার হাতে এখন। নীরবে পড়ে যাচ্ছে আর খাচ্ছে। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাঁচিয়ে দিল নাসরিনই।

চন্দনাকে আমি পছন্দ করি না। তাহার মাথায় উকুন আছে।

মাহজাবীন ভাংচি কাটে।

উকুন তোমার মাথায়, ক্ষুদে শয়তান।

আমার মাথায় উকুন তোমার মাথা হইতে আসিয়াছে।

নাহার বাধা দেয়।

এই শুরু হলো দুজনের। চুপ কর। আমার মন ভালো নেই।

নাসরিন সহজে ছাড়ে না। মাকে সে মনে করিয়ে দেয়, বুবুর যে ঘর খালি হইয়াছে, আমাকে সেখানে দখল দিবে তো ? আমি এই মুখরা বালিকার সহিত এক ঘরে বাস করিব না।

নাহার ধমক দেয়, আহ, রিনা। বুবুকে এভাবে বলতে নেই।

আমি বলিব।

না, বলবে না।

ঠাস করে পিঠে কিল বসিয়ে দেয় নাহার।

বেয়াদব মেয়ে। বীনা, তুই যাবি তো যা। আমাকে আর তোরা জ্বালাসনে। আমার চোখের সমুখ থেকে দূর হয়ে যা।

মাহজাবীন নাহারের চোখের আড়ালে নাসরিনকে ছোট্ট করে ভাংচি কেটে দ্রুত বেরিয়ে যায়। ওপরে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে তরতর করে নামে। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। পাছে, মায়ের মত বদলে যায়। যাবার সময় হল থেকে চিৎকার করে বলে যায়, বিদায়, মাম।

টেলিফোন বেজে ওঠে, মাহজাবীনকে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা বলবার আগেই।

নাহার ফোন তুলে নেয়।

শাপলা ট্রাভেল এজেন্সি। হ্যালো।

করিম বলিতেছি।

আপনার টিকিট তো ?

হাঁ, প্রস্তুত আছে কি ? কখন আসিব ? আপনি কি বাংলা বলেন ?

হাঁ, আমি মিসেস আলি। উনি একটু পরেই ফিরবেন। আপনি তিনটের দিকে আসুন।

আচ্ছা। আচ্ছা, কবেকার ফ্লাইট বলতে পারবেন, মিসেস আলি ?

উনি বলতে পারবেন।

জানতে পারলে ভালো হতো। টেলিগ্রাম করে দিতে পারতাম। বাংলাদেশের ব্যাপার কদ্দিনে পৌঁছায়। আমার আবার আর্জেন্ট ব্যাপার। আচ্ছা, তিনটের সময় আসব।

ফোন রেখে দিতে না দিতেই কাচের ভেতর দিয়ে স্বামীকে দেখতে পায় নাহার। ক্লান্ত পায়ে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছে। রাস্তার ওপারে ক্রসিংয়ে এসে দাঁড়ান আলি। সিগন্যাল দেখে দ্রুত পায়ে পথ পেরিয়ে আবার ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন। হাতের ব্রিফকেসটাও যেন আজ বড্ড ভারি মনে হচ্ছে। একদিকে একটু ঝুঁকে পড়েছেন।

আলি দরোজা ঠেলে ঢুকতেই নাহার উঠে দাঁড়াল। নাহারের চোখে মুখে ফিরে এলো উদ্বেগ, সকালবেলার সমান মাত্রায়।

টেবিলের ওপর ব্রিফকেসটা নামিয়ে রেখে আলি বলেন, থানায় গিয়েছিলাম। বলে চুপ করে বসে থাকেন। অনেকক্ষণ আর কিছু বলেন না।

কেন, থানায় কেন ? কী হয়েছে ইয়াসমিনের ?

নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না নাহার। এই সম্ভাবনাটা তার মাথায় আসে নি কেন ? মেয়েটি বাড়ি না পালিয়ে আসলে কোনো বিপদেও পড়তে পারে তো ? অপহরণ ? ধর্ষণ ? খুন ?

চুপ করে থেকো না, আমাকে বল কী হয়েছে।

না, কিছু হয় নি।

তাহলে থানায় গেলে কেন ?

জানিয়ে রাখলাম ওদের। যেখানেই আছে, বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। নইলে কোনো দুর্ঘটনার কথা দুজনের কারোরই মনে এলো না কেন ? ট্রেনে খবরের কাগজে, কারা ষোল বছরের একটা ইংরেজ মেয়েকে রেপ করে মেরে গেছে, সেই খবর দেখে, মনটা কেমন করে উঠল। গেলাম থানায়। মেয়ের বয়স আইনের চোখে সাবালিকা। স্বেচ্ছায় গেলে তো আর পুলিশ ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু ওদের ব্যবহারটা দেখে অবাক হলাম। আমার গায়ের রঙ দেখে কিনা জানি না, প্রথমে অনেকক্ষণ পাত্তাই দিল না, দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, অথচ লন্ডনের পুলিশের কত নাম কত গল্প শুনেছি, নিজেও দেখেছি, আগে এ রকম ছিল না, এখন

যেন অন্য রকম, আমার কাছে সব শুনে, তেমন কোনো মেয়ের কিছু হয়েছে বলে তাদের জানা নেই এই কথাটা এমনভাবে বলল, যেন আমি মেয়ের বাবা নই, অন্য কেউ, বাইরের কেউ খামোখা বিরক্ত করতে গেছি। তারপর নাহার, পুলিশ একগাদা আমাকে উপদেশও দিল।

আলি আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন যেন মনে মনে আবার থানায় ফিরে যান।

কী বলল তারা ?

সে আর তুমি শুনে কী করবে ? স্ত্রীর দিকে করুণ চোখ তুলে আলি তাকান। আজকাল লন্ডনে বহু ভারতীয় মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করছে। ঐ যে প্লে-বয় বলে একটা খারাপ কাগজ আছে, ওতে নাকি ভারতীয় কোনো এক মেয়ে, কোথায় কোন ব্যাংকে কাজ করে, তার সব বিবস্ত্র ছবি বেরিয়েছে। সেই থেকে ভারতীয় মেয়েদের নাকি খুব চাহিদা। মানে বুঝতেই পারছ, পুলিশ বলতে চাইল, সে রকম কোনো হাবভাব মেয়ের মধ্যে লক্ষ করেছি কি না। কী আর বলব কাকে ? নিজের মেয়েকে নিয়ে এ সব কথা শোনাও, কী বলে, মরণতুল্য। নাহ, আমাদের জন্য পুলিশেরও আর কোনো সহানুভূতি নেই দেখলেই তো, দু দুবার আমার এই আপিসের কাচ দুধের বোতল মেরে শাদা ছোকরাগুলো ভাঙল, করল কিছু পুলিশ ? এসে শুধু জিগ্যেস, কে মেরেছে, দেখতে কেমন, আবার দেখলে চিনতে পারব কিনা, সাত সতের। আরে, চিনতেই যদি পারব, দেখেই যদি থাকব, তো ছেড়ে দিয়েছি তাকে ? দু দুবার ঘটনা, তোমরা একটা পাহারার বন্দোবস্ত করতে পার না ? নজর রাখতে পার না ? কিছু না পার, দুটো আশা ভরসা তো দিতে পার ? নাহ, নাহার, আমার মন উঠে গেছে আজ থানায় গিয়ে। বয়স যদি থাকত, দেশে গিয়ে আবার সব শুরু করবার মতো উপায় যদি থাকত, লাথি মেরে চলে যেতাম। ইয়াসমিন যদি ফিরে আসে, আসবে, কি বল ?— এলে ওকে আমি ঢাকায় পাঠিয়ে দেব। মিয়া ভাইয়ের কাছে থাকবে। তারও মেয়ে আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। মাহজাবীনকে পাঠিয়ে দেব। দু বছর পরে নাসরিনকেও। ও আমি কাউকে আর এখানে রাখব না।

ইতস্তত করে নাহার বলে, আর আমরা ?

হঠাৎ শূন্য চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায় আলি। তারপর দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নেয়। ব্রিফকেস খুলে টিকিট কাগজপত্র বের করে চশমা চোখে দিয়ে পড়বার চেষ্টা করেন। অল্পক্ষণ পরেই ধরা পড়ে, চশমার কাচ যেন অস্বচ্ছ হয়ে গেছে, ধোঁয়াটে লাগছে।

৮

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাহজাবীন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এক মুহূর্ত বাড়িতে ভালো লাগে না তার। আবার ইয়াসমিনের মতো তার পছন্দটা অস্পষ্ট নয়। ইয়াসমিন চায় বন্ধনহীন জীবন, শাসন নেই, বাবা-মা, এমনকি স্বামীরও নয়। বিয়ের কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। তবে, কাউকে ভালো লাগলে তার সঙ্গে বাস করতে আপত্তি নেই তার। তেমন ভালো লেগেছে, এখনো কেউ নেই অবশ্য! ইয়াসমিন ভালোবাসে গান, বন্ধুত্ব, পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, যাযাবরের মতো খোলা আকাশের নিচে রাতবাস। জীবিকার জন্যে লেখাপড়াকে ঘৃণা করে, বিয়ের জন্যে নিজেকে বড় করে তোলা তার কাছে কুসংস্কার বলে বোধ হয়। জীবিকা উপার্জনের একটা ধারণা তার আছে। সে কাঠমিস্ত্রি হবে এবং কেবল জানালাই বানাবে। তার মাথায়

নতুন নতুন ডিজাইনের জানালা ঘোরে। নিজেকে সে কল্পনা করে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান জানালা নির্মাতা হিসেবে।

আর মাহজাবীন চায় যত শিগগির সম্ভব, সময়কে ঠেসে খাটো করে হলেও, ষোল বছর অতিক্রম করতে। তারপর সে বেরুবার স্বাধীনতা আদায় করে নেবে। বাবা মায়ের কাছ থেকে সে স্বাধীনতা না পাওয়া গেলে বিপ্লবী যেমন দেশত্যাগ করে, সে গৃহত্যাগ করবে। সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে মাসের একুশ বড়ি ব্যবহার করবার ব্যবস্থা নেবে। তারপর কিছুদিন ছেলেদের সঙ্গে তারিখ করবে, হল্লা করবে, নাচ করবে, ছেলের গাড়িতে শেষরাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, ছুটির দিনে দূরদূরান্তে যাবে, একদিন বাগদত্তা হবে, বিয়ে হবে, মাহজাবীনের নিজের সংসার হবে। সে পরিষ্কার জানে, বাড়ি থেকে এর কোনোটিই সম্ভব নয়। এমনকি তুচ্ছ সিগারেট পর্যন্ত সে খেতে পারবে না। তাই যতদিন তার ষোল বছর না হচ্ছে, চমৎকার অভিনয় করে যাচ্ছে বাড়িতে। সিদ্ধান্ত করে অভিনয় নয়, একটু একটু করে সহজভাবে সে এই কৌশলটি অবলম্বন করেছে।

বেরিয়ে সে চন্দনার বাড়ির কাছাকাছি যায়। চন্দনার কথাটা তখন মনে এসে ভালোই হয়েছে। বরং ওকে নিয়েই ইয়াসমিনের কাছে যাওয়া যাবে। অলবানি স্ট্রীট টিউব স্টেশনের একেবারে কাছে।

পথে লাইব্রেরি পড়ে। বই দুটো চট করে ফিরিয়ে দেয় মাহজাবীন। ফুটপাতে লাল টেলিফোনের বাক্সে ঢোকে। চন্দনাকে ফোন করে দেখে নেয়া দরকার, বাড়িতে আছে কিনা।

ফোন করতে ঢুকে, প্রথমে সে কাঁধের ঝুলি থেকে সিগারেট বের করে। নিপুণ হাতে ধরিয়ে লম্বা একটা টান দেয়। মাথাটা বেশ হাল্কা আর শরীরটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে তার।

চন্দা?

বীন?

হাঁ, বীন বলিতেছি। বাড়িতে আছ?

আছি।

তোমার পিতা মাতা?

তাহারা কাজে গিয়াছে। আটটায় ডিউটি শেষ হইবে। তুমি কোথায়?

নিকটেই। আসিতেছি।

চন্দা পৌলের বাবা-মা দুজনেই লন্ডন ট্রান্সপোর্ট বাসে কাজ করে, চন্দনা তাদের একমাত্র মেয়ে। ভালোই হলো, খালি বাড়িতে বসে মনের সুখে সিগারেট খাওয়া যাবে।

মিনিট খানেকের ভেতরেই মাহজাবীন পৌঁছে যায়। দরোজা খুলে দিয়েই দুই বন্ধু হেসে গড়িয়ে পড়ে। ঐ বয়সে এভাবেই হাসি পায়; এর বিশেষ কোনো কারণ থাকে না।

ভেতরে ঢুকে মাহজাবীন ব্যাগটা ধপ করে নামিয়ে রেখে সোফার ওপর দুপা তুলে জোড়াসন হয়ে বসে। নিজে আরেকটা সিগারেট ধরায়, চন্দনাকে দেয়।

না, ধন্যবাদ। আমি এই মাত্র একটি শেষ করিয়াছি।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে মাহজাবীন বয়সের তুলনায় বেশি সাবালক স্বরে বলে, ইহা কি সম্ভব?

কী ?

পানীয় যাহাই হউক।

আমি চেষ্টা করিব।

চন্দনা কার্পেটের ওপর, মাহজাবীনের পায়ের কাছে বসেছিল। উঠে দাঁড়ায়। ড্রিংকস-ক্যাবিনেটের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, ড্যাডি চাবি দিয়া যায়।

তোমার চাবি নাই ?

তাহা তোমাকে বলিব কেন ?

মাহজাবীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে চন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ঈর্ষাও হয় তার। এই চন্দনা কী সুখে আছে! তার বাবা-মা একসঙ্গে কাজে বেরিয়ে গেছে। সারা বাড়িতে সে এখন একা। যা খুশি কর। তার বাবার আপিস বাড়ির মধ্যে। হতভাগ্য আর কাকে বলে! চন্দনা তো ইচ্ছে করলে বালক-বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করতে পারে। কী সৌভাগ্য!

চন্দনা বলে, তুমি এদিকে দেখিও না। ক্যাবিনেট খুলিতেছি।

ক্যাবিনেটটা দেহ দিয়ে আড়াল করে চন্দনা কী এক কৌশলে মুহূর্তের ভেতরে খুলে ফেলে।

কী পান করিবে ? চাহিয়া দ্যাখো। তবে সামান্য দিতে পারিব, নহিলে ড্যাডি সন্দেহ করিবেন। মারধোর করিবেন।

মারধোর করেন ?

হ্যাঁ, প্রায়ই।

মাহজাবীনের চিত্ত লঘু হয়ে যায়। যাক, তাহলে ততটা সুখে চন্দনা নেই। অন্তত তার বাবা গায়ে হাত তোলে না। সে উঠে এসে ক্যাবিনেটের ভেতরে সাজানো সারি দেওয়া বোতলগুলোর দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিপাত করে। ভ্রু গেঁথে রাখে। তারপর বলে, সময় সংকীর্ণ। বেশিক্ষণ থাকিতে পারিব না। আমাকে ভোদকার সহিত অনেকখানি লাইম মিশাইয়া দাও।

শিস দেয় চন্দনা। বলে, কার কাছে শিখিয়াছ ?

জন।

তারিখ করিয়াছিলে ?

উহাকে ততটা পছন্দ করি না। আমাকে চুম্বন করিয়াছিল। জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। আমি তাহা রুঢ় মনে করিয়াছিলাম। আর বাহির হই নাই।

দুজনেই সুরা নেয়। মাহজাবীন আবার সোফায় গিয়ে জোড়াসন হয়ে বসে। আবার সে সিগারেট ধরায়। চন্দনা কার্পেটের ওপর, পায়ের কাছে বসে। মুখোমুখি হয়ে।

একের পর এক সিগারেট ধরাইতেছ ?

হ্যাঁ, একটি জোড়ের ভেতরে বর্তমানে আছি।

কী ব্যাপার ? সঙ্গে একটি ভারি ব্যাগও দেখিতেছি। কী আছে উহাতে ?

ইয়াসমিনের কাপড়। পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

বুঝিলাম না।

ইয়াসমিন বাড়ি ছাড়িয়াছে। আজ কন্যা দেখিবার জন্য এক ষাঁড়ের আসিবার কথা! ইহা ব্যতীত পথ ছিল না।

আবার শিস দেয় চন্দনা। জিগ্যেস করে, বাড়ির পরিস্থিতি কী ?

মাম কাঁদিতেছে। ড্যাডি কাঁদিতেছে। উহারা বুঝে না। উহারা বাঙালিই রহিয়া গেল। আজ শুনিতেছিলাম আমাদের কোরান পড়াইবার কথা হইতেছে। উহারা কোরানকে সার্ফ সাবানের গুঁড়াতুল্য জ্ঞান করে। সমস্ত নির্মল বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে।

লম্বা একটা চুমুক দেয় গেলাশে মাহজাবীন। তালু জিভেয় টক করে শব্দ তুলে বলে, লাইম বেশি দিয়াছ। আমি কিঞ্চিত ভোদকা ঢালিয়া লই।

চন্দনা বলে, ইয়াসমিনকে দোষ দিই না। সে উত্তম করিয়াছে। আমারও হয়তো বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু আমি বাড়ি ছাড়িতে পারিব না।

কেন পারিবে না ?

আমার সাহস হয় না। এই জন্যই আমার মৃত্যু হইবে। মহিষের মতো গন্ধযুক্ত কোনো অজানা ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে। না, আমি আর ভাবিতে পারিতেছি না।

এত সুযোগ থাকিতেও তুমি এত ভীতু, অবাক হইতেছি।

দুঃখিত স্বরে চন্দনা বলে, ড্যাডি আমাকে খুন করিতেও দ্বিধা করিবে না।

মাহজাবীনের ভাবনা হয়। চন্দনার জন্যে নয়, এত যার ভয়, তাকে নিয়ে অলবানি স্ট্রীটে যাওয়া বোধহয় আর হবে না। একা যাওয়া সে ভালো মনে করে না। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় সে কিছুক্ষণ থেকেই টের পাচ্ছে যে, ইয়াসমিনের অনুপস্থিতির প্রথম দিনে তার নিজের দীর্ঘক্ষণ একা বাইরে থাকাটা গোলমেলে হয়ে দেখা দিতে পারে। বাড়িতে কিছুক্ষণের ভেতরেই খোঁজ পড়বে। চন্দনা থাকলে, তাকে নিয়ে না হয় একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যেত, মাকে বলা যেত— দুজনে ইলিং ব্রডওয়ের বিপণী বিতান ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

মুশকিলের কথা।

মাহজাবীন নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্যটি করলেও চন্দনা সেটাকে তারই ওপর মন্তব্য বলে ধরে নেয় এবং বন্ধুর প্রতি আরো অন্তরঙ্গতা বোধ করে। চন্দনা বলে, তুমি আর খানিকটা পানীয় লও ?

না।

বিপদ অবশ্য আসিয়া পড়িলে আমি শেষ চেষ্টা করিব। ততদিনে কোনো বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সহিত পালাইয়া যাইব।

মাহজাবীন অন্য কথা ভাবছে। সে বলে, চন্দনা, ভাবিয়াছিলাম তোমাকে লইয়া বাহির হইব। তা থাক। আমাকে শীঘ্র বাড়ি ফিরিতে হইবে। তুমি একটা কাজ করিবে ?

কী কাজ ?

ইয়াসমিনের এই ব্যাগ লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। ড্যাডি হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছে। চোখে পড়িলে ওয়াটারগেট হইয়া যাইবে। ব্যাগটি তুমি রাখিবে ?

হাঁ, রাখিব।

পরে লইয়া যাইব।

যখন খুশি লইও। ইয়াসমিন কোথায় আছে ?

অলবানি স্ট্রীটে, সে অনেক দূর। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের নিকটবর্তী।

বালকবন্ধুর সহিত আছে ?

না, আমি যতদূর জানি, তাহার কেহ নাই। ইয়াসমিন স্বপ্নজগতে বাস করে। সেই জগত স্বভাবতই নিঃসঙ্গ। সহসা সঙ্গী জুটে না। না, আমার মনে হয় না, ইয়াসমিনের দৃঢ় কোনো বালকবন্ধু আছে।

চন্দনা উঠে দাঁড়ায়। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, চলিলে ?

হাঁ। দাঁড়াও, আরেকটি সিগারেট শেষ করিয়া লই। বাড়িতে ঢুকিলে তো আর সম্ভব হইবে না।

আমাকে দুইটি ধার দাও। আমার ফুরাইয়া গিয়াছে। ড্যাডির পকেট হইতে একটির বেশি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মাহজাবীন তাকে ব্যাগ রাখবার পুরস্কার হিসেবে গোটা প্যাকেটটাই দিয়ে দেয়।

ব্যাগটি লুকাইয়া রাখিও।

৯

এক প্রস্থ ধোয়া গেলার পর অলবানি স্ট্রীটের তেতালা এখন কিছু সময়ের জন্যে না মর্তে না সুনীলে। ভিনসেন্ট দৃশ্যতই প্রত্যেকের ওপর বিরক্ত হয়েছে। তার বিরক্তির কারণ, একই সঙ্গে সকলের ভাঁড়ার তলানিতে এসে ঠেকেছে, সেটা তাকে আগে জানান হয় নি কেন ? গ্যাবি, তার বান্ধবী এবং শয্যাসঙ্গিনী, তাকে পর্যন্ত সে একটা লাথি মেরেছে। এমন কিছু প্রচণ্ড লাথি নয়, ইয়াসমিন বাধা দেয়ায় গুরুত্বটা বেশি পেয়ে যায়। ভিনসেন্ট ক্ষণকাল এ ইচ্ছা লালন করে, ইয়াসমিনকেও লাথি মারবে কিনা।

নিমিলীতি চোখে মার্ক গিটার হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। খুব অল্পটানেই তার দশা হয়ে যায়। সবার থেকে এমনিতেই সে আলাদা, দশা-র পর তাকে ভিন্নগ্রহের বলে বোধ হয়। ইয়াসমিন তবু তার কাছেই আসে, কাঁধ ঘেঁষে বসে। অন্য কারো কাছে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গ্যাবি বাথরুমে গিয়ে সেই যে স্নান করছে, বেরুবার নাম নেই। ভিনসেন্ট ক্রুদ্ধ। পিটার আর কোকো পরষ্পর জিহ্বা লেহন করছে সবাইকে অনুপস্থিত গণ্য করে। প্যাম আর জো, দুজনে মুখোমুখি জোড়াসন হয়ে বসে দীর্ঘতর ধ্যানের অভ্যেস করছে।

মার্ক।

মার্ক সাড়া দেয় না। দ্বিতীয়বার ডাকতে সে একটা হাত ইয়াসমিনের হাতের ওপর আলতো করে রাখে।

মার্ক, সে কেন লাথি মারিল ?

উহা তাহার চুম্বন।

বুঝিতে পারি না।

উহা আদর।

এ কীরূপ আদর ? লাথি হয় লাথি। নয় ?

হাঁ, লাথি হয় লাথি, চুম্বন হয় চুম্বন এবং ভিনসেন্ট হয় ভিনসেন্ট।

ইয়াসমিন খানিকটা ভীত চোখে দূরে ভিনসেন্টের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে। এই ঘণ্টাখানেক আগেও জন্মগ্রহণের যে অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, তার সৌন্দর্য আবিষ্কার করে সে মুগ্ধ হয়েছিল। এখন সে মুগ্ধতাবোধে যেমন সূক্ষ্ম একটা চির ধরে যায়, তেমনি ভিনসেন্টও অন্য কোনো বালক বলে মনে হয় তার।

মার্ক, আমি পছন্দ করিতে পারিলাম না।

গাঁজার সরবরাহ পর্যাপ্ত যতক্ষণ, ভিনসেন্ট আকর্ষণীয়। তাহার তুলনায় প্রতিটি ব্যক্তি কর্কশ। গাঁজা ফুরাইল, ভিনসেন্ট ক্রুদ্ধ হইল।

আমি ভিনসেন্টকে তিরস্কার করিব।

না, করিবে না।

কেন ?

তুমি অনুতপ্ত হইবে।

কেন ? অনুতপ্ত হইব কেন ?

এই গৃহ তাহার।

গৃহ তাহার কেন হইবে ? এ কীরূপ কথা বল। গৃহ সকল সন্তানের।

অধিকারবোধের পুরাতন ধারণা চলিয়া গিয়া নতুন ধারণা স্থান করিয়া লয়।

স্বীকার করি না।

শূন্যতা যে প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

তাহা হউক। গৃহ ভিনসেন্টের হইল কী প্রকারে ?

সে এখানে প্রথম দখল লইয়াছিল। তাহারই নিমন্ত্রণে অন্য সকলে আসিল। যাহারা ভিন্ন গৃহের সন্ধান পায়, তাহারা চলিয়া যায়।

উত্তম করে।

সেখানেও তাহারা অপর কোনো ভিনসেন্টের অধীনস্থ হয়।

সামান্য গাঁজার জন্য ভিনসেন্ট লাথি মারিল। গ্যাবি সহ্য করিল ?

গ্যাবি শয্যায় ইহার প্রতিশোধ লইবে।

ইয়াসমিন মনের ভেতরে দ্রুত চিন্তা করে।

মার্ক ধীর লয়ে হেসে উঠে বলে, নারী স্বাধীনতার কালেও নারীর মারাত্মক অস্ত্রটি এখনো শয্যাতেই তাহাদের ব্যবহার করিতে হয়।

ইয়াসমিন জামার একটা বোতাম খোলে, নিজের বুকের ভেতরে একটা হাত ঢুকিয়ে দেয়।

কী করিতেছ ? আমারই ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করিবে নাকি ? মার্ক কৃত্রিম আঁতকে উঠে বলে।

না, ইহা দ্যাখো।

ইয়াসমিন বুকের ভেতর থেকে সোনার লকেট বের করে। আবুধাবি থেকে তার বাবা এটা আনিয়ে দিয়েছিলেন। খুব ছোট বাঁধানো বইয়ের মতো দেখতে। সোনার ওপর মিনা করা নক্সা। ভেতরে পুরো কোরান শরিফের অনুবীক্ষণে দেখা সম্ভব এত ক্ষুদ্র অনুলিপি।

মার্ক মুগ্ধ হয়ে যায়।

সুন্দর!

ইয়াসমিন চেন ঘুরিয়ে হুকের মুখ বিযুক্ত করে। ঝপ করে হাতের তেলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে সোনার চেন লকেট। দূরে ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে সে একবার। মার্ক বিস্মিত হয়ে বলে, খুলিলে কেন?

ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

ইয়াসমিন উঠে গিয়ে ভিনসেন্টকে বলে, এই লও।

ভিনসেন্ট কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে বস্তুটার দিকে, তারপর খপ করে হাতে তুলে নেয়।

ইয়াসমিন বলে, ইহা স্বর্ণ। কোথায় বিক্রয় করিবে জানি না। প্রথম দিনেই কলহ আমি চাই না। আমরা আনন্দ করিব।

ভিনসেন্ট দাঁড়ায়।

হাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে পূর্বাহ্নে বলিলেই ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমি আসিতেছি।

ভিনসেন্ট দ্রুত ঘর ছেড়ে যায়।

ইয়াসমিন তখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে।

আমাকে কেহ একটা সিগারেট দিবে?

কোকোর মুখ থেকে মুখ সরিয়ে পিটার বলে, দৈর্ঘ এবং আয়তন সম্পর্কে ধারণা দিলে, বিবেচনা করিতে পারি।

কোকো তার চুল ধরে নিজের মুখের কাছে আবার টেনে আনে। ইয়াসমিনের হঠাৎ ইচ্ছা হয় পিটারকে লাথি মারে। এবং মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হয়। ভিনসেন্ট যে গ্যাবিকে লাথি মেরেছিল, সেটা আর এখন এতখানি পীড়াদায়ক মনে হয় না। আসলে সে নিজেও জানে না, সকালে এবং দুপুরে দুইপ্রস্থ ধোঁয়া নেবার পর সে এবং সকলেই কী ক্ষিপ্রগতি উভচর যুক্তিবোধের জ্যোৎস্নাক্রান্ত প্রান্তরে পৌঁছে গেছে।

ইচ্ছাই বা অপূর্ণ থাকে কেন? ইয়াসমিন উঠে গিয়ে পিটারের পাছায় লাথি কসিয়ে দেয়।

বলে, দৈর্ঘ এবং আয়তন জানিতে চাও বটে। তবে তোমারটা দেখিয়া বিবেচনা করিব, চলিবে কি না।

প্যাম ওদিক থেকে বিরক্তিসূচক শব্দ করে ওঠে, আহ, তোমরা কী লাগাইলে? আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিলে?

জো বলে, ইয়াসমিনের সঙ্গে কে পারিবে? পিটার? শুস।

প্যাম তখন জো-কে নিয়ে পড়ে।

এই তোমার ধ্যান? তুমি সব শুনিতেছিলে। আমি মন্দিরে গিয়া গুরুকে বলিয়া দিব।

ইয়াসমিন হেসে উঠে বলে, কেন? গুরুকে নালিশ দিবে কেন? শয্যায় অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। জো সিধা হইবে।

প্যাম তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে আবার ধ্যানে বসে।

মার্ক, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।

সংগীত ছাড়া আপাতত আমার কাছে দ্বিতীয় কোনো আহার্য নাই।

তুমি কি অনাহারে থাকিবে ?

হাঁ, অন্য ব্যবস্থা না হইলে, সন্ধ্যাবেলায় চ্যারিং ক্রস যাইব। সেখানে পাদ্রীরা সুপ বিতরণ করিতে প্রত্যহ আইসে।

তোমার কি অর্থ নাই ?

ছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে। সোমবারে ভাতা তুলিব, তবে খাইব।

ইয়াসমিন নিজের ক্ষিদে সত্ত্বেও মার্কের ক্ষিদের জন্যে কষ্ট পেতে থাকে। ভিনসেন্ট লকেট বেচে সব টাকাই গাঁজায় খরচ করবে, না খাবারও আনবে— সেই সংশয়ে কিছুক্ষণ সে দোলে। প্রার্থনা করে, ভিনসেন্ট যেন কিছু খাদ্য আনে।

গান শুনিবে, ইয়াসমিন ? তবে শোন। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইবে।

১০

শাপালা ট্র্যাভেল এজেন্সির সাইনবোর্ড দেখেই ডাঃ বারী বলে ওঠে, আরে, এখানে নাকি ? মেয়ে কার ? আলি সাহেবের ?

ডাঃ ইউনুস ভাইয়ান ফর্সা মানুষ। লজ্জায় রাঙ্গা হলে সহজে বুঝা যায়। সেটা গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে বলে, হাঁ। বড় মেয়ে।

আশ্চর্য, ফি বছর টিকিট নিচ্ছি আলি সাহেবের কাছ থেকে, একবারও তো শুনি নি, মেয়ে আছে।

যুক্তিটা দুর্বল। টিকিট নিলেই টিকিটদাতার পারিবারিক সব খবর ক্রেতার জানা হয়ে যাবে, বা হওয়া উচিত, এটা কোনো কথা নয়। বারী নিজেও সেটা অন্য সময় হলে বুঝত। কিন্তু, প্রতি বছর সে দেশে গেছে পাত্রী খুঁজতে, সে পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার এই আবিষ্কার সত্যি তাকে ক্লিষ্ট করে। রুহুল কুদ্দুস একবারে পাশ করেছে, সে পারে নি, দুপুরে সেটা মনে করেও এখনো বুকের ভেতর খচখচ করছে।

গাড়ি থামিয়ে বারী গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসে। ভাইয়ান থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। ভাইয়ানের একবার মনে হয়, তাকে না বলে এতদূর টেনে আনাটা বোধহয় ঠিক হয় নি। লোকটা সত্যি সত্যি রাগ করেছে। পুষিয়ে দেবার জন্য সে খুব চটপটে হয়ে বলে, বেশিক্ষণ বসব না। এক নজর দেখা, এই তো! আপনার ওপর খুব ডিপেন্ড করছি। আপনিই দেখবেন, আপনি বললে করব, নইলে নয়।

তেলটাতে বিশেষ কাজ হয় বলে মনে হয় না। বারী প্রায় স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করে, আমি নিজের ওপর স্বয়ং নির্ভর করতে পারি না।

পাশাপাশি দুটো দরোজা। বাড়ির ভেতরের ওপর তলায় যাবার দরোজাটা নিরেট কাঠের। তার পাশেই আপিসে ঢোকার দরোজা স্বচ্ছ কাচের। ভাইয়ান বারীকেই সমুখে ঠেলে দেয়। আপিস থেকেই মিষ্টার আলি দেখতে পেয়েছিলেন ওদের। স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে সাগ্রহে

উঠে এসে আপ্যায়ন করে ভেতরে আনতেন, এখন ওদের দেখা মাত্র তার মনে হলো, যদি পালিয়ে যেতে পারতাম। ইয়াসমিনের অনুপস্থিতির কী ব্যাখ্যা দেবেন বহু ভেবেও তা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। শেষে ভবিষ্যতের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন নিজেকে। এটুকু স্থির করেছেন, ইয়াসমিন বাড়িতে নেই বলবেন, বাকিটা অবস্থা দেখে বানিয়ে নেবেন।

এই মুহূর্তে তার মনে হলো কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকাই ভালো। তিনি কাচের দরোজার ওপারে ওদের দেখেই বিরাট এক ফাইল খুলে বসেন।

দরোজা ঠেলে প্রথমে ঢোকে বারী, পেছনে ভাইয়ান।

বারীকে দেখে অবাক হন আলি। ভাইয়ানের দিকে চোখ যেতে চায় তার, তিনি শাসন করে রাখেন। হাত বাড়িয়ে দেন বারীর দিকে।

আরে, আপনি, আসসালামুআলাইকুম, আসুন, আসুন। ভালো আছেন ? ম্যানচেস্টারেই আছেন ? এমনভাবে কথা বলেন তিনি যেন দ্বিতীয় আর কেউ নেই সেখানে।

বারী পরিচয় করিয়ে দেয়।

ইনি আমার বন্ধু ডাঃ ইউনুস ভুইঞা, বেলশিলে থাকেন।

মিস্টার আলি একটা মিথ্যা কথা বলেন, ও তাই তো! আপনার আসবার কথা, অপেক্ষাও করছি, অথচ বুঝতে পারি নি। বারী সাহেবকে দেখে মনে করেছি, টিকিটের ব্যাপার কি দেশেটেশে যাচ্ছেন, জিনিস কেনা কাটা আছে। বসুন, বসুন।

দুজনে বসে। আপিসের এক পাশে জোড়া একটা সোফা, সেখানেই বসে তারা। মিস্টার আলি ফাইল বন্ধ করে ক্যাবিনেটে তুলে রাখতে রাখতে বলেন, ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার সাহেব।

দুজনেই ডাক্তার, তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, উদ্দিষ্ট হচ্ছে ডাঃ বারী।

ভাইয়ান তখন থেকে মুখে একটা স্থির বিস্তৃত হাসি ঝুলিয়ে বসে আছে। বসে আছে কিন্তু স্বস্তি নেই, একবার পা লম্ব করছে, ভালো লাগছে না; পা ভাঁজ করছে, আরাম বোধ হচ্ছে না; আবার ডান দিকে একটু কাত হচ্ছে, হাতলে লাগছে; তখন আবার সোজা হচ্ছে; আবার গোড়া থেকে শুরু করছে।

বারী বলে, কেন খারাপ কেন ?

আলি এসে চেয়ার টানেন, টেবিলে এক হাত রাখেন, ঠেস দিয়ে বসেন।

খারাপ হবে না ? দেশে লোক যাচ্ছে কোথায় ? সবাই তো আসছে। বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছে। ফেরত যাবার সংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে, ডাক্তার সাহেব। আমরা তো এই ব্যবসাই করি, স্ট্যাটিকটিক্স আমাদের কাছে আছে।

বারী যতখানি চিন্তিত নয়, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত মুখ করে বসে থাকে। একটু পর বলে, উনি বেলকিশ থেকে আসছিলেন, পথে আমাকে তুলে নিলেন। আমি কিছু জানতাম না।

ও।

তাও উনি ওখানে আমাকে কিছু বলেন নি। পথে শুনলাম। তা আপনার ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে, আবার ঠিক হয়ে যাবে। ব্যবসায় ওঠানামা তো আছেই। কী বলেন ডাক্তার সাহেব ?

ভাইয়ান হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, হাঁ, তাতো বটেই।

দু মিনিটও হয় নি, এর ভেতরই অধির বোধ করছে সে। কখন মেয়ে দেখা যাবে ? ভেতরে নিয়ে যাবে ? না এখানেই দেখাবে ? মেয়ের সঙ্গে আলাদা একটু কথা বলা যাবে তো ? মেয়ে স্বয়ং না হোক, মেয়ের ছোট বোন দুটিকেও একবার দেখা যাচ্ছে না কেন ? পাত্র বাড়িতে এসেছে, তাদের কি কোনো কৌতূহল নেই!

আলি দু হাতের করতল চিৎ করে বলেন, এবার নামারই পালা, বুঝলেন ? বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি আপনি তো প্রত্যেক বছরই যাচ্ছেন, আপনিই ভালো বলতে পারবেন— মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এতদিন শিক্ষিতলোক, দেশের উপকারে আসবে, এই জানতাম, এখন দেখছি, শিক্ষিত হলেই বাইরে ছোটে না। আর শিক্ষিতদেরই বা দোষ দেই কেন ? মিডিল ইস্টে আপনার কী বলে, সাধারণ লোক, মজুর, ড্রাইভার, বাবুর্চি ছুটছে না ?

বারী এখানে বাধা দেয়।

একটা তফাত আছে আলি সাহেব। ওরা যারা যাচ্ছে, দেশে গিয়ে তো কয়েকবারই দেখলাম, দু হাতে টাকা উপার্জন করে, জিনিসপত্র কিনে দেশে ফিরছে, দেশে জমি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে। আর শিক্ষিত লোক, তারা রোজগার করে বিদেশেই খরচ করছে, বিদেশেই বাড়ি গাড়ি করছে। আমরাই বা কী করছি ? এই যে ভাইয়ান সাহেব, তা আপনার দশ বছর হয়ে গেল না ? আমার তো তারো বেশি, আমরা এখানে পড়ে আছি, দেশে যাব, দেশে গেলে আমারই সমসাময়িক ডাক্তারেরা সব পোস্ট দখল করে বসে আছে, কেউ মন্ত্রী হয়েছে, কেউ গুলশানে বাড়ি টাড়ি করে ফেলেছে, আমরা গেলে কনুই মেরে বার করে দেবে, দেশে যাচ্ছি না তা আপনার কথাই ঠিক, দেশে কেউ আর ফিরে যাচ্ছে না।

বারীর ধারণা, এবং তার আশেপাশের বন্ধু বাঙালি ডাক্তারদের ধারণা, সে খুব বলিয়ে কইয়ে লোক, রাজনীতিও খুব ভালো বোঝে। তাই ভাইয়ানের মতো অনেক ডাক্তারই তাকে কাজ কর্মে সঙ্গে রাখে। তার কথার তোড়ে গরম বোধ করে। আসলে, বারী যে এক কথা থেকে আরেক কথায় লাফ দিয়ে যায়, দুটো কথার ভেতরে যুক্তির ফাঁক গমগমে আওয়াজ দিয়ে ভরিয়ে দেয়, এটা হঠাৎ কারো চোখে পড়ে না। তার কথায় শেষে সকলেই, বুঝুক আর না বুঝুক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাতে হয়।

অভ্যেস বশে ভাইয়ানও চিন্তিত মুখ সৃষ্টি করে।

আলি সেটা লক্ষ করেন। তার চৈতন্য হয়, মেয়ে দেখতে এসেছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর মোটেই শোভন দেখাচ্ছে না।

আরো কিছু সময় নেবার জন্যে, পরিস্থিতি সামাল দেবার উপায় ভেবে নেবার জন্যে আলি এই আলোচনার জের টেনে বলেন, গুলশানের কথা বলছিলেন, ডাক্তার সাহেব। সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিমান আপিসে দেখা। মাস তিনেকের জন্য এসেছেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তিনি এক কথা বললেন।

বারী ভ্রু তুলে অপেক্ষা করে। দেয়ালে প্যান আমিরিকান-এর এক পোস্টারে সহাস্য এক তরুণীর জীবন্ত ছবি দেখে অজান্তে তার হাত উঠে যায় টাকে। বার দুয়েক বুলিয়ে নেয়।

আলি বলেন, সেই ভদ্রলোক বলছিলেন, গুলশানে আর একটি বাড়িও থাকবে না।

কেন ?

পাবলিক একটা একটা করে ইট খুলে নেবে। বেশিদিন আর বাকি নেই।

রেভেলেউশন তো একটা হওয়া দরকার, আলি সাহেব। তবে, হবে বলে আমার মনে হয় না। বাঙালিকে কিছুটা চিনি তো ? হোটেলের সামনে ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, হোটেলে ঢুকে কেড়ে খাবে না। এই হচ্ছে আপনার বাঙালি। নাহ্, আপনার ভদ্রলোকের কথা মানতে পারলাম না। হলে তো ভালোই।

ভাইয়ান এবার স্থির হয়ে গেছে। প্রথম ঢুকেই যে উত্তেজনা বোধ করছিল, কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে পারছিল না, এখন সে যেন অন্ধ নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

আলি উঠে দাঁড়ান।

ওপরে একটা খবর দিয়ে আসি।

ডাঃ ইউনুস ভাইয়ানের বুকের ভেতরটা ধ্বক করে ওঠে। ট্রাউজারের ভেতরে শিরশির করতে থাকে। একাধিক শ্বেতাংগিনীর সাহচর্য পাবার পরও, তার নিজেরই বিশ্বাস হয়ে যায়, সে এখনো কুমার।

১১

ইয়াসমিন, তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন কর। ইহা অত্যন্ত নিশ্চিত ও মুল্যবান সামগ্রী। বহুকষ্টে জোগাড় করিয়াছি।

ভিনসেন্টের নির্দেশে তার ডান পাশে গিয়ে ইয়াসমিন বসে। বাম পাশে গ্যাবি, তারপরে পিটার, কোকো, জো, প্যাম, মার্ক, মার্কের পরেই ইয়াসমিন— এইভাবে বৃত্ত রচনা করে বসেছে ওরা। ইয়াসমিন ভেবেছিল, বস্তুটা গাঁজা জাতীয় কিছু হবে, সিগারেটের মতো টানতে হবে। কিন্তু না, আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিনসেন্ট দ্রুত হাতে অথচ সাবধানে একটা ছোট গোল শিশি বের করে, তার ভেতরে শাদা গুঁড়ো। অতি সূক্ষ্ম সেই গুঁড়ো। পাউডারের মতো।

ইহা তুমি পছন্দ করিবে।

ধূপদানের মতো ছোট্ট একটা জিনিস বের করে ভিনসেন্ট। হাত বাড়ায়। কেউ তাকে একটা দেশলাই দেয়।

ইহা নাসিকা দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

ভিনসেন্ট ধারাবিবরণী দিয়ে চলে। ধূপদানের মতো বস্তুটির ভেতরে গুঁড়ো সামান্য একটু ঢেলে, শিশির মুখ বন্ধ করে সে।

তুমি প্রস্তুত, ইয়াসমিন। পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া, শ্রবণ কর। দুই হাত পেয়ালার মতো করিবে। পাত্র সমুখে ধরিব আমি, তুমি চক্ষু বুঁজিয়া, পাত্রটিকে করতলের দুই পেয়ালার ভেতর লইয়া ঘ্রাণ গ্রহণ করিবে। অতঃপর, পাত্রটিকে গ্রহণ করিয়া তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে যে উপবিষ্ট তাহার সম্মুখে ধরিবে। সে ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া পাত্রটি অনুরূপভাবে তোমার হাত হইতে লইবে। এইভাবে আমার কাছে সর্বশেষে ফিরিয়া আসিবে। আরম্ভ করিতেছি।

ইয়াসমিন চোখ বুজে অপেক্ষা করে। ফস করে দেশলাই জ্বলে ওঠার শব্দ পায়। মুহূর্তকাল পরেই ভিনসেন্ট ফিসফিস করে বলে, লও।

ইয়াসমিন দুই করতল পেয়ালার মতো করে, চোখ বুজে থেকেই পাত্রটিকে ঘিরে মুখ নামিয়ে আনে, ঘ্রাণ নেয়, সাধারণ ধোঁয়ার মতোই মনে হয় তার, পাত্রটিকে ধরে এবং ডানপাশে

মার্কের সম্মুখে ধরে। মার্ক দ্রুত ঘ্রাণ নিয়েই পাত্রটি তার হাত থেকে সরিয়ে নেয়।

প্রথমে কিছুই মনে হয় না ইয়সমিনের। চোখের ভেতরে ঘন বেগুনি রঙটা স্থির হয়ে থাকে। সেখানে ভিন্ন রঙের কোনো চিড় ধরে না। সাধারণ অবস্থায় চোখ বুজে থাকলে, চোখের ভেতরে রঙ যেমন সমুদ্র তরঙ্গের মতো ফুলে ফুলে ওঠে, তাও ওঠে না। সব কিছু স্থির এবং স্বাভাবিক মনে হয়। তবু সে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে হঠাৎ কোনো দীপ্তির, বিদ্যুতের, স্তব্ধতার অথবা সংগীতের জন্যে। পাত্র আবার তার কাছে ফিরে আসে।

আবার সে ঘ্রাণ নেয়। প্রথমে হয়তো নতুন বলে ভালো করে নিঃশ্বাস টানে নি. এবার সে বুক ভরে ধোঁয়া নেয়। অচিরে তার মনে হয়, বড় দ্রুত পাত্রটি তার কাছে ঘুরে ঘুরে আসছে। অবিরাম সে ঘ্রাণ নিচ্ছে। তার দেহ অতি ধীরে সম্মুখের দিকে চলছে, ফিরে আসছে, দুলছে, ফিরে আসছে।

ইয়াসমিন।

বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত সেই ডাকে সে হঠাৎ আবিষ্কার করে এতক্ষণ এক ভয়াবহ স্তব্ধতার ভেতরে সে ছিল। সেই স্তব্ধতা এখন অপার্থিব অনুরণনে নীলবর্ণ ধারণ করছে এবং তার নামের ধ্বনিপর্বগুলো দীপ্তিময় গোলকের মতো ওঠা নামা করছে।

ইয়াসমিন, শুনিতে পাইতেছ?

হাঁ, ভিনসেন্ট, আমি শুনিতে পাইতেছি।

নীলবর্ণ দেখিতে পাও?

হাঁ। ঘন নীল।

উহা আকাশের নীল।

কয়েকটি গোলক দেখিতেছি।

শীঘ্রই উহারা একটি গোলকে পরিণত হইবে।

হাঁ, এখন একটি গোলক দেখিতেছি।

তুমি গোলকের দিকে তাকাইয়া থাক।

হাঁ, আমি তাকাইয়া আছি। আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে।

তুমি নতুন চক্ষু প্রাপ্ত হইবে।

গোলক বৃহৎ হইতেছে।

হাঁ, লক্ষ করিয়া দ্যাখো, নীল আর নাই।

নীল আর নাই।

আমার হস্ত ধারণ কর।

করিলাম।

তোমার সম্মুখ ভাগ এখন ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ।

হাঁ, অন্ধকার।

চক্ষু খুলিও না, জাগতিক চক্ষু আর তোমার কাজে লাগিবে না। তোমার নতুন চক্ষু দিয়া মহাশূন্যের নিস্তব্ধ অতল কৃষ্ণ শূন্যতা প্রত্যক্ষ কর।

করিতেছি।

তোমার দুই পার্শ্ব দিয়া সেই অসীম শূন্যতা প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে।

কোথায় যাইতেছে?

এক শূন্যতা হইতে আরেক শূন্যতায়।

আমি গতি অনুভব করিতেছি, ভিনসেন্ট।

উত্তম। তুমি মুক্তি পাইয়াছ।

আমি ছুটিয়া যাইতেছি।

উত্তম। উত্তম।

আমার ভয় করিতেছে।

ইয়াসমিন, ভীত হইও না। আমার হস্ত ধারণ কর।

আমি কোথায়?

একটি চন্দ্রযানে।

চন্দ্রযান?

হাঁ, তুমি এখন চন্দ্রযানে, তুমি এখন দীপ্তিমান গোলকের দিকে ধাবিত হইতেছ, পৃথিবী তুমি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।

আমি সেখানে ফিরিতে চাহি না।

তবে তুমি ফিরিবে না।

আমি গতির বেগ অনুভব করিতেছি। এই গতি আমি হারাইতে চাহি না।

তবে তুমি হারাইবে না।

আমার দেহের ভেতরে তীব্র আনন্দ কল্লোলিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। আমার রক্তপ্রবাহ আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। আমার করোটি হইতে পূর্ণচক্র নির্গত হইতেছে। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আলোক ভিন্ন কিছু দেখিতেছি না। বিশুদ্ধ সেই আলোক কাহাকেও আলোকিত করে না। আমি সেই আলোকের ভেতরে লীন হইয়া যাইতেছি। আমার চন্দ্রযান আলোক নির্মিত বোধ হইতেছে। আমি অবতরণ করিতে চাহি না, আমি অবতরণ করিতে চাহি না।

১২

আপিস ঘরে বারী আর ভাইয়ানকে রেখে ওপরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা রাখতেই মিস্টার আলির মাথায় বিদ্যুতের মতো বুদ্ধিটা খেলে যায়। এত সহজ বুদ্ধিটা আগে কেন মাথায় আসে নি, ভেবে তিনি অবাক হন। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে নাহারকে ফিসফিস করে বলেন, ইয়াসমিনের কথা তোলার দরকারই নেই। মাহজাবীনকে দেখিয়ে দাও।

কী বলছ?

আহ্, অসুবিধে কী?

বীনার বয়স মাত্র পনের। ওকে তুমি বিয়ে দেবে?

তা নয়, তা নয়। মেয়ে দেখতে এসেছে, মেয়ে দেখে যাক। অসহিষ্ণুভাবে আলি হাত নাড়েন। বুদ্ধিটা নিজের কাছেই এত ভালো লেগেছে, মুক্তি পাবার এত নির্বিঘ্ন পথ পেয়ে গেছেন, যে সেটাকে ব্যবহার না করা পর্যন্ত তার ভেতরে উত্তেজনা কাটছে না। তিনি বলেন, মাহজাবীনকে এখন বিয়ে দেব কেন ? দেখে যাবার পর জানিয়ে দেব, ছেলে আমার পছন্দ হয় নি।

এবার কথাটা কিছু মনঃপূত হয় নাহারের। আবার সন্দেহও দেখা দেয়।

মেয়ের নাম তো ছেলে জানে।

কী আর জানে ? অত কি আর লোক খেয়াল রাখে ? একবার দুবার শোনা ? ভাববে, বড় বোন ছোট বোনের নাম গুলিয়ে ফেলেছে। নাও চটপট কর। আমি ওদের ওপরে নিয়ে আসি। মাহজাবীনকে বল, চা ও-ই দেবে।

বীনা যদি বেঁকে বসে।

আহ্, ওকে এসব বলতে যাবে কেন ? ও কিছুই জানবে না। চা-টা দেবে, একটু কথা বলবে, হয়ে গেল। এ কি আর দেশের মেয়ে দেখা যে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখান ? আর সে রকম তো কোনো কথাও ছিল না। ছেলে আসবে, সবার সঙ্গে দেখা হবে, সেই সঙ্গে মেয়েকেও দেখবে, আমরাও ছেলে দেখব, এইতো ?

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান আলি।

ভেতরে এসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে বলেন, আপনারা তাহলে ওপরে আসুন। একটু চা খাবেন।

আপিস ঘর বন্ধ করেন না আলি। ভেতর থেকে শুধু হাতল-তালাটা ঘুরিয়ে দেন। ইচ্ছেটা, ওদের ওপরে বসিয়ে নিচে নেমে আসবেন। এখনো আপিস বন্ধ করবার সময় হয় নি, তাছাড়া, তিনি একটা মিথ্যের ভেতরে উপস্থিত থাকাটা ভালোও বোধ করছিলেন না।

ওপরে নিজেদের শোবার ঘরটাই বসবার ঘর। সেখানে বারী আর ভাইয়ানকে বসিয়ে নাহারকে ডেকে আনেন। আলাপ করিয়ে দেন।

তুমি ওদের চা-টা দাও। মেয়েদেরও ডাক, তারাও বসুক। আপনারা বসুন, আমার আবার ক্লায়েন্ট একজন আসবে। নিচে থাকতে হয়। চা খেয়ে নিচেই আসুন তাহলে। আপনাদেরও তো সময় নেই বলছিলেন।

ভাইয়ান বলে, না, সময়, সময় আর কী।

আলি চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বিদায় করতে। ভাইয়ানের মুখে অনির্দিষ্ট কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্যে ভয় হয় তার। যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই বিপদ। হেসে তিনি বলেন, তা বেশ, বেশ তো। স্ত্রীকে বলেন, এদিকে শোন।

রান্নাঘরে নাহারকে তিনি বলেন, মাহজাবীনকে ডাকবার আগে, ডাক্তারকে বোলো, মেয়েকে আমরা বলি নি কিছু। তাই, সে রকম আভাষ যেন না দেয়। আর মাহজাবীনকেও বেশিক্ষণ সামনে থাকতে দিও না। বুঝলে ?

স্ত্রীকে সাগরে ফেলে তিনি নিচে নেমে যান।

পেছন থেকে নাহার বলে, তুমি চা খাবে না ?

বড় আকুল শোনায় তার কণ্ঠস্বর। স্বামী থাকলে সে ভরসা পেত। তাই শেষ চেষ্টা করে।

আলি শুনেও কোনো উত্তর না দিয়ে আপিস ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ভেতরটা ভয়াবহ রকম শূন্য লাগে তার। কোথায় যেন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। ব্যর্থতাবোধ বাদুরের মতো ঝুলে থাকে। দুহাতে মাথার দুপাশ ধরে তিনি কতক্ষণ বসে থাকেন, চেতনা থাকে না। তারপর হঠাৎ যখন বাস্তবে ফিরে আসেন, ইয়াসমিনের জন্যে প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করেন তিনি। কোথায় তিনি ভুল করেছেন ? কী তিনি মেয়েকে দিতে পারেন নি ? কোন তীব্রতর আকর্ষণে সে তাকে ত্যাগ করল ? যদি বা চলেই গেল, খবর দিল না কেন ? তাকে তিনি স্নেহ দেন নি ? শিশুকালে বুকের পরে রেখে রাত কাটিয়ে দেন নি ? ইয়াসমিন কি বোঝে না, সে ভালো আছে কি না শুধু একটু জানার ভেতরে এখন তার পিতার জন্যে সমস্ত সঞ্জীবন ?

খণ্ড খণ্ড ছবিগুলো তার চোখের ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে সরে যায়। সাতষট্টি সালে পি.আই.এ-র লন্ডন আপিসে বদলী হয়ে এলেন। প্লেন থেকে নামছেন। বিয়ের পর সেই তার একা এতদূর ভ্রমণ। নাহারের জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি শূন্য বোধ করতেন ইয়াসমিন আর মাহজাবীনের জন্যে। মাহজাবীন তখন তিন, ইয়াসমিন পাঁচ। করাচিতে ফেলে এসেছিলেন তিনি। তারপর, বাসা গুছিয়ে নেবার পর, ওরা এল। মাসটা ছিল ডিসেম্বর। কড়া শীত। সকলেই নিষেধ করেছিল, এ সময়ে ওদের আনবেন না। আলি সে পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নি। পাছ প্লেন থেকে নেমে বাসা পর্যন্ত যেতেই শীতে কষ্ট হয়, তিনি স্ত্রী আর দু'মেয়ের জন্যে গরম কোট কিনে হিথরো এয়ারপোর্টে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখনো স্পষ্ট চোখে ভাসে। পি.আই.এ-র পাশ থাকবার দরুণ একেবারে ভেতর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি। মায়ের কোলে ছিল মাহজাবীন, আর পাশে টুরটুর করে হেঁটে আসছিল ইয়াসমিন। আলি দৌড়ে গিয়ে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছিলেন তাকে।

হাহাকার করে ওঠে বুকের ভেতরে।

কাঁধের পরে কোমল একটি হাত অনুভব করেন তিনি। একাত্তর সালে পি.আই.এ-র চাকরি থেকে বিদায় নেবার পর এই ঘরে এই আপিসে নিজের এজেন্সি যখন গড়ে তুলছেন, তখন ইয়াসমিন একেকদিন পা টিপে টিপে পেছনে এসে দাঁড়াত।

চোখ ফিরিয়ে দেখেন, নাহার।

মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেছেন তিনি আজীবন। ইয়াসমিন যখন পা টিপে আসত, মেয়েটির কি ইচ্ছে করত, বাবার গায়ে হাত রাখে ? সাহস পেত না ? তিনি তিরস্কার করতেন, যদি হাত রাখত ?

স্বামীর বিরল চেহারা দেখে নাহার ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না। সব ঠিক আছে।

আলি যেন এক মুহূর্তের জন্যে কিছুই বুঝতে পারেন না।

চা খেয়ে নিয়েছে। এখন এক মুশকিল হয়েছে।

কী, কীসের মুশকিল ?

বীনাকে নিয়ে ওরা একটু বেরুতে চাইছে। সঙ্গে নাসরিনও যাবে।

মাহজাবীনকে পছন্দ করে ফেলল নাকি ? দেখতে ওকেও তো সতের আঠার লাগে।

কী যে তুমি বল! বীনা যে ছেলেমানুষ। ওরা কী গাড়ি করে এসেছে, কত মাইল স্পীডে এসেছে, এই সব গল্প তুলে বীনা বেশ মাতিয়ে রেখেছে, এরই মধ্যে শুনি ডাক্তার বলছে, বেশ তো গাড়ি করে ঘুরিয়ে আনি। বীনা রাজি হয়ে গেল আমাকে জিগ্যেস না করেই। আমি আর কী করি, নাসরিনকে সঙ্গে নিতে বললাম। যাবে আর আসবে।

এ আবার কোন বিপদ হলো ? আলি আবার সাগরে গিয়ে পড়েন।

নাহার বলে, যেতে না দিলে খারাপ দেখাবে। বীনাকে অবশ্য আমি রান্নাঘরে ডেকে সব বলে দিয়েছি। নাহার ওপরের দিকে শংকিত দৃষ্টিপাত করে ফিসফিস করে বলে, মেয়েকে না বলে আর রাখা গেল না। মেয়েটি তোমার ভালো। ঘুনাক্ষরেও ওরা জানতে পারবে না ইয়াসমিনের কথা।

তবু ছেলেমানুষ।

না, না। বীনা নিজে আমাকে বলল, সে জানতেই দেবে না। বোনের জন্যে ওরও তো একটা কষ্ট আছে। কীসে সুনাম, কীসে দুর্নাম, তা কি বোঝে না ? কী সুন্দর আলাপ করছে, দেখে আমিই অবাক।

১৩

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে এবার ভাইয়ান। মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে। চটপটে, মুখশ্রী সুন্দর, বয়সটাও কম। এই শেষ দিকটাই ভাইয়ানকে মাতিয়ে রাখে। অধিকাংশ বাঙালির মতোই তার মজ্জাগত যে কয়েকটি রক্ষণশীলতা রয়ে গেছে, তার একটি হচ্ছে, মেয়েদের বারো বছর বয়স থেকেই সহবাসযোগ্য মনে করা, বিয়ের জন্যে ষোলর ধারে কাছে পাত্রী খোঁজা। সে একেবারে আটখানা হয়ে থাকে। বারীকে না বলে এতদূর টেনে আনবার জন্যে কিছু সময় আগেও যে অপরাধবোধ ও কুণ্ঠা ছিল, এখন আর তা নেই। বরং বারীর উপস্থিতিকে সে এখন অবাঞ্ছিত মনে করছে, শাপশাপান্ত করছে। বেশ হয়েছে, বারী যেমন যুবতী-পাগল, তার ভাগ্যে পেছনের সিটে পড়েছে ন বছরের পুঁচকে নাসরিন।

সাঁৎ করে গাড়ি পথে নামায় ভাইয়ান।

তোমাকে তুমি করেই বলি, কেমন ?

মাহজাবীন নিঃশব্দে সুন্দর করে হাসে। সে জানে, ঠিক কোন হাসিটি কোথায় গিয়ে টুং করে শব্দ তোলে। ভাইয়ান উৎসাহের সঙ্গে গাড়ি চালায়, ঘন ঘন আয়নায় নিজের চেহারা দ্যাখে।

লাইব্রেরির কাছে গাড়ি আসতেই মাহজাবীন বলে, সহসা মনে পড়িল। বাম দিকে মোড় নিন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাইয়ান বাম রাস্তায় গাড়ি আনে, এনেও ধীরে চালাতে থাকে।

একটি বাড়ি হইতে একটি ব্যাগ তুলিতে হইবে।

পেছন থেকে নাসরিন বলে ওঠে, কীসের ব্যাগ।

আমার সহিত আসিলেই দেখিতে পাইবে।

মাহজাবীন মনে মনে বিরক্ত হয়। এই মেয়েটিই সব ভণ্ডুল করে দেবে। অথচ একে না নিলে মা বেরুতেই দিতেন না। চমৎকারভাবে সে গাড়ির কথা তুলে, বারবার গাড়ির প্রশংসা করে

বেরুবার পথ করে এনেছিল, ফাঁদে পা দিয়ে ভাইয়ান তাকে নিয়ে বেরুতে চেয়েছিল, মাটি করে দিল নাসরিন।

এই বাড়ি।

চন্দনাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই দাঁড় করায় সে ভাইয়ানকে।

এক মিনিটে ফিরিব। নাসরিন, আইস।

যখন নিশ্চিত যে, এতদূর থেকে তাদের কথা ওরা শুনতে পাবে না, মাহ্জাবীন বলে, নাসরিন, একটি গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে। নহিলে বড় দিন আসিতেছে, সান্তাক্লজকে বলিয়া দিব, তোমাকে আর উপহার দিবে না। যদি আমার কথা শোন, তোমাকে আগামী সপ্তাহেই বায়োনিক উম্যান পুতুলটি কিনিয়ে দিব।

নতুন এই পুতুলটা বাজারে বের হবার পর থেকেই নাসরিন বায়না ধরেছিল। আলি বা নাহার কেউই তা পাত্তা দেয় নি বলে নাসরিনের একটা ক্ষোভ ছিল। সে এখন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সত্য বলিতেছ ?

হ্যাঁ। আগামী শনিবারেই পাইবে।

কী গোপন করিতে হইবে ?

আমি আজ যেখানে যাই, যাই করি, বাড়িতে মাম বা ড্যাডি জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, কী বলিবে পরে তাহা আমি শিখাইয়া দিব। এই লও, দশ পেনি অগ্রিম দিতেছি।

চন্দনা দরোজা খুলে দেয়। মাহ্জাবীন ও নাসরিনকে এক সঙ্গে দেখে উপলক্ষ্যটা ঠিক বুঝতে পারে না।

কী ব্যাপার ?

ব্যাগটি লইতে আসিয়াছি। ভিতরে আর যাইব না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ব্যাগ দিয়ে দরোজা বন্ধ করেও পুরো বন্ধ করে না চন্দনা। একটু ফাঁক রেখে চোখ চালিয়ে মাহ্জাবীনের গতিবিধি লক্ষ করে। তাকে একটা ঝকঝকে বড় গাড়িতে উঠতে দেখে অবাক হয়। এ গাড়ি কার! দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে তার। নাহ্, মাহ্জাবীন সত্যিই ভাগ্যবতী।

গাড়িতে বসতেই ভাইয়ান বলে, ব্যাগের ভেতরে কী ?

মহিলাদের ব্যাগের খবর লইতে নাই। বলেই সে আবার সেই টুং করা হাসিটা উপহার দেয়।

আর কোনো ব্যাগ লইতে নাই ? ভাইয়ান রসিকতা করে।

না, নাই।

কোনদিকে তাহলে যাব ?

মুশকিলে ফেলিলেন। মাহ্জাবীন ভালো করেই জানে, কোথায় তার এখন গন্তব্য, তবু কপাল কুঁচকে চিন্তা করবার ভান করে।

পেছন থেকে বারী বলে ওঠে, মুশকিল তো কেবল শুরু হইল।

মাহ্জাবীন সায় দেয়। হাঁ, তা হইল।

নাসরিন উদগ্রীব হয়ে বলে, তোমাদের কি গোপন কোনো কথা হইতেছে ?

মাহজাবীন তাকে ধমক দেয়, নাসরিন। বায়োনিক উম্যান স্মরণ রাখিও।

নাসরিন চুপ করে যায়।

মাহজাবীন স্টিয়ারিং হুইলে চাপড় দিয়ে বলে, উপকার যখন করিতেছেন, আরো একটি করিবেন ?

ভাইয়ান বিগলিত হয়ে যায়। মাহজাবীন কী সুগন্ধ মাখে ? নামটা জেনে নিতে পারলে, আজই একটা শিশি কিনে উপহার দেওয়া যেত।

এই ব্যাগটি পৌঁছাইতে হইবে।

কোথায় ?

অলবানি স্ট্রীটে।

অলবানি স্টীট কোথায় ?

আমি জানি না। আপনার গাড়িতে মানচিত্র নাই ?

১৪

বজলুল করিম টিকিটটা ভালো করে দেখে নিয়ে বেশ যত্ন করে পকেটে রেখে, চোখ থেকে চশমা নামিয়ে খাপে পুরে, খাপটি কোটের পকেটে রেখে, টেবিলে দুহাত জড়ো করে বলেন, আলি সাহেব, একটা ইনফরমেশন দিতে পারেন ?

বলুন।

ঢাকায় তো যাচ্ছি। ঢাকা থেকে সঙ্গে কাউকে আনতে হলে, তার টিকিট কি এখান থেকে কেনা যায় ? আমি শুনেছি, ঢাকায় লন্ডনের টিকিট কেনা অনেক ঝামেলা। পারমিশনের ব্যাপার আছে।

ব্যবসা ছেড়ে দিতে নেই। আলি বলেন, এখান থেকে টিকিট নিয়ে যাওয়াই ভালো। আপনি এখানে দাম দেবেন, অ্যাডভাইস চলে যাবে ঢাকায়, টিকিট সেখানে নিয়ে নেবেন। ভেতরের কলকজা আর বিশেষ খুলে বললেন না আলি।

তাহলে আপনি তাই অ্যাডভাইস করছেন ?

হ্যাঁ। আমিই আপনাকে করিয়ে দিতে পারি। কজন আসবে ?

একজন। সেই একজনই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবসাটা পাবার জন্য আলি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন।

তা এ রকম বোঝা তো আমাদের বইতেই হয়। তবু তো আপনি এখানে আছেন, পাউন্ড রোজগার করছেন, দেশের বোঝা যতই হোক, অতটা নয়। টাকায় উপার্জন করে বোঝা টানা, সে যারা টানে তারা বোঝে।

তা অবশ্য।

ভদ্রলোককে বেশ বিচলিত দেখায়। আলির চোখ এড়ায় না।

যাকে আনতে চান তার এনট্রি পারমিট এ-সব আছে তো ? সে কিন্তু লম্বা ঝামেলা। বিশেষ

করে এখন।

না, না, সে-সব আছে। কোনো অসুবিধে নেই। আমারই মেয়ে, এখানে এতদিন আমার কাছেই ছিল।

আলি হঠাৎ ব্যবসায়ী থেকে পিতা হয়ে যান। কৌতূহল হয় তার।

আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ, আমার মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তাকে আনতেই দেশে যাচ্ছি। আর বলবেন না। ভদ্রলোক সখেদে উচ্চারণ করে গুম হয়ে বসে থাকেন খানিক।

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কেন?

না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। বাঙালিয়ানা সব ভুলে যাচ্ছিল। আমাদের ফ্যামিলিতে ও-সব তো চলে না। একেবারে বাড়াবাড়ি দেখে বহুকষ্টে জোরজার করে বছরখানেক আগে ঢাকা পাঠিয়ে দিই আমার শশুরের কাছে।

আলি ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করেন, তারপর?

একে সেখানে বাবা নেই, মা নেই. নানা-নানী। আলি সাহেব, অনেকদিন থেকেই আপনাকে জানি, নিজের লোক মনে করি, তাছাড়া আপনারও ফ্যামিলি আছে, ঢাকা নাকি এখন লন্ডনকেও ছাড়িয়ে গ্যাছে।

বলেন কী? এত অভাব অভিযোগ।

রাখুন সাহেব অভাব অভিযোগ। সে তো নিচের তলায়। আর অভাব অভিযোগের সঙ্গে তো আপনার, কী বলে, ভ্যালু জাজমেন্ট বা মরালিটির কোনো সম্পর্ক নেই। ঢাকায় মেয়েরা এখন যা করছে অনেক ইংরেজ মেয়েও নাকি তা করতে দুবার চিন্তা করবে।

প্রতিবাদ করতে প্রেরণা পান আলি, কিন্তু নিজের মেয়ের কথা টেনে যখন বলছেন, ভদ্রলোককে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ থাকে না।

করিম সাহেব বলেন, যাকগে, এখন ঠিক করেছি ফিরিয়ে আনব। আমার কাছেই রাখব। কাছে থেকেই সহ্য করতে পারি নি, দূর থেকে শুনে কি সহ্য হয়? আপনি তাহলে মেয়ের একখানা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিন।

শুকনো গলায় আলি বলেন, করব। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি দিয়ে আসব আপনার বাসায়।

সে তো ভালোই হয়, খুব ভালো হয়। আমার যা মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। মেয়েকে নিয়ে না আসা পর্যন্ত শান্তি নেই। সে তো আসতেই চায় না। তাই যাচ্ছি।

আসতে চায় না কেন?

তেতো গলায় করিম সাহেব বলেন, নিজে বোঝেন না? সেখানে সুযোগও আছে, স্বাধীনতাও আছে।

টিকিটের দাম চেক লিখে দিয়ে বজলুল করিম ধীর পায়ে বেরিয়ে যান।

ইলিং থেকে আলবানি স্ট্রীট দূর হলেও সোজা রাস্তা। ওয়েস্টার্ন এভ্যেনু ধরে গেলেই হলো। মাদাম ত্যুসো-র মোমপুতুলের যাদুঘর পেরিয়ে একটু পরেই বাঁ হাতি রাস্তা। ভাইয়ানের হাতে গাড়ি উড়ে চলে। মাহ্‌জাবীন অনেকক্ষণ কোনো প্রসঙ্গ তোলে না বলে, তার সন্দেহ হয়, মেয়েটি তাকে অপছন্দ করছে না তো ?

ভাইয়ান অনেক ভেবে কোনো প্রসঙ্গ না পেয়ে হাতের কাছে যা খুঁজে পায় তাই তোলে। গাড়ি কেমন ?

মাহ্‌জাবীন সংক্ষেপে উত্তর দেয়, উত্তম।

তুমি কি একেবারেই বাংলা বলতে পার না ?

কিছু কিছু পারি। অনেক বুঝি।

এই তো সুন্দর বাংলা বলছ।

ভালো একসপ্রেশন হয় না।

চেষ্টা করলেই হবে। বাঙালি মেয়ে, বাবা-মা বাঙালি, চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। ইংরেজ তো আর নও।

লোকটির কথা শুনে গাড়ল মনে হয় মাহ্‌জাবীনের। তবু অলবানি স্ট্রীটে লোকটার ঘাড়ে চেপে যাওয়া যাচ্ছে, মাহ্‌জাবীন মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখে।

পেছন থেকে অনেকক্ষণ পর বারী মুখ খোলে। মাহ্‌জাবীনকে লক্ষ্য করে বলে, বুঝতে পারছেন না ? বাংলায় একটা কথা আপনার মুখ থেকে শুনতে চায়। গাড়ির কথা জিগ্যেস করছিল, গাড়ি কেমন ? গাড়ি নয়, নিজে কেমন সেটাই আসল প্রশ্ন। দিয়ে দিন উত্তর। বলে হা হা করে হাসে লোকটা।

বুঝিলাম না।

জানিতে চায়, গাড়ি নয়, গাড়ির মালিক আপনার পছন্দ হইয়াছে কি ?

বড় স্থুল মনে হয় মাহ্‌জাবীনের। এক ঘণ্টার আলাপেই এরা একটি মানুষের পাজামার ভেতর ঢুকে পড়তে চায়। নিষ্ঠুরভাবে সে খেলাতে শুরু করে তখন। বারীকে বলে, আপনি বিবাহিত ?

না। সৌভাগ্যবান নহি।

বিবাহ করিবেন ?

কন্যা পাইলে করিব।

কন্যা পান নাই।

পাইয়াছি অনেক। পছন্দ হয় নাই।

এখনো বাজার করিয়া চলিয়াছেন ?

হাঁ, আশা ছাড়ি নাই।

মুল্যহ্রাসের আশায় রহিয়াছেন কি ?

রসিকতাটি ঠিক রসিকতা নয় বলে বারীর সন্দেহ হয়। সে হাসতে গিয়েও আধখানা হেসে

বিসদৃশভাবে চুপ হয়ে যায়।

লক্ষ রাখিবেন, ইতিমধ্যে স্বয়ং আপনার মূল্য না হ্রাস হইয়া যায়। ঈশ্বর না আপনার দেহে 'বিরাট মূল্যহ্রাস' ঝুলাইয়া দেন।

গুম হয়ে যায় বারী। গোড়াতেই তাকে যে এতদুর টেনে আনা হয়েছিল, এর জন্যে আবার সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মনে মনে।

মাহজাবীন এবার ভাইয়ানকে নিয়ে পড়ে। তার ওপর রাগটা আরো বেশি, কারণ এই লোকটিই তো ইয়াসমিনকে গাভীর মতো ব্যবহার করতে চায়।

আপনি কী রকম বাজার করিয়াছেন?

আমি? না, একেবারেই না, মোটেই না।

আমিই প্রথম?

ভাইয়ান আমতা আমতা করে।

মাহজাবীন বলে, সত্য বলিলে কিছু মনে করিব না।

ভাইয়ান বলে, মিথ্যে করে বলে, এই প্রথম কন্যা দেখিতে আসিলাম।

ইংরেজিতে মিথ্যে কথাটা বলে ততটা অপরাধী মনে হয় না নিজেকে।

আমাকে পছন্দ হইয়াছে?

তোমার কী মনে হয়?

মাহজাবীনও মেয়েলিপনা করে, সুর তুলে, বাংলা জবাব দেয়, কেন বলব? মেয়ে বলে না। ছেলে বলে।

ভাইয়ান শরীরের ভেতরে শিহরণ অনুভব করে। এমনকি সে গিয়ার বদলাবার ছুতোয় মাহজাবীনের উরু ছুঁয়ে দেয়। রাগে ভেতরটা দপদপ করতে থাকে মাহজাবীনের। একটা নিষ্ঠুর খেলা তার মাথায় আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ে ফিরে যায় সে।

চুপ করিয়া আছেন কেন? উত্তর দিন। পছন্দ হইয়াছে?

হ্যাঁ খুব পছন্দ তোমাকে।

সত্য?

ঈশ্বর উপরে। আমার বিষয়ে কিছু বলিলে না?

কী বলিব?

আমাকে পছন্দ কিনা?

আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, পুরুষের পছন্দকেই একমাত্র জ্ঞান করি। আমি আপনার উপযুক্ত হইতে পারিব কিনা কে জানে, আপনি যে আমাকে দয়া করিয়া পছন্দ করিয়াছেন, আমি সৌভাগ্য বিবেচনা করিতেছি।

ভাইয়ান হাতে চাঁদ পাবার সুখ অনুভব করে। অন্তরে বাঙালি বাইরে ইংরেজ, সোনায় সোহাগা আর কাকে বলে? একেবারে জাত ইংরেজ মেয়ে ঘরে আনতে তার যেমন ভয়, তেমিন পুঁইশাকের গন্ধমাখা বাঙালি মেয়ে তার বিবমিষার উদ্রেক করে। অথচ দুটোরই মজার দিক সে লুটতে চায়। এরকম ভাগে ভাগ আর সে কোথায় পেত? খুশিতে সে

মাহজাবীনের কাঁধে একটা হাতই ক্ষণকালের জন্যে ছুঁইয়ে দেয় বিনা ছুতোয়।

পেছন থেকে খসখসে গলায় বারী বলে, মাদাম ত্যুসো পেরিয়ে গেলাম, ডাক্তার সাহেব। আলবানি স্ট্রীটে যাচ্ছেন তো?

১৬

সদ্য অধিকার বোধের পাখায় ভর করে গাড়ি থেকে মাহজাবীনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ানও নেমে আসে। পেছন পেছন দরোজা পর্যন্ত আসবার উদ্যোগ দেখে সে বলে, আপনি অপেক্ষা করুন।

চুপসে গিয়ে ভাইয়ান গাড়িতেও ঢোকে না, সঙ্গেও যায় না। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝুলি থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করে আবার নম্বর মিলিয়ে নেয় মাহজাবীন। তারপর ভারি আর চওড়া কালো কাঠের দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দরোজার গায়ে কোনো বেল-বোতাম নেই। তাহলে? হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, এখানে যারা আছে, তারা জোর করে দখল করে আছে। সে দরোজায় করাঘাত করে। সাড়া পাওয়া যায় না। আবার করাঘাত করে। অপেক্ষা করে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। ভুল ঠিকানা নয় তো? কিম্বা বাড়িতে কেউ নেই? এত অভিনয় করে একটা উজবুককে পটিয়ে এতদূর আসাটাই বৃথা হয়ে গেল? পেছন ফিরে তাকায়। রাস্তার ওপারেই পুলিশ থানা। এতক্ষণ থানার নীল চৌকো ডোমবাতিটা চোখে পড়ে নি। এখন দেখেই কেমন ভয় করে মাহজাবীনের। থানার এত কাছে? এদের সাহস আছে বলতে হয়?

ক্যাঁচ করে শব্দ হতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিল আর কী। তাকিয়ে দ্যাখে চওড়া দরোজার ভেতর থেকে একটুখানি ফাঁক করে ঘন দাড়িওয়ালা এক শ্বেতাঙ্গ উঁকি দিয়ে নিঃশব্দে তাকে দেখছে। দরোজা ভেতর থেকে সেফটি-চেন দিয়ে আটকান।

অনেকক্ষণ পর দাড়ির ফাঁকে হাসি বিচ্ছুরিত হয়।

কাহারো সাক্ষাতপ্রার্থী?

হাঁ। আমার ভগ্নী এখানে থাকে।

তাহার কী নাম?

ইয়াসমিন। মাত্র গতরাত্রি আসিয়াছে।

হাঁ, উহারা ত্রিতলে আছে।

সে ভেতরের চেন খুলে দেয়। মাহজাবীন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ গতিতে দরোজা বন্ধ করে দেয় তরুণটি। তারপর মাহজাবীনের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিপাত করে নিঃশব্দে হাসে। বলে, আমাদের সাবধান থাকিতে হয়। মালিক জোর করিয়া ঢুকিতে পারে। পুলিশ আসিতে পারে। ঐরূপ আলামত দেখিলে আমরা দরোজা খুলি না। তোমার ভগ্নী অপেক্ষা তুমি সুন্দর। যাও, সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলে সর্বদক্ষিণ দরোজায় ঘা দিবে। সেখানে আছে।

সিঁড়িগুলো অত্যন্ত চওড়া এবং বেশ উঁচু উঁচু। দরোজা জানালা অতিকায়, ছাদ গগনস্পর্শী প্রায়। বাড়ির ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ। বাড়ির প্রাচীনত্ব, অধিবাসীদের বিচিত্র রান্না, আর

তামাকের ধোঁয়া মিলিয়ে গন্ধটা স্থির ঝুলে আছে। মাহজাবীন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে না ভেবে পারে না, ইয়াসমিন এখানে থাকবে কী করে? শুভাকাঙ্খার ক্ষীণ একটা জ্যোৎস্না তার ভেতরে বিকীর্ণ হতে থাকে।

তেতলায় উঠে একেবারে ডান দিকের দরোজা আধো খোলা দ্যাখে সে। কাছে এসে উঁকি দেয়। কয়েকজন তরুণ তরুণীকে দেখা যায়। ইয়াসমিনকে দেখা যায় না। তারা মাহজাবীনের দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু অবাক হয় না, কিম্বা চোখে কোনো প্রশ্ন আঁকে না। একটি মেয়ে আমন্ত্রণের হাসি নিয়ে ভেতবে আসতে ইশারা করে তাকে। দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায় ইয়াসমিনকে। ছেড়া এক টুকরো কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ বোঁজা, মনে হয় মৃত। বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে মাহজাবীনের। পা অবশ হয়ে যায়। ব্যাকুল চোখে সবার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

সে ঘুমাইতেছে।

মাহজাবীন তাকিয়ে দ্যাখে, গিটার কোলে এক তরুণ। তার আরো চোখে পড়ে, শুধু ইয়াসমিন নয় আরো তিন জন ঘুমিয়ে আছে। এক তরুণ তরুণী প্রায় নগ্নদেহে নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের এক পাশে গ্যারাফিন হিটার জ্বলছে। তার উত্তাপে উষ্ণ এবং সুখী মনে হয় যুগলদেহ। ক্ষণকাল আগের আশংকায় মাহজাবীন নিজেই বিব্রত বোধ করে। সহজভাব হাসে সে।

মার্ক বলে, আমি মার্ক, তুমি ইয়াসমিনের ভগিনী।

হাঁ, এই ব্যাগ দিতে আসিয়াছি। দেরি করিতে পারিব না।

মার্ক পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে ঘুমন্ত ইয়াসমিনকে দ্যাখে।

মাহজাবীন বলে, না, জাগাইও না। বলিও আমি আসিয়াছিলাম।

মাহজাবীন আবার ঘুমন্ত যুগলকে দ্যাখে। তরুণীটির স্তন সৌষ্ঠব তাকে মুগ্ধ করে। আরেক যুবক যে ঘুমন্ত নয়, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে মাহজাবীনকে, তার পরনে কেবল অন্তর্বাস। যুবকের ধবধবে উরু সে এর আগে এত স্বাভাবিকভাবে দেখে নি। ক্ষণকাল তার চোখ সেখানেও আটকে থাকে। তারপর সে বলে, বলিও সব ঠিক আছে।

নেমে আসে মাহজাবীন। একেবারে নিচে পৌঁছুতেই, হলের পাশে টুক করে একটা দরোজা খুলে যায়। দাড়িওয়ালা সেই তরুণ উঁকি দেয়। তাকে দেখেই মৃদু হাসে। যেন বলতে চায়, হয়ে গেল? এর মধ্যেই চললে? মাহজাবীন তাকে বলে, এক মিনিটের মধ্যেই আমি আবার আসিতেছি, সঙ্গে একজন বন্ধু থাকিবে। আপত্তি নাই তো?

তরুণ সম্মতি দেয়।

মাহজাবীন বেরিয়ে হাত তুলে ইশারা করে ভাইয়ানকে ডাকে। সে তখনও পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইশারা পেয়ে দ্রুত পায়ে কাছে আসে সে।

কী ব্যাপার?

আলাপ করাইয়া দিব।

কার সঙ্গে? বলতে বলতে ভাইয়ান দূরে গাড়ির ভেতরে বারীকে একবার চট করে দেখে নিয়ে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই মাহজাবীনকে অনুসরণ করে।

সেই তরুণ সেফটি-চেন লাগিয়ে দরোজা ফাঁক করে এতক্ষণ দেখছিল, এখন দরোজা খুলে দেয়। তাকে দেখে একটু হকচকিয়ে যায় ভাইয়ান। তরুণ এখন নিঃশব্দে হাসে, সে আরো অপ্রস্তুত বোধ করে।

মাহজাবীন তাকে আশ্বস্ত করে বলে, বন্ধু।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে দুজন। ভাইয়ান ভ্যাপসা গন্ধটার জন্যে রুমাল বের করবে কি না চিন্তা করে। বদলে জিগ্যেস করে, এখানে কারা থাকে ?

মানুষ।

তেতলায় পৌঁছে যায় ওরা। তেতলায় একেবারে ডান দিকের ঘরে ঢুকে জড়াজড়ি করে থাকা যুগলকে দেখে ভাইয়ানের চোখ কপালে উঠে যায়। মেঝের ওপর শুয়ে থাকা, বসে থাকা মানুষগুলোকে দেখে ভীষণ অপ্রতিভ বোধ করে।

মার্কের দিকে তাকিয়ে মাহজাবীন ক্ষমা প্রার্থনার নীরব হাসি নিবেদন করে। উত্তরে ম্লান হাসে মার্ক।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারে না ভাইয়ান। তার দৃষ্টি এবার আবিষ্কার করে সবগুলো শাদার ভেতরে একটি বাদামি। ঘুমিয়ে থাকা ইয়াসমিন।

মাহজাবীন ইয়াসমিনের দিকে আঙুল তুলে ভাইয়ানকে বলে, ভালো করিয়া দেখিয়া লউন। আমার জেষ্ঠা ভগিনী। উহাকেই আপনার দেখিতে আসিবার কথা। পছন্দ করিবার কথা। আমাকে নহে।

হতভম্ব হয়ে যায় ভাইয়ান। ইয়াসমিনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

মাহজাবীন তীব্র গলায় বলে, আর উহাকে দৃষ্টি দিয়া লেহন করিবেন না।

নিচে নেমে, পথে বেরিয়ে মাহজাবীন বলে, বজ্রাহত হইবার অভিনয় না করিলেও চলিবে। আপনার বন্ধুটির মতো আপনিও কন্যা দেখিয়া বেড়ান, বাংলাদেশের বাজারে বহু গাভী আছে।

গাড়ির কাছে এসে মাহজাবীন বলে, নাসরিন, বাহির হও।

তুমি কি আজই বায়োনিক উম্যান কিনিয়া দিবে ?

বাহির হও।

মাহজাবীন সরাসরি না তাকিয়েও টের পায়, বসন্তমুখো কালো টেকো ডাক্তারটি কিছু না বুঝেই বোকা হয়ে গেছে, একবার তার দিকে, একবার ভাইয়ানের দিকে তাকাচ্ছে।

পাতাল রেলপথে বাড়ি ফিরে মাহজাবীন ঘোষণা করে, মাম, ভাবিও না। সে বিদায় হইয়াছে।

মিস্টার আলি উদ্বিগ্নস্বরে জানিতে চান, কটু ব্যবহার করিস নি তো ?

বুঝিলাম না।

জানিতে চাহিতেছি, রূঢ়ভাবে বিদায় দাও নাই তো ? সে যে তোমাকে পৌছাইয়া দিল না ?

সে চাহিয়াছিল।

ও। আশ্বস্ত হন আলি।

ড্যাডি, তোমার নিন্দা হইতে দিব না। বিদায় মুধর হইয়াছিল।

মার্ক, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি।

মাঝরাতে কাছের রাস্তা ও দোকানগুলো যখন জনজঙ্গল আর নয়, তখন সোহো স্কোয়ার লোকের ভিড়ে গমগম করছে। চারদিকে এত উজ্জ্বল আলো যে, আলোকেই মনে হয় কলরব মুখোরিত। অধিকাংশ দোকান স্টল, রেস্তোরাঁ খোলা। বিদেশী পর্যটকদের ভিড়। ঢ্যাড়া চিহ্ন দেওয়া ছবি, বিবসনা রমণীর দেহ এবং আসন প্রদর্শনী আর ডিস্কো নাচের আসরগুলোতে মানুষ ভিড় করে ঢুকছে। কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আধ ঘণ্টা পরের সেশনে ঢুকবে, চলতিটায় আসন পায় নি। কেউ জানালায় সাঁটা নগ্ন মেয়েদের পোস্টার দেখছে, ভেতরে ঢুকবে কি না মনস্থির করতে পারছে না। কেউ সুইচ সেন্টারের মাথায় আলোয় লেখা চলমান বিশ্ব সংবাদের শিরোনাম পড়ছে, রেকর্ডের খোলা দোকানে হ্রাসমূল্য রেকর্ড কিনছে কেউ। সুভ্যেনিরের দোকানে লন্ডন স্মৃতি কিনছে। আর কিছু লোক অলস স্রোতে জলজগুলোর মতো ভেসে চলেছে।

অলবানি স্ট্রীটের দল, ইয়াসমিনের সোনার লকেট বেচার টাকায়, আজ সোহোতে এসেছিল চাইনিজ খেতে। এখন তারা জলজগুল্ম হয়ে গেছে। ভিনসেন্ট, পিটার আর জো একেকটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। মার্ক একা পেছনে, ইয়াসমিনও একা, পাশে এবং দূরে।

শরীরের ভেতর দুর্বোধ্য একটা অনুরণন বোধ করে ইয়াসমিন, ব্যাথাটা শারিরীক কিম্বা আত্মীক সে অনেকক্ষণ স্থির করতে পারে না। এমনও মনে হয়, অন্য কারো শরীর ধারণ করে সে চলাচল করছে।

এক সময়ে পিছিয়ে এসে মার্ক পাশে চলতে শুরু করে।

মার্ক, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি।

হাঁ, ইহাতে দুঃখিত হইও না। নিঃসঙ্গতা সচেতন ব্যক্তিই অনুভব করে। অস্থির ভেতরে।

মার্ক, আমার ভালো লাগিতেছে, এবং ভালো লাগিতেছে না।

মার্ক চুপ করে থাকে।

ভিনসেন্ট হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, দলকে সমবেত করে। দু তিনজনকে এক সঙ্গে কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলে, হাঁ, হলুদ শয়তানগুলোকে দ্যাখো।

তার আঙুল অনুসরণ করে দেখা যায়, একটা নাইট ক্লাবের সমুখে দশ বারোজন জাপানি। দেখে বোঝা যায়, পর্যটক ঠিক নয়, ব্যবসার কোনো কাজে এসেছে, অবসরে ফুর্তি করতে বেরিয়েছে। তাদের বিচিত্র কলরব শুনে দলের আমোদ হয়। এতক্ষণ উদ্দেশ্যহীন নিরবতা ছিল, তা হো হো হাসিতে তারা ছিঁড়ে ফ্যালে।

দুলকি চালে সবাই এগিয়ে যায়। ভিনসেন্ট এক জাপানিকে বলে, পয়সা কেন খরচ করিবে এখানে? চাও তো, আমার বালিকারা দেখাইবে। এইসব বালিকা উহাদের চেয়ে উত্তম।

জাপানিদের ভেতরে সবাই ইংরেজি বোঝে না। একজন বোঝে। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠাতেই টের পাওয়া যায়। তাই সে একটু এগিয়েও আসে।

তখন পিটার জাপানিটির কাছে ঘেঁষে কোকোকে দেখিয়ে বলে, ইহাকে লইবে?

জাপানিটি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে।

জো প্যামের চিবুক তুলে ধরে বলে, এবং ইহাকে ?

ভিনসেন্ট বলে, তোমাদের মুখে ইহারা সুন্দর বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। হাঁ ?

জাপানিটি ইংরেজি ভালো জানে না, তাই মর্মার্থ তার বোধগম্য হয় না।

ভিনসেন্টের রসিকতা শুনে দলের পেটে হাসি বুড়বুড় করছিল, জাপানিটি যখন হাতের আঙুল তুলে আন্তর্জাতিক নিরব ভাষায় জানতে চায় ঐ কাজের দরুন তারা পারিশ্রমিক কত চায়, তখন গোটা দল, এমনকি ইয়াসমিনও দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে। হতবাক জাপানিদের পেছনে ফেলে, হাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তে তারা অন্য মজা সন্ধান করে।

এইভাবে বহুবার তারা চক্কর দেয় সুইস সেন্টার থেকে পিকাডেলির মোড় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ, পুরো পথটাই পথিকের।

মার্ক বলে, হাসিতেছ ?

ইয়াসমিন থতমত খেয়ে যায়।

মার্ক আশ্বস্ত করে তাকে, হাসিবে না কেন ? উহারাও নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা কাটাইবার জন্য হাসিবার উপকরণ খুঁজিতেছে।

ইয়াসমিন আবার হেসে ফেলে সত্যি। বিষ্ঠা ত্যাগের কথাটা যে জাপানিরা আদৌ বুঝতে পারে না, এখনো সুড়সুড়ি দেয় তাকে।

মধ্যপ্রাচ্যের দুই আরবকে দেখা যায়। দলের মেয়েগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে থাকে। যতবার সমুখ দিয়ে ওরা যায়, ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে।

ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল জো-র। সে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে দলকে থামিয়ে বলে, গরীব আরব দেখিবে ?

হাঁ, হাঁ, কোথায় ?

কলরব করে ওঠে সকলে।

ঐ দ্যাখো।

সেই আরব দু'জন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, এবার সকলের চোখে পড়ে।

কোকো জো-র গালে টোকা দিয়ে বলে, গরীব কী প্রকারে জানিলে ?

নহিলে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে ?

কোকো একটু ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু অন্যান্য সকলেই হেসে ওঠে। তাদের বিদ্রুপের হাসিতে আরব দুজন মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ভিনসেন্ট তখন দলকে ঠেলে আরবদের পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে, কাছে এলে ঘাড় ফিরিয়ে আরবদের উদ্দেশ্যে বলে, এখানে পাইবে না ; মহারানীর প্রাসাদে যাও। সেখানে অশ্বাননা রাজকুমারী অ্যান রহিয়াছেন। ছুটিবে এবং ভালো ছোটাইবে।

বলেই হা হা করে হাসতে হাসতে সকলে তাদের, অতিক্রম করে যায়।

নাহ, ফিরিয়া যাইতে হয়। প্যাম দুহাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভেঙে শরীর বাঁকিয়ে বলে।

আমি শয্যায় যাইতে চাই।

কি, আরবদের শয্যায় ?

পিটারের দুর্মুখ মন্তব্য শুনে প্যাম তাকে লাথি মারে পেছনে। বলে, আরবরা বালক পছন্দ করে। তুমি তাহাদের শয্যায় যাও।

সবাই আবার এক প্রস্থ হেসে ওঠে।

ফেরাই স্থির হয়। নীরবেই স্থির হয়ে যায়। তারা আর সুইসসেন্টারের দিকে ফেরে না। ধীরে ধীরে এলাকা ছেড়ে এগোয় তারা। হেঁটেই তারা যাবে। অলবানি স্ট্রীট মাইল দেড়েকের মতো। শনিবার রাতে এমন বহু দল দুটো তিনটের সময় দেখা যায় অলস পায়ে ফিরে যাচ্ছে রাস্তার সমস্ত দখলিসত্ত্ব নিয়ে।

সোহো স্কোয়ারের ভেতরেই অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা রাস্তায় বাঁক নিতেই দেখা যায়, চীনা একটা রেস্তোরাঁ, তারপরে গাড়ি ঢোকার মতো কাঠের চওড়া গেট, পাশে এক আলোকিত সরু দরোজা। দরোজার দুপাশে উজ্জ্বল হলুদ রঙের পটভূমিতে, কাচের আড়ালে সাঁটা উলঙ্গ নৃত্যকরা রমণীদের ছবি। দরোজার মুখেই কাউন্টারে দুজন বসে আছে টিকিট বেচতে। আর দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে ঘন ঘন ভীরু দৃষ্টিপাত করছে বাদামি এক লোক।

লোকটিকে অতিক্রম করে যাবার মুহূর্তেই ভিনসেন্টের বাসনাটি হয়। সে বলে, বাদামি শুকরটি নতুন আসিয়াছে।

পেছন ফিরে তাকায় দলের সবাই। লোকটির ভীরু ভাব এতদূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। তাদের সমবেত স্ফূর্তি হয়।

ভিনসেন্ট ইয়াসমিনকে কাঁধে ধরে বলে, উহাকে ডাকিয়া আন। ভিনসেন্ট তার পিঠে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়।

ইয়াসমিন হেসে বলে, যদি আমাকে প্রস্তাব করে, বাঁচাইবে তো ?

রগড় দেখবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে দলটি। ইয়াসমিন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে হাত দিয়ে কাছে আসতে ইশারা করে। লোকটি প্রথমে শংকিত হয়। পরে, ইয়াসমিনের বাদামি রঙ দেখে, চেহারা ভারতীয় বলে আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

অন্ধকারের ভেতর আসতেই চারদিক থেকে দলটি ঘিরে ধরে লোকটিকে। এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে তাকে ঘিরেই আরো নির্জন অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তারা। লোকটি ইয়াসমিনকে আর দেখতে পায় না। তার চারদিকে শাদা মুখগুলো দেখে, গায়ের ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সে।

ভিনসেন্ট বলে, নতুন আসিয়াছ ?

লোকটি হয় প্রশ্ন বুঝতে পারে না, অথবা ভয়ে তার গলা শুকিয়ে যায়। সে ঠোঁট চাটতে থাকে ঘন ঘন। পিটার বলে, আমার গিরগিটি স্মরণ হইতেছে।

জো বলে, বাদামি শুকরটি গিরগিটির জিড়া প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির কৌতুক অবলোকন কর।

লোকটি বেরুবার চেষ্টা করে। গলা তুলে দলের মাথার ওপর দিয়ে আশেপাশে পথিক সন্ধান করে। তখন ভিনসেন্ট তার গলা ধরে বলে, তুমি সহবাস করিবে ? শ্বেতাঙ্গ বালিকার সহিত

নিদ্রা যাইবে? কত আনিয়াছ?

সকৌতুক দল লোকটির উত্তরের অপেক্ষা করে। সহবাসের উল্লেখে লোকটির জিভ একবার বেরিয়ে আর বেরোয় না।

পিটার লোকটির কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়।

যথেষ্ট আনিয়াছ তো?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে কোটের দুদিক চেপে ধরে ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে, সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত, সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত।

শক্ত থাবায় তার মুখ চেপে ধরে ভিনসেন্ট। সবার দিকে হেসে তাকিয়ে বলে, ইহা ইংরাজি বলে দেখিতেছি। হইবে না কেন? সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত তো।

সকলে নিচু পর্দায় হেসে ওঠে। লোকটি ইয়াসমিনের দিকে ভয়ার্ত করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, ছয় মাস পরে চলিয়া যাইব।

জো লোকটির পেটে ঘুষি দেয়। বলে, ছয় মাস সরকারি বৃত্তিতে শ্বেতাঙ্গ বালিকার সুখ লইবে? তবে এই লও। বলে, সে প্যামকে ধাক্কা দিয়ে লোকটির বুকের ওপর ফেলে দেয়। এবং পরক্ষণেই তাকে সরিয়ে দিয়ে লোকটির পেটে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে বলে, তুমি আমার বান্ধবীর গায়ে হাত দিলে কেন?

ভিনসেন্ট তার মুখ শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। আর দমাদম তাকে লাথি ঘুষি মারতে থাকে জো আর পিটার। মেয়েরা দৃশ্যটাকে আড়াল করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাছে পুলিশ না এসে যায়।

থাবায় মুখ আটকানো থাকলেও লোকটির মুখ থেকে একটি আর্ত শব্দ বেরিয়ে আসে, বাবাগো!

ইয়াসমিনের কাছে শব্দটি বিদ্যুৎবেগে পরিচিত বোধ হয়।

লোকটির রক্তমাখা ঠোঁট থেকে আবার উচ্চারিত হয়, আর না, আর না।

ইয়াসমিনকে ভিনসেন্ট প্রশ্ন করে, সে কী বলিতেছে? বুঝিতে পার?

বুকের ভেতরে কেমন যেন করে ওঠে ইয়াসমিনের। ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে অপরিচিত মনে হয়। ভয়ে তার উত্তর আপনা থেকে গড়িয়ে পড়ে, যথেষ্ট হইয়াছে বলিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কোথা থেকে শক্তি পায়। নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে খানিক। নিমজ্জমান মুমূর্ষু মানুষও কাঠের টুকরো দেখে বল ফিরে পায়। লোকটি ইয়াসমিনের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে বাংলায় বলে, আপনি বাঙালি. আপনি আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

এক ঝটকায় তাকে টেনে তোলে জো আর পিটার দু'দিক থেকে। ভিনসেন্ট লোকটির দুই উরুর ফাঁকে প্রচণ্ড এক লাথি মারতেই লোকটি কোঁৎ করে ওঠে। ইয়াসমিনের দিকে আবার তাকায়। তার দৃষ্টিতে কী ছিল, ইয়াসমিন চোখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটিকে সংজ্ঞাহীন করে, তার পকেট থেকে টাকাগুলো নিয়ে দল অলবানি স্ট্রীটের দিকে গলা জড়াজড়ি করে এগোয়।

১৮

ঘুম আসে না ইয়াসমিনের। কেবলি সে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। লোকটির চেহারা নয়, কণ্ঠস্বর তার স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে। লোকটি যে পরিষ্কার বাংলা কথাগুলো বলেছিল, এখন তা ইয়াসমিনের কানে তীব্র ভাষায় রূপ নেয়। বাংলা কি ইংরেজি, সে আর সচেতন নয়।

ঘর অন্ধকার। মেঝের ওপর প্রত্যেকে জায়গা দখল করে শুয়ে পড়েছে মাথা পর্যন্ত কম্বল টেনে। ইয়াসমিনকে দরোজার কাছে জায়গা দেয়া হয়েছে। দরোজার ফাঁক দিয়ে হিস-হিস করে হিম বাতাসের স্রোত আসে। তার দরুণ শীতবোধ হয়।

হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে শীতের সঙ্গে লড়াই করে। কম্বল আনে নি, গায়ের কোট খুলে ওপরে দিয়ে দিয়েছে সে।

নিজেকে রিক্ত এবং ব্যর্থ মনে হয় তার। ব্যর্থতাই বড় হয়ে তাকে রোমশ জন্তুর মতো চেপে ধরে। সেই সঙ্গে আবার তার মনে হয়, অন্য কারো শরীর সে ধারণ করে আছে, তার পুরনো দেহ বিদায় নিয়েছে, এই দেহের কোনো সংকেতই বোধগম্য বা নিয়ন্ত্রিত নয়।

পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।

অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে মার্ক এসে ফিসফিস করে বলে, আমার কম্বল লও।

অনুভব করে মার্ক কোট সরিয়ে নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয় তাকে। ইয়াসমিন মার্কের হাত ধরে থাকে কিছুক্ষণ। যেন সে এতক্ষণ উঁচু দালানের কার্নিশে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ একটা অবলম্বন পেয়েছে।

তুমি কী গায়ে দিবে?

আমি বসিয়া থাকিব।

ইয়াসমিন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। শীত পরাজিত হয়। উষ্ণতা ফিরে আসে।

মার্ক, তুমি আছ?

হ্যাঁ, আমি আছি।

আমি কাঁদিতে ইচ্ছা করি।

কাঁদিও না, কেন কাঁদিবে?

তুমি ইহাদের মতো নও। তুমি ইহাদের সঙ্গে আছ কেন?

মার্ক কোনো উত্তর দেয় না।

ইয়াসমিন এবার কম্বলের ঢাকা সরিয়ে মুখ বের করে ফিসফিস করে বলে, চল আমরা দুজনে কোথাও চলিয়া যাই। মার্ককে নীরব দেখে ইয়াসমিন আধো উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে নাভীর নিচে ক্ষীণ অথচ গভীর একটা ব্যথা অনুভব করে, লোকটিকে তখন প্রহার করবার স্মৃতি ফিরে আসে, এই ব্যথাবোধ মানসিক এবং তারই সহানুভূতিতে বলে ইয়াসমিন মনে মনে ব্যাখ্যা করে নিয়ে, মার্কের হাত ধরে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, যাইবে মার্ক?

না, যাইব না।

তুমিও কি আমার ত্বকের রঙ ঘৃণা কর।

মার্ক তার কপালে হাত রাখে। তোমার ত্বকের রঙ সম্পর্কে আমি সচেতন নহি।

সে তো উহারাও নহে। আমার উপস্থিতিতে লোকটিকে 'বাদামি শুকর' বলিল।

উহাদের কথা আলাদা। আমি উহারা নহি।

তবে যাইতে চাহ না কেন?

আমি দুঃখ এবং পতন প্রত্যক্ষ করিতে চাই।

আর কত করিবে?

জীবৎকাল পর্যন্ত। তোমার সঙ্গে যাইতে পারিলে খুশি হইতাম। সুখ আমি চাহি না। সুখের ভিতরে সম্পদ নাই, ঐশ্বর্য নাই। আমার সঙ্গীত মরিয়া যাইবে। সঙ্গীত ভিন্ন আমার বন্ধু নাই। মানুষ কখনোই মানুষের বন্ধু হইতে পারে না। ইহা অলংঘনীয় দূরত্ব।

ইয়াসমিন ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে।

মার্ক বলে, তুমি নিদ্রা যাও।

উহারা লোকটিকে বাদামি শুকর বলিল কেন?

তুমি নিদ্রা যাও।

উহারা লোকটিকে প্রহার করিল কেন?

তুমি নিদ্রা যাও।

উহার লোকটিকে সর্বস্বান্ত করিল কেন?

তুমি নিদ্রা যাও।

আমি কেন প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কেন বাধা দিলাম না। কেন তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম?

তুমি তো স্ব ইচ্ছায় আসিয়াছিলে। তুমি তো পূর্বেও বাধা দাও নাই। তুমি তো পূর্বেও প্রতিবাদ কর নাই।

ইয়াসমিন আবার উঠে বসে। গা থেকে কম্বল সরিয়ে বলে, কী বলিতেছ? এ কী যুক্তি দিতেছ?

যুক্তি যথাযথ।

তুমিও উহাদের দলে। তুমিও 'বাদামি শুকর' বলিতে পার। আমার উপস্থিতিতে কী করিয়া বলিতে পারিল? তবে কি আমাকে অন্তর হইতে গ্রহণ করে নাই?

না, করে নাই।

ইয়াসমিন স্তব্ধ হয়ে যায়।

মার্ক বলে, মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া যাউক। বাক্য সত্য হউক। তোমাকেও 'বাদামি কুক্কুরী' বলিয়াছে, তোমার সাক্ষাতেই বলিয়াছে।

.না, বলে নাই। কে বলিয়াছে?

অবশ্য তোমার তখন উপলব্ধি করিবার মতো অবস্থা ছিল না। ভিনসেন্ট বলিয়াছে।

অন্ধকার বিকট ও দুঃসহ মনে হয় ইয়াসমিনের। দুর্বল কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, সত্য?

হ্যাঁ। সত্য। তোমাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি। মিথ্যা বলিব না। অপরাহ্নে ঘ্রাণ লইবার অধিবেশনে তুমি সম্পূর্ণরূপে উত্তোলিত হইয়া যাইবার পর, ভিনসেন্ট তোমার কুমারীত্ব হরণ করে।

না। আর্তনাদ করে ওঠে ইয়াসমিন। নাভির নিচে ক্ষীণ ব্যথাটা হঠাৎ তীব্র হয়ে যায়। মার্ক মন্ত্র পাঠের মতো উচ্চারণ করে চলে, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় তোমার শরীর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সম্ভবত তোমার যন্ত্রণা হইতেছিল।

ইয়াসমিনের স্মৃতিতে যন্ত্রণা নেই দেখে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। তার স্মৃতিতে মহাশূন্যে চন্দ্রযানের সুখকর সম্মুখ-ধাবমান। তার চেতনা এখন ক্রমশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে থাকে।

মার্ক নিষ্করুণ কণ্ঠে বলে যায়, তখন ভিনসেন্ট তোমাকে চড় মারিতে মারিতে 'বাদামি কুক্কুরী শান্ত হও' বলিতেছিল।

চন্দ্রযান থেকে ছিটকে পড়ে ইয়াসমিন। ভয়াবহ দ্রুত গতিতে পতিত হতে হতে সে আকুল কণ্ঠে বলে, মার্ক আমাকে তুমি রক্ষা করিলে না?

মার্ক উত্তর দেয়, আমি তখন আমা হইতে বিযুক্ত ছিলাম।

১৯

এত ভোরে দরোজায় বেল বাজতে শুনে মিস্টার আলি আর নাহার, দুজনে একই সঙ্গে নেমে আসেন। নাহার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে থাকে দুঃসংবাদের দুঃসহ প্রতীক্ষায়। নিশ্চয়ই থানা থেকে পুলিশ ইয়াসমিনের কোনো খবর নিয়ে এসেছে। সে আল্লাকে ডাকে।

দরোজা খুলেই আলি হতভম্ভ হয়ে যান।

ইয়াসমিন দাঁড়িয়ে আছে।

নাহারের মনে হয়, বাস্তব এত সহানুভূতিশীল নয়। এ স্বপ্ন।

ইয়াসমিন বাবার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলে, ভিতরে আসিতে পারি?

আলি সরে দাঁড়ান নীরবে। ইয়াসমিন ক্ষণকাল অপেক্ষা করে ভেতরে পা রাখে। নাহার এসে তার হাত ধরলে, সে অধোমুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে, সন্তর্পণে হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেন, বাস্তব এখনো সত্যি বলে বিশ্বাস হয় না তাদের। তারপর, স্বামীর বুকে হাত রেখে নাহার বলে, আল্লা মুখ তুলে চেয়েছেন, ওকে তুমি কিছু বোলো না।

দুজনে ওপরে এসে দেখেন, ইয়াসমিন তার ঘরে। ঘরের দরোজা সে বন্ধ করে দেয় নি। ভোরের ধূসর আলোয় ইয়াসমিনকে দেখা যায় বিছানার ওপর হাতের বড় ব্যাগটা রেখে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

দূর থেকেই আলি ইয়াসমিনকে লক্ষ্য করে বলেন, নিজের বাড়িতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতির আবশ্যক হয় না, স্মরণ রাখিও।

আলি তার নিজের ঘরে চলে যান। দরোজা বন্ধ হয়ে যেতেই নাহার ছুটে যায় ইয়াসমিনের

ঘরে। দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, তোর দয়া মায়া নেই, তুই পাষাণ, কী করে পারলি তুই ?

ধীরে ইয়াসমিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাম, আমি ঢাকা যাব।

নাহার অবাক হয়ে যায়। ঢাকা ?

দেশে যাব। ড্যাডিকে বল।

মেয়ের স্থির নিশ্চিত উচ্চারণ শুনে নাহার আর কিছু বলতে পারে না। ত্রস্ত পায়ে স্বামীর কাছে যায়।

নাহারের মুখে শুনে আত্মার ভেতরে চমকে ওঠেন মিস্টার আলি। শোবার ঘরের দেয়ালে টানানো পোস্টারের লেখা, 'ফ্লাই বিমান ফ্লাই হোম' আজ এই প্রথম তার কাছে বিকট ও ভয়াবহ মনে হয়।

স্বদেশ কি এই গাঢ় সবুজ পোস্টারের মতো সুন্দর ? কোন স্বদেশে ফিরে যেতে চায় ইয়াসমিন ?

ইউনিভার্সিটির সেই অধ্যাপকের কথা, বজলুল করিমের কথা, ডাঃ বারীর কথা, টুকরো টুকরো কথাগুলো আছড়ে পড়ে তার চেতনায়। আবার একই সঙ্গে সে কানে শুনতে পায়, তার আপিস ঘরে দুধের বোতলে জানালা ভাঙ্গার শব্দ, থানায় পুলিশের পরিহাস, সড়কে শ্বেতাঙ্গদের নিষ্ঠুর মন্তব্য।

মিস্টার আলি নিঃশব্দে সখেদে ক্রমাগত মাথা নাড়েন। তারপর হঠাৎ দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে অস্ফুট স্বরে বলেন, উহার কোনো স্বদেশ নাই, উহার কোনো স্বদেশ নাই।

তিনি নিজেও টের পান না, বিলাপের উচ্চারণ ইংরেজিতেই করছেন।

মহাশূন্যে পরান মাস্টার

আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা বাঙালি, এই বাংলাদেশ আপনাদের স্বদেশ এবং এই দেশটি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে। না, আমি ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ এখন ভাবছি না। অতএব, আমার এ উপন্যাস পড়তে বসে— আহ্ এ আবার কেমন শুরু ?— বলে বই বন্ধ করবেন না, এই অনুরোধ। আমি আপনাদের মনে করতে বলি, যে, আমরা সকলেই পল্লীর মানুষ; রাজধানী ঢাকা নগরীতে যারা বাস করছি কিম্বা নগরীতে আমাদের যাদের জন্ম, আমরাও আসলে পল্লীরই; ঢাকা নগরীও এক বৃহৎ পল্লী ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি আপনাদের বাংলাদেশের পল্লীগুলোর একটি বিশেষ দিকের প্রতি এখন মনোযোগ প্রার্থনা করছি।

এই বাংলাদেশের যে-কোনো পল্লীতেই আপনি লক্ষ করে দেখবেন, যে, অন্তত একজন দয়াহীন ধনবান ব্যক্তি আছেন, একজন অভিশপ্ত কৃপণ আছেন, একজন সুকণ্ঠ গায়ক ভিক্ষুক আছেন, একজন হতভাগ্য ইস্কুল শিক্ষক আছেন এবং ঘোর উন্মাদ অথচ নিরীহ একটি ব্যক্তি আছেন; এই পাঁচ ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোনো পল্লীই সম্পূর্ণ নয়।

কেউ একদা বলেছিলেন, 'বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি'; আমি জানি না এই বাংলাদেশে সুদূর কোনো অতীতকালে প্লেটোর মতো কোনো দার্শনিক জন্ম নিয়েছিলেন কি না এবং তিনি বাংলার আদর্শ পল্লীর রূপরেখা বর্ণনা করেছিলেন কি না, কিন্তু এই পাঁচ চরিত্র বাংলাদেশের যে পল্লীতে নেই, সে পল্লী বড় অসম্পূর্ণ বলে আমরা নিজেরাই অনুভব করি। আমরা শিশুকালে, আমি এখনো মনে করতে পারি, আমাদের শহর জলেশ্বরীর উঠতি দাদা মনসুর ভাই পাশের নবগ্রামের প্রশান্ত তলাপাত্রকে খাটো করবার জন্যে প্রায়ই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে বলতেন— যা যা, তোদের ওখানে একটা পাড়ার পাগলা পর্যন্ত নেই; কী আছে তোদের ? সেই তাচ্ছিল্য দিনের পর দিন সহ্য করতে করতে একদিন প্রশান্ত তলাপাত্র নিজেই উন্মাদ হয়ে নবগ্রামের সুনাম রক্ষা করে কি না বলতে পারব না; প্রশান্তদা এখনো নবগ্রামে আছেন এবং রেল ইস্টিশানের প্ল্যাটফরমে তাকে আজ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে যাত্রীদের ফেলে দেয়া ঠোঙ্গার কাগজ, বিভিন্ন মোড়ক ও সিগারেটের বাক্স সংগ্রহ করতে দেখা যায়। কাগজগুলো তিনি পরিষ্কার করে, ভাঁজ মসৃণ করে সরকারি নোটের মতো কেতাবন্দি করে রাখেন। কিন্তু এ কাহিনী প্রশান্ত তলাপাত্রের নয়; অতএব, তাকে আমরা এখানেই ছেড়ে দিয়ে যাই।

আমি একটি সমাবন্ধের খেলা, আপনাদের দিই। বাংলা শব্দটি দুর্বোধ্য যদি মনে হয়, ইংরেজিতে বললে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে যাবে— গেম অব কমবিনেশন। যেমন, পাঁচটি জিনিস হাতে আছে— এর কত রকম জোড়া হতে পারে ? আচ্ছা, আমাদের সেই পল্লীর পাঁচটি চরিত্রেব কথাই মনে করা যাক।

একই সঙ্গে কেউ দয়াহীন ধনবান এবং অভিশপ্ত কৃপণ হতে পারেন ? আপনারা হেসে বলবেন, অবশ্যই হতে পারেন। আমি পাল্টা বলব, না, সম্ভব নয়। আমার যুক্তি এই যে, কৃপণের ধন থাকতেই হবে, এমন কোনো কথাই নেই। নির্ধনও কৃপণ হতে পারে; কৃপণতা মূলত একটি মানসিকতা বিশেষ। তাছাড়া, কৃপণ ধনী হলেও ধনকে সে গোপন করতেই ব্যস্ত, আর ধনবান যিনি, তিনি হৃদয়হীন হলেও নিজের চাকচিক্য তথা ধনের গৌরব অপরের দৃষ্টিগোচর করাতে খুব আগ্রহী।

তবে, দেখাই যাক না, অভিশপ্ত কৃপণ ব্যক্তিটি, যার নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়

বলে শোনা আছে, তিনি কি সুকণ্ঠ একজন গায়কও হতে পারেন? সম্ভাবনাটি নিয়ে আপনারা ইতস্তত করেছেন, আমি অনুভব করছি; আমি বলব, অসম্ভব। আমি কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাতে পারব না। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, কৃপণের স্বরযন্ত্র গানের যোগ্য হয় না, যে গান করে সে বিতরণ করে এবং কৃপণ বিতরণকে সর্বাংশে এড়িয়ে চলে।

সমাবন্ধের খেলা আমরা আরো অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি; তা সংক্ষেপেই এখন করি। সবশেষে, একজন ইস্কুল শিক্ষক কি ঘোর উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন?

অবশ্যই হতে পারেন; উন্মাদ যে কেউ হতে পারে; চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে, পাগলের কোনো সংজ্ঞা নেই, কে যে পাগল আর কে যে সুস্থ স্বাভাবিক?—আজ পর্যন্ত কেউ ছক কেটে দেখাতে পারে নি; কাজেই আমরা যাকে সুস্থ বলে ধরে নিচ্ছি, সে আসলে হয়ত আস্ত একটি পাগল, এবং যাকে পাগল বলে সনাক্ত করেছি, সে হয়ত আমাদের চেয়েও অনেক বেশি সুস্থ ও স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা তো বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের প্রধান একটি কাজ হচ্ছে— সংজ্ঞা নির্ধারণ করা; অতএব চিকিৎসকেরা একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে উন্মাদ ব্যক্তির একটি সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন। সেটি হচ্ছে— সামাজিক বিশ্বাস, আচরণ ও ধ্যান ধারণার বিপরীতে যে যায় এবং সম্মিলিত কোনো মানব গোষ্ঠির অর্জিত জ্ঞানের বিরোধী উক্তি যে করে, সেই উন্মাদ।

এবং এই সংজ্ঞা শীতকালে শীত নিবারণের জন্যে গরম কাপড়ের মতো কাজ দিলেও, যে-কোনো শৈত্য বোধেই জামা কাপড় কিছু কাজে দেয় না, আপনারা নিজেরাই অবগত আছেন।

আমি এখন জলেশ্বরী উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আনসার আলী যিনি পরান মাস্টার নামেই গত পঁচিশ বছর থেকে পরিচিত, তার কথা ভাবছি।

বাংলাদেশের যে-কোনো পল্লীর অবশ্য উপস্থিত একটি চরিত্র হচ্ছেন একজন হতভাগ্য ইস্কুল শিক্ষক, পরান মাস্টার শিক্ষক এবং হতভাগ্য; বিদ্যালয়ে একশ সাতষট্টি জন বালক বালিকার শিক্ষক, এবং গৃহে বাইশ থেকে এগার বছর বয়সের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে দুটি আশু বিবাহযোগ্য কন্যা ও একটি বেকার পড়াশোনায় ইস্তফা দেয়া পুত্রসহ মোসাম্মৎ চাঁন বড়ুর হতভাগ্য স্বামী পরান মাস্টার।

২

অনেকদিন পরে আবার আমি জলেশ্বরীতে ফিরে আসি; ব্যবধান শুধু দিনের নয়, ব্যবধান অভিজ্ঞতারও বটে; পুরো সাতটি বছর লন্ডনে কাটিয়ে, যে সাতটি বছরকে আমি ইউসুফের সেই স্বপ্নে দেখা সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি শস্যহীন গমশীষের সঙ্গে তুলনা করে থাকি, আবার আমি ফিরে এসেছি আমার জলেশ্বরীতে।

এই সাত বছরে বদলে গেছে অনেক কিছুই, ভেতরের কথা ছেড়েই দিলাম, যা চোখে দেখা যায় তারই কথা বলছি; ঢাকার নতুন বিমানবন্দরে নামা থেকে শুরু করে ট্রেন ধরে উত্তরের দিকে যাত্রা করে, ফেরীতে শীর্ণ ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, তোরশা জংশন হয়ে জলেশ্বরী পর্যন্ত কেবল বদলে যাওয়া দেখতে দেখতেই এসে পৌঁছুলাম; জলেশ্বরী ইস্টিশানও বদলে গেছে, সেই ছন ছাওয়া ঘরটি নেই, মরা লাল রং দেয়া টিনের চাল এখন, ইস্টিশানের বাইরে ফাঁকা মাঠ আর নেই, সারি সারি দোকান এখন, বুড়ো কদম গাছটা উধাও, আমার আশঙ্কা হলো

আমি নিজেও এত বদলে গেছি যে, আমাকে হয়ত এখানে কেউ আর চিনতে পারবে না আজ।

টিকিট দিয়ে বেরুবার পথেই হাত ধরে টান দিল পরান মাস্টার; যেন আমারই জন্যে সে ইস্টিশানের পেছনের বারান্দায় অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল।

হাত ধরে টান দিয়েই আমার নাম উচ্চারণ করে সে বলল, ঠিক ধরেছি না?

আমি তাকে চিনতে পেরেছি, তবু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। কারণ, পরান মাস্টার এখন দাড়ি রেখেছে, কিম্বা দাড়িই তাকে রেখেছে বলা ভালো, গ্রামে পাকা আধপাকা দাড়ি অযত্নে অবহেলায় বাড়তে বাড়তে এখন উদ্ধত হয়ে চারদিকে খাড়া হয়ে আছে গাল চিবুক জুড়ে। গায়ের হাফহাতা জামায় চিতে পড়েছে, হরেক রঙের তালি পড়েছে, পরনের লুঙ্গি ছেঁড়া ও ময়লা, পা খালি, হাতে একটি ছোট লাঠি। পরান মাস্টারকে শেষ যখন দেখেছিলাম, নিয়মিত দাড়ি কামাতে না পারলেও দাড়ি সে তখন রাখত না এবং দশ পনের দিনের বেড়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে সে অনবরত হাত বুলোত, যেন সংস্কার করতে না পারবার জন্যে নীরব ক্ষমা প্রার্থনা করে চলেছে; তার গায়ের জামা সস্তা কাপড়ের হলেও সব সময় সে ধোয়া পরিষ্কার রাখত এবং লুঙ্গি বদলে মার্কিন কাপড়ের পাজামা দেখেছিলাম, পায়ে রবারের ডিঙি পাম্পু স্যু; আর, পথে কখনো জিগা গাছের কাঁচা ডাল ভাঙা লাঠি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

আমাকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে পরান মাস্টার বলল, দেখে পাগল মনে করছিস না?

আমি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, তা কেন? অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম তো, তাই।

পরান মাস্টার আমার হাত আরো জোরে চেপে ধরে বলল, ঠিক বলছিস তো? পাগল মনে করিস নি?

না, না,।

বল, তুই বল, পাগল কেউ মানুষ চিনতে পারে?

না। আমি মাথা ঝাঁকায়ে বললাম।

পাগল কেউ অতীতের কথা মনে করতে পারে?

না।

তাহলে? আমি তো বেশ মনে করতে পারছি; বলব একটা কথা? পুরনো কথা?

বলুন না?

তোর দু ক্লাস উপরে পড়তাম।

মনে আছে।

একদিন তুই ফরিদ মাস্টারের ক্লাসে 'ডগস আর বার্কিং' কথাটার বাংলা বলতে পারিসি নি মনে আছে?

আমার ঠিক মনে পড়ল না, কিন্তু হতেও পারে তো; আমি হাসি মুখে পরান মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরান মাস্টার বলে চলল, ফরিদ মাস্টার পিটিয়ে তোর পাছা লাল করল?

আমি অপ্রতিভ হয়ে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

পরান মাস্টার হা হা করে হেসে উঠে বলল, পাশের ক্লাসে আমি ছিলাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব দেখছিলাম, তার পর যেই আমি বললাম— কুকুরেরা ভৌ ভৌ করিতেছে— ফরিদ মাস্টার বাঘের মতো এসে আমাকে ক্লাস থেকে টেনে বের করে, তোকে আমাকে এক সঙ্গে আমলকির ডাল দিয়ে পেটাতে শুরু করল। মনে নেই? সেই থেকে তোর সঙ্গে আমার ভাব। সেদিন দুজনে নদীর পাড়ে বসে গুড়ের নৌকোগুলো দেখলাম সারা বিকেল। হে হে, আমি ভুলি নি, তুই ভুলে গেছিস। আমি কিচ্ছু ভুলি নি। পাগল কি এত পুরনো কথা মনে রাখতে পারে? তোকে দেখেই সব পরিষ্কার মনে পড়ে গেল। তুই-ই বল, আমি পাগল?

আমি হেসে বললাম, কী যে বলেন। আমার মুখ থেকে ফসকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, কী যে পাগলের মতো বলেন, পরান ভাই? সামলে নিয়ে তার হাত ধরে বললাম, কে বলল আপনি পাগল?

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ছাড়িয়ে, হাতের লাঠি বাতাসে সপাং করে বাজিয়ে, সেই লাঠি দিয়ে দূরে দোকানগুলোর দিকে দেখিয়ে পরান মাস্টার বলল, ঐ ওরা বলে। আয় তুই আমার সঙ্গে আয়। তুই নিজেই শুনতে পাবি, ওরাই তোকে বলবে, আমি নাকি পাগল, আমার মাথা খারাপ।

আমাকে এতটুকু অবকাশ না দিয়ে পরান মাস্টার আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় একটা মিস্টির দোকানে, সেখানে কতগুলো তরুণ বসে আড্ডা দিচ্ছিল, তাদের আমি চিনি না, হয়ত চেনাই, কিন্তু এই সাত বছরে তারা বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে বলে অচেনা ঠেকছে, তাদের সমুখে আমাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পরান মাস্টার যেন টেক্কা দিয়ে বলে উঠল, এই যে ইয়াংম্যানেরা, আমার বাল্য বন্ধু, আপনাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানীগুণী, অনেক দেখেছে, দুনিয়া চষে ফেলেছে, এর সামনে বলুন দেখি, আমি পাগল?

পরান মাস্টার অচিরে মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে যোগ করল, আমার হিস্ট্রি শুনে আমাকে পাগল বলেন তো? এক বর্ণ বিশ্বাস করেন না? এই তো? আমার এই বাল্য বন্ধু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করেছে শুনে, জানেন? সে আমাকে পাগল বলে নি।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। কখন কী হিস্ট্রি শুনলাম, আর কীসের ওপরই বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার বিশ্বাস হলো, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হা হয়ে গেলাম। আমার এই প্রথম সত্যি সত্যি সন্দেহ হলো যে পরান মাস্টারের মাথা আসলেই বিগড়ে গেছে।

তরুণদের একজন আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি সব শুনেছেন?

আমি ঢোক গিললাম।

আরেকজন জানতে চাইল, সব বিশ্বাস করেছেন?

এবং আরেকজন আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঘোষণা করল, যদি বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে আপনিও একটি পাগল।

তরুণেরা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল।

আমি তখন প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম, আমি এখনো কিছুই শুনি নি, উনি আমাকে কিছুই বলেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে পরান মাস্টার আমার কাঁধ খামচে ধরে নিজের দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে

বলল, ওহো হো, তোকে তো বলাই হয় নি। এই দ্যাখো, তুই তো এই মাত্র এসে নামলি। জানিস ? এতজনকে বলেছি, এতবার বলেছি, যে আমার এখন মনেই থাকে না কাকে বলেছি, আর কাকে বলি নি। তুই এখন বাসায় যাবি তো ? যা, খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নে, আমি ও বেলায় এসে তোকে সব বলব।

তরুণেরা আমার মুখভাব লক্ষ করতে থাকে কৌতুকভরা চোখে। আমি পরান মাস্টারকে বলি, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবেখন। আমি আশা করি যে, দোকান থেকে আমারই সঙ্গে পরান মাস্টারও বেরুবে, কিন্তু না, পরান মাস্টার তরুণদের পাশেই বসে পড়ল যে।

আমি বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম, পরান মাস্টার তরুণদের বলছে, এক কাপ চা খাওয়ান দেখি। পেছন ফিরে দেখি, পরান মাস্টার বেঞ্চের ওপর একটা পা তুলে হেলান দিয়ে বসেছে, আর এক তরুণ তাকে হাতের আধ খাওয়া সিগারেট দান করছে।

৩

বিকেলে আমি পরান মাস্টারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, রাতে মনে পড়ল যে, সে কী একটা শোনাবার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিল, সত্যি সে পাগল এবং ওটা পাগলের কথা মনে করে আমি ঘুমোতে গেলাম। রাতে স্বপ্ন দেখলাম পরান মাস্টারকে। কাঁচা জিগার ডাল ভেঙে সড়ক দিয়ে ধাওয়া করে যাচ্ছে সে, আর পুরো জলেশ্বরীর সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে: দৃশ্যটা আমি দেখছি অনেক ওপর থেকে, শূন্যে ভাসমান অবস্থায়, কোনো বিমান থেকে নয়, বিমান তো সচল, আমি যেন স্থির একটি পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে নিচের এই কাণ্ড কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করছি।

পরান মাস্টার হঠাৎ সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আমাকে বলল, ওখানে কী করছিস ? নেমে আয়, নেমে আয়।

পরদিন, সারাদিনেও পরান মাস্টার এল না। আমি যে তার অপেক্ষায় ছিলাম, তা নয়, অনেক দিন পরে দেশে ফিরেছি— একজন যাকে সুস্থ বলে জানতাম তাকে পাগল দেখলাম, পল্লীর পরিকল্পনায় পাগলের উপস্থিতি তো আমরা জন্মসূত্রেই মেনে নিয়েছি; অতএব আমার কোনো বিশেষ কারণ নেই যে পরান মাস্টারকে নিয়ে ভাবব। তবে, গত রাতে ঐ স্বপ্নটা দেখে সামান্য কৌতুকবোধ করেছিলাম ভোর বেলায়; সারাদিনে আজ পরান মাস্টারের কথা মনে পড়ে থাকে তো, ঐ পর্যন্তই।

সকালে সাইকেল নিয়ে গোরস্তানে গেলাম, বাবার কবর জেয়ারত করলাম, কবরে বহু দিনের আগাছা, লোক ডেকে পরিষ্কার করালাম, আমার ছোট ভাইয়ের বৌ নানা রকম মাছ রান্না করেছিল, খেয়ে দেয়ে দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেল করলাম, সন্ধে বেলায় নদীর পাড় দিয়ে খানিক হেঁটে এসে সিনেমা হলের সমুখে দাঁড়ালাম, পুরনো কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, হলের ম্যানেজারি করছেন এখন বুড়ো মনসুর ভাই, তিনি পেটপুরে পুরি আর জিলিপি খাওয়ালেন, বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে নটা হয়ে গেল। পল্লীতে রাত সাড়ে নটা অনেক রাত।

এই এত রাত্তিরে পরান মাস্টার এসে উপস্থিত।

আমাকে খেতে দেবার আয়োজন করছিল বৌমা, সে হাত গুটিয়ে বিশেষ বিরক্ত হয়ে বলল, পাগল আর আসবার সময় পেল না।

বারান্দায় ভাঙা হেলনা বেঞ্চে সটান বসেছিল পরান মাস্টার, ভেতর থেকে আমি এসে দাঁড়াতেই আমার হাত টেনে পাশে বসিয়ে প্রশ্ন করল, তুই যে লন্ডনে ছিলি, স্পেসশীপ দেখেছিস ?

আমি আরো একবার আকাশ থেকে পড়লাম। স্পেসশীপ ? নভোযান ? মহাশূন্যে নভোচারীরা যায় যে যানে করে ? ব্যাডমিন্টনের কর্কের মতো দেখতে ?

অবাক হয়েছি এতটা যে, আবার না শোনা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না ঠিক শুনেছি। বললাম, কী দেখেছি বললেন ?

স্পেসশীপ, স্পেসশীপ। নিতান্ত বিরক্ত হয়ে পরান মাস্টার বলল, যেন সাইকেল টাইকেল জাতীয় সাধারণ একটা বস্তু আমি চিনতে পারছি না।

ও স্পেসশীপ ? আমি নকল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, না দেখি নি তো।

দেখিস নি ? বড় হতাশ হলো সে।

তবে ছবিতে দেখেছি।

ছবিতে ? ছবি আর আসল কি এক কথা ? আসল সে একেবারে আলাদা জিনিস। কথাটা বলে আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে পরান মাস্টার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকি বুঁকি দিতে লাগল।

কেন ? হঠাৎ স্পেসশীপের কথা জিগ্যেস করছেন কেন, পরান ভাই ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পরান মাস্টার আমাকেই একটা প্রশ্ন করল। তুই বিশ্বাস করিস যে, স্পেসশীপে করে পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়া যায় ?

বাহ, বিশ্বাস না করবার কী আছে ? আমেরিকা, রাশিয়া হরদম লোক পাঠাচ্ছে স্পেসশীপে করে। বিনা মানুষে স্পেসশীপ তো মঙ্গল গ্রহ, শনি গ্রহ ছাড়িয়ে টাড়িয়ে এখন সৌরজগৎ ছেড়ে অজানা অসীমের দিকে যাত্রা করেছে। স্বয়ং মানুষ স্পেসশীপে করে চাঁদে নেমেছে, সকলেই জানে; ঢাকায় টেলিভিশনে ছবি পর্যন্ত দেখিয়েছে, জ্যান্ত ছবি, চাঁদের বুকে মানুষ নামছে।

হু। চিন্তিত স্বরে অনুনাসিক ধ্বনি করে পরান মাস্টার কিছুক্ষণ মূর্তির মতো বসে রইল।

আমি নির্ঘাত এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি, এবং বেশ বৈজ্ঞানিক পাগল, নভোযান আর মহাশূন্য ছাড়া দুশ্চিন্তা নেই।

মুখ তুলে পরান মাস্টার বলল, তুই শুনে অবাক হবি, অন্য কথা দূরে থাক, অন্য সৌরজগত তো পরের কথা, মানুষ যে চাঁদে নেমেছে এটাই জলেশ্বরীর কেউ বিশ্বাস করে না।

আমি মৃদু হাসলাম। এবং চমকে উঠলাম। গতরাতের স্বপ্নের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে আমার। অদ্ভুত যোগাযোগ তো! স্বপ্নে দেখলাম আমি নভোচারীর মতো আকাশে, নিচে পরান মাস্টার আমাকে নেমে আসতে বলছে, আর আজ এই রাতের প্রথম প্রহরে পরান মাস্টার আমাকে মহাশূন্য বিষয়ে প্রশ্ন করছে ?

পরান মাস্টার বলল, তুই অনেক লেখাপড়া করেছিস, বিলেত আমেরিকা ঘুরেছিস, তুই যত সহজে বিশ্বাস করেছিস, জলেশ্বরীর কারো পক্ষে বিশ্বাস করাটা তত সহজ না। এখানে কুতুব শাহের মাজারের খাদিম, তিনি এক হ্যান্ডবিল ছেপে বিলি করেছিলেন সেই চাঁদে মানুষ নামবার সময়।

কীসের হ্যান্ডবিল ?

মহামুর্খের প্রলাপ। খাদিম সাহেবের কথা হচ্ছে, ঐ যে চাঁদে নামবার ছবি দেখান হয়েছে, ওটা আসলে সাহারা মরুভূমিতে তোলা ছবি, সাহেবরা গোপনে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই ভাওতা দিয়েছে।

আমার মনে পড়ে যায়; আমি বললাম, হ্যাঁ, ঢাকাতেও তখন কেউ কেউ ওরকম একটা কথা বলেছিল বটে; বলেছিল, যে চাঁদ নবীজীর আঙুলের ইশারায় দুটুকরো হয়ে গিয়েছিল, সেই চাঁদে মানুষ নামতে পারে না।

খি খি করে কিছুক্ষণ হাসল পরান মাস্টার; সে হাসির প্রসঙ্গ সঠিক বোঝা গেল না; এবং আমি পাগল সাব্যস্ত করে সে হাসিকে আমল দিলাম না। অচিরে পরান মাস্টার প্রশ্ন করল, তুই তো অনেক জানিস, এটা জানিস তো, যে এই পৃথিবী ছাড়াও আরো অনেক পৃথিবী আছে ?

হ্যাঁ, আছে, আছে বৈকি।

সেইসব পৃথিবীর সূর্য আলাদা, আবহাওয়া আলাদা, সেখানে আমাদের মতো প্রাণী আছে ? মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীব আছে তুই জানিস ?

হেসে উঠে বললাম, আচ্ছা পরান ভাই এ সব আমি কি চোখে দেখে এসেছি যে আপনাকে বলতে পারব ? বিলেত তো আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নয় যে, বিলেত ফেরত বলেই ব্রহ্মাণ্ডের চোখে দেখা হাল তোমাকে দিতে পারব ?

পরান মাস্টার ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুই জানিস কি না, তাই জিগ্যেস করছি। আমি তো জানিই তুই সেখানে যাস নি, তুই কেন— এ পৃথিবীর কেউই সেখানে আজ পর্যন্ত যায় নি, এক আমি ছাড়া।

আপনারা শুনলেন ? অন্য কোনো সূর্যের অন্য কোনো পৃথিবীতে নাকি এই মাটির পৃথিবী থেকে এ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই গিয়েছেন; এবং সেখান থেকে যে তিনি ফিরেও এসেছেন তার প্রমাণ তো জ্বলজ্যান্ত আমার সমুখেই এখন বসে আছেন।

আপনাদের মনে পড়বে যে, এর আগে তার কথা শুনে আমি বার দুয়েক আকাশ থেকে পড়েছিলাম, বারবার তো আর পড়া যায় না ?— অতএব, আমি এ বার মাটির ওপরেই রয়ে গেলাম। পরান মাস্টার যেন জলেশ্বরী থেকে ঢাকা যাবার কথা বলেছে, আমি সেই রকম জ্ঞানে তার বক্তব্যটি গ্রহণ করলাম।

বললাম, কবে গিয়েছিলেন, পরান ভাই ?

হবে, সব হবে, সব বলব। তোকে বলব বলেই তো এসেছি। আমি জানি তুই অন্তত বিশ্বাস করবি। গোড়াতেই তোকে যদি পেতাম, ফিরে আসবার পরপরই, তাহলে এই সারা টাউনের মুর্খগুলোর থোতা মুখ ভোতা করে দিতে পারতাম দুজনে মিলে। আমাকে একা পেয়ে পাগল টাগল যা খুশি এত দিন বলেছে, জানিস ?

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো পুরোটা আর ওদের বলা হয় নি, অর্ধেকের একটু বেশি বলা হয়েছিল, তাতেই আমাকে পাগল বলেছে, পুরোটা বললে তো ওরা নিজেরাই পাগল হয়ে যেত।

তাহলে পুরোটা না বলে ভালোই করেছেন, পরান ভাই। এতগুলো মানুষকে পাগল বানানো কি আপনার উচিত হতো ?

হুঁ, মন্দ বলিস নি।

পরান মাস্টার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। এর ভেতরে বৌমা একবার লোক পাঠাল আমার খোঁজ নিতে। 'একটু পরে আসছি' বলে তাকে বিদায় করলাম। পরান মাস্টারের জন্য আমার খুব মায়া করছে এখন, কী করে তাকে বলি যে, আপনি এখন যান ? তার চোখ দিয়েই বা হঠাৎ ঝরঝর করে পানি পড়ছে কেন, তাও বুঝতে পারলাম না; নিঃশব্দে চোখ মুছছে, আবার চোখ ভরে উঠছে তার। আমি পরান মাস্টারের কাঁধে হাত রাখলাম।

পরান ভাই, ও পরান ভাই, কী হলো ? আহা, পাগল বললেই তো আর আপনি পাগল হয়ে গেলেন না, যে কাঁদছেন।

আমি কি আর আমার জন্য কাঁদছি রে ?

কার জন্যে সে কাঁদছে, আর জিগ্যেস করতে সাহস হলো না, আমি তার কাঁধে হাত রেখেই বসে রইলাম।

অচিরেই পরান মাস্টার আবার আমাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা তুই এসব বিশ্বাস করিস তো ?

আপনার যাওয়ার ব্যাপারটা তো ?

না, না। জিগ্যেস করছি, তুই অন্য সূর্যের অন্য কোনো গ্রহে আমাদেরই মতো অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করিস তো ?

আমার নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়, আমিই পাগল হয়ে যাচ্ছি কি না? পরান মাস্টার এত ঘুছিয়ে, পরিষ্কার করে অমন দীর্ঘ প্রশ্নটি করতে পারল, তাকে আমি পাগল মনে করি কী করে, যদি আমি নিজে পাগল না হই ?

নাহ, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, হাঁ, আমি বিশ্বাস করি।

কেন করিস ?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, তাই বিশ্বাস করি।

বৈজ্ঞানিকরা বললেই তুই বিশ্বাস করবি ?

তাদের বহু কথাই তো চোখে না দেখে, হাতে কলমে প্রমাণ না পেয়েও আমরা বিশ্বাস করি। তারা বলেন, এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি সূর্য আছে, আমরা দূর থেকে যাদের তারা বলে জানি, সেইসব সূর্যের ভেতরে একমাত্র আমাদের সূর্যেরই গ্রহণ আছে, আর আমাদের সূর্যেরই একটা গ্রহ এই পৃথিবীতে মানুষ নামে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, এটা হতে পারে না; মানুষ যদি তা মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে মানুষ নিতান্ত কুয়োর ব্যাঙ ছাড়া আর কিছুই নয়, কুয়োর বাইরে পৃথিবী আছে, বা আর কোনো ব্যাঙ আছে সে ভাবতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অন্তত কয়েক কোটি সূর্যের নিজস্ব গ্রহ আছে, আর তার ভেতর এমন লাখ লাখ গ্রহ অবশ্যই আছে যেখানে প্রাণের বিকাশ হবার মতো পরিস্থিতি আছে, আসলে, সেখানে প্রাণী আছে, কোনো কোনো গ্রহের প্রাণী আমাদের চেয়েও অনেক উন্নত, অনেক অগ্রসর।

ভেতর থেকে বৌমা লণ্ঠন পাঠায়, সে ধরেই নিয়েছে যে আমার উঠতে দেরি হবে, অতএব আমাকে অন্ধকারে থাকতে দেওয়াটা তার পক্ষে বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে। লণ্ঠনের সঙ্গে চা-ও এসে যায়।

লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলাম, পরান মাস্টার খুব প্রশংসা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুড়ুৎ করে চায়ে চুমুক দিয়ে পরান মাস্টার বলল, দ্যাখ, লেখাপড়ার গুণটা তুই দ্যাখ। যে কথা তুই গড়গড় করে বলে গেলি, পড়েছিস বলেই না বলতে পারলি ? এখানে সব ছোঁড়া সারাদিন টি-টি করে বেড়াবে, চায়ের দোকানে আড্ডা মারবে আর প্রেম করে বেড়াবে, পড়াশোনা করবার, দুনিয়ার খোঁজ খবর নেবার সময় আছে তাদের ?

প্রসঙ্গটি দুনিয়ার নয়, দুনিয়ার একেবারে বাইরের. এমনকি অনেকের কাছে সুস্থ মস্তিষ্কেরও বাইরের ব্যাপার। আমি চুপ করে রইলাম।

পরান মাস্টার নতুন একটি প্রশ্ন এবার করে বসল।

আচ্ছা, তুই কি বিশ্বাস করিস যে, অন্য সূর্যের কোনো গ্রহ থেকে অন্য জাতের সেইসব বুদ্ধিমান প্রাণী, তুই বললি যাদের অনেকেই আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, তারা স্পেসশীপ নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে এসেছে ?

কে বলবে, পাগলের সঙ্গে আলাপ করছি ? রীতিমতো নভোবিজ্ঞান নিয়ে কথা হচ্ছে আমাদের। আমিও কখন ভুলে গেছি, প্রথম দিনকার সেই পাগলের সঙ্গে পাগল সেজে কথা চালিয়ে যাবার ব্যাপারটা।

আমি বললাম, সত্যি কথা বলব, পরান ভাই ? আমার কখনো বিশ্বাস হয়, কখনো হয় না।

আমার কথার শেষভাগটুকু দূর দূর করে উড়িয়ে দিয়ে পরান মাস্টার বলল, বিশ্বাস না হবার কথাটা ছেড়ে দে; আমার কথাটা যখন শুনবি তখন আর দোমনা থাকবে না তোর। তুই শুধু বল বিশ্বাস যদি করিস তো কেন করিস ?

কী উত্তর দেব মাথার ভেতরে হাতড়াতে থাকি আমি।

বিলেতে প্রচুর বই বেরিয়েছে এ বিষয়ে, তার খানকতক আমি পড়েছি; প্রথম একখানা বই পড়ে নেশা লেগে যায়, খুঁজে খুঁজে আরো কয়েকখানা যোগাড় করেছিলাম, আমার মনে পড়ে গেল।

সবগুলো বই বাইবেল থেকে কিছু কিছু বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়; প্রাচীন কিছু গাথা ও পুরাণ কথা তুলে ধরে; অতীতকালের কিছু নকশা, স্তম্ভ, নির্মাণ ইত্যাদির ফটো ছেপে দেয় এবং বলতে চায় এসবের ভেতরেই প্রমাণ লুকিয়ে আছে যে, একদা এই পৃথিবীতে অন্য সূর্যের অন্য গ্রহের উন্নত প্রাণীরা এসেছিল।

আমার এখন মৃদু বিস্ময় হলো এই ভেবে যে, জলেশ্বরীর মতো সুদূর মফস্বলের একজন ইস্কুল শিক্ষক কী করে ঐ বইগুলো পেল ? আর যদিও তা পেয়ে থাকে, তার সামান্য ইংরেজি বিদ্যায় বইগুলোর মর্মোদ্ধার করল কীভাবে।

আমি জিগ্যেসই করে ফেললাম, আপনি এত কথা জানলেন কী করে ?

পরান মাস্টার স্মিত হেসে উঠল এবং আমি মনে মনে বললাম— এই সেরেছে, এটা কি প্রশ্ন

করলাম ? এক্ষুণি তো উত্তর হবে যে, বললাম না তোকে, আমি গিয়েছিলাম, সেই নতুন গ্রহে, সেখানে শুনে এসেছি।

না, পরান মাস্টার নির্মল হেসে উত্তর দিল, বিলেতে গিয়েছিস, ইংরেজি কেতাব পড়েছিস, আর আমাদের একেবারে গেঁয়ো ঠাউরে বসে আছিস, না ? তোর ঐ সায়েবদেরই লেখা বই বাংলাতেও এখন পাওয়া যায়, কষ্ট করে পড়লেই জানা যায়। সব শুনলে বুঝবি। ভাষাটাও কোনো ব্যাপারে নয়। ভাষা তো মানুষেরই তৈরি একটা জিনিস। ওটা কোনো বাধাই নয়। তবে আমি বই পড়ে শুধু নয়, অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। শেষ বাক্যটি পরান মাস্টার হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

অতএব আমাকে তার প্রশ্নের উত্তর এখন দিতেই হয়। আমি বললাম, বিশ্বাস এই জন্যে করি পরান ভাই যে, কোথায় যেন পড়েছিলাম, খুব বড় একজন লেখকের কথা, কথাটা এই— মানুষ যা কল্পনা করে তা যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন সম্ভবপরতা ছাড়িয়ে কিন্তু মানুষ কিছুই কল্পনা করতে পারে না। মানুষের কল্পনা আজ সত্য না হলেও কাল হবেই হবে, কিম্বা অতীতে তা সত্য হয়েছে আমরা ভুলে গেছি।

পরান মাস্টার আমার হাতে চাপড় দিয়ে বলল, তোকে আমি দেখেই বুঝেছি, আমার কথা তোর বিশ্বাস হবেই হবে, সেই জন্যে তো ইস্টিশানে দেখেই হাত ধরে টান দিয়েছিলাম রে। তোকে আমি সব বলছি। ওদের যেটুকু বলি নি, তাও বলছি। একেবারে গোড়া থেকে না বললে তুই বুঝতে পারবি না।

এখুনি শুরু হবে নাকি পাগলের পাঁচালি ? এ তো ভালো বিপদে পড়া গেল। ওদিকে ভেতরে আমার ভাত নিয়ে বসে আছে বৌমা, ছেলেমানুষ, তার কষ্ট হচ্ছে। আমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়লাম। বোধহয় সেটা টের পেয়েই পরান মাস্টার এখন আমার হাঁটুর ওপর নিজের দুহাত চেপে ধরে ঘুরে বসল, যেন আর উঠে যেতে না পারি। তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে পরান মাস্টার বলল, আমার বীথিপৃ যাওয়ার শুরু কীভাবে শোন।

শব্দটা ঠিক ধরতে না পেরে আমি প্রতিধ্বনি করলাম, বীথিপৃ ?

ওহো, তোর তো এখনো জানবার কথা নয়। আমি যে গ্রহে গিয়েছিলাম, তার নামই বীথিপৃ। নুভা নামে এক সূর্য, তারই একটি গ্রহ। সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সারা দুনিয়ার এত সভ্য দেশ থাকতে এই বাংলাদেশে, আর এই বাংলাদেশেও এত জায়গা থাকতে এই জলেশ্বরীতে, তাও আমার মতো পুওরেস্ট অব দি পুওর এক ইস্কুল টিচারের ভাঙা বাড়ির পেছনে বীথিপৃ স্পেসশীপ নিয়ে ষ্যনুম এসে নেমেছে।

ষ্যনুম ?

আমার হাঁটুতে চাপড় দিয়ে পরান মাস্টার বলল, বীথিপৃর অধিবাসী। ওদের ঐ নাম। এত প্রশ্ন করিস না। চুপচাপ শুনে যা।

৪

চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। জ্যোৎস্না থাকলে না হয় ঘরের ভাঙা চাল দিয়ে এক আধটু আলো এসে পড়ত। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘুম ভেঙে চোখে আর কিছু ঠাহর পাই না। কানের ভেতরেও হঠাৎ কী রকম একটা ভোঁ ভোঁ করছে, কানেও কিছু শুনতে পাই না। শেষ রাতে

ঘুম তো আর নতুন ভাঙল না? কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, শেষ রাতে একবার আমাকে উঠে বাইরে যেতেই হয়। এ বরাবরের ব্যাপার। আজো উঠেছি কিন্তু আজ যেন অন্য রকম লাগছে। বেগটা আছে অথচ নেই। উঠতে ইচ্ছে করছে অথচ ঠিক উঠতে পারছি না। বুকের ওপর কেমন একটু চাপ। নিঃশ্বাসটা গরম। জ্বর নাকি? না। হাত দিয়ে দেখি কপাল ঠাণ্ডা, হাত-পা ঠাণ্ডা একেবারে ভালো মানুষের মতো। অথচ একটা তাপ অনুভব করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হলো, তাপটা ঠিক আমার শরীরের ভেতরে নয়, বাইরে কোথাও; যেন কাছেই একটা উনুন জ্বলছে গনগন করে।

উনুনের কথাটা মনে আসতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আমি হেসে ফেললাম। সারা দিন খাওয়া হয় নি, সেই ভোরে এক মুঠো পান্তা পেটে পড়েছিল, ব্যাস আর কিছু না; আমার বৌ চান বড়ু ছেলেমেয়েদের থেকে কেটে রাতে দুমুঠো খেতে বলেছিল, আমি দেহটা 'ভালো নেই' বলে উপোস দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে ক্ষুধার কাণ্ড। উনুনে হাঁড়ি চড়াতে পারি না, উনুনের তাপ পাচ্ছি।

জোর করে বিছানা থেকে উঠে বসলাম।

একটাই মাত্র ঘর, সেই ঘরে এখনো কোনো রকমে আমার বিশ বছরের পুরনো চৌকিটা টিকে আছে, আর আমিও এখনো সেই চৌকিতেই রাতে শরীর ছেড়ে দিই। চৌকির ঠিক নিচেই মাটির ওপরে মাদুর বিছিয়ে শোয় চান বড়ু আর তিন মেয়ে, দরোজার ওদিকটায় আমার দুই ছেলে। সন্ধেবেলায় বাতি দেখিয়েই আলো নিভিয়ে ফেলা হয়, তা আজ প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল, বাতির তেলের চেয়ে হাঁড়ির জন্যে চাল কেনাটা বেশি দরকার। ভবিষ্যৎ যার অন্ধকার, রাতের অন্ধকার দূর করা না করা তার কাছে সমান কথা।

সে যাক। এসব কথা এখানেও কিছু না, ওখানেও কিছু না। আসল কথা, এই অন্ধকারে কাউকে না মাড়িয়ে দরোজা খুলে বাইরে যাওয়াটা রীতিমতো ম্যাজিক। এ পর্যন্ত একবার বাইরে যাবার সময়, স্টেজে একই খেলা দেখাতে গিয়েও ম্যাজিশিয়ানদের মতো প্রতিবারই বুক কেঁপে ওঠে। আজ মনে করলাম, শরীর যে রকম খারাপ বোধ হচ্ছে, কারো ঘাড়ে না পা দিয়ে বসি। একবার ভাবলাম সাড়া দিয়ে বেরোই; কিন্তু চান বড়ুর মুখখানা মনে করে মায়া হলো— সারা দিন পরে নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমুচ্ছে, যতক্ষণ ঘুমিয়ে আছে ততক্ষণই জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, ক্ষুধার বোধশক্তিও নেই। থাক।

আজও সেই ম্যাজিক পার করে দিলাম, কারো গায়ে পা না ঠেকিয়ে অন্ধকারের ভেতরেও চমৎকার বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঘরের পেছনে বসবার জন্যে যাব, দক্ষিণ একটা বাঁক নিয়েছি হঠাৎ মনে হলো কী একটা শব্দ— খুট খস; হিসস। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কিন্তু কান খাড়া করবার সঙ্গে সঙ্গে কানের ভেতরে আবার সেই ভোঁ ভোঁ শব্দটা হতে লাগল। চোখ যথাসম্ভব বিস্ফোরিত করে সমুখের দিকে তাকালাম, দূরে ঝোপের ভেতরে অথবা পেছনে, মনে হলো অন্ধকারের ভেতর খানিকটা জায়গা একটু বেশি অন্ধকার। যেন, গাঢ় রঙের ওপর গাঢ়তর রঙের একটা ছোপ।

মনে হলো, পায়ের শব্দ যেন।

কে? আমি ডেকে উঠলাম।

কেউ সাড়া দিল না।

এগোতে গেলাম, পা উঠল না।

যেন পক্ষাঘাতে অচল হয়ে গেছে পা।

আমার হাত হঠাৎ পাথরের মতো কেবল ভারিই বোধ হলো না, সেই সঙ্গে মনে হলো জীবন্ত দেহের অঙ্গ নয়, কাঠের হাত।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম বলতে পারব না, হঠাৎ দেখি অন্ধকারের ভেতরে গাঢ় সেই অন্ধকারটুকু আর নেই, যেন আদপেই কখনো ছিল না, কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ শব্দটাও বেমালুম পরিষ্কার এখন, পা আবার তুলতে পারছি, হাত আবার নিজেরই হাত বলে বোধ করছি, নতুনের ভেতরে এই মাত্র যে, অতি ক্ষীণ একটা পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে উজির আর নাজিরকে ডেকে তুললাম; সঙ্গে সঙ্গে তারা হাঁকডাক করে বেরিয়ে পড়ল; ঘরের আদাড়ে বাদাড়ে তারা সন্ধান করতে লাগল, চান বড়ু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ততক্ষণে, সে চেঁচাতে লাগল— ছেলে দুটো না চোর খুঁজতে গিয়ে সাপ খোপের হাতে প্রাণ দেয়, তার সে চেঁচানি শুনে মেয়ে তিনটিও উঠে পড়ল। সে এক তুমুল কাণ্ড। এর মধ্যে গুলি আবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। গুলি আমার ছোট মেয়ে। বড় দুটির নাম, দুলি আর পুলি, একাত্তরে যখন আরেকটা মেয়ে হলো আগের সঙ্গে মিলিয়ে নাম আর মাথায় এল না, চারদিকে গুলি গোলা, চান বড়ু মেয়ে কোলে করে থরথর করে কাঁপছে, বড় ছেলে উজির একদিন ঘোষণা করল, তার নতুন বোনটির নাম গুলি। আমরা প্রথমে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলাম, এ কী ধরনের রসিকতা ?— কিন্তু শেষ অবধি সেই নামটাই দেখি টিকে গেল। সেই গুলি। এখন পা মেলে কাঁদতে শুরু করল তারস্বরে এবং উজির বাইরে থেকে ফিরে এসে অন্ধকারে আন্দাজ নিয়ে, গুলির গালে চড় কষিয়ে বলল, চোপ, দুদিন বাদে তোর জন্যে যখন লোকে এসে বেড়া নাড়া দেবে, তখন কাঁদিস।

বুঝলাম, উজির সন্দেহ করছে টাউনের কোনো নষ্ট ছেলে দুলি অথবা ফুলির জন্যে শেষ রাতে ঘুরঘুর করছিল।

চান বড়ু বলল, চোরও তো হতে পারে।

নাজির এতক্ষণ চুপ করেছিল, অন্ধকারে তার ধমক শোনা গেল, হাঁহ, চোর। চোর আসবে তোমার ভাঙা কপাল চুরি করতে। চুরি করবার মতো আছে কী যে চুরি করবে ? অভাবের ঘরে যার মুখে যা আসে তাই বলে; যখন যার যে মেজাজ হয়, রাখ ঢাক নেই, উগরে দেয়। বাপ হয়ে আমার শাসন করবার কথা উজিরকে গুলির গালে অহেতুক চড় মারবার জন্যে; নাজিরকে— আপন জননীকে তাড়া দেবার জন্যে; তার বদলে আমি আমতা আমতা করে শান্তি ফেরাবার চেষ্টা করলাম এই বলে, যে, হয়ত আমারই মনের ভুল, আসলে কিছু না।

বললাম মনের ভুল, কিন্তু সারাদিন আমার মন থেকে শেষ রাতের সেই কয়েক মুহূর্তের অদ্ভুত ধাক্কাটা বিদায় নিল না। কাউকে কিছু বললাম না, এমনকি চান বড়ুকেও কিছু জানালাম না, মনে মনে স্থির করলাম— আজ রাতে জেগে থাকব, মটাকা মেরে পড়ে থাকব, দেখব— ব্যাপারখানা কী ?

আমার ভেতর থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলছিল, জেগে থেকো, জেগে থেকো। আমার কানের ভেতরে থেকে থেকে ভোঁ ভোঁ ধ্বনির স্মৃতি ফিরে আসছিল। চোখের ভেতরে সেই

অন্ধকারের ভেতরে গাঢ় অন্ধকারটুকু ক্রমশ সাহেবদের শোলা হ্যাটের আকার ধারণ করছিল— বিশালা এক শোলা হ্যাট। ব্রিটিশ আমলে পাটের দালাল, দারোগা আর রাজ কর্মচারীরা সে রকম হ্যাট পরত— অবিকল সেই জিনিস। এসব আমি সারা দিন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এবং পরে বুঝেছি— এসব আমার মনে আমার সিদ্ধান্তে গড়ে ওঠে নি, বীথিপৃর ষ্যনুমেরা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে অনুভূতিগুলো পাঠিয়ে চলেছিল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, আমি জেগে রইলাম, ফুলি কোথা থেকে কিছু চাল আর একটা লাউ এনেছিল, আমরা কোনো প্রশ্ন করি নি, এমনকি উজিরও নীরব ছিল; দুপুরে লাউ ভাতের খ্যাঁট পেট পুরে খাওয়া হয়েছিল সবার, রাতে চমৎকার ঘুম এসেছে ছেলেমেয়েদের; চান বড় তো আহারে অনাহারে বিছানায় কাত হলেই জাগ্রত জগৎ পায়; ভেবেছিলাম যে উজির নাজির আজ রাতে জেগে থাকবে নষ্ট ছেলেদের হাতেনাতে ধরে ফেলবার জন্যে, আমি কেন জানি মনের ভেতরে প্রার্থনা করে চলেছিলাম— উজির নাজির যেন জেগে না থাকে; আমার প্রার্থনা আল্লাহ্ শুনেছেন; সকলেই ঘুমে, আমি জেগে, যেন আমি কারো অথবা কোনো কিছুর অপেক্ষায় আছি, যেন আমাকে অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। আমি একাকী অপেক্ষা করছি নির্ধারিত সময়ের অগ্রসর হয়ে আসবার জন্যে।

শুধুই কি সময়ের অগ্রসর হয়ে আসবার জন্যে?

পরে জেনেছি বীথিপৃর ষ্যনুমেরা আমাকে অপেক্ষমাণ রেখেছিল তাদের জন্যে।

রাত এখন কত, জানি না; শুধু জানি, এই হচ্ছে সেই মুহূর্ত। বেরুবার কোনো বেগ অনুভব করলাম না, শুধু মনে হলো যে আমাকে এখন বাইরে বেরুতে হবে। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম কারো গায়ে পা না মাড়িয়ে, সেই আগের মতোই, আরো একবার। দরোজা ভেজিয়ে, সেই অন্যান্য রাতের মতোই আমি দক্ষিণ বাঁক নিলাম ঘরের পেছনে যাবার জন্যে। বাঁক নিয়ে, সেই গত রাতের মতোই আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং বিশাল সেই শোলা হ্যাটটি দেখতে পেলাম, গতরাতের মতোই অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকার একটি ছোপ।

খুট, খস, হিসস।

আজ আমার বুক হিম হয়ে গেল না।

কানের ভেতরে সেই ভোঁ ভোঁ শব্দ।

আজ আমার উৎকণ্ঠা হলো না।

আমি পা বাড়ালাম, আমি আজ পা বাড়াতে পারলাম।

আমি হাত প্রসারিত করলাম, আমি আজ হাত আমার জীবন্ত দেহের অঙ্গ বলেই অনুভব করতে পারলাম।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আমি দেখতে পেলাম শোলা হ্যাটের আকৃতি ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল চিকন ও তীব্র সবুজ রঙের আলোয়। আমি দেখলাম, শোলা হ্যাটের ওপরের দিকে বাতাস চলাচলের জন্যে যেমন দুটো ছিদ্র থাকে তেমনি দুটো ছিদ্র আলো হয়ে ফুটে উঠল চাপা কমলা রঙের ফুলকির মতো। অচিরে সেই কমলা আলো আমার সমুখের পথ আলোকিত করে তুলল, যেন কেউ আমাকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্যে সহানুভূতিশীল হয়ে প্রায় খরচ হয়ে যাওয়া ব্যাটারির আলো জ্বেলে ধরল।

প্রায় হাত দশেকের ভেতরে এসে গেছি, হঠাৎ একটি ধাক্কা খেলাম; অথচ সমুখে কোনো

প্রতিবন্ধক নেই। আমার বোধ হলো যেন একটা কাচের দেয়ালের সঙ্গে টক্কর খেয়েছি। আমার হাত দুটো সেই অদৃশ্য দেয়াল অনুভব করবার জন্যে সমুখে প্রসারিত হলো; হাত দিয়ে ঠিকই অনুভব করতে পারছি কঠিন মসৃণতা, কিন্তু চোখে কিছুই পড়ছে না। কয়েক পা পিছিয়ে এসে বিহ্বল ও বিমূঢ় আমি তখন স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

টুক করে কমলা আলো নিভে গেল।

অত্যন্ত ধীরে হ্যাটের চারপাশের সবুজ আলো মরে ছাই হয়ে গেল।

আমার খুব কাছে, একেবারে কানের ভেতরে, কে যেন খুব সুরেলা গলায় অদ্ভুত এক ভাষায় বলে উঠল— মতগস্বা; কক্ষশি বহেসা। আমি এর এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না।

আমি বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করতে গেলাম, হতভম্ব হয়ে গেলাম যখন উচ্চারিত হতে শুনলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভাষায় আমার প্রশ্ন— রাকা? রাকা নেখাও? আমার নিজেরই কণ্ঠে।

এ কি দুঃস্বপ্ন? আমি নিজেই কি আমি আর নই?

আমার সমুখে বিশাল শোলা হ্যাটের গায়ে হঠাৎ দরোজার মতো চৌকো আলো কেটে বেরুল; হাঁ, দরোজাই; স্পষ্ট দেখলাম রুপার মতো চকচকে একটি ছোট সিঁড়ি নিঃশব্দে নেমে এল দরোজার ভেতর থেকে, আর আমাকে কী একটা অদৃশ্য শক্তি এখন আকর্ষণ করে নিতে লাগল সেই সিঁড়ির দিকে।

আমার তখনো মনে আছে যে কাচের দেয়ালে বাধা পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম একটু আগেই, এখনো আমি অদৃশ্য আকর্ষণে এগিয়ে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমার শঙ্কা হলো আবার না ধাক্কা খাই।

না। আমি স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেলাম। মনে হলো সেই কাচ এখন গলিত পর্দার মতো, আমি ভেদ করে অপর পারে পৌঁছে গেলাম, পেছনে আবার কঠিন হয়ে গেল কাচের দেয়াল। অন্তরাল থেকে আবার আমাকে সুরেলা গলায় কেউ সম্বোধন করল— মতগস্বা, কক্ষশি বহেসা। কিন্তু এবার এক বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ করলাম, বাক্যটি বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। আমি আমার কানেব ভেতর স্পষ্ট বাংলায় শুনতে পেলাম— স্বাগতম, শিক্ষক সাহেব।

এবং আবার যখন আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে গেলাম, কারা? কারা ওখানে? আমি নিজের কানেই শুনতে পেলাম, আমি উচ্চারণ করছি রাকা? রাকা? নেখাও?

শোলা হ্যাটের আলোকিত দরোজা, চকচকে সিঁড়ি; আমি একেবারে সিঁড়ির ধাপের কাছে এখন, পা রাখব কি রাখব না; ইতস্তত করছি, সুরেলা সেই কণ্ঠ এবার আমাকে অভয় দিল— কাংশ ইনে, টকনি নহো।

আমি সিঁড়িতে পা দেবার আগে নিঃসংশয় হবার জন্যে জানতে চাইলাম, রেতভে?

উত্তর হলো, তভী নচ্ছেহ নকে?

না, আমি আর ভীত নই, মন্ত্র বলে আমার সমস্ত ভয় যেন চলে গেছে, আমি সিঁড়িতে পা রাখলাম। পৃথিবীর কোনো জীবিত মানুষের যে অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত হয় নি, যে দৃশ্য কেউ কখনো চোখে দেখে নি, আমি তাই দেখলাম, আমি সেই অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি বীথিপৃর স্পেসশীপে পা দিয়ে একজন ষ্যনুমকে দেখতে পেলাম। তার যেখানে মুখ থাকবার কথা, সেখানে চকচক করছে নীলাভ কাচ দিয়ে তৈরি একটি ফুটবল,

সেই ফুটবলের ভেতর থেকে দুটি স্মিত চোখ, রুপার নরোম সুতোয় তৈরি জামা দিয়ে তার সর্ব অঙ্গ ঢাকা, সে টলমলে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল, তার স্পর্শ একই সঙ্গে কঠিন ও কোমল, স্নিগ্ধ এবং তপযুক্ত। আমি বোধহয় তখনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

৫

তারপর?

পরান মাস্টার আমার হাঁটুতে চাপড় দিয়ে সোৎসাহে কী বলতে যাচ্ছিল, ভেতর থেকে আমার বৌমা স্বয়ং এসে হাজির হলো।

আজ আর খাওয়া দাওয়া হবে না, দাদা?

বুঝলাম, ধৈর্যশীলার বাঁধ ভেঙে গেছে; তার গলার স্বর লক্ষ করে টের পেলাম পাগলকে তিনি নিজেই তাড়িয়ে দেবার জন্যে পণ করে বেরিয়েছেন।

পরান মাস্টার আফসোস করে উঠল, এ হে হে, তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? ছি ছি, কী কাণ্ড। আমি মনে করলাম, বিলেতের মানুষ, সন্ধে রাতেই ডিনার ফিনার করে রেডি; তাই তো রাত করে এলাম দেখা করতে। কী কাণ্ড! এখনো দেখি বাঙালিই রয়ে গেছিস।

বললাম, বিলেতে গেলেই কি আর বিলেতি হয়ে যায়, পরান ভাই?

তার উত্তর, অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে, হয়, অনেকে হয়। অনেকে বিলেত না গিয়েও বিলেতি হয়।

বৌমা বলল, মাস্টার সাব, আজ আপনি আসুন।

সরাসরি লোকটাকে এভাবে বিদায় দেওয়াটা আমার কাছে বড় আপত্তিকর মনে হলো প্রথমে, পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে পাগলের সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলাই দস্তর। বাংলাদেশে লোকে সুস্থ মানুষের সঙ্গে ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলে— এটাই নিয়ম।

তবু আমি না বলে পারলাম না— আহা, বৌমা, উনিও বোধহয় খান নি, আবার সে বাড়ি যাবেন; খাবেন; আমাদের না হয় এক সঙ্গেই দুটি দিয়ে দাও। পরান ভাই, আপনি খেয়ে দেয়ে যান।

খাব? পরান মাস্টার ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বৌমাকে বলল, তা বৌমা যখন খেতেই দেবে, আর একটু দয়া করো না? একটা কলাপাতা টাতাও ধরে দাও, বাড়ি নিয়ে গিয়েই খাই। আমার দিকে ফিরে বলল, মাইন্ড করিস না। বলেই সে অপ্রতিভ হয়ে হাসতে লাগল আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

ভেতরে এসে বৌমাকে বললাম, দুটো বেশি করেই দিও। বৌমাকে আর বলে দিতে হবে না, সে জানে পরান মাস্টারের অবস্থা; তাকে একজনের খাবার দিয়ে বিদায় করা যায় না। নিঃশব্দ বিরক্তি নিয়ে বৌমা সব বেঁধেছেদে দিতে লাগল, আমি আশেপাশে অপরাধীর মতো পায়চারি করতে থাকলাম।

তারপর নিজেই গিয়ে পরান মাস্টারের হাতে তুলে দিল খাবার জড়ানো পাতার পোঁটলা। খাবার হাতে পেয়ে বড় আনন্দ তার দেখলাম। মুখে কিছুই না, কেবল হা হা করে বৌমার দিকে তাকিয়ে হাসল খানিক, তারপর ছুটে সড়কের অন্ধকারে নেমে গেল। বৌমাকে বললাম, খাবার পড়ে টড়ে না যায়। গামলায় দিলে পারতে।

গামলায় দিলে সে গামলা ফেরত আসবে? বৌমা ভেতরে চলে গেল।

অচিরে আমিও ভেতরে গেলাম। আমার ভাইটি পেশাগত একটা দরকারে আজই রংপুরে গেছে, আগামীকাল ফিরবে; অতএব তার জন্যে অপেক্ষা নেই, হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলাম। চমৎকার রাঁধে আমার বৌমা। প্রশংসা করতেই সে লজ্জিত হয়ে হেসে বলল, দাদা অনেকদিন দেশী রান্না খান না তো, যা খাচ্ছেন ভালো লাগছে। তারপরই প্রসঙ্গ বদলে সে যোগ করল, দাদা, এরপর রাতে যদি মাস্টার আসে, আমি কিন্তু বলে দেব— আপনি বাসায় নেই।

কেন ? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

আমার ভয় করে।

ভয় ? কীসের ভয় ?

ওর হাতের ঐ লাঠি। যদি মেরে টেরে বসে ?

বৌমার আশঙ্কা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

বৌমা বলল, আমি তো ভেতরে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। শেষে কিছু যদি হয় ? লণ্ঠন পাঠিয়ে দিলাম।

ও, তাই ?

বৌমা ভীত চোখ তুলে বলল, কিছু বিশ্বাস নেই, দাদা। ওর ওইসব গল্প কেউ বিশ্বাস না করলে হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যায়, লাঠি নিয়ে তাড়া করে। ও পাড়ার নানটুকে এমন বাড়ি মেরেছিল, হাত প্লাস্টার করতে হয়েছিল।

আমি গভীর হয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুললাম।

রাতে বিছানায় শুয়ে আমার মনে পড়ে গেল, গতরাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে— পুরো জলেশ্বরীর লোক ছুটছে আর তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে লাঠি হাতে পরান মাস্টার। অথচ তখনো আমি শুনি নি যে, সে কাউকে সত্যি সত্যি মেরে বসেছে। আমি ঈষৎ কৌতূহল বোধ করে উঠলাম। ঘটনাটি শোনবার আগেই আমি তার আভাস স্বপ্নে পেয়ে গেলাম কী করে ? কৌতূহলটি জটিল হয়ে পড়ল, যখন আরো স্মরণ হলো যে, পরান মাস্টারের মুখে তার বীথিপুর যাবার গল্প শোনার আগেই আমি আমার স্বপ্নে দেখেছি আকাশে একটা অদৃশ্য পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছি, নিচের দৃশ্য অনেক ওপর থেকে দেখছি, আর পরান মাস্টার আমাকে বলছে, নেমে আয়, নেমে আয়। এটাই বা কী করে হলো ?

পরান মাস্টারের গল্প যতই গাঁজা হোক, শুনতে তখন মন্দ লাগে নি। গাঁজা তো অবশ্যই। কে বিশ্বাস করবে এ সব ? জলেশ্বরীর তরুণদের দোষ দিতে পারলাম না; তবে, আমার মন ঠিক সায় দিল না যে পরান মাস্টার বদ্ধ পাগল। আমার ক্রমশই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকল যে, হয় পরান মাস্টার সজ্ঞানে সমস্ত কিছু বানিয়ে বলছে, অথবা সে আমূল প্রত্যক্ষ করেছে। শব্দটা কি দুর্বোধ্য মনে হলো ? ইংরেজিতে প্রকাশ করলে অবশ্য প্রাঞ্জল হবে— হ্যালুসিনেশন। অর্থাৎ তার মনের ভেতরে সে যা কল্পনা করেছে সেটাই চোখে দেখতে পেয়েছে, যদিও তার বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নেই।

এ রকম হয়, হয়ে থাকে। ইউরোপ আমেরিকার বহু লোক দাবি করেছে যে, তারা অন্যগ্রহের স্পেসশীপ দেখেছে, উড়ন্ত পিরীচ দেখেছে, উড়ন্ত চুরুট দেখেছে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিয়েছে, পরে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে যে তারা হ্যালুসিনেশন দেখেছে। অনেক

সময় নৈসর্গিক কারণে ভ্রম হয় যে আকাশে অদ্ভুত কোনো যান উড়ছে যেমন মেঘ দেখে মনে হতে পারে, মেঘে দূরবর্তী কোনো আলোর প্রতিফলনের দরুন এটা মনে হতে পারে, অথবা আবহাওয়া বেলুনকে ভেসে যেতে দেখেও ধারণা হতে পারে যে স্পেসশীপ চলে যাচ্ছে। ইদানীং পাশ্চাত্য জগতে মহাশূন্য নিয়ে বহু কাহিনী চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে, সিনেমার পর্দায় জীবন্ত দেখান হচ্ছে অন্য গ্রহের প্রাণী, পরিবেশ, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে এক সৌরজগৎ থেকে অন্য সৌরজগতে যাত্রা। ডাক্তাররা বলছেন, এইসব চলচ্চিত্র দেখে সাধারণ মানুষ অনেকেই সত্যি বলে ধরে নিতে পারে এবং মনের কোনো সূক্ষ্ম হেরফেরে নিজেদের আশেপাশেই এ সব আবার অভিনীত হতে দেখতে পারে। হয়ত পরান মাস্টারের বেলায় তাই-ই হয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়— পরান মাস্টার তো সেসব চলচ্চিত্র দেখে নি? খেতে খেতে বৌমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, আজকাল টেলিভিশনে এ ধরনের ছবি দেখান হয়। জলেশ্বরীর পাবলিক লাইব্রেরিতে টেলিভিশন আছে, সেখানে অনেকেই গিয়ে ছবি দ্যাখে। পরান মাস্টার কি তাহলে টেলিভিশনের ছবি দেখেই হ্যালুসিনেশনে ভুগছে? কিন্তু আমি যদ্দুর জানি, পাশ্চাত্যের ডাক্তারেরা বলেন, টেলিভিশনের ছোট পর্দায়, এবং শাদা কালোতে, মহাশূন্যের যে ছবি দেখান হয়, তার প্রভাব আদৌ দর্শকের ওপর হয় না। সিনেমা হলের বড় পর্দায়, উন্নত ক্যামেরা লেন্সের সাহায্যে প্রায় ত্রিমাত্রিক গভীরতা এবং অবিশ্বাস্য রকমে উজ্জ্বল রং ও স্টিরিওফোনিক শব্দ প্রক্ষেপণের ফলে যে মায়া জগৎ রচিত হয়, দুর্বল ও কল্পনাপ্রবণ মনে তার প্রভাবই হয় মারাত্মক।

অতএব, পরান মাস্টার হ্যালুসিনেশনে যে ভুগবে, তার সূত্র কোথায়? মানুষ বিভ্রম দেখলেও তার বাস্তব একটা সূত্র থাকে। ভূতের গল্প লোক শোনে বলেই ভূত দেখতে পায়। অন্য গ্রহের স্পেসশীপ আর প্রাণী দেখেছে বলে শোনা যায় ইউরোপ আর আমেরিকাতেই, কারণ ওখানে এসব নিয়ে প্রচুর বই বেরোয়, চলচ্চিত্র তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি যে, এশিয়া বা আফ্রিকায় কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আগন্তুকদের হ্যালুসিনেশন দেখেছে।

তাহলে, আর একটি সম্ভাবনাই হতে থাকে— পরান মাস্টার পুরো ব্যাপারটাই সজ্ঞানে বানিয়ে বলছে।

কেন? কী উদ্দেশ্য তার থাকতে পারে? মানুষ কেন কিছু বানিয়ে বলে? কোন পরিস্থিতিতে বানিয়ে বলে? মানুষ কিছু বানিয়ে বলে দু রকম পরিস্থিতিতে। এক, আত্মরক্ষা করতে। দুই, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া দেখে মজা পেতে। যদি আত্মরক্ষার কথাটা ধরা যায়, পরান মাস্টার কীসের থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কাল্পনিক উপখ্যানের সাহায্য নিচ্ছে? যদি মজা দেখাই তার উদ্দেশ্য হয়, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য পঁচিশ বছরের পুরনো একজন ইস্কুল শিক্ষক, পাঁচ সন্তানের পিতা, সমাজে আপন অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ সচেতন, প্রায় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক এহেন ছেলেমানুষি করবেন একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে? আমি অস্বস্তিবোধ করতে থাকি। আমার ভালো করে ঘুম আসে না।

ভোর রাতের দিকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এবং ঘুম ভেঙেই প্রথম যে শব্দটি আমার মনে পড়ল, তা হচ্ছে— টেলিপ্যাথি। কোনোরকম যান্ত্রিক সাহায্য না নিয়ে, শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে নিজের বক্তব্য অপরের মনে পৌঁছে দেয়া, এবং সেই অপর ব্যক্তিটি নিকটেও হতে পারে, হাজার মাইল দূরেও হতে পারে, এমনকি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও থাকতে পারে।

সন্তানের বিপদে মায়ের যে ঘুম ভেঙে যায়, প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে না জেনেও আমরা যে হঠাৎ তার শূন্যতা অনুভব করে উঠি অথবা তাকে বহুদূরে থেকেও এক ঝলকের জন্যে দেখতে পাই— টেলিপ্যাথির বলেই এ সবের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। কাল রাতে পরান মাস্টার এই টেলিপ্যাথির কথাই বলছিল। সে বলছিল, বীথিপৃর ষ্যনুমেরা টেলিপ্যাথির সাহায্যে তাকে পরবর্তী রাতে তৈরি থাকবার নির্দেশ দিয়েছিল।

আমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়ি।

স্বপ্নে আমি নিজেকে আকাশ পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে যে দেখেছি পরান মাস্টারের মহাশূন্যে যাত্রার কাহিনী শোনাবার আগেই, এটা কি টেলিপ্যাথি ছিল? পরান মাস্টারই টেলিপ্যাথি প্রয়োগ করেছিল আমার ওপর? মনে পড়ে গেল— সে তো আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিল, তুই বিশ্বাস করবি, আমি জানি। তারই জন্যে সে কি আমাকে এভাবে তৈরি করে রেখেছিল?

ভোরের অন্ধকার, অন্ধকার নয়; ভোরের আলো, আলোও নয়; আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণও নয়; ভিন্ন একটি দীপ্তি। সেই দীপ্তি আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলে। আমি যেন স্পষ্ট বার্তা পাই, আধকোশা নদীর পাড়ে, অপরাহ্নে।

কী সেখানে?

পরান মাস্টার আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, একদা, সেই সুদূর অতীতে, 'কুকুরগুলো ভৌ ভৌ করিবার' পর আমি ও সে ফরিদ মাস্টারের হাতে মার খেয়ে নদীর পাড়ে বসে গুড়ের মহাজনী নৌকোগুলো দেখছিলাম।

অপরাহ্নে আমি আধকোশা নদীর পাড়ে যাই। এবং সেখানে পরান মাস্টারকে দেখতে পাই। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যেন আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল, সে আমাকে হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলল, জ্ঞান হারাবার কথা শুনে ভয় পাস নে। জীবনে কখনো জ্ঞান হারিয়েছিস? তাহলে আর কী জানবি? জ্ঞান হারাবার সময় তোর মনে হবে, তুই হঠাৎ ঘুমিয়ে গেলি। শুনেছি, মানুষ যখন মারা যায় তখনো তার ঐ রকমই মনে হয়, সে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, হঠাৎ বড় ঘুম পাচ্ছে তার।

৬

জ্ঞান ফিরে আসাই হোক, আর ঘুম থেকে জেগে ওঠাই হোক, আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখতে পেলাম নীলাভ রঙের নিস্তেজ আলো আমার চারদিকে; সেই আলোয় আমি শুয়ে আছি সরু একটি বিছানায়; বিছানার চাদর জ্যোৎস্নার মতো ধবধবে শাদা ও দ্যুতিময়, স্পর্শের অনুভব— যেন শরৎকালের মেঘ। মেঘ কখনো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি নি সত্যি, কিন্তু মেঘের অনুভব এ রকমই বলে আমার ধারণা হলো তখন।

চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ আলোও যেন চোখ মেলে তাকাল; আলো উজ্জ্বলতর হলো। আমি আবিষ্কার করলাম আমার চারদিকে প্রচলিত অর্থে কোনো দেয়াল নেই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নেই, একটি গোল নলের ভেতরে আমি শুয়ে আছি, নলটির মুখ কোথায় গিয়ে মিশেছে বা শেষ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, বিছানা থেকে নিচে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, কোনো তল পাওয়া যাচ্ছে না; নলের দেয়াল মসৃণ, খুব পালিশ করা শাদা

কোনো ধাতুর পাতের মতো, কোনো দরোজা জানালা নেই, আদৌ আমি এর ভেতরে স্থাপিত হলাম কোন পথে বুঝতে না পেরে এই প্রথম বিচলিত হয়ে পড়লাম।

উঠে বসবার চেষ্টা নিতেই বাধা পেলাম; আমি যেন শয্যার সঙ্গে হাতে পায়ে আটকান; অথচ তাকিয়ে দেখি, কোনোকিছু দিয়ে আমাকে বাঁধা হয় নি। আমার মনে পড়ে গেল, সেদিন রাতে আমার বাড়ির পেছনে একবার এই রকম পক্ষাঘাত অনুভব করেছিলাম। হঠাৎ আমার সমুখে একটি শূন্যতা ঝিলমলি করে উঠল; পাশে এক হাত, লম্বায় হাত তিনেক একটি দীপ্তির শিহরণ; আমি অচিরেই সেখানে অবিকল আমাদেরই মতো এক মানুষকে নির্মিত হয়ে উঠতে দেখলাম। অবিকল; কেবল তার মুখের রং ঈষৎ নীলাভ।

আবির্ভূত হয়ে সে আমার দিকে স্মিত মুখে স্থির তাকিয়ে রইল।

আমি বিহ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের দুজনের ভেতরে দিয়ে অতি ক্ষীণ স্রোতে সুম সুম জাতীয় একটি শব্দ অবিরাম প্রবাহিত হতে লাগল। যতক্ষণ সেই শব্দ উপস্থিত রইল, আমরা নীরব রইলাম; অচিরে শব্দ উধাও হয়ে গেল, ব্যক্তিটি বলল, 'সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, আপনাকে আরো একবার স্বাগত করছি।' আমি এবার লক্ষ করলাম, যদিও তার কথা আমি বাংলাতেই শুনতে পেলাম, আর ঠোঁট ভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত সংলাপের মতো নড়ছিল।

ঈষৎ বিস্ময় সত্ত্বেও আমি স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম, আমি কোথায়? এবং আমি লক্ষ করলাম যে, প্রশ্নটি মনের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচনা করলেও আমি অজ্ঞাত একটি ভাষায় তা উচ্চারণ করে বসেছি।

ঠিক এই ব্যাপারটিই আমার বাড়ির পেছনে একবার হয়েছিল, আমি যখন অন্তরাল থেকে কণ্ঠ শুনেছিলাম এবং প্রশ্ন করেছিলাম। এখন আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমরা কোনো এক আশ্চর্য পন্থায় আমাদের নিজ নিজ ভাষাকেই অপরের সুবিধার্থে অনুবাদ করে চলেছি সাবলীল ও তাৎক্ষণিকভাবে।

আপনি এখন নভোযানে রয়েছেন।

আমি তাহলে যাকে বিশাল একটি শোলা হ্যাট মনে করেছিলাম, আসলে তা নভোযান?
আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কে?

আমি একজন ষ্যনুম।

ষ্যনুম?

হাঁ, বীথিপৃর অধিবাসী।

বীথিপৃ?

হাঁ, একটি গ্রহ। নুভা নামে একটি সূর্যের গ্রহ। সেই সূর্য আপনাদের সৌরজগৎ থেকে ন হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত।

ব্যক্তিটি হাত তুলল এবং আমি তখন স্বচ্ছন্দে উঠে বসতে পারলাম। আমার ধারণা হলো, এতক্ষণ বন্দি ছিলাম, ব্যক্তিটি আমাকে মুক্ত করল। আমি প্রশ্ন করলাম, আমি কি বন্দি ছিলাম?

না। আমাদের নভোযান মহাশূন্যের কালিক মাত্রা ঝাঁপ দিয়ে পার হচ্ছিল, আপনার

নিরাপত্তার জন্যেই আপনাকে শায়িত এবং স্থির রাখা হয়েছিল। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বীথিপৃতে অবতরণ করতে যাচ্ছি।

বলে কী ?

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম।

বীথিপৃতে অবতরণ করতে যাচ্ছি মানে ? আমরা এখন কি মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি ? পৃথিবী ছেড়ে এসেছি ? কখন ?

আমার ধারণা ছিল যে নভোযানটি এখনো আমার বাড়ির পেছনেই আমাদের ঝোপের ভেতর হামা দিয়ে আছে, আমি বাইরে পা বাড়ালেই আবার এক্ষুণি মাটি ছুঁতে পারব। ব্যক্তিটি আমার এতগুলো প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বাঁ হাত ঈষৎ তুলল, সঙ্গে সঙ্গে নলের একটি অংশ স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং আমি ঘোর কালো পটভূমিতে কোটি কোটি আলোকবিন্দু বিজ বিজ করছে দেখতে পেলাম। এত নক্ষত্র এর আগে আমি কখনো দেখি নি, আর আকাশও এমন জ্বলজ্বলে ভেলভেটের মতো গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখি নি।

আমার বর্তমান পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে সেই জ্যোতিঃস্রোত দেখতে লাগলাম। অচিরে, অতি ধীরে নল অস্বচ্ছ হয়ে গেল, মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য সেই সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়ে গেল, কিন্তু তখনো আমার চোখ থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে গেল না। আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ষ্যনুমকে আমি নক্ষত্রখচিত বলে কিছুকাল বোধ করলাম, আগাগোড়া চুমকির কাজ করা একটি পোশাক সে পরে রয়েছে।

হাত দিয়ে অনুভব করে আমি আবার বিছানায় বসে পড়লাম।

আমার মনে এখন অনেকগুলো প্রশ্ন ছুটোছুটি করছে, পাল ভাঙা পিঁপড়ের মতো। কিন্তু কোনো প্রশ্নই আমাকে করতে হলো না, কোনো এক উপায়ে প্রশ্নগুলো অনুধাবন করে ব্যক্তিটি একের পর এক উত্তর দিয়ে চলল।

হে আমাদের সম্মানিত অতিথি, বিশিষ্ট মানব, নিবেদিতপ্রাণ স্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনসার আলী, ওরফে পরান মাস্টার, আপনি এই মুহূর্তে আমাদের নভোযানে উপস্থিত। নভোযান সঠিক বর্ণনা নয়, কিন্তু আপনাদের ভাষায় নভোযান শব্দটি অধিক প্রচলিত বলেই ব্যবহার করলাম; অধিকতর সঙ্গত বটে নক্ষত্রযান বলা। অতঃপর নক্ষত্রযানই ব্যবহার করব। এই নক্ষত্রযান, আগেই যেমন বলেছি, বীথিপৃর।

আপনাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত প্রাণীর নাম মনুষ্য, আমাদের গ্রহে সবচে' উন্নত প্রাণীর নাম ষ্যনুম ? আপনার প্রশ্ন, ভিন্ন সূর্যের ভিন্ন গ্রহের উন্নত প্রাণী অবিকল আপনাদেরই মতো দেখতে, এটা কী করে হলো ? তার উত্তর বড় জটিল ও দীর্ঘ। সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, মহাপ্রকৃতির মতো এত ক্লান্তিকরভাবে পুনরাবৃত্তিকারক আর কেউ নয়। শিশু যেমন একবার বাংলা অক্ষর 'দ' এর পা টেনে লম্বা করে পাখি আঁকা যায় এটা আবিষ্কার করতে পারলে ঘরের যাবতীয় খাতাপত্তর, মেঝে, দেয়াল, উঠোন জুড়ে সেই পাখিই আঁকে, মহাপ্রকৃতির ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। অবশ্য, এই লঘু উদাহরণই কোনো কথা নয়। আপনি লক্ষ করে দেখুন, ব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই কোনো প্রাণীকে উন্নত হতে নয়, তার কতগুলো ব্যবহারিক সুবিধে শরীর ধারণ করতেই হয়। যেমন, তাকে চলাফেরা করতে হয়, অতএব পা দরকার, এবং পা শরীরের নিচে না হলে পায়ের কোনো উপযোগিতাই থাকে না। বলতে পারেন, সব

উন্নত প্রাণীরই কি পা দুটো হবে? চারটে বা চারশ হতে বাধা কোথায়? আছে, বাধা আছে। দু'পায়ে চলাফেরার যান্ত্রিক দিকটা সরল এবং জটিলতামুক্ত। পায়ের হাঁটুতে ভাঁজ জরুরি, কারণ আপনাকে উঠতে হবে, নামতে হবে, বসতে হবে, দাঁড়াতে হবে, ছুটতে হবে— হাঁটুর ভাঁজ আপনাকে এসব ক্ষেত্রে চমৎকার সাহায্য করবে। আসুন হাতের কথায়, একই কারণে হাত দুটো হওয়াই সবচে' সরল ও যুক্তিসম্মত; হাতের অবস্থান দেহের মধ্যভাগেই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র হবে; কারণ, হাত আপনাকে ওপরে তুলে কিছু পাড়তে হবে, আবার নিচু করে কিছু তুলতে হবে। চোখের কথা ধরুন, চোখ দুটো থাকতেই হবে, এক চোখেও দেখা যায়, আপনি তো জানেন বহু কানা ব্যক্তি এক চোখেই কাজ সারেন, কিন্তু দুটো থাকার সুবিধে এই যে, চোখের মতো অতি জরুরি জিনিস দুটো থাকলে একটি নষ্ট হলেও একেবারে অকেজো হয়ে পড়বেন না, আর, সবচে' বড় কথা, চোখ দুটি থাকার ফলে আপনি বস্তুর তল বেধ ও ব্যাস এবং আপনার চোখ থেকে বস্তুটি কতদূরে অবস্থিত তা নির্ণয় করতে পারবেন। মস্তিষ্ক দেহের সবচেয়ে ওপরেই থাকতে হবে, এই কারণে যে, ওটাই সবচে' নিরাপদ অবস্থান, একই কারণে মস্তিষ্ক করোটি বন্দি হতে হবে, এবং করোটিতে চোখ, নাক ও কান থাকবে এই জন্যে যে, দেহের সবচে' উঁচুতে থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, ঘ্রাণ পাবে। আগেই বলেছি, বিষয়টি অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল, সামান্য আভাস দিলাম মাত্র, যাতে আপনি বুঝতে পারেন— কেন আমাদের শরীর, গড়ন ও অঙ্গ সংস্থাপন অবিকল আপনাদেরই মতো।

হাঁ, আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমরা ন' হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বের গন্তব্যে যাচ্ছি, অথচ এত শিগগিরই কী করে সেখানে পৌঁছুচ্ছি? প্রথমত, সময় বলে আসলে কিছু নেই, সময় একটি ধারণামাত্র এবং সেই ধারণা পৃথিবীতে আপনাদের মনোগত, বীথিপৃতে আমাদের মনোগত এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য যারা উন্নত প্রাণী রয়েছে তাদের প্রত্যেকের মনোগত এবং প্রত্যেকের সূর্য কক্ষপথ পরিক্রমা, দিবস ও রজনী, ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। আপনি যাকে এক প্রহর বলেন, আমার কাছে তা এক প্রহর নয়; এবং আমি যাকে এক রহপ্র বলি আপনার কাছে তা এক রহপ্রের অনুরূপ সময় নয়। আপনাদের পৃথিবীর এক বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বিষয়টা খানিক আঁচ করতে পেরেছিলেন, তবে পুরো অনুধাবন করার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন। আমার বিশ্বাস— তিনি, আপনাদের সময় হিসেবে আর দুশ বছর জীবিত থাকলে মহাশূন্যের কালিক মাত্রাটি শনাক্ত করতে পারতেন। এই কালিক মাত্রা যেমন সরল তেমনি জটিল। যে বোঝে সে পৃথিবীর অত্যাবশ্যকীয় তরল পদার্থ জলের মতোই বোঝে, যে বোঝে না তার করোটিতে পৃথিবীর মনুষ্য জাতির প্রথম উদ্ভাবিত হাতিয়ার সেই হাতুড়ি মারলেও বুঝবে না। আপনার কৌতূহল হচ্ছে এবং আপনি আমাদের সম্মানিত ও আমন্ত্রিত অতিথি, তাই সংক্ষেপে এইটুকুই বলি, যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই সরল অথবা ঋজু নয়; সমস্ত কিছুই সমস্ত কিছুকে যত ক্ষীণ বা প্রবলভাবেই হোক না কেন অনবরত আকর্ষণ করে থাকে, এবং এই আকর্ষণের ফলেই সমস্ত কিছুই সমস্ত কিছুর প্রতি অবনত, বস্তুতই একটি কাল্পনিক সরল রেখার তুলনায় প্রতিটি বস্তুই বঙ্কিম। এবং এই ব্রহ্মাণ্ডও বঙ্কিম। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা অবসন্নকারী বিশাল, তাই তার বঙ্কিমতাও বিকট। পৃথিবীতে আপনারা, বা বীথিপৃতে আমরা, কিম্বা কোটি কোটি অন্যান্য গ্রহে যেখানেই যে উন্নত প্রাণী আছে তারা যে দূরত্ব নির্ণয় করে থাকে তা ঐ কাল্পনিক সরল রৈখিক দূরত্ব।

অথচ দূরত্বও বঙ্কিম। আমরা এই সত্যটি কিছুকাল আগে আবিষ্কার করেছি, অনুমান করি অচিরে পৃথিবীতে আপনারাও আবিষ্কার করবেন যে, কোনো কিছুই নিতান্ত আলঙ্কারিকভাবে উচ্চারণ করি নি; বস্তুত, নিঃশ্বাস হচ্ছে প্রাণ স্পন্দন এবং স্পন্দিত প্রাণই হচ্ছে দূরত্ব পরিমাপের একমাত্র একক, সে দূরত্ব স্থানিক হোক, কালিক হোক অথবা মনস্তাত্ত্বিক হোক। সে যাই হোক এরই জন্যে যে দূরত্ব হাজার আলোকবর্ষ বলে কাগজপত্রে হিসেবে বের হয়, সেই দূরত্ব আমরা নিঃশ্বাস পতনের ব্যবধানে অতিক্রম করে এসেছি।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে জলেশ্বরী থেকে বীথিপৃতে তো এক নিঃশ্বাসেই পৌঁছে যাবার কথা, আপনার পৃথিবীর হিসেবে ঘণ্টা নয়েকের মতো সময় লাগছে কেন? তার উত্তর এই যে, পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্রে পৃথিবীর কাল মানতে হয়, বীথিপৃর আকর্ষণ ক্ষেত্রে বীথিপৃর কাল; মধ্যবর্তী পথ এক নিঃশ্বাসে আমরা অতিক্রম করলেও পৃথিবী ত্যাগ করতে এবং বীথিপৃতে প্রবেশ করতে কিছু সময় লাগে।

মাননীয় শিক্ষক সাহেব, আপনার কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় আপনি এই প্রশ্নগুলোর কারণে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতেন, আপনার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যু হওয়াও বিস্ময়কর ছিল না, কিন্তু আমরা আগেই তার ব্যবস্থা নিয়েছি, আপনার স্নায়ু শান্ত রয়েছে, অতএব আপনি নিজেকে পরিবারের প্রতি উদাস গৃহস্থ বলে ভাববেন না। আমরা এ সংবাদ রাখি, আপনি আপনার পরিবারকে এতটা ভালোবাসেন যে, খাদ্য সংস্থানে ক্রমাগত অপরাগ হয়ে আপনি একদা তাদের একত্রে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। আপনি তারপরও জীবিত আছেন পৃথিবীর মানুষের দুর্বল একটি ধারণার জন্যে; সেই ধারণাটি হচ্ছে কালিকে ধারণা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারণা, যা বস্তুত অমূলক সর্বাংশে; আপনি ভবিষ্যতের দিকে এখনো আশা করতে পারেন বলেই জীবিত আছেন, যদিও সেই ভবিষ্যৎ অতীত থেকে ভিন্ন বলে ভাববার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণই নেই।

সম্মানিত পরান মাস্টার, আপনার একটি প্রশ্ন— আপনাকে কি আমরা অপহরণ করেছি? না, তাহলে আপনাকে আমরা সম্মানিত ও আমন্ত্রিত অতিথির মর্যাদা দিতাম না। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনাকে তাহলে আমরা কেন বীথিপৃতে নিয়ে যাচ্ছি? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমার প্রতি কেবল এই নির্দেশ রয়েছে, আপনাকে জলেশ্বরী থেকে সংগ্রহ করে তানেহামের কাছে উপস্থিত করতে হবে।

তানেহাম? এতক্ষণ পরে আমি একটি প্রশ্ন করি, আমি একটু অবাকও হই যে, আমার মনের এত প্রশ্ন এই ব্যক্তি অনুমান করতে পেরেছে, আর এটি পারল না?

ব্যক্তিটি বোধহয় লজ্জিত হলো; তার মুখ ঝলক দিয়ে সবুজ হয়ে উঠল একবার, ঠিক যেভাবে আমরা অপ্রতিভ হলে রাঙা হয়ে যাই। ব্যক্তিটি ইতস্তত কণ্ঠে বলল, আমাদের গ্রহে তাঁর অস্তিত্ব, অবস্থান, বা বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষ কোনো তথ্য ধারণ করতে অক্ষম; ফলত তার বিষয় কোনো প্রশ্ন হতে পারে, আমরা ধারণা করতে পারি না; আপনার প্রশ্নও তাই আমি অনুমান করতে পারি নি এবং প্রশ্নটা প্রকাশিত হবার পরও আপনার কৌতূহল মেটাতে পারছি না।

এরপর ব্যক্তিটি দ্রুত বলে যেতে লাগল, আপনার পরবর্তী প্রশ্ন, আপনাকে কি চিরতরে বীথিপৃতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আপনি স্মরণ করবেন, আপনাকে অতিথি বলে সম্বোধন

করেছি, অতিথি কখনো স্থায়ী বাসিন্দা হয় না। আপনি পৃথিবীতে ফিরে যাবেন। যেভাবে আপনাকে আনা হয়েছে সেভাবেই আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কবে ? আপনি কি বীথিপৃর সময়ের হিসেব অনুভব করতে পারবেন ? যদি বলি, তসা নদি, কী বুঝবেন ? যদি বলি, সতা সমা, কী হিসেবে করবেন ? আর যদি বলি, তসা রজাহা রসৎব, তাহলে ? না, আপনি আমাদের কাল মাত্রা অনুধাবন করতে পারবেন না। আমাকে বলা হয়েছে, আপনার মনে এই প্রশ্ন জাগবে, এবং তখন যেন আপনাকে আমি এই উত্তর দিই যে— পৃথিবীর হিসেবে আপনি এক বিপলের ভেতরেই আবার জলেশ্বরীতে ফিরে যাবেন, আপনি ফিরে গিয়ে দেখতে পাবেন, আপনার পেছনে বাড়ির যে ভাটুই ঘাসটি মাথা নত করেছিল আপনার হেঁটে যাবার সময় লুঙ্গির ধাক্কায় সেই ঘাস তখনো সম্পূর্ণ মাথা তুলে দাঁড়ায় নি।

আমার ঠিক বোধগম্য হলো না। আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু বিপলটা কী ?

ব্যক্তিটি এবার সবুজ হয়ে গেল না; তার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। বোধহয় ওদের ওটা বিরক্ত হবার রং। ব্যক্তিটি অচিরে সেই রং গোপন করে, স্বাভাবিক নীলাভ মুখ নিয়ে বলল, ওহো, আপনারা তো পাশ্চাত্যের কতগুলো হিসেব একেবারে আত্মস্থ করে বসে আছেন, নিজেদের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন বহু আগে। বিপল হচ্ছে, আপনাদেরই পৃথিবীর বর্তমান প্রভু পাশ্চাত্য জগতের সময় পরিমাপের সেকেন্ড নামক এককের পাঁচভাগের দুভাগ পরিমাণ কাল।

এবার আমিই রাঙা হলাম। এবং আমার আশঙ্কা হলো ব্যক্তিটি না আমার অভিব্যক্তিকে বিরক্ত হবার অভিব্যক্তি বলে ধরে নেয়। ফলে, যদি কিছু মনে করে বসে, যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে ঠিকঠাক আবার জলেশ্বরীতে পৌঁছে না দেয়, আমি বড় বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। চান বড়র মুখ ভেসে উঠল আমার চোখে। আমার ছেলেমেয়েরা ভিড় করে এল চারদিক থেকে। আমি ব্যাকুল হয়ে ব্যক্তিটির দিকে তাকালাম।

ব্যক্তিটি ডান হাত ঈষৎ তুলে ধরল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি নলের গায়ে আমার পরিবারের ছবি দেখতে পেলাম। তারা সবাই মেঝেতে অঘোর ঘুমে গড়াচ্ছে।

৭

আমাদের পেছনে কোরাসে হো হো হাসির শব্দে আমি চমকে ফিরে তাকালাম, আমার পাশে পরান মাস্টার নদীর দিকে, অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে রইল।

আমি দেখলাম কয়েকজন তরুণ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বেজায় হেসে চলেছে। আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে পরান মাস্টারই এই হাসির লক্ষ্য। কখন নিঃশব্দে তারা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা কিছুই টের পাই নি।

ভেতরে ভেতরে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম এবং উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা প্রতিবাদ করতে যাব, পরান মাস্টার আমার হাত চেপে ধরল এবং আমার দিকে না তাকিয়ে, সেই নদীর দিকেই দৃষ্টি রেখে। আমি তো কোনো আভাস দিই নি যে, আমি এই মুহূর্তে ওই তরুণদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম, তবু পরান মাস্টার কী করে আমার মনোভাব আঁচ করতে পারল ? এবং একটু আগেই শোনা বীথিপৃর ষ্যনুমের মতো ?

আমি শীতল ও নির্বাপিত হয়ে গেলাম।

পেছনে তরুণদের সাড়া পাচ্ছি এখনো; এখন আর কোরাসে নয়; কেউ হাসছে কেউ কী একটা অসভ্য শব্দ উচ্চারণ করছে, কেউ প্রস্রাব করছে।

পরান মাস্টার আমার হাতের ওপর চাপ বজায় রেখেই ফিসফিস করে বলল, ওরা এখন অপেক্ষা করছে।

আমার গলা দিয়ে চাপা আর্ত প্রশ্ন বেরুল. কীসের অপেক্ষা করছে ? এর উত্তর না দিয়ে পরান মাস্টার আবার ফিসফিস করে উঠল, ওরা নিজেরাই জানে না, ওরা কীসের ভেতরে আছে।

আমার অন্তর জুড়ে আশঙ্কা লেজ বুলিয়ে গেল। আমি প্রথম প্রশ্নটিই আবার উচ্চারণ করলাম দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে, ওরা কীসের অপেক্ষা করছে, পরান ভাই ?

না, পেছনে তাকাসনে। ওরা এখন আমাদের অপেক্ষা করছে। আমি যদি এখন মুখ ফিরিয়ে কিছু বলি, যাই বলি না কেন, ওরা গলা ফাটিয়ে হাসবে; আমি যদি ওদের ধাওয়া করি, ওরা আমার আগে-আগে ছুটবে আর হি হি করে হাসবে; আমি যদি গাল দেই, ওরা পাগল - পাগল বলে আমাকে ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে।

বুঝলাম এরকম অভিজ্ঞতা পরান মাস্টারের বহুবার হয়েছে। কিন্তু সে 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার করেছে গোড়াতে; আমি এখন ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলাম।

পরান মাস্টার অচিরেই তার ব্যাখ্যা করল, এখন তুই যদি মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাস, ওরা তোকে ঠাট্টা করবে— তুই আমার কাহিনী শুনছিস বলে। তুই যদি ওদের ধমক দিস, তোকেও পাগল বলবে। আর যদি তাড়া করিস তো. সারা টাউন তোকেই ওরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, লোকে যেমন ন্যালা ক্ষ্যাপাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। চুপ করে বসে থাক। নড়িসনে, কথা বলিসনে, শ্বাস পর্যন্ত শব্দ করে নিবিনে, বুঝলি ? একটু পরে নিজেরাই বিদায় হবে।

নদীর পাড়ে আধকোষার পানি ঝুপঝুপ করে আঘাত করে চলল, আমরা ঠায় বসে রইলাম, এবং সত্যি সত্যি তরুণেরা এক সময় বিদায় নিল।

পরান মাস্টার বলল, শুধু কি ওরা ? টাউনের বুড়োরা পর্যন্ত আমাকে আজকাল বদ্ধ পাগল ঠাওরে বসে আছে। দু চারজন আবার ছেলেদের মতো ক্ষ্যাপায়, জানিস ? অথচ দ্যাখ, তুই নিজেই বুঝতে পারছিস, আমার মাথা ঠিক আছে, আমার কথা এক বর্ণ মিথ্যে না, যা যা ঘটেছে অবিকল বলে যাচ্ছি। কই, তুই তো অবিশ্বাস করছিস না ?

হঠাৎ আমার মাথায় একটি প্রশ্ন আসে।

পরান ভাই, আপনার বাড়িতে বিশ্বাস করে ? ভাবি ? ছেলেমেয়েরা ? ওদের আপনি বলেন নি এসব ?

অম্লান বদনে পরান মাস্টার উত্তর দিল, হাঁ বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি ওদের খুব শক্ত করে বলে দিয়েছি, বাইরে যেন স্বীকার না করে যে তারা বিশ্বাস করে।

আমি একটা ধাঁধার ভেতর পড়ে গেলাম। জানতে চাইলাম, কেন ? মানা করেছেন কেন, পরান ভাই ?

এই জন্যে যে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। টাউনের লোক বলবে, পরান মাস্টারের গুষ্টি শুদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। বুঝতে পারছিস না ? সে ভয়াবহ ব্যাপার।

ব্যাখ্যা শুনে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। তার চেয়েও অবাক লাগছিল, তার বাড়ির সকলের কথা ভেবে, তারা কি কেউ স্বামী, কেউ পিতা মনে করেই বিশ্বাস করেছে?

প্রশ্ন করতে হলো না, বীথিপৃর সেই ষ্যনুমের মতো প্রশ্নটা অন্তরে অনুভব করেই পরান মাস্টার বলল, আমার বাড়ির লোক বিশ্বাস করবে না কেন? তারাতো প্রমাণ পেয়েছে, যাকে বলে চোখের প্রমাণ।

কী রকম?

আরে তোকে বলছিলাম না? নক্ষত্রযানের সেই নলের গায়ে ওদের ছবি দেখতে পেলাম, সব ঘুমে কাতর? বীথিপৃর সেই ব্যক্তিটি আমার মুখের ভাব দেখেই ঠিক ধরতে পেরেছ যে, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ওদের জন্য। মনে বোধহয় দয়াও হলো, আহা, একটা ভালো মানুষকে বলা নেই কয়া নেই এ রকম উঠিয়ে নিয়ে এলাম? সে আমাকে বলল, আমি যদি চাই, আমার পরিবারের সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে পারি। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে ব্যক্তিটি আমাকে বলল— আপনি নাম ধরে ডাকুন, ওরা উঠে পড়বে। ঠিক ভরসা হলো না, তবু ইতস্তত করে নাম ধরে ডাকলাম— চান বড়ু, ও দুলি, ও ফুলি, ও বাবা উজির, ও নাজির, ও গুলি মানিক। সবার নাম ধরেই ডাকলাম, বুঝলি? হাজার হোক, স্পেসের ভেতর দিয়ে ওদের নামটা তো ট্রান্সমিট হচ্ছে, স্বশরীরে আমার সঙ্গে বীথিপৃতে আসবার সৌভাগ্য না-ই হলো। সকলের আগে সাড়া কে দিল জানিস? আমার ছোট মেয়ে গুলি? সেই যে একাত্তরে গুলি গোলার সময় হয়েছিল বলে যার নাম রাখা হয়েছিল গুলি, সেই গুলি। আর সে মোচড় দিয়ে উঠেই আমাকে কী বলল, জানিস?

না, না তো। আমি যে কোনো বিস্ময়ের অপেক্ষা করছি।

গুলি উঠেই ঘুম ভাঙা গলায় বলল, বাবা, জিলিপি খাব।

আমি বোধহয় ছেলেমানুষের কাণ্ড শুনে একটু হেসে উঠেছিলাম মাথা পেছনে ঠেলে দিয়ে, চোখ ফিরিয়ে এনে দেখি জায়গার সমুখের পরান মাস্টার নেই। একেবারে হিম হয়ে গেলাম। একটা জলজ্যান্ত মানুষ চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই গায়েব। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকলাম, পরান ভাই, পরান ভাই। সাড়া পেলাম না, তবে কে একজন আমার পাশ থেকে খন-খনে গলায় বলে উঠল, এই তো হনহন করে রাস্তায় ছুটলেন। রাস্তায় উঠে দেখি, সত্যিই তাই। ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম।

হঠাৎ উঠে এলেন যে?

মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল রে। জিলিপি খেতে চেয়েছিল, এখনো এনে দিতে পারি নি। দেখি। দেখি। বলতে বলতে হাত মুচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে সে চলে গেল। আমি পাথর-কুচি বিছানো সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সড়কের ওপারে অনেকখানি আকাশ, দুদিকে ফাঁকা মাঠ কি না সেই আকাশে কয়েকটা বড় বড় তারা টকটক করছে; আমার গায়ের ওপর দিয়ে নীলাভ একটি বাতাসের শীতলতা বয়ে গেল যেন।

সামলে নিতে একটু সময় লাগল। পরান মাস্টার পয়সা পাবে কোথায় যে গুলির জন্য জিলিপি নিয়ে যাবে? আমি আকাশের তারাগুলোকে মিটমিট করতে দেখলাম। আমি ইস্টিশানের মিষ্টির দোকানের দিকে অগ্রসর হলাম।

সেখানে সেই তরুণেরা বসে আছে; আমাকে দেখে নিজেদের ভেতরে কী বলাবলি করল

তারা; আমি মুখ কঠিন করে অপেক্ষা করতে লাগলাম— এই হয়ত হো হো করে হেসে উঠবে ওরা, কিন্তু না, তার বদলে খুব সৌজন্য নিয়ে একজন আমাকে সম্বোধন করে বলল, এত সহজে ছাড়া পেলেন, ভাইয়া ?

আমি মুখ ফিরিয়ে হাসলাম একটু।

আরেকজন জানতে চাইল, সবটা শুনেছেন।

আমার মনে পড়ে গেল যে, পরান মাস্টার বলেছিল— কাহিনীর সবটা এদের কাছে কিম্বা জলেশ্বরীর কারো কাছেই সে এ পর্যন্ত বলে নি। আমি জিগ্যেস করলাম পাল্টা, আপনারা শুনেছেন ?

ও আর শোনাশুনির কী আছে ? যা শুনেছি তাতেই বোঝা গেছে, মাথাটি একেবারে গিয়েছে।

অচিরেই ওদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, পরান মাস্টার স্কুলে বহুদিন ধরে বেতন পাচ্ছিল না, বড় অভাব যাচ্ছিল তার, কোনো রকমে দু একটি টিউশানির ওপর নির্ভর করে চলছিল, এর ভেতরে তার বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়; জামাইয়ের জন্য একটা টু-ইন-ওয়ান চাই, বরপক্ষের দাবি; কোনো উপায় না দেখে বাড়ির পাশে দেড় বিঘা পতিত জায়গা ছিল সেটা বিক্রি করে টাকার যোগাড় হয়, মোট সাড়ে চার হাজার টাকা নিয়ে পরান মাস্টার রংপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হয় এবং পথে তোরশা জংশনের গুণ্ডারা সম্পূর্ণ টাকা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। চায়ের দোকানের এই তরুণেরা মত প্রকাশ করে যে, তারপর থেকেই মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে তার। মেয়ের বিয়ে যথারীতি ভেঙে যায়, টু-ইন-ওয়ানের দেবার মতো মেয়ের বাপ এদেশে বহু আছে, এবং এদেশের বহু ছেলেই এখন মেয়ের চেয়ে টু-ইন-ওয়ানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বেশি আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত ইস্কুলের চাকরিটাও চলে যায় পরান মাস্টারের— সেও আজ বছর ঘুরে আসতে চলল।

দোকানির হাত থেকে জিলিপির ঠোঙাটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে তরুণদের বললাম, আর, এই রকম একটা লোককে নিয়ে আপনারা হাসতে পারেন।

আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তিরস্কার শুনে তারা তেড়ে উঠবে; নদীর পাড়ে তাদের যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব বলে আমি মনে করি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তারা আমাকে কিছুই বলল না, সকলেই এক সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল, একজন কেবল মিনমিন করে বলল, সকলেই তো হাসে।

ওদের নির্বাপিত চেহারা দেখে আমি বেশ উৎসাহ পেলাম, রুষ্ট গলায় প্রশ্ন করলাম, সকলে হাসে মানে ?

মানে, সকলেই। শহরের সবাই। ছেলে বুড়ো বৌ মেয়ে সকলেই।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, না, আমার মনে হয় না সকলেই হাসে। আমার মনে হয় না, যারা অভাবে আছে তারা হাসে, যারা দুঃখের ভেতরে আছে তারা হাসে।

এক তরুণ বিদ্রোহ করে বলল, আপনি কচু জানেন। সকলেই হাসে। গরিবেরাই বেশি হাসে পরান মাস্টারকে দেখে।

অবাক হয়ে আমি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে সোজা মাইল খানেক গেলেই গোরস্তানের পাশে বাড়ি আমি জানি; পাথরের কুঁচি বিছানো প্রশস্ত সড়কের ওপর আকাশে তারাগুলো

এখন তীব্ররশ্মি বিচ্ছুরণ করে চলেছে; দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছি, যেন সমস্ত শহরে অট্টহাসি আমাকে তাড়া করছে; আমি পরান মাস্টারের বাড়িতে এসে দাঁড়ালাম।

কীরে ? তুই ? তুই কোত্থেকে ?

তার বিস্ময় দেখে মনে হলো, আমার সঙ্গে তার যে কিছুক্ষণ আগেই দেখা হয়েছে, আমরা যে নদীর পাড়ে একসঙ্গে এতক্ষণ বসেছিলাম, সে সব কিছুই নয়, বহু বছর পরে আবার এই প্রথম দেখা হলো।

আমি জিলিপির ঠোঙাটা তার হাতে তুলে দিলাম।

কী ? এটা কী ? অ্যা, এর মধ্যে কী ?

জিলিপি।

জিলিপি ? যেন বস্তুটির নাম তিনি আগে কখনোই শোনেন নি।

হাঁ, গুলির জন্যে, ছেলেমেয়েদের জন্য।

জিলিপি ? আবারো অবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে উঠল পরান মাস্টার; পরমুহূর্তেই হঠাৎ খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতে চায় না। লোকটা দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে নাকি ? আমি তার হাতে হাত রাখলাম শান্ত করবার জন্যে, সে আমার হাতখানা খপ করে কেড়ে নিয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগল, খেতে পাই না, খ্যা খ্যা, জিলিপি ? ভাতের বদলে, খ্যা খ্যা জিলিপি ? বলিস কীরে, হো হো, জিলিপি ?

আমার চোখ দিয়ে টপ করে পানি পড়ল এক ফোঁটা, পড়বি পড়, পরান মাস্টারের হাতের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে সে হাত ছেড়ে আকাশের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, বিষ্টির ভেতরে জিলিপি নাকি রে ? সেই ছেলেবেলার মতো ? কোথায় বিষ্টি ?

কী পাগলের মতো বলছো ? বলেই জিভ কাটলাম আমি।

ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। পরান মাস্টার আমার হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, পষ্ট বিষ্টির ফোঁটা পড়ল, আর তুই বলছিস আমি পাগল ? দ্যাখ, এই দ্যাখ, আমার হাতের পিঠ এখনো ভেজা।

আমি বললাম, তাই তো, আমি লক্ষই করি নি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে, পরান ভাই।

সগর্বে পরান মাস্টার বলল, এই রকম কেউ লক্ষ করে না বলেই আমাকে পাগল বলে। শালা নিজেরাও জানে না যে, আগুনের ফোঁটা টপটপ করে পড়ছে।

বললাম, ঠোঙাটা আপনি বাড়ির ভেতরে দিয়ে আসুন তো। তারপর চলুন, দু ভাই বাজারে যাব।

কেন ? বাজারে কেন ? জানিস না, বাজারে আগুন।

আহ, আপনি চলেন না।

জিদ করে উঠল পরান মাস্টার, না তুই আমাকে বল, আগুনের ভেতরে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস কেন ?

কেন আবার ? আমি বাজার করব, ভাবি রান্না করবেন, সবাই মিলে খাব।

আবার খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল পরান মাস্টার, আমার পেটে সংক্ষিপ্ত একটা খোঁচা দিয়ে বলল, তুই দেখছি সরকারের মতো ব্যবহার করছিস রে। পিটিশনের পর পিটিশন, কান্নাকাটি, পায়ে ধরা, অভাবের পাঁচালী, সাত কাহন হবার পর, সরকার দয়া করে অন্তর্বর্তীকালীন মঞ্জুরি দিলেন ছেয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা। আর দশটা পয়সা দিলেই একটা টাকা পুরো হয়, দেবেন না কেন ? অডিটের ঝামেলা।

রাখেন তো আপনি, সরকার-টরকার যা ইচ্ছে করুক।

তাহলে তুই মুসলমানের মতো করছিস।

এ আবার কী ?

বুঝলি না ? মিসকিনকে দান করো। দান করলে পুণ্য হবে। মিসকিন না থাকলে তুই দানই বা করবি কোথায় আর পুণ্যই বা হাতে পাবি কী করে ? অতএব, শালা মিসকিন বানাও, দুনিয়া জুড়ে মিসকিন পয়দা কর।

আমি আবার তাড়া দিয়ে বললাম, দেখুন পরান ভাই, রাত হয়ে যাচ্ছে। এখন বাজার না করলে, রান্নাই বা হবে কখন, আর খাবই বা কখন! বলছি তো, আমি আজ আপনাদের সঙ্গে খাব। দু ভাই একসঙ্গে বসে অনেকদিন পর খাব।

খ্যা খ্যা খাবি বৈকি। একসঙ্গে মার খেতে পেরেছি, একসঙ্গে বসে আজ দুটো অন্ন মুখে দিতে পারব না ? তোর মনে আছে ? সেই যে, ডগস আর বার্কিং ? কুকুরেরা ভৌ ভৌ করিতেছে ? খ্যা খ্যা খ্যা। চল চল।

আরে, আপনি যে জিলিপির ঠোঙা হাতে না নিয়েই চললেন। ওটা বাড়ির ভেতরে দিয়ে আসুন।

তাইতো, তাইতো।

সে রাতে বাজার নিয়ে আসবার পর, ভাবি রান্না শুরু করেছে, আমি পরান মাস্টারের হাত টেনে বললাম, চলুন, কোথাও একটু বসিগে।

বাড়ির সম্মুখেই সড়কের ওপর পুরনো একটা কালভার্ট; চমৎকার চাঁদ উঠেছে; দূরে ডাক বাংলোর টিনের ছাদ রুপোর মতো ঝকঝক করছে, দুজনে গিয়ে কালভার্টের শানে বসলাম।

রান্নার তো অনেক দেরি হবে, পরান ভাই।

আবার সেই খ্যা খ্যা করে হেসে উঠে পরান মাস্টার বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, তারপর কী হলো জানবার জন্যে ছটফট করছিস তো ? আর বলতে হবে না বুঝেছি।

৮

কখন যে নক্ষত্রযান বীথিপৃতে অবতরণ করেছে কিছু টের পেলাম না, ব্যক্তিটি এক সময় শুধু ঘোষণা করল, আমরা এখন বীথিপৃ পৃষ্ঠে। তারপরই সে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল, আপনার শরীরে কোনো তামাটামা নেই তো ?

কেন ? কেন ? এই প্রশ্ন কেন ?

আপনাকে এখন তানেহামের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনি যে পদ্ধতিতে তার সমুখে উপস্থিত হবেন, সেই পদ্ধতিটি তামার ক্ষেত্রে তড়িৎ সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণহানি অবশ্যম্ভাবী।

প্রাণ নিয়ে কথা, নইলে কিছুতেই স্বীকার করতাম না, জিনিসটা বহুকালের; কাচুমাচু হয়ে বললাম, সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ব্রিটিশ আমলের তামার একটা ছ্যাঁদা এক পয়সা, কালো সুতো দিয়ে মা কোমরে বেঁধে দিয়েছিল, মায়ের চিহ্ন খুলে রাখবে ?

ব্যক্তিটি বিস্মিত হয়ে ভ্রূ তুলল; না ভ্রূ বলে তার কিছু নেই, ভ্রূর জায়গাটা সামান্য উঠে গেল মাত্র। আমি লক্ষ না করে পারলাম না যে, যে গ্রহেরই হও বাপু কিছু কিছু মৌলিক জিনিস ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়— যেমন এই ভ্রূ কপালে তোলার ব্যাপার।

একটু আড়াল হয়ে কোমর থেকে তামার পুরনো পয়সাটা বের করে তার হাতে দিলাম। বললাম, বহুদিনের স্মৃতি।

ব্যক্তিটি আবার নীরব বিস্ময় প্রকাশ করল ঐ ভ্রূর জায়গা কাঁপিয়ে; বলল, যাবার সময় ফেরত পাবেন।

এখন ? এখন কী কর্তব্য ? কোথায় যেতে হবে, নিয়ে যাও।

অচিরে আমাকে নিবস্ত্র হতে বলা হলো। ক্ষ্যাপা নাকি ? বস্ত্র দেহে থাকলে তো নিবস্ত্র হব ? ছেঁড়া একখানা লুঙ্গি পরে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম, আমি কি জানি সফরে বেরুচ্ছি ? জানা থাকলে না হয়, সেই কবে কাফনের কাপড় কিনে রেখেছিলাম সেটা গায়ে জড়িয়ে বেরুতাম; ঈদের নামাজটা না পড়লেই নয়, অন্তত ফেৎরার পয়সাটা ছাত্ররা দেয় কাতারে দাঁড়াবার আগে, ঈদের নামাজ আজকাল ঐ কাফনের কাপড় পরেই চালিয়ে দেই; লোকে অতো বুঝতে পারে না, তারা ধরে নেয় বড় মুসল্লী হয়েছি, হজের কাপড়ে নামাজ আদায় করছি। তা সে কথা যাক।

নিবস্ত্র হতে বলছে; একেবারে আদিম হয়েই কি ওদের ঐ তানেহাম লোকটির সঙ্গে দেখা করবার রেওয়াজ নাকি ? এবার আমার ভ্রূ তোলার পালা; আমার দুখানা ভ্রূ আছে এখনো স্ব-স্থানেই, ও তো আর সোনাদানা নয় যে বাধা দিয়ে খেয়ে ফেলেছি; আমি দুই ভ্রূ একসঙ্গে কপালে তুলে লুঙ্গির গেরো হাতের মুঠোয় ধরে ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তোমার সম্মুখেই কি নিবস্ত্র হব ?

ব্যক্তিটি অন্তর্হিত হয়ে গেল চোখের পলকে।

বাহ, এদের দেখছি ভদ্রতাবোধ বেশ আছে। নির্জন দেখে হাতের মুঠো আমার অলগা হয়ে গেল। তারপর, পায়ের কাছ তেকে লুঙ্গিটা কুড়িয়ে বিছানার ওপর রাখতে যাব, আবার ফিরে যেতে হবে তো, তখন কি উদোম হয়ে প্রত্যাবর্তন করব ? দেখি, বিছানার ওপর পাট পাট ইস্ত্রি করা কাপড় রাখা। বহুদিন আগে, বিয়ের পর পর, তখন ছেলেপুলেও হয় নি, দেশেও আকাল পড়ে নি, সেই তখনকার কথা, আমার ইস্কুল টাইমের আগে চান বড়ুয়া আমার কাপড় ভাঁজ করে বিছানার ওপর সাজিয়ে রাখত; অবিকল সেই রকম। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি তুলতুলে নরম বস্ত্র, হাত থেকে পিছলে পড়ে যেতে চায়, দুধের মতো চাপারঙ, পাঞ্জাবি, পাজামা, ভাঁজ করা চাদর, তার আবার বাসন্তী রঙের সরু পাড়, পাশে একজোড়া ঝকঝকে কালো রঙের পাম্পস্যু। কখন এ সব এখানে কে রেখে গেছে, আমার চোখে পড়ে নি। আমার তাড়াতাড়ি বেশভুষা শেষ করে চোখ তুলেছি, নলের গায়ে দিব্যি একখানা লম্বাটে আয়না এসে হাজির। সেই আয়নায় যার ছবি পড়েছে তাকে আমি পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলাম। সেই ডান পাশে কাত করা সিঁথি, টলটলে মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ, বাটারফ্লাই

গোঁফ, গালের সেভটা পর্যন্ত ব্রজলালের সেলুনে কামাবার মতো নিখুঁত। দেখে এত লোভ হলো, মনে মনে ইচ্ছে প্রকাশ করলাম, ফিরিয়ে দেবার সময় অন্তত এই জামা জুতো জোড়া, আর পারলে যুবক চেহারাটা আর কেড়ে রেখ না।

আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি আয়নায় সেই ব্যক্তিটির ছবি— কখন এসে উপস্থিত হয়েছে আবার। আমি জিগ্যেস করলাম, আপনাদের বীথিপৃতে কি পাঞ্জাবি পাজামারই রেওয়াজ নাকি ?

সে বলল, না আপনারই জন্য বানানো হয়েছে বিশেষভাবে।

আমি বললাম, আহা, বানালেনই যদি, একসেট সাফারী স্যুট করিয়ে দিলেই পারতেন। আজকাল ও না হলে দেশে কোথাও পাত্তা পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিটি উত্তর দিল, করিয়ে দিলেও তো নিয়ে যেতে পারতেন না। আমাদের বস্ত্র আপনাদের আবহাওয়ায় মুহূর্তে মাকড়সার জালের মতো ছিঁড়ে যাবে। এই পাঞ্জাবি পাজামাও এখানেই রেখে ফিরে যেতে হবে।

পা তুলে বললাম, পাম্পসু ?

পৃথিবীর আবহাওয়ার সংস্পর্শে এলেই লোহার জুতোয় পরিণত হবে।

বাবা দরকার নেই। এক বিপলের মধ্যে আমাকে জলেশ্বরীতে ফিরিয়ে দেবার কথা, এযে কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তিটি আমার উদ্বেগ আঁচ করেই বলল, না, আমরা তো এখন চলছি।

মানে ?

বহু আগেই মূল নক্ষত্রযান থেকে নলটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে; এই নল এখন তানেহামের প্রাসাদের দিকে ধাবিত। অচিরেই আমরা সেখানে পৌছুব।

বলতে না বলতেই নলের গা স্বচ্ছ হয়ে গেল; চারদিকেই একেবারে স্বচ্ছ পরিষ্কার, যেন নল-টল কিছুই কখনো ছিল না; আমার চারদিকে এখন বিরাট এক হলঘরের পরিবেশ। স্ফটিকের মতো মেঝে টলমল করছে, দূরে-দূরে নীলাভ রঙের গোল থাম, দেয়ালগুলো সোনার মতো ঝকঝক করছে, আর তীব্র পূর্ণিমার মতো আলো এসে পড়েছে দূরে একটি জায়গায়। মনে হলে পাথরে খোদাই একটি মূর্তির ওপরে আলো ফেলা হয়েছে।

আমার যাত্রা সঙ্গী, নাকি পথপ্রদর্শক বলব ?— সে ইঙ্গিত করল এগিয়ে যাবার জন্যে। আমি ভরসা পেলাম না। একটু আগেই আমার চারদিক ছিল নলের দেয়াল, এখন স্বচ্ছ হলেও যদি সেই জলেশ্বরীতে বাড়ির পেছনের মতো আবার ধাক্কা খাই ? বারবার বেলতলায় যেতে রাজি নই।

ব্যক্তিটি আবার হাত তুলে ইঙ্গিত করল; এবার তার মুখ রক্তাভ লক্ষ করলাম এবং বুঝতে পারলাম বিশেষ বিরক্ত হয়েছে সে— ওটাই ওদের বিরক্ত হবার রং, মনে পড়ে গেল। আমি পা বাড়ালাম, দিব্যি নল ভেদ করে বেরিয়ে এলাম; ব্যক্তিটি আমার পেছনেই রয়ে গেল, সে আমার সঙ্গে এল না, আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল— দূরে পূর্ণিমার উদ্ভাসিত ঐ মূর্তিটির দিকে অগ্রসর হও।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর লক্ষ করলাম, মূর্তি নয়— মানুষ, মানুষ মানে এক্ষেত্রে ম্যনুম

একজন। হিস্ট্রি বইতে যে রকম দেখেছিলাম, অবিকল নেপোলিয়নের ভঙ্গি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই তেমনি আড় হয়ে, দু পায়ের গোড়ালি যুক্ত, বাঁ হাতখানা করতল পর্যন্ত জামার জোড়ের ভেতরে ঢোকান, তফাত শুধু এই যে-ডান হাতখানা কোমরের পেছনে থাকবার বদলে এই ষ্যনুমটির হাত মুখের কাছে তোলা, ভালো করে তাকিয়ে দেখি সে হাতে লম্বা এককাঠি লেবেনচুষ দিব্যি মুখে পুরে দিয়ে চুষছেন।

আমি কাছে যেতেই মুখ থেকে কাঠি সরিয়ে ষ্যনুমটি বললেন, স্বাগতম। আমার নাম তানেহাম। এই বলে কাঠি লেবেনচুষ আবার মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুষলেন আর আমার দিকে মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি জানি না বীথিপৃতে ভদ্রতার ধরন-ধারণ কী, পৃথিবীতে আমরা মোটামুটি পাশ্চাত্য কেতা কায়দাই ব্রহ্মাণ্ডের জন্য সত্যি বলে মেনে নিয়েছি, অতএব আমি শেকহ্যান্ড করার জন্য হাত বাড়িয়ে বললাম, আমি পরান মাস্টার, আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে প্রীত হলাম।

তানেহাম আমার বাড়ানো হাতের দিকে অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, না, আপনার মন আমি তন্নতন্ন করে দেখলাম, আপনার তো পাঞ্জা লড়বার ইচ্ছে নেই, হাত বাড়ালেন যে?

বললাম, ভিনদেশে ভিন্ন আচরণ, আপনার দেশে শেকহ্যান্ড নেই বুঝলাম।

তানেহাম তার অনুপস্থিত ভ্রূ তুলে বললেন, আচরণটি আপনার পক্ষেও তো ভিনদেশী বটে। তবু হাত বাড়ালেন যে তাই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

আবার তিনি কাঠি লেবেনচুষ মুখে পুরে দিলেন।

এই দেখবার জন্য আমাকে ন' হাজার আলোকবর্ষ দূরে এই ধাপধারা বীথিপৃতে আনা হয়েছে নাকি?

এদের এখানে আবার মনে মনেও কিছু ভাবনার জো নেই, মুহূর্তে সব টের পেয়ে যায়, তার প্রমাণ আমি পথেই পেয়েছি।

তানেহাম বললেন, আপনি আমাকে কাঠি লেবেনচুষ চুষতে দেখে অবাক হচ্ছেন। আপনি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন বীথিপৃর আমিই প্রধান, আমি আপনাদের ভাষায় বীথিপৃর সম্রাট, আপনাদের মহা গৌরবের বস্তু মোগলদের দরবারি বর্ণনায় জিললুল্লাহ্ অর্থাৎ ঈশ্বরের ছায়া। তাই আমি যখন কাঠি চুষছি, আপনার বিস্মিত হবার কথাই। আপনার কাছে আমি একটা বিশেষ ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী বলেই আপনার কৌতূহলও আমি উপেক্ষা করতে পারি না। অতএব আপনাকে এই কাঠি লেবেনচুষের ব্যাখ্যা দিই। মানুষ হোক, ষ্যনুম হোক বা ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোনো সূর্যের যে-কোনো গ্রহেরই কোনো উন্নত প্রাণী হোক, সে যখন ক্ষমতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছায়, তখন তার ইচ্ছা কাজে পরিণত হতে শুধু উচ্চারণের অপেক্ষা মাত্র। যখন যুদ্ধ, গণহত্যা, পারমাণবিক ধ্বংসলীলাও আর মোটেই উত্তেজনাকর নয়, তখন আমাদের জন্য আবার সেই শৈশবেরই দ্বারস্থ হতে হয়; শৈশবে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না, ফিরে যাবার অভিনয় করতে হয়, তাই লক্ষ করে দেখবেন, আপনাদের পৃথিবীতে বড় বড় শক্তিমানেরা মিলে নার্সারী খেলাঘর বানায়, যার নাম জাতিসংঘ, আমাদের গ্রহে আমি একাই শক্তিমান বলে অগত্যা কাঠি লেবেনচুষ চুষি।

তানেহামের কথাগুলো শেষ দিকে আমার কানে ঠিক ভালো মতো গেল না, তার কারণ

মাঝখানে তিনি বলেছেন— একটি বিশেষ ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্যপ্রার্থী; আমি বড় ভাবিত হয়ে আছি সেই থেকে।

অবিলম্বে তিনি জামার জোড় থেকে হাত বের করে আমাকে করতল দেখিয়ে দিলেন। ভঙ্গিটার অর্থটা অনুধাবন করতে পারলাম না; বীথিপৃতে ষ্যনুমদের চালচলন আলাদা, সে এখন আমি জেনে গেছি। পরে অবশ্য তার সংলাপে অনুমান করলাম, ভঙ্গিটির অর্থ হচ্ছে— আমি কি আসন গ্রহণ করে তাকে বাধিত করব ?

তার পেছনেই মর্মর পাথরের আসন দেখিয়ে তিনি বললেন, বসবেন না ? আপনি আসন গ্রহণ করলেই আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি একে একে দিয়ে যাব।

আমি পৃথিবীর চিরাচরিত ভঙ্গিতে দু হাত তুলে বললাম, দোহাই আপনার, আমাদের জন্যে এ বড় কষ্টকর। মুখ বুঁজে বসে আছি, আরেকজন ক্রমাগত বলেই যাচ্ছে, আমাদের তাতে পেট ফুলে ঢোল হয়। দয়া করে আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন, আমি জানি আপনাদের বীথিপৃতে প্রশ্ন করবার দরকার হয় না, কিন্তু আমার উদরের স্বাস্থ্যের জন্যে প্রশ্নটা করা খুবই জরুরি।

তানেহাম আমার সমুখে আসন গ্রহণ করে বললেন, বেশ, আপনি প্রশ্ন করুন, যদিও তা নিতান্তই অনাবশ্যক।

আপনি একটি বিশেষ সাহায্য প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি কী ?

আপাতত এর উত্তর দেব না। তানেহাম ঈষৎ রক্তাভ হয়ে বললেন, আপনাদের ঐ প্রশ্ন করবার রেওয়াজটির অসুবিধে কোথায় জানেন ? কখন কোন প্রশ্ন করা উচিত, তা নির্ণয় করতে পারেন না। তবে, আপনি অতিথি এবং আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী, অতএব উপায় নেই। আপনি প্রশ্ন করে যান, প্রশ্ন যদি ধারাবহির্ভূত হয় উত্তর না দেবার অধিকার আমার রইল। হাঁ আপনার প্রশ্ন।

আমি ভালো বিপদে পড়লাম, যেটা গোড়াতেই আমার জানা দরকার সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারব না, তাহলে কেন প্রশ্ন করি ? আর যে প্রশ্ন করব সেটাই যে তানেহামের বিবেচনায় ধারাবহির্ভূত হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কী ? আমি তো তাঁর মতো বীথিপৃর ষ্যনুম নই যে বই পড়ার মতো অপরের মন পড়তে পাড়ি।

ইতস্তত করে গোড়া থেকেই শুরু করলাম।

আপনার যদি পৃথিবীর কোনো মানুষেরই সাহায্য নেবার দরকার ছিল তো এত জ্ঞানী গুণী থাকতে আমার কাছে কেন লোক অর্থাৎ ষ্যনুম পাঠালেন ?

পরের প্রশ্ন!

অর্থাৎ এটিরও উত্তর তিনি এখন দেবেন না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে আপনার নক্ষত্রযান বাংলাদেশেই নামালেন কেন ?

পরের প্রশ্ন।

এটিও কি ধারাবহির্ভূত হয়ে গেল ?

পরের প্রশ্ন।

আমার একমাত্র বাক্যটি কিন্তু ঠিক প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন নাকচ হবার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করছিলাম।

আপনারা এই আরেক মস্ত গোলমেলে ব্যাপার করে থাকেন। বিস্ময় প্রকাশ করতে প্রশ্নের আশ্রয় নেন। অর্থাৎ বিস্ময় সম্পর্কেও আপনারা পূর্ণ কোনো ধারণা রাখেন না। আমি না ক্ষেপে গিয়ে পারলাম না। বলেই ফেললাম, এতই যদি আপনার সমালোচনা আমাদের সম্পর্কে, তাহলে সাহায্যের জন্যে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছেন যে ?

তানেহাম স্মিত হয়ে বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। আপনাদের কিছু কিছু দুর্বলতাই আমার সাহায্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ।

অর্থাৎ ?

পরের প্রশ্ন।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, মহামান্য তানেহাম, আমি বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল, আপনার ষ্যনুমটি আমাকে বলেছে এক বিপলের মধ্যেই আমাকে জলেশ্বরীতে আমার পেছন বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে, সময় মতো ফিরে না গেলে আমার স্ত্রী বড় বিচলিত হয়ে পড়বেন, আমার ছোট মেয়ে গুলি এখন নিশ্চয়ই জিলিপির জন্যে কাঁদাকাটা শুরু করে দিয়েছে, আসবার পথে তাকে ডাকতেই সে জিলিপি খাবার বায়না ধরে ঘুম থেকে উঠেছিল। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থা, আপনার জগতে তো কিছুই অজানা থাকে না। আপনি বরং নিজে থেকে নিজের মতো করে উত্তর দিয়ে যান, আমি মুখ বন্ধ রাখলাম। শুধু ঐ বিপলের মধ্যেই আমার ফিরে যাওয়াটা নিশ্চিত করবেন।

অবশ্যই। বলে তানেহাম কাঠি লেবেনচুষ মুখে দিলেন।

আমাদের ঘিরে পূর্ণিমার আলোটি বেশ ছোট হয়ে এল ধীরে ধীরে, সমস্ত হলঘরের ভেতরে এখন আমরা দুটি প্রাণীই আলোকিত মাত্র এবং ভিন্ন দু সূর্যের দু গ্রহের মানুষ— তিনি সম্রাট, আর আমি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তানেহাম মুখ থেকে লেবেনচুষ সরিয়ে বললেন, হাঁ, অবাক হবার কিছু নেই, একমাত্র শিক্ষকের কাছেই সম্রাটকে জানু পেতে বসতে হয়, যদিও সম্প্রতি শুনেছি যে পৃথিবীতে ভাবী সম্রাটতো দূরের কথা, ভাবী আর্দালিও শিক্ষককে উল্টো প্রহার করে। না, আপনার ও আমার সাক্ষাৎ মোটেই বিস্ময়কর নয়।

আমাদের এই গ্রহের পরিস্থিতি আপনাদের গ্রহ থেকে বিন্দু মাত্র ভিন্ন নয়, কেবল দুটি প্রসঙ্গ বাদে। এক, বীথিপৃতে আমিই একমাত্র শক্তি, আপনাদের পৃথিবীতে একাধিক। দ্বিতীয় ভিন্নতা, আপনারা ধর্মে বিশ্বাস করেন, আমরা করি না। ধর্মকে আমরা একদা দুর্বলতা বলে ত্যাগ করেছিলাম— এখন দেখছি সেই দুর্বলতাটুকুই বড় শক্তি ছিল।

আমার সন্দেহ হলো, হয়ত আমাকে ডাকা হয়েছে কিছু দ্বীনি হেদায়েত করবার জন্যে। আমি অবাক হয়ে গেলাম; কারণ মনের কিছুই যদি এদের কাছে গোপন না থাকে তো এদের ভালো করেই জানবার কথা যে, ধর্মের আমি কিছুই জানি না, আল্লাহ গুনাহ মাফ করুন, নামাজটা পর্যন্ত ঠিক মতো পড়া হয়ে ওঠে না।

তানেহাম আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনার এ সংশয়ের অবসান এক্ষুণি হবে। আমাকে বলতে দিন। বীথিপৃতে আমি একাই শক্তিমান, পুরো গ্রহই আমার সাম্রাজ্য, তাই বলে ভুলেও ভাববেন না যে, এখানে যুদ্ধ নেই, অস্ত্র ব্যবহার নেই, নির্যাতন নেই, আন্দোলন নেই। আপনাদের পৃথিবীতে যা যা আছে; এখানেও তাই আছে, বরং একা আমাকে সামাল দিতে হয় বলে, মাত্রাটা একটু বেশি প্রয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশে শুনেছি একাত্তরের

গণহত্যায় তিরিশ লাখ লোক মারা গেছে, কেউ কেউ অবশ্য পরে অনেক কমিয়ে বলে সংখ্যাটি, সে যাই হোক, আমার এখানে ওই পরশুদিনেই এক অভিযানে সাড়ে তিন কোটিকে বীথিপৃ লীলা থেকে মুক্তি দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ল। আবার এরপর প্রতিক্রিয়া আছে। যত মরবে তত আন্দোলন হবে। বলতে গেলে আপনাদের পৃথিবীর তুলনায় এখানে তুমুল ব্যাপার। তবে আপনাদের একটা সুবিধে আছে। সব সময় মানুষ মেরে ঠাণ্ডা করবার দরকার হয় না। বস্তুত নির্বোধ শাসকরাই আপনাদের ওখানে হত্যা আর নির্যাতন চালায়। চালাক যারা তারা ধর্মকে ব্যবহার করে। পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও বহুগুণে ফলদায়ক এই জিনিসটি। ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা যায়, জীবিত অবস্থায় স্বর্গ না পাও, মারা গেলে তো পাবেই, এত হা হুতাশ করছো কেন ? ধর্মের দোহাই দিয়ে বুঝান যায়, এ সবই মায়া, বিশ্ব মায়া, তুমি মায়া, আমি মায়া; অতএব তোমার রক্তপাত হচ্ছে, এটিও মায়া, তুমি দরিদ্র, এও মায়া, তুমি নিচের তলায়, সেই অবস্থানটিও মায়া ভিন্ন আর কিছু নয়। জনাব আনসার আলী সাহেব; আমি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই কথাগুলো বলছি; আমি আপনাকে যে সাহায্য করবার কথা বলছিলাম তার সঙ্গে এই কথাগুলোরই যোগাযোগ রয়েছে।

আমি ভ্রূ তুললাম।

তানেহাম খুব চট করে লেবেনচুষের স্বাদ নিয়ে বলে চললেন, আমি আগেই বলেছি বীথিপৃর ষ্যনুমেরা ধর্ম ভুলে গেছে। রাজনৈতিক কারণে আমি তাদের ভেতরে ধর্মকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাই। কীভাবে তা আনা যায়— বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিদ ইত্যাদি বহু জনের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি শুধু বিভ্রান্তই হয়েছি। কেউ বলেছেন, ধর্ম রক্তের ভেতরে থাকে। কেউ বলেছেন, ধর্ম মনের ভেতরে থাকে। কেউ বলেছেন, রক্তও নয়, মনও নয়, ধর্ম পকেটে থাকে। নানা জনের নানা মত শুনে আমি উত্যক্ত হয়ে নিজেই একটা পরীক্ষা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সেই পরীক্ষাটির জন্য আপনাকে প্রয়োজন।

আমি কান খাড়া করে রইলাম। কোনো আঁচই এখনো পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে কথা ফেনিয়ে চলছে, আমার বিপল না আবার পার হয়ে যায়। চান বড় বড় অস্থির হয়ে পড়বে।

তানেহাম বলতে লাগলেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর একটিতে জন্ম নিয়েছেন, আপনি প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষক, এবং আপনি আপনার রোগব্যাধিগ্রস্ত, অনাহার ও অভাব পীড়িত পরিবারকে নিত্য আশার বাণী শোনান। এই তিনটি কারণের জন্যেই আমি পৃথিবীর যাবৎ মানুষের ভেতরে আপনাকে বেছে নিয়েছি। আপনি দরিদ্রতম একটি দেশের লোক বলে পৃথিবীতে আপনাদের কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করে না; অতএব ধরে নিয়েছি যে আপনি যদি ফিরে গিয়ে বলেন— বীথিপৃতে গিয়েছিলেন, ইউরোপ বা আমেরিকা হেসেই উড়িয়ে দেবে। শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, অভিযান বলুন, কোনো ক্ষেত্রেই আপনাদের মতো দেশের সত্যিকার কোনো সাফল্যও তারা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা, গণনায় আনে না। অতএব আপনার বীথিপৃতে আগমন অবিশ্বাস্য বলে চিহ্নিত হবে; এদিকে আমার কাজটি হাসিল হবে। ব্রহ্মাণ্ডে কেউ জানবেও না, বিশ্বাসও করবে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি হিসেবে আপনি সৎ। কিছু মনে করবেন না, সৎ না হয়ে আপনার উপায় নেই। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের নিম্নতম বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের চেয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সৎ আর কে ? প্রাইমারি পাশ করে কারো কোনো লাভ নেই, তাই আপনাকে ঘুষ দিয়ে প্রশ্ন বের করে আনবার ব্যাপার নেই, সরকারি কোনো

ব্যাপারে আপনার দেয়া সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই; অতএব আপনার সুপারিশ সংগ্রহের জন্যে কেউ আপনাকে টাকার লোভ দেখায় না। আপনার বিদ্যালয়ের সরকারি বরাদ্দও এত কম বা নেই যে তহবিল তছরুপেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না, ইত্যাদি কারণে এই মহাবিশ্বে আপনি এবং আপনার মতো সৎ ব্যক্তি আর নেই। আমি একজন সৎ ব্যক্তিরই সন্ধানে ছিলাম। তৃতীয়ত, আপনি আপনার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, তাদের শুভাশুভের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই করার সাধ্য আপনার নেই বলে আপনি তাদের অনরবত বলে থাকেন যে, আর দুটো দিন অপেক্ষা কর, ঈমানের জোরে পার হয়ে যাব এই বিপদ। এই তিন বিবেচনা করেই আপনাকে আমি বেছে নিয়েছি, নক্ষত্রযান পাঠিয়ে বীথিপৃতে এনেছি। আমার পরীক্ষা কাজে আপনি সাহায্য করুন।

প্রশ্ন করবার দরকার নেই তবু পৃথিবীর মানুষ বলেই প্রশ্ন করে বসলাম, কী রকম সাহায্য? কী রকম পরীক্ষা?

সাহায্যটি আপনার পক্ষে সুখকরই হবে। অন্নগ্রহণের মতোই ব্যাপারটি মানুষের কাছে খুব তৃপ্তিকর।

কিছুই বুঝতে পারছি না মহামান্য তানেহাম।

তানেহাম উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

তানেহাম বললেন, আবার সেই হিস্ট্রি বইতে দেখা নেপোলিয়নের ভঙ্গি ধরে, আমি বিশ্বাস করি, ধর্মবোধ রক্তের ব্যাপার, রক্তের মাধ্যমেই এটা পিতা থেকে পুত্রে প্রবাহিত হয়ে যায়। আপনি লক্ষ করে দেখবেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর প্রতি প্রেরিত পুরুষেরা নিজ নিজ শাখায় পরস্পর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, কেউ এমন নেই যে আধ্যাত্মিক বংশতালিকা দাবি করেন নি। এ থেকেই আমি সিদ্ধান্ত করেছি, রক্তের অবশ্যই একটা ভূমিকা আছে বলে পৃথিবীতে আপনারা স্বীকার করেন। তাই যদি হয়, ধর্মহীন এই বীথিপৃতে ধর্মবোধ সঞ্চারিত করতে হলে রক্তের মাধ্যম ছাড়া আর উপযুক্ত মাধ্যম কী হতে পারে। তবে এটা যেহেতু আমার এখনো অনুমান মাত্র, তাই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আপনি সৎ, দরিদ্র এবং ধর্মে বিশ্বাসী, আপনাকে বীথিপৃতে আনা হয়েছে আমার এই পরীক্ষাটি বাস্তবায়িত করার জন্য।

আমি বিমূঢ় হয়ে বললাম, তবু কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না।

তানেহাম আবার ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠলেন। বললেন, আহ্ পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে এই এক অসুবিধে; তাদের যতক্ষণ না ভাষায় বলা হচ্ছে, মাথায় ঢুকছে না। সব কিছুই বানান করে বলে দিতে হয়।

রেগে গেলে পৃথিবীর আমরা লাল হয়ে যাই, আমার রং এক সময়ে বেশ ফর্সা ছিল, এখন সংসারের তাপে রঙটা পুড়ে গেলেও নলের ভেতরে বেশভুষা করার সময় যৌবন ফিরে পেয়েছি ক্ষণকালের জন্যে, বলা ভালো বিপলের জন্যে; আমার চেহারা যদি এখন রাগে লাল হয়ে যায়, বীথিপৃর এরা ধরে নেবে যে আমি বিরক্ত হয়েছি, কারণ আগেই বলেছি, এদের বিরক্ত হবার রং লাল; আগের মতোই এখন আবার আমার আশঙ্কা হলো, আমাকে বিরক্ত দেখে যদি আর পৃথিবীতে ফেরত না পাঠায়? যদি আমাকে প্রাণেই মেরে ফেলে?

আমি জানি এ ধরনের আশঙ্কা একটু বাড়াবাড়ি মনে হবে, যে শুনবে তারই। কিন্তু ভুলে যাওয়া কি ঠিক, যে আমি তখন পৃথিবী থেকে ন' হাজার আলোকবর্ষের দূরের এক গ্রহে? গ্রামের মানুষ ঢাকায় গিয়ে ভদ্রলোকদের বিরক্ত করতে সাহস পায় না, আমি তো পৃথিবী থেকে বীথিপৃতে। হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তানেহাম তখন বললেন, আপনি অগ্রসর হয়ে পাশের ঘরে যান। আমার কিছু বলে দেবার আর দরকার হবে না।

পাশের ঘর বললেই তো আর পাশের ঘর নয়; বীথিপৃর ব্যাপার স্যাপারই আলাদা; পাশের ঘর অর্থ, একেবারে আমাদের খাঁটি সংস্কৃত শব্দের মতো, পাশ অর্থাৎ ফাঁদ বা জাল যেরূপ পাশবদ্ধ; একটা ফাঁদে গিয়ে পড়লাম।

নক্ষযানের সেই নলের মতো একটি নল, সেটাই ঘর, তবে ব্যাস কিছুটা বেশি, নক্ষত্রযানের মতোই এখানেও একটি বিছানা, আর সেই বিছানার ওপর কনুই ভর দিয়ে আধো শুয়ে আছে এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। কাঁঠালিচাঁপার মতো গায়ের রং। জ্যোৎস্না রঙের পট্টবস্ত্র তার পায়ের কাছে লুটোচ্ছে। চোখের ভঙিতে পাখি উড়ল যেন।

নিমেষে আমার কাছে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

৯

উজির নাজির এসে যমদূতের মতো উপস্থিত হলো।

বাবা, এখানে বসে গাঁজা মারছ ওদিকে রান্না কখন হয়ে গেছে। খেতে হবে না? চল চল।

পরান মাস্টার আমাকে ধরে চাপা গলায় বলল, দেখলি ছেলের ব্যবহারটা দেখলি? বাপের সঙ্গে বাক্যালাপ করার ধরনটা দেখলি?

আমিই এবার তাড়া দিলাম। বললাম, চলুন, আগে চা খেয়ে নেই।

ফিরতে ফিরতে পরান মাস্টার হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, মাইন্ড করিসনে। ছেলে দুটো ভালো, খুবই ভদ্র, হাজার হোক মাস্টারের ছেলে তো? তবে কিনা, তোর বাজার করে দেবার দরুন ভালো-মন্দ রান্না হয়েছে তো, দেখে গণ্ডে পিণ্ডে গেলবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। তাই কাকে কী বলছে কোনো খেয়াল নেই। গবর এগুলো আস্ত গবর।

আমি বড় চিন্তিত হয়ে খেতে বসলাম। নানা রকম কারণে চিন্তাটা বেশ পাকিয়ে উঠল। পরান মাস্টার কি সত্যিই পাগল? বীথিপৃর কথাটা কি আগাগোড়াই বানানো? আর সেই যুবতী? শেষ পর্যন্ত কি পরান মাস্টার বীথিপৃতেও সন্তানের পিতা হতে চলেছে?

যদি বানানো কাহিনীই হয়, তাহলে রচনার উদ্দেশ্য কী?

যদি হ্যালুসিনেশন হয়ে থাকে, তাহলে এর উৎস কোথায়? অনাহারে? না, এখন এই শেষ ধাপে এসে যেমন ইশারা পেলাম, শরীরের অপর তৃষ্ণার দরুন?

কিন্তু আমি নিজেই এখন কাহিনীটি অবিশ্বাস করবার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। কেন? শুধু এই যে, পরান মাস্টার বাংলাদেশের এক প্রাইমারি ইস্কুলের চাকরি হারানো, দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষক? কই ইংরেজি বইতে যখন পড়েছি, ফ্রান্সের এক দরিদ্র কৃষক রমণী তার আলুক্ষেতে অপর গ্রহের জীব ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, তখন তো অবিশ্বাস একেবারে করি নি? শুধু

আমি কেন খোদ সভ্য দেশের মানুষগুলো তো লাখ লাখ কপি সে সব বই কিনে গোগ্রাসে গিলেছে। যখন পড়েছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়ন্ত পিরীচ দেখা গেছে; যখন ঝকঝকে পকেট বুকে পড়েছি ব্রাজিলের এক যুবককে স্পেসশীপ এসে নিয়ে যায়, তাকে এক ভিন্ন গ্রহের রমণীর সঙ্গে তারা মিলিত করে, তখন তো বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। আর এই জলেশ্বরীতে বসে পরান মাস্টারের কথা গাঁজা বলে উড়িয়ে দিচ্ছি ? কেন ? নিতান্ত বাংলাদেশের মানুষ বলে ? অপর জগতের মানুষের সাক্ষাৎ পাবারও উপযুক্ত আমরা নই ? এতই দরিদ্র আমরা যে কল্পনাবিলাস থেকেও বঞ্চিত ?

মোটামুটি চাঁদের আলোতেই আহার শেষ হলো। বাজার থেকে দুটো মোমবাতিও কিনে এনেছিলাম। আমার জানাই ছিল যে, এ বাড়িতে আলো জ্বালাবার পাট অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। আহার শেষ হতে না হতেই পরান মাস্টার ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল।

চাঁদের আলোয় এঁটো হাত ধুচ্ছি, বড় মেয়ে দুলি আমার হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকে দেখে বড় মিষ্টি লাগল। মনে পড়ে গেল এই মেয়েটির বিয়ের বাজাব করতে গিয়েই পরান মাস্টার সর্বস্বান্ত হয়ে ফেরে।

আমাকে তাকাতে দেখেই দুলি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

তোমার নামই তো দুলি ?

মাথা দুলিয়ে নীরবে হাঁ বলল সে। আর কী বলতে পারি ? বললাম, ভালো আছ তো ? বলেই বুঝলাম এ সংসারে এর চেয়ে নির্মম প্রশ্ন আর কিছু নয়। অপ্রতিভ গলায় উচ্চারণ করতে শুনলাম নিজেকে, তা দুলি তুমি একবার এসো না আমাদের বাড়িতে, বেড়িয়ে যেও। তোমাকে সেই কত ছোট দেখেছিলাম।

অন্ধকারের ভেতর দুলি আত্মগোপন করল।

ফুলি আমার হাতে পান দিল।

ফুলির মুখের দিকে তাকালাম। বুকের ভেতরে বড় মায়া করে উঠল আমার । বললাম, ফুলি না ?

হাঁ!

তোমাকেও অনেক ছোট দেখেছিলাম।

পাশ ফিরে দেখি ছোট মেয়েটি আমার হাতঘড়িটা অবাক হয়ে দেখছে। ডিজিটাল ঘড়ির লেখা পাল্টাচ্ছে টক-টক করে, দেখে হাঁ হয়ে গেছে। মুখখানা দেখেই বোঝা যায় একেবারে ছেলেমানুষ নয়, কিন্তু অপুষ্ট দেহ থেকে শৈশব যায় নি।

পরপর তিনটি মুখ আমার সমুখ দিয়ে পার হয়ে গেল, যেন একটি নীরব আর্তনাদের মিছিল দেখলাম।

পরান মাস্টার বলল, বসবি আবার ? কালভার্টে ?

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, এখন থাক না ? আমার বুকের ভেতর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, সেটাই বাস্তবে দাঁড় করিয়ে বললাম, শরীরটা ভালো লাগছে না, যাই।

পরদিন সকালে আমি ইস্টিশানের লাগায়ো সেই চায়ের দোকানে গেলাম। এবং সেখানে তরুণদের সঙ্গে ভাব করতে গেলাম। ওদের কেউ কি দুলিকে বিয়ে করবে না ? আমি যদি

উদ্যোগী হই? ফুলিকে? আমি যদি কিছু সাহায্য করি?

কিন্তু কথাটা তো একদিনেই তোলা যাবে না, সময় লাগবে; তাছাড়া আমাকেও বুঝে দেখতে হবে, এদের ভেতরে কে ভালো ছেলে, কার উপার্জন আছে। ওদের ভেতরে একটি ছেলে আমার বেশ চোখে পড়েছিল, আমি দোকানে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে এখন হাসলাম।

না, বেশ ভদ্র আছে। একেবারে উঠে এল আমার কাছে, অপ্রস্তুত একটু হেসে বলল, বসবেন না কি? আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, আমার খুব লন্ডনের গল্প শুনতে ইচ্ছে করে।

তাই?

আগ্রহের সঙ্গে আরো কয়েকজন আমার কাছে ঘনিয়ে বসল।

একজন প্রশ্ন করল, আচ্ছা লন্ডনে না কি মাটির নিচে সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন চলে?

মানুষের দম বন্ধ হয়ে যায় না? যদি সুড়ঙ্গ ধসে পড়ে? ভয় করে না?

হাজার রকমের প্রশ্ন।

একে একে উত্তর দিয়ে চললাম. বর্ণনা করে চললাম, ওরা হাঁ করে শুনতে লাগল। হঠাৎ আমার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এল।

বললাম, তোমাদের এ সব বিশ্বাস হচ্ছে?

ওরা অবাক হয়ে বলল, হাঁ, হবে না কেন?

কেন হবে?

আপনি সেখানে গেছেন যে, দেখে এসেছেন যে, বাহ্।

এতক্ষণে বেশ জমে উঠেছিল ওদের সঙ্গে। পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করলাম, তাহলে পরান মাস্টারের কথা বিশ্বাস কর না কেন।

হা হা করে হেসে উঠল ওরা, যেন ভারি মজার কথা বলেছি। বললাম, উনিও তো বলছেন, উনি গিয়েছেন।

যে ছেলেটিকে আমার গোড়াতেই পছন্দ হয়েছিল সে বলল, আপনার নিজের কি বিশ্বাস হয় এসব শুনে?

উত্তর দিলাম না।

ছেলেটি আবার বলল, আপনি কি মনে করেন না উনি পাগল?

উত্তর দিলাম, না, আমি মনে করি না, উনি পাগল।

আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

প্রশ্ন করলাম, তাহলে বল, পাগল তোমার কাকে বলবে?

যে পাগল সে-ই পাগল।

কে পাগল?

পাগলই পাগল।

তরুণেরা উত্তর দিচ্ছে বটে, আমি কিন্তু লক্ষ করছি যে তারা বিহ্বলবোধ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বললাম, তোমরা কিন্তু চরকি ঘোরার মতো ঘুরছো। পাগলকে পাগল বলছ, কিন্তু কে পাগল তা বলতে পারছ না, কেন একটা লোককে পাগল বলবে তা বুঝাতে পারছ না।

হঠাৎ তরুণদের একসঙ্গে চোখ তুলতে দেখে আমিও পেছন ফিরে দেখি দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে পরান মাস্টার।

সে ভেতরে এসে বলল, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি ? আমি ছাড়া তো আপনাদের কোনো কথা নেই। পাগলই বলুন আর যাই বলুন, সবার মাথার মধ্যে বসে আছি তো ? বলেই পরান মাস্টার খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসতে লাগল।

তরুণেরা আমার দিকে ঘুরে তাকাল এবং প্রায় একই সঙ্গে। চোখে যেন একই প্রশ্ন সবার, এখন বলুন এ লোক পাগল নয় তো কি ?

চোখ নামিয়ে নিলাম আমি।

একজন তরুণ বলল, ও মাস্টার সাব এক কাপ চা খাবেন ?

খাওয়াবেন ?

চায়ের সঙ্গে টা-ও খেতে পারেন।

পরান মাস্টার ইতস্তত করে উঠল। বুঝতে পারলাম, এই আতিথ্যের প্রস্তাব সে সরল মনে নিতে পারছে না, তার কিছু একটা সন্দেহ হচ্ছে। পরান মাস্টার বলেই ফেলল, আজ এত খাতির করছেন যে ? অন্য দিন তো পাগল বলে হা-হা করে হাসেন।

বারে বা, আপনি ভুলে গেছেন ? কতদিন আপনি নিজেই চা খেতে চেয়েছেন, খাওয়াই নি আমরা ?

ও হাঁ, তাও তো এক কথা, আচ্ছা, হোক চা। বলে পরান মাস্টার নিজেই উঠে গিয়ে মিষ্টির আলমারির সমুখে দাঁড়াল। দোকানিকে বলল, ভিজে গজা করেন নি, ভাই ? বড্ড ভিজে গজার সাধ হচ্ছিল।

পরান মাস্টার আলমারির কাছে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণ আমাকে হাতে ঠেলা দিয়ে বলল, আপনি যে বলেছিলেন, উনি পাগল কী করে বুঝলাম ? ওঁর গল্প বোধহয় শোনেন নি। বদ্ধ পাগল না হলে কারো মাথায় ওসব কথা আসে না। আমরা পয়লা পয়লা মনে করেছিলোম, মাস্টার সাব বোধহয় মহাতামাক অভ্যেস করেছেন। পরে দেখি না তা নয়, আরো ওপরে উঠে গেছেন।

সকলে চাপা গলায় হেসে উঠল এ কথা শুনে।

পরান মাস্টার হাতের থাবায় দুখানা বালুসাই এনে, বেঞ্চের ওপর পা তুলে বসে, বড় এক কামড়ে একখানা আস্ত উড়িয়ে দিল। আরেকটাতে কামড় দিতে গিয়েও থেমে গেল সে, হঠাৎ সকলের দিকে লজ্জিত হাসি ছুঁড়ে বালুসাইখানা কোমরে গুঁজে রেখে বলল, চান বড়ুর জন্য।

একজন বলল, মাস্টার সাব একে আপনি সেই যে সেই গল্পটা বলেছেন ?

তরুণের চোখের টুসকি দেখেই ধরে ফেলল পরান মাস্টার। বলল, সেইটা তো ?

হাঁ, বলেছেন ?

পরান মাস্টার চোখে সন্দেহ নিয়ে কিছুক্ষণ সবাইকে দেখল, তারপর বলল, না, আপনারা

বিশ্বাস করেন না, এখানে বলব না।

বলুন না, বলুন।

তরুণটি আমার কানে ফিসফিস করে বলল, শুনেই দেখুন যদি আপনি নিজেই পাগল না বলেন তো, কী বলেছি।

বলব ? পরান মাস্টার ইতস্তত করে; একবার তরুণদের দিকে চোখ রাখে, একবার আমার দিকে। বলব ?

হাঁ বলুন বলুন।

মাইরি বলছি, আজ অবিশ্বাস করলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে। রক্তারক্তি হয়ে যাবে। হাঁ।

আমি বড় অস্বস্তিবোধ করে উঠলাম। ভাবলাম, পরান মাস্টারকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই; শেষে একটা গণ্ডগোল না হয়ে যায়।

ঠিক তখনই পরান মাস্টার আমার দিকে হেসে বলল, তাহলে বলি। সেদিন তোকে বলতে গিয়েও বলা হলো না; পিণ্ডি গেলবার জন্যে ছুটতে হলো। শালা এই পিণ্ডির ডাক পড়ল ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত হাত ধুয়ে নড়ে চড়ে বসে।

১০

ধিরি ধিরি মিঠি মিঠি হেসে চলেছে মেয়েটি, আমি আর পালাবার পথ পাইনে। একেবারে নলের ভেতরে বন্দি, মসৃণ ঝকঝকে দেয়াল, নিপাট নিশ্ছিদ্র, দরোজা জানালা কিচ্ছু নেই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নেই, আমি পাগলের মতো ছোটাছুটি করছি। বেরুবার পথ পাইনে, আবার যেদিকেই যাই মেয়েটিকে আড়ালে রাখতে পারিনে— সমুখেই দেখি সে বিছানায় আধো শুয়ে আছে।

আমি তখন অধোবদনে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

কোকিলার মতো সুরেলা গলায় মেয়েটি কথা কয়ে উঠল, পরান, তুমি কি বিরক্ত হয়েছ ?

সেই পুরনো কাণ্ড আর কী। আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেছি, তিনি তাদের গ্রহের হিসেবে বুঝে নিয়েছেন বিরক্ত হয়েছি। মাথা নাড়ালাম। আর সেটাই এক মহাভুল হয়ে গেল। মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে আমার হাত ধরল তখন।

বলল, তাহলে ?

তাকিয়ে দেখি, মেয়েটির মুখে সবুজ আলো খেলা করছে। বুঝলাম লাজে রাঙা হয়েছেন দেবীটি।

কোকিল আবার কথা কয়ে উঠল, আমার নাম তীবয়ু ?

এই বলে হাত ধরে সে আমাকে বিছানার ওপর বসাল। বসতেই হলো কারণ সেই নলের মধ্যে আর কোনো আসবাব নেই, আমারও পা থরথর করে কাঁপছিল; অজানা রমণীর বিছানাতেই আশ্রয় নিতে হলো।

তীবয়ু আমার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি ?

আমি চুপ করে রইলাম অধোবদন বজায় রেখে।

তীবযু আমার চিবুক ধরে বলল, আমার দিকে তাকাতেও তোমার ইচ্ছে করছে না ? আমি কি তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে খুবই কুৎসিত ? তুমি কি জানো এই বীথিপৃতে আমি এবার মিস বীথিপৃ হয়েছি ? তার অর্থ বোঝ ? আমি বীথিপৃর সেরা সুন্দরী। আর সে জন্যেই তানেহাম আমাকে স্মরণ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ যে স্বয়ং তানেহামের একটি পরীক্ষার কাজে আমি লাগতে পারছি। তানেহামের সেবা যে করে সে মহাগৌরবের অধিকারী হয়, তার মুখের প্রতিকৃতি কম্পিউটার যন্ত্রে অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হয়। তোমাদের পৃথিবীতেও তো এই ব্যাকুলতা আছে, মানুষ কৃতী সাধনের চেয়ে আপন মুখের প্রতিকৃতি সংরক্ষণে বেশি যত্নবান হয়। তুমি আমাকে তোমার অবহেলা দ্বারা এই অমরত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে, পরান ?

একটা বিষম দায়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাদের বয়সকালে শিক্ষা পেয়েছিলাম, কখনোই কোনো রমণীর মনে আঘাত দেবে না। আবার এদিকে, আঘাত না দিতে হলে যে কাজ এখন করতে হয়, সেটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পাঁচ সন্তানের পিতা হয়েছি, এখনো আরও দুচারটি জন্ম দিতে পারি, কিন্তু পাপ কখনো করি নি! পৃথিবীতে যা করি নি এই বীথিপৃতে এসে তাই করা যায় ?

আগেই বলেছি, এ গ্রহের ষ্যনুমেরা আবার অপরের মনের কথা পরিষ্কার দেখতে পায়; ভাষায় কিছু বলতে হয় না।

তীবযু বলল, তুমি ইতস্তত, করছ কেন? অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কি তোমাদের পৃথিবীতে অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত নয় ?

হাঁ, তা বটে। তবে দৃষ্টান্তটি অনুমোদনযোগ্য হতে হবে।

অনুমোদনযোগ্য ? কার অনুমোদন ? তোমার।

আমি ইতস্তত করি।

তীবযু আমার দিকে মোহিনী চোখ মেলে বলল, কথা বলছ না, কারণ, তুমি জান তোমার অনুমোদনের কোনো মূল্য নেই। আসলে, পৃথিবীতে সমাজ যা অনুমোদন করে সেটাই আদর্শ, সেটাই অনুসরণযোগ্য, তাই নয় ?

হাঁ, তাই বটে। আমি উৎসাহের সঙ্গে এবার বলে উঠলাম, আমার সমাজ এটা অনুমোদন করবে না, তীবযু। ফিরে গেলে আমি তাদের মুখ দেখাতে পারব না।

কী যে বল। তীবযু ভঙ্গি ধরে বসে রইল, যেন আমি মহামুর্খের মতো একটি কথা বলে ফেলেছি। অচিরে সে আবার আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, আমি সরে বসতে গেলাম, নলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আড় হয়ে পড়লাম, প্রায় আমার গায়ে গা চেপেই তীবযু বলে উঠল, তোমাদের নামি দামি মানুষেরা মুখ দেখায় কী করে ? বিদেশ থেকে ফিরে এসে ?

অর্থাৎ ?

আহ, প্রশ্ন কোর না, পরান। প্রশ্ন করবার দরকার নেই। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি শোন— তোমার সমাজে যে দৃষ্টান্ত আছে, তোমাকে তাই অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে, এর বেশি কিছু নয়। পৃথিবীতে, বিশেষ করে তোমার স্বদেশ বাংলাদেশে এটা নতুন কিছু নয় যে, বিদেশ গিয়ে বিবাহ ব্যতিরেকে যুবতীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। আমরা এমন সংবাদও রাখি যে, তোমার স্বদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদেশে নিতান্ত বুভুক্ষু হয়ে পড়েন, নৈশ মিলন

কেন্দ্রগুলোতে যান এবং স্বদেশে ফিরে এসে বেমালুম তা চেপে যান। তারা যা অনবরত পারেন, তুমি কেবল একটি বারের জন্যে তা পারবে না? তুমি মনে কর না কেন, যে, তুমি বীথিপৃতে নয়, ব্যাংকক অথবা প্যারিসে এসেছে? হ্যাঁ, তুমি ভেবে দ্যাখ, পরান আমি কোনো নতুন কথা তুলি নি। এবং এই সঙ্গে এটাও তোমার ভাবনায় এনে দেই যে, তুমি নিতান্ত স্ফূর্তির জন্যে নয়, এক উন্নত গ্রহের সম্রাটের অনুরোধ রক্ষার জন্যে আমার প্রতি অগ্রসর হবে। তোমাদের পৃথিবীতে তো কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ রক্ষা, যত অন্যায়ই হোক, বড় পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, আর এ ক্ষেত্রে তো একটি গ্রহের সর্বময় প্রভু স্বয়ং অনুরোধ করছেন। হ্যাঁ, তবে তোমার বাংলাদেশে তোমরা বড় সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করে কিঞ্চিত পুরস্কার পাও, এ ক্ষেত্রেও আমি অঙ্গীকার করছি যে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। বাংলাদেশে যেমন সে পুরস্কারটি তোমরা গোপন রাখ, ইচ্ছে হলেই আমাদের পুরস্কারটি তুমি গোপন রাখবে। অথবা প্রকাশ করতে পার, কারণ বীথিপৃতে যে পুরস্কার করতলগত হয়েছে তার দরুন স্বদেশে তোমাকে দুর্নীতি দমন বিভাগে আসামি হয়ে হাজির হতে হবে না। তোমরা তো বিদেশের কমিশন উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে থাক; এবং আমরা জানি, স্বদেশের এহেন উপার্জনের চেয়ে বিদেশের উপার্জন তোমাদের ওখানে বিশেষ সম্মানজনক। তুমি কেন ইতস্তত করছ? এখন দেখতে পাচ্ছ তো, যে, তুমি বস্তুত সমাজের অনুমোদিত পথই অনুসরণ করছ?

আমি ভ্রূ তুলে বসে রইলাম।

তীবযু বলল, তোমাদের মতো আমার ভ্রূ থাকলে আমিও এখন ভ্রূ তুলে তোমাকে দেখতাম যে, তুমি কতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে পার।

আমি ভ্রূ নামিয়ে নিলাম।

তীবযু সেটাকে আমার নরম হবার ইঙ্গিত বলে মনে করল কি-না জানি না; তবে সে রকম মনে করবার কথা নয়, কারণ এরা মনের কথা নিমেষে টের পেয়ে যায়। অথচ তীবযু এখন যা বলল তাতে বোঝা গেল যে সে ধারণা করেছে আমি সম্মত হয়েছি— তবে কি আমিই আমার মন বুঝতে পারছি না?— তীবযু এখন বলল, তবে আর দেরি করে কী হবে? তোমারও ফিরে যাবার আছে। আমিও মিলিত হবার পরই পরীক্ষাগারে দশ মাস দশ দিনের জন্যে প্রবেশ করব। তানেহাম অধীর অপেক্ষা করেছেন। তার বিশ্বাস সৎ পুরুষ দিয়ে যে সন্তানের জন্ম হবে, তার ভেতরে ধর্মবোধ পরিলক্ষিত হবে। তার এই পরীক্ষা যদি সফল বলে প্রমাণিত হয়, আমি আদি মাতা বলে এই বীথিপৃতে স্বীকৃত হব এবং সে পরিস্থিতিতে আমার কেবল প্রতিকৃতিই নয়, আমার ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তিও অমর কম্পিউটার যন্ত্রে সংরক্ষিত হবে; ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কম্পিউটারের বোতাম টিপলেই আমাকে জ্বলজ্যান্ত দর্শন করতে পারবে। তোমাদের পৃথিবীর মতে আমিও ভবিষ্যতে দেবী রূপে পূজিত ভজিত হবার আশা করছি।

তীবযু লীলাভরে আমাকে আকর্ষণ করল। তার কাঁঠালি চাঁপার মতো গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে জোর সামলে নিলাম। তীবযু ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠল।

আমি করজোড়ে বললাম না তীবযু, তুমি আমার দুলির মতো।

দুলি কে?

আমার বড় মেয়ে। বড় দুঃখী মেয়ে। অবশ্য তোমাকেও আমি দুঃখী বলে মনে করছি না। আমি কেবল বলছি যে, তুমি আমার মেয়ের মতো, আমার পক্ষে এ সম্ভবই নয়।

তীবযু তিরস্কার করে বলল, শিক্ষক হয়েও তুমি যুক্তিবিজ্ঞানের কিছুই জান না, দেখছি। মেয়ের মতো আর মেয়ে— এক কথা নয়।

তানেহাম যে কেন পাশের ঘর বলেছিল এবার মর্মে টের পেলাম— এ যে মহা ফাঁদ এবং সেই ফাঁদে পাশবদ্ধ পরান মাস্টার জলেশ্বরী প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার।

তীবযু আবার বলল, চুপ করে থেকো না।

বললাম, মা, তোমাদের তো অজানা কিছুই থাকে না; আমার মনের কথাটি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ; ভাষায় হয়ত একটু গোলমাল করে ফেলেছি; আর এ জন্যে এখন বেশ প্রশংসাও করছি যে তোমাদের এই নীরবে নিঃশব্দে অপরের মনোভাব পড়ে নেয়াটা বড়ই উপযোগী একটা গুণ, তা সে যাক— তুমি নিশ্চয়ই জান যে, তোমাকে মেয়ের মতো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি নিজে যে বুড়ো মানুষ সেইটে জানান।

বুড়ো মানুষ?

হাঁ, বাঙালির পঞ্চাশ হলে আর থাকে কী, মা?

বাজে কথা।

আমি চমকিত হয়ে উঠলাম। আবার কী প্যাঁচ দেয়, কে জানে।

তীবযু বলল, তোমার দেশে পুরুষেরা সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সেও আবার ষোড়শী বিয়ে করছে; জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোর কর্মচারীরা আশি বছরের বুড়োকেও ধরে এনে ভ্যাসেকটমি করে ছেড়ে দিচ্ছে।

আমি অধোবদন হয়ে রইলাম; লজ্জায় নয়, রীতিমতো ভয়ে। আর নিস্তার নেই।

তীবযু তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, ঢং।

আমি একেবারে দেশের স্বাদ পেয়ে থ' হয়ে গেলাম।

কি? রাজি?

মনের খবর এরা রাখে, আমার উত্তর দেবার দরকার নেই। হঠাৎ দৈববাণী হলো, অতিথির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। মনে হলো তানেহামেরই কণ্ঠস্বর। আবার শোনা গেল, প্রায় খেদোক্তি একটি, 'রমণী যে-কোনো সূর্যের যে-কোনো গ্রহের রমণীই রয়ে গেল।' কণ্ঠস্বর উধাও হয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ সুমসুম একটা শব্দ হতে লাগল, তারপর তাও থেমে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো ঘর, ঘর নয়, নল।

নলের মধ্যে আবার সেই আমি আর তীবযু।

তীবযু হেসে বলল, রাগ করো না। নিজেকে বুড়ো ভাবছ, মোটেই তুমি বুড়ো নও। আয়নায় দ্যাখ, তুমি যুবক।

পঁচিশ বছর আগের সেই মুখখানা আবার দেখতে পেলাম নলের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আছে। ধবধবে পাঞ্জাবি পাজামা একেবারে নতুন জামাইর মতো লাগছে দেখতে। নলের প্রতিফলনের পাশে তীবযু মুখ এনে বলল, এতই যদি আপত্তি, নিজের বউ হলে তো আপত্তি নেই?

কথাটি ঠিক ধরতে না পেরে, প্রতিফলন ফেলে মানুষটিকেই সরাসরি তাকিয়ে দেখবার জন্যে যেই মুখ ফিরিয়েছি, দেখি, কোথায় তীবযু ?— বিয়ের কনে চান বড়ু আমার সম্মুখে লাল চেলিতে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পঁচিশ বছর আগের মতো।

১১

হা হা করে হেসে উঠল সারা চায়ের দোকান। লক্ষ করে দেখি দোকান ভর্তি লোক, দোকানের বাইরে লোক, রাস্তা উপচে পড়েছে লোকের ভিড়ে। সকলে ঠা ঠা করে হাসছে।

তরুণ একজন আমার পাঁজরে খোচা দিয়ে বলল, আর সব না হয় বিশ্বাস করা যায়, এক মানুষ কখনো আরেক মানুষ হয়ে যেতে পারে ?

পরান মাস্টার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল, বুড়োকালে রসের ভীমরতি।

হাসির একটা এরাপ্লেন উড়ে গেল যেন মাথার ওপর দিয়ে। আমি পরান মাস্টারের হাত ধরে বললাম, চলুন আপনি চলুন তো এখান থেকে।

আমার হাত প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ফেলে দিয়ে পরান মাস্টার বলল, না। যাব না। কেন যাব ?

আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

আহ, কী করছেন।

চোপ।

আসুন তো আপনি। জনতার দিকে লক্ষ করে বললাম, আর আপনারাই বা কী ? একটা মানুষকে নিয়ে হাসতে পারছেন ?

কে একজন আমাকেই বলে বসল, পাগলের দেখি দোস্ত জুটেছে রে।

হা হা হা। ঠা ঠা ঠা।

চিৎকার করে উঠলাম, চুপ করুন।

হাসির তোড় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পরান মাস্টার তখন ভাঁটার মতো চোখ করে আমাকে বললো, এদের সঙ্গে তুই পারবি না। তুই চুপ করে থাক। বলে সে আমাকে ঠেসে বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিল আবার।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি যে কোথায় আছি তাই এখন আর নিশ্চিত হতে পারছি না। সমস্ত কিছুই ধোঁয়ার মতো ঠেকছে। অন্য জগতের মতো বলে বোধ হচ্ছে। মাথার ভেতর একটি কেবল শব্দ ঘুরছে বোলতার মতো বীথিপৃ, বীথিপৃ।

কী কারণে জানি না, আমি একবার প্রচণ্ড এক অব্যয় ধ্বনি করে উঠলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুখের টেবিলে মাথা রেখে এলিয়ে পড়লাম।

কানের কাছে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, এরও হয়ে গেছে রে।

না! আমি চিৎকার করে উঠলাম।

প্রায় আমারই প্রতিধ্বনি করে উঠল পরান মাস্টার— না! চিৎকার করে সে বেঞ্চের ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; জনতার উদ্দেশে তারস্বরে বলতে লাগল, আমি পাগল ? আমার ভাই

পাগল ? না, দুনিয়া পাগল ?

হা হা হা।

ঠিক শুনেছি কি না, মাথা তুলে দেখি পরান মাস্টারও জনতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হা হা করে হাসছে।

অচিরে পরান মাস্টার বলে উঠল, হাসুন ভাইসব, হাসুন, এই শেষ হাসি হেসে নিন, আর সুযোগ পাবেন না, আর চান্স পাবেন না, আর মওকা পাবেন না।

ফিরিওয়ালাদের মতো এক কথাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দে সুর করে বলে চলল সে। এই শেষ সুযোগ, লাস্ট চান্স, আখেরি মওকা, হেসে নিন ভাইসব।

আমার কেমন সন্দেহ হলো। আমি পরান মাস্টারের হাঁটু ধরে টানলাম নামিয়ে আনবার জন্যে, সে হাঁটু সরিয়ে নিল জনতার উদ্দেশে বলতে বলতে, কেন শেষ হাসি হেসে নিতে বলছি জানেন ? অনুমান করতে পারেন ? ধারণা করতে পারেন ?

জনতা হেসে গড়িয়ে পড়ল আরো একবার।

চায়ের দোকানদার সন্তস্ত্র হয়ে বলল, ভাই, হাত জোড় করি ভাই, আমার দোকানে না, আমার দোকানে না, দোকান খালি করুন, পায়ে ধরি ভাই।

জনতার চাপে দোকানি কোথায় তলিয়ে গেল, কেউ কেউ দোকানির ভঙ্গি দেখেই হেসে খুন।

পরান মাস্টার ধমক দিয়ে উঠল, চোপ, কেউ হাসবে না। সত্যি সত্যি এবার যেন সবাই চুপ করে যায়। খবরদার দোকানে ভিড় করবেন না। গরিব বেচারা চা বেচে খায়, তার বিজনেস নষ্ট করবেন না। বেরোন সব, বেরোন, বলতে বলতে পরান মাস্টার বেঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে নেমে হাত ধরে হাঁচকা টান দিল। আয় কাছারির মাঠে যাই, সেখানে আল্লার দেয়া মাঠ, জায়গার অভাব নেই। আল্লার বিজনেস সেখানে খারাপ হবার ভয় নেই।

তার কথা শুনে জনতা ভারি মজা পেয়ে যায়। আবার তারা হেসে উঠল। এবার পরান মাস্টার তাদের ধমক দিল না, হাসিটাকে সমেত আমাকে টানতে টানতে সে এগিয়ে চলল কাছারির মাঠের দিকে।

মাঠের একদিকে স্পোর্টসের বিজয়ীদের স্যালুট নেবার জন্যে তিন থাকের বাঁধান একটা সিঁড়ি, তারই ভেতরে উঁচুটাতে উঠে দাঁড়িয়ে পরান মাস্টার বলতে লাগল, এতকাল আমার কথায় অবিশ্বাস ? আমাকে পাগল বলে হাসা ? অবিশ্বাস করে অঙ্গভঙ্গি করা ? সব এখন বের হবে। একটা কথা তো এখনো বলিই নি। সেইটে শোন দিকি বাবা সকল, তারপর দেখি অবিশ্বাস কর না বিশ্বাস কর।

কত লোক হবে মাঠে ? একশ ? দু'শ ? দু' হাজার ? পাঁচ হাজার ? আমার মনে হতে লাগল যেন পুরো জলেশ্বরী ভেঙে পড়েছে এখন কাছারির মাঠে।

আর কী বলবে পরান মাস্টার ? আর কোন কথা এতকাল সে বলে নি ওদের ? জনতাও যেন কান খাড়া করে ঘন হয়ে এল আস্তে আস্তে।

মনে আছে ? মনে নেই ? হুঙ্কার দিয়ে শুরু করল পরান মাস্টার। চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, আমি বীথিপৃতে গিয়েছিলাম ? তানেহাম আমাকে একটা অনুরোধ

করেছিল ? মনে নেই ?

জনতা আবার হেসে উঠবার জন্যে তৈরি, কিন্তু হাসিটাকে চেপেচুপে রইল, যেন দেখাই যাক না কী বলে ?

আর সেই কথা মনে আছে ? তীবযু আমাকে বলেছিল, পুরস্কার দেবে ?

হাঁ, হাঁ, মনে আছে, মাস্টার। জনতার ভেতর থেকে আওয়াজ ওঠে।

কী পুরস্কার ? বল দেখি কী পুরস্কার ?

বলুন, বলে যান। টানা একটা ধ্বনি বয়ে যায় কাছারি মাঠের ওপর দিয়ে।

বলব না।

পরান মাস্টার আকস্মিকভাবে ধাপের ওপর বসে পড়ে।

কী হলো মাস্টার কী হলো ?

না বলব না।

কেন ? কেন ?

বললেই তো অবিশ্বাস করবে। পাগল বলবে। পেছন পেছন তাড়া করবে। ছোঁড়া লেলিয়ে দেবে।

না, না, না।

পরান মাস্টার আমাকে বলল, ওদের একটা কথা বিশ্বাস করিসনে। ঐ যে না না করছে, মনে মনে ঠিক তৈরি হয়ে আছে নতুন রগড়ের জন্যে, হাসবার জন্যে, অবিশ্বাস করবার জন্যে। কিন্তু জানে না যা বলব, বিশ্বাস ওদের করতেই হবে।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ পরান মাস্টার আবার লাফ দিয়ে ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে বলতেই লাগল, একটা মেশিন।

কী ? কী ? কী ?

মেশিন, মেশিন যন্ত্র। আশ্চর্য এক যন্ত্র। সেই যন্ত্র আমাকে পুরস্কার দেয় তানেহাম। বড় সাহেবের কাজ করে দিয়েছি না ? তারই পুরস্কার এক আশ্চর্য মেশিন।

হা হা হেসে উঠল জনতা।

হাসো ভাই, হেসে নাও। কী সে মেশিন ? কী কাজ হয় সেই মেশিনে ?

জনতা টিটকিরি দিয়ে উঠল, পাগল তৈরি হয়।

আমি চঞ্চল হয়ে পড়লাম। 'পাগল' শব্দটা না শুনে পরান মাস্টার ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু না, সে নির্মল হেসে উঠল।

বলল, হাঁ পাগল চাইলে পাগলও সেই মেশিন তৈরি করে দিতে পারে। তবে কিছু সময় লাগবে। আমাদের পৃথিবীর হিসেবে তিন বিপল। সেই মেশিনে এখনো প্রাণী তৈরির ব্যবস্থা নেই। বীথিপৃর বৈজ্ঞানিকেরা খুব খাটাখাটি করছে সেই মেশিনে প্রাণীও যাতে তৈরি হতে পারে। তিন বিপল সময় নিয়েছে তারা তানেহামের কাছ থেকে। হাজার হলেও পাগল একটা প্রাণী তো বটে ?

তা বটে তা বটে। হি হি হি।

হ্যাঁ খুব হেসে নাও। লাস্ট চান্স।

বলে যাও, মাস্টার বলে যাও। সেই মেশিনে এখন তবে কী তৈরি হয়?

প্রাণী ছাড়া সব কিছু।

সাইকেল তৈরি হয়?

হয়।

রেল গাড়ি?

খুব হয়।

দালানবাড়ি?

চোখের পলকে।

জনতা এখন পাল্লা দিয়ে একেকটি জিনিসের নাম বলে চলে, আর পরান মাস্টার সায় দিতে থাকে।

হয়, সব কিছু হয়, চোখের পলকে হয়। কীভাবে হয়? সরল একটি থিয়োরি। সবকিছুই অ্যাটমের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়; যেটাই তুমি দেখছো, ভাঙো, ভেঙে যাও, ভাঙতে ভাঙতে এক সময়ে অ্যাটমে গিয়ে ঠেকবে।

ভিড়ের ভেতরে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাটম বোমার থিয়োরি নাকি?

পরান মাস্টার ধমক দিয়ে ওঠে, চোপ মুর্খের দল।

হা হা করে হেসে ভেঙে পড়ে সকলে।

হাসো ভাই, হাসো, শেষ হাসি হেসে নাও অবিশ্বাসীর দল। সেই অ্যাটম হচ্ছে সবকিছুর মূলে, আর সেই অ্যাটম সব ক্ষেত্রে এক। দালানের অ্যাটমও যা, সাইকেলের অ্যাটমও তাই. তোমার দাদির পুরনো ছেঁড়া লেপের মধ্যেও একই অ্যাটম।

হা হা হা।

সেই অ্যাটম ভুলে যেও না, বাবা সকল। বীথিপুর বৈজ্ঞানিকেরা এমন এক মেশিন বানিয়েছে, তার কাজই হচ্ছে অ্যাটম পেলেই অ্যাটম তৈরি করা, হুবহু কপি করা, আসল নকল চেনার উপায় নেই, যতবার চাও ততবার অ্যাটমের কপি উগরে দেবে সেই যন্ত্র।

জনতা একটু মজা পেয়ে যায় মনে হলো। ধ্বনি শোনা যায় তারপর?

যন্ত্রটির আবার এমন বাহাদুরি অ্যাটম পেলে শুধু অ্যাটম কপি করছে তাই নয়। যন্ত্রের সম্মুখে যে জিনিস ধরে দেবে নিজের ভিতরে তৎক্ষণাৎ সেটা বিশ্লেষণ করে অ্যাটমের অনুবাদ করে ঝপাঝপ অ্যাটম বানিয়ে অবিকল সেই রকম আর একটা জিনিস হাজির করে ফেলবে চোখের পলকে। সমুখে জিনিস, পেছনেও আরেকখানা সেই রকম জিনিস হাজির।

মাথার ওপর চড়া রোদ, দর দর করে ঘাম পড়ছে পরান মাস্টারের খোলা গা বেয়ে; বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। চোখ লাল, ঠোঁটের দুপাশে গ্যাঁজ দেখা দিয়েছে, হাতের জিগার ডালখানা পর্যন্ত ভেঙটি সাপের মতো মনে হচ্ছে।

ঠা ঠা ঠা।

চোপ। কথা শেষ হয় নি। এখন চিন্তা করো সকলে। আশ্চর্য মেশিনের কথা চিন্তা করো।

তুমি চিন্তা করো মাস্টার।

দূর শালা পাগল।

একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে।

পায়ে শিকল দিয়ে রাখতে হয়।

এই রকম মন্তব্য করতে করতে জনতা পাতলা হবার উদ্যোগ নেয়, সরে পড়তে শুরু করে দু একটা ছোড়া ঢিল ছোঁড়ে পরান মাস্টারের উদ্দেশে।

আমি বেগতিক দেখে পরান মাস্টারের হাত ধরে টান দিয়ে বলি, খুব হয়েছে আসুন।

না। আবার গর্জন করে ওঠে পরাণ মাস্টার। জনতার উদ্দেশে বলে, খুব হাসি না ? বিশ্বাস হয় না ? তবে শোনো, আমি নিজে সেই মেশিন পরীক্ষা করে দেখেছি। সেই মেশিনের সামনে ধান ধরে দিলে ধান হয়, চাল ধরে দিলে চাল হয়।

সচল জনতা হঠাৎ থেমে যায়।

একদানা চাল ধরে দাও সামনে, যতক্ষণ সুইচ টিপে রাখবে, পেছনে অনবরত চালের দানা বেরুতে থাকবে। পাহাড় হয়ে যাবে চালের পাহাড়।

জনতা ফিরে তাকায় পরান মাস্টারের দিকে।

ডাল ধরে দাও। অড়হরের ডাল, ছোলার ডাল, মুগ ডাল, পেছনে ডালের পাহাড়। স্তূপাকার। এত ডাল যে চণ্ডি বাবুর গুদামেও ধরবে না।

জনতা হা করে তাকিয়ে থাকে বক্তার দিকে।

নুন ধরে দাও, নুন বেরিয়ে পাহাড়, তেল ধরে দাও, খাঁটি সরষের তেল, তেলের প্রশান্ত মহাসাগর।

জনতা খোদিত মুর্তির মতো স্থির।

আমিও স্থির— পরান মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে।

পরান মাস্টার এই প্রথম টিটকিরি দিয়ে ওঠে জলেশ্বরীর মানুষদের— এতকাল যারা তাকে টিটকিরি দিয়েছে এখন সে তাদেরই খোঁচা দেয় নিষ্ঠুরভাবে, কি, হাস ? পাছার কাপড় তুলে হাস ভাইসব। হাসি নাই ? ফুরিয়ে গেছে ? সব শেষ ? কী হলো ?

জনতা অপরাধীর মতো মাথা নামিয়ে নেয় এক সঙ্গে।

পরান মাস্টার আবার উদাহরণ হাজির করতে থাকে, আলেকজাণ্ডার নব্বুই সুতার পাবনার লুঙ্গি মেশিনের সামনে ধর, হাজার হাজার লুঙ্গি; টাঙ্গাইলের বাহারি পাছাপাড় শাড়ি, দ্রৌপদীর দেহ থেকে শালা দুঃশাসনের বাপও কোনোদিন সে শাড়ি টেনে শেষ করতে পারবে না। কী মিয়ারা ? হাস না যে ? বিশ্বাস হয় ? এখন বিশ্বাস হয় ?

জনতা যেন কাতর চোখে অনুনয় করে ওঠে পরান মাস্টারকে। কীসের অনুনয়, আমি শনাক্ত করতে পারি না।

আমার নিজের মাথার ভেতরটাই কেমন গোলমাল বোধ হচ্ছে এখন।

আর হাঁ, ঘি, মশলা, পোলাওয়ের চাল, জাফরান, ভালো জর্দা, পান, মুখ সেঁকা বিড়ি, কাঁচি মার্কা সিগারেট, পেটেন্ট লেদারের এক নম্বর পাম্পস্যু।

আমি কি নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছি ?

পরান মাস্টারের কণ্ঠস্বর গমগম করতে থাকে।

রুপার হাঁসুলি, সোনার চন্দ্রহার, বোলাক নথ, কান পাশা, মাকড়ি, দুল, টু-ইন-ওয়ান, ক'টা টু-ইন-ওয়ান চাই ? ক'হাতে ক'টা ঝোলাতে চান বাবা সকল ?

আমি চোখের সমুখে সব ধোঁয়া দেখি।

উজির নাজিরকে ছুটে আসতে দেখি। ভিড় ভেঙে তারা ছুটে আসছে, মানুষগুলো যেন পাথর— তাদের সরাতে বড় কষ্ট হচ্ছে দুভাইয়ের, তারা চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে আসছে, বাবা, বাবা।

পরান মাস্টার বলে চলেছে, সরু চাল, মোটা চাল, লাল চাল, আঁলো চাল, মুগ ডাল, মুশরি ডাল, পাটনাই বুট, মটর ডাল, সরষের তেল, লাল লংকা, পাঁচফোড়ন, আলু আলু, পাটল পটল, কপি কপি, ফুল কপি, বাঁধা কপি, ভিজে গজা, জিলিপি।

উজির নাজির প্রায় কাছে এসে পড়েছে; আমিও এগিয়ে যাই; তিনজনে এক সঙ্গে নিশ্চয়ই জাপটে ধরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব।

কিন্তু তার আগেই পরান মাস্টার হঠাৎ লুঙ্গির গেরো টান মেরে খুলে ফেলে লাফ দিয়ে নেচে উঠল।

হা হা। করো অবিশ্বাস, করো, আরো করো, আরো আমাকে বলো পাগল।

আমরা তাকে ধরে ফেলবার আগেই পরান মাস্টার হাতের লাঠি রাজদণ্ডের মতো বুকের ওপর আড় করে ধরে ছুট দেয়। তার বীথিপৃর ভাষায় সে চিৎকার করে বলতে বলতে সড়ক ভেঙে চলে যায়। রালাশা সশ্বাবি ছেরেক। তোইবেরক টেপে রোকা নাদা যেইনে। তষ্যবিভ লিঝুলিকা।

পুরো জলেশ্বরী জুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে বীথিপৃর ভাষায়, তষ্যবিভ লিঝুলিকা, তষ্যবিভ লিঝুলিকা, তষ্যবিভ লিঝুলিকা।

অন্য এক আলিঙ্গন

বাংলাদেশে এ দু'টো কোনো অপরাধই নয়, এ দু'টো নিয়ে কাউকে অপরাধী করলে বাঙালি তার স্বদেশে অভিযোগকারীকেই পাগল বলে সনাক্ত করবে, অথবা হেসে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু লন্ডনে এর যে-কোনোটির জন্যে পুলিশের পাল্লায় পড়তে হবে— যেখানে সেখানে জলভারমুক্ত হওয়া এবং অনিচ্ছুক তরুণীকে প্রেম নিবেদন করা।

লন্ডনে এসে এই পাঁচ বছরে আন্দালিব খান নিজেকে এখন অ্যান্ডি কাহান বলে পরিচয় দেয়, জলভারমুক্ত হবার জন্যে গণ-শৌচাগার সে এখন দিনের বেলায় খোঁজে, রাত অধিক হলে এবং পথ নির্জন হলে অতটা ধৈর্য না ধরে টেলিফোন বুথে ঢুকে কাজ সারে, অন্তত এ ব্যাপারে পুলিশের সম্ভাবনা সে এখন এই পাঁচ বছরে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিতে এখনো সে বাঙালিই রয়ে গেছে।

তাই, জাহানারা সাদুল্লা টেলিফোন ছেড়ে দিলেও, আন্দালিব আবার তাকেই ফোন করে। পাবলিক ফোনের ফোকরে দু'পেনি পয়সা রেখে সে ডায়াল করে এতটুকু ইতস্তত না করে। অপর প্রান্তে রিং হচ্ছে, যে মুহূর্তে অপর প্রান্তে রিসিভার তুলবে, পোষা ডাহুকের মতো শব্দ করে উঠবে ফোন, দু'পেনির পয়সাটি তখন ফোকরে ঠেসে দিলেই লাইন এসে যাবে। লাইন যখন সে পেয়ে যাবে, আর নতুন কী বলবে আন্দালিব ?

সে অপেক্ষা করে।

পোষা ডাহুকের মতো ডেকে চলে ফোন, অর্থাৎ অপর প্রান্তে ফোন তোলা হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পয়সা ঢুকিয়ে দিতে গিয়েও দেরি করে আন্দালিব। অপর প্রান্তে যখন ফোন তুলেছে জাহানারা সাদুল্লা, তখন কি আন্দালিবের সেই আগুন আর নেই ? হঠাৎ নিবে গেছে ?

এক্ষুণি পয়সা গুঁজে না দিলে অপর প্রান্তে ধারণা করে নেবে যে, এ প্রান্তে পয়সা গুঁজে দিতে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হচ্ছে, ফোন হয়তো বিকল হয়ে গেছে, তখন ফোন নামিয়ে রাখবে এবং ফোনের কাছেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। এরকম হলে, মানুষ অন্য ফোন থেকে আবার চেষ্টা করে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অপর প্রান্ত ফোন রেখে দেয়।

সেই যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অপর প্রান্ত, তাতেই আন্দালিব ছোট একটি আনন্দ অনুভব করে যে, জাহানারা অন্য কারো ফোন মনে করেছে, আন্দালিবই যে আবার রিং করেছে তা ভাবতে পারে নি, নইলে হয় ফোন তুলতই না, অথবা তুলে অতক্ষণ অপেক্ষা করত না। কিন্তু তার খুশি পরমুহূর্তেই ঈর্ষার ছোবলে নীল হয়ে যায়। জাহানারা কি অন্য কারো ফোনের অপেক্ষা করছে ? আন্দালিবের সন্দেহ ঘন হয়ে আসে, তার মনে পড়ে যে, তার সঙ্গে কথা বলবার সময় জাহানারার কণ্ঠে এবং শ্রবণে বড় ধৈর্যের অভাব ছিল এবং সেটা যে সবটাই তাকে প্রত্যাখ্যান করবার প্রেরণায় তা এখন আর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।

আন্দালিব আবার ফোকরে পয়সা গুঁজে দেয় এবং দ্রুত আঙ্গুলে ডায়াল করে; অপর প্রান্ত ফোন তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সা ঠেসে দেয় এবং সাড়া না দিয়ে নীরব হয়ে থাকে।

দেখাই যাক না, সাড়া না পেয়ে জাহানারা সাদুল্লা কারো নাম ধরে ডেকে ওঠে কিনা। যদি কারো ফোন করবার কথা থাকে, সময় আন্দাজে ফোনটা এসেও যায়, অনেক সময় মানুষ তো ফোন তুলেই ব্যক্তিটির নাম উচ্চারণ করে বসে।

আন্দালিব নীরব থাকে; অপর প্রান্তেও নীরবতা এবং সেই নীরবতা এ প্রান্তে ভেসে আসে।

আন্দালিবের ভ্রু হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে আসে; ফোন জাহানারা সাদুল্লাই কি ধরেছে ? না, ফ্ল্যাটের অপর কেউ ? অপর কেউ কে হতে পারে ? আন্দালিব কখনো জাহানারার ফ্ল্যাটে যায় নি বললে পুরো বলা হয় না; জাহানারাই কোনোদিন তাকে সেখানে নিয়ে যায় নি, আন্দালিব যেতে চেয়েছে, জাহানারা অসম্মতি জানিয়েছে প্রতিবার। ফোন করে আন্দালিব কখনো একটি নারী কণ্ঠ, কখনো একটি পুরুষের ধূসর কণ্ঠ পেয়েছে। জিগ্যেস করে আন্দালিব শুধু এই উত্তর পেয়েছে যে, ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের।

তারা কে ?

তারা হয় ব্যক্তি। ব্যক্তিবৃন্দ। ইংরেজিতে জাহানারার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

অপর কোনো বর্ণনা নাই ?

তোমার কৌতূহলি হইবার কোনো আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

জাহানারা এখন অপর প্রান্ত থেকে নিরপেক্ষ গলায় উচ্চারণ করে, হ্যালো।

আন্দালিব সাড়া দেয় না।

জাহানারা আবার সরব হয়, হ্যালো-ও-ও।

কণ্ঠের সেই ঈষৎ তরঙ্গ এসে আন্দালিবের রক্ত মথিত করে তোলে। সে ঘন নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে, বিবি।

জাহানারা সাদুল্লাকে তার বাবা ঢাকা থেকে এনে ভর্তি করে দিয়ে যান লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে জাহানারা সাদুল্লা নামেই। তার একটি ডাক নাম আছে, 'ছবি'। বাংলা এই শব্দটি নিয়ে হুল্লোড় পড়ে যায় সহপাঠীদের ভেতরে, কারণ, ছবির উচ্চারণ বিদেশী জিহ্বায় 'চাবি' হয় এবং ইংরেজিতে 'চাবি' শব্দটি গোলগাল নাদুস নুদুস বাচ্চাদের বেলায় বেশি ব্যবহৃত হয়, বড়দের বেলায় সেটি ব্যাংগের মতো শোনায়। অতএব একদিন জাহানারা নিজেই নামটিকে অন্তর্ধ্বনি রক্ষা করে 'বিবি' বানিয়ে নেয়; তার আগে কেউ কেউ তাকে বলেছিল যে, অভিনেত্রী বিবি অ্যান্ডারসনের সহিত তোমার মুখচ্ছবির আশ্চর্য সাদৃশ্য তুমি কি অবগত আছো ? সম্ভবত এই পর্যবেক্ষণটিকে কাজে লাগায় জাহানারা।

আন্দালিবের কণ্ঠস্বর পেয়ে বিবি সাডুলা থমকে যায়। ক্ষণকালের নীরবতার ভেতরে সে প্রথমে বিরক্ত হয়, পরে ক্রুদ্ধ হয় এবং অবশেষে নিজেকে সংযত করে নেয়। অত্যন্ত ধীরে, শান্ত ও নিচু গলায় বিবি বলে, ও অ্যানডি।

আশা হয় অ্যানডি কাহনের। সে আবার বলে, যেন বিবির কণ্ঠের সঙ্গে ঐকতান সৃষ্টি করে, কোমল স্বরে, বিইবি।

হঠাৎ ফেটে পড়ে বিবি সাডুলা।

অ্যানডি, তুমি হও একটি গাভী, তুমি হও একটি নির্বোধ গাভী, সেই নিমিত্ত পিতার প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা টেলিফোনের গহ্বরে নিঃশেষ করিতেছ।

আন্দালিব শুকনো গলায় বলে, নিশ্চয়ই তোমার আশেপাশে ফ্ল্যাট বাসিন্দাদের কেহ রহিয়াছে। তিরস্কার করিতে হয়, বংগভাষায় কর।

হাঁ। বিবি সাডুলা সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ একটি হাসি পাঠিয়ে টেলিফোনের ভেতরে বলে, বংগভাষা অনুরোধ করিতেছ এবং উহা বংগভাষাতে নয়। শ্রবণ কর, আমি তোমাকে

ভালোবাসি না এবং কখনো ভালোবাসিব বলিয়া স্বপ্নেও দেখি না।

কাউকে ভালোবাস?

কী? কী উচ্চারণ করিলে?

অপর কাহাকেও ভালোবাসিয়াছ কি?

উত্তর দিতে বাধ্য নহি। এবং আমার পিতার বন্ধু পুত্র বলিয়া তোমাকে এখনো শান্তকণ্ঠে কহিতেছি, ব্যক্তিগত প্রশ্ন উত্থাপন করিও না। আশা করিতেছি, অতঃপর তোমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিবে। এবং বিদায়।

আবার এক তরফা টেলিফোন রেখে দেয় বিবি।

আন্দালিব সশব্দে রিসিভার রেখে দেয়, যেন এই উত্তাপটুকু তারের ভেতর দিয়ে বিবি সাডুলার কানে পৌঁছুবার কথা।

আজ শনিবার এবং ছুটির দিন। আন্দালিবের অবশ্য সপ্তাহের প্রতিটি দিনই এখন ছুটির দিন, এখন অর্থ, আজ দু'বছর থেকে, যেদিন থেকে সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। একেবারে ছেড়ে দিয়েছে বললে ভুল হবে, বাণিজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত একটি কোর্সে নাম লিখিয়েছে বছর খানেক আগেই, হুন্ডি মারফত দেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন তার পিতা এবং ক্রমাগত তাকে সে আশ্বাস দিয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও যে অচিরেই সে পরীক্ষা দেবে, দেশে ফিরে আসবে, পিতার ব্যবসায়ে যোগ দেবে। আজ আন্দালিবের ইচ্ছে ছিল, যে করেই হোক বিবির সঙ্গে দেখা করে, আবার জলসেচ করে দ্যাখে পাতা সবুজ হয়ে ওঠে কিনা।

বিবি সাডুলা তাকে নির্বোধ গাভী বললেও বিবি নিজেই জানে যে অ্যানডির ব্যাপারটা নিতান্ত এক তরফা নয়; বছর দু'য়েক আগে সে যখন লন্ডনে আসে তখন আন্দালিব খানই তার একমাত্র বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক ছিল।

মেয়েকে নিয়ে সাদুল্লা সাহেব উঠেছিলেন তাঁর বন্ধু, কৈশোর জীবনের বন্ধু, ডাঃ মজুমদারের বাড়িতে; বন্ধুর সঙ্গে আগে থেকেই চিঠিতে কথা হয়েছিল, আগের বছর জাতিসংঘের এক সম্মেলনে যোগ দেবার পথে লন্ডনে নেমে বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি স্থিরও করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করবে জাহানারা।

বন্ধুকে বলেছিলেন সাদুল্লা— ভাই, একটু চোখ রাখিস, শত হোক বাঙালির মেয়ে, মুসলমানের মেয়ে, ইংরেজও নয়, খ্রিষ্টানও নয়। একবারে লাগামছাড়া না থাকে।

ডাঃ মজুমদার টনিক সহযোগে জীন পান করছিলেন, বিষম খেলেন হঠাৎ।

লাগামছাড়া মানে?

সাদুল্লা সাহেব হঠাৎ বুঝে উঠতে পারেন না যে, তাঁর বন্ধুটি বিশ বছর লন্ডনে বাস করে বাংলা ভুলে গেছে বলেই শব্দার্থ জানতে চাইছে, না, আশংকাটি বিস্তৃত করে বলবার জন্যে প্রশ্নের ছদ্মবেশে অনুরোধ করছে। ডাঃ মজুমদার ইংরেজ বিয়ে করেছেন। গোড়ার দিকে যে হাসপাতালগুলোতে তিনি কাজ করেছেন তারই একটিতে এক নার্সের সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক হয়। এরকম পরিস্থিতিতে অনেকেই পড়ে, কেউ বিয়ে করে, কেউ করে না, তাঁরও ঈষৎ ইচ্ছে ছিল একাধিক বাজিয়ে দেখে একটিতে স্থির হন, শ্বেতাংগিনী বিয়ে করবেন এ

তাঁর সিদ্ধান্ত করাই ছিল, কেবল পাত্রী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অপেক্ষা, তাঁর বেলায় রমণীটি ছিল পটিয়সী এবং চাঁদ ও নক্ষত্র সম্পর্কে নিতান্ত বিজ্ঞানবাদী, অতএব একেই জীবন সংগিনী করে নিতে হয়; বন্ধুরা অবশ্য বলে থাকে তিনি বাধ্য হন। চমৎকার সংসার করছেন তিনি স্ত্রীর প্ররোচনায় চিকিৎসা শাস্ত্রে বড় ডিগ্রি নেবার কষ্ট ও দীর্ঘকাল অপেক্ষা ত্যাগ করে, কম আয়াসে অধিক অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেন, অর্থাৎ জিপি হন, যার পুরো বর্ণনা জেনারেল প্র্যাকটিশনার, বাংলায় অনুবাদ করা যায়, পাড়ার ডাক্তার। ষোল বছর ইংরেজের ঘর করে, আজ চৌদ্দ বছর দু'বেলা ইংরেজ রোগী দেখে দেখে বাংলা ভুলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়; অতএব সাদুল্লা সাহেব গলা পরিষ্কার করে গোড়া থেকেই শুরু করেন।

আমি বাঙালি, আমার স্ত্রী বাঙালি, আমার মেয়ে বাঙালি ঘরের মেয়ে। তাকে লন্ডনে এনেছি লেখাপড়ার জন্যে, মেম সায়েব করবার জন্যে নয়। আমার নিজের ইচ্ছে ছিল না, ছবিকে এ দেশে আনি, আমার সে সংগতিও নেই, নিতান্ত তার মায়ের অনুরোধেই রাজি হতে হলো।

ঈষৎ ভ্রু তোলেন ডাঃ মজুমদার। দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করছেন, আর কিছু না হোক মনোভাব গোপন করাটা ঘৃণা করতে শিখেছেন।

তিনি প্রশ্ন করেন, সংগতি নাই কী বলিতেছ ? এ শংকাও তিনি গোপন করেন না যে, জাহানারার ব্যয় শেষ পর্যন্ত না তাকেই বহন করতে হয়। তিনি যোগ করেন, শুনি যে একমাত্র উচ্চশিক্ষা ভিন্ন কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রা তোমাদের সরকার দিতে চাহে না। কিছু মনে করিও না, আমার শংকা হইতেছে। মুদ্রা প্রেরণের কী ব্যবস্থা করিয়াছ ?

সতর্ক গলায়, স্বদেশ থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে থেকেও নিচু গলায় সাদুল্লা সাহেব উত্তর দেন, ব্যবস্থাটি কিঞ্চিত সড়ক বহির্ভূত বটে। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, মুদ্রা নিয়মিত পৌঁছিবে। উত্তম হইত, যদি তুমি দেশে পাউন্ড প্রেরণ করিতে, আমি দেশে টাকায় দিতাম, তুমি সমপরিমাণ মুদ্রা আমার কন্যাকে দিতে।

হাঁ, নিজেই চলিতে পারি না। ডাঃ মজুমদার সংক্ষিপ্ত হেসে বলেন, দেশে পাউন্ড পাঠাইব ?

সাদুল্লা সাহেব বলেন, যাকগে, যে কথা বলছিলাম, মেয়েটার কথা, ওর মায়ের চাপাচাপি ঠেকাতে না পেরে লন্ডনে দিয়ে গেলাম। ওর মা'র কথা, ঢাকায় থাকলে লেখাপড়া হবে না, বাজে ছেলের সঙ্গে মিশবে, বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোনোদিন কেউ ছিনতাই করবে। তুমি স্বীকার করবে, জাহানারা সুদর্শনা বটে।

হাঁ, আকর্ষণীয়া।

তবেই বুঝে দ্যাখো, ভাবনা হবে না কেন ? আবার বাংলায় ফিরে যান সাদুল্লা সাহেব। লন্ডনের জীবন টীবন তো আবার আরেক ধরনের, সে জন্যেই তোমার ঘাড়ে এই দায়িত্ব চাপানো।

দায়িত্ব হামেশার জন্যে চাপিয়ে দিলে তো মুশকিল, আমি আগেই বলেছি। আমি তো চার পাঁচ বছর আমার কাছে রাখতে পারব না। বলতে বলতেই ডাঃ মজুমদারের খেয়াল হয় বারবারা পাশেই রান্নাঘরে কাজ করছে, কথাটা তার শুনে রাখা দরকার। তাই ডাঃ মজুমদার বলে ওঠেন, তুমি হও প্রাচীন বন্ধু, সেই বন্ধুত্বের সম্মান রক্ষার্থে প্রথম কয়েক মাস তোমার কন্যাকে অবশ্যই এই গৃহে স্থান দিতে আমরা সম্মত। তোমার কন্যা নগরী সম্পর্কে পরিচিত

হইয়া উঠিলেই আমি নিজে তাহাকে বাসস্থান খুঁজে দিব, নিয়মিত খোঁজ খবর লইব. আশা করি তুমি অনুভব করিবে যে, আমি এখনো প্রাচীন বন্ধুত্ব স্মরণে রাখিয়াছি এবং বন্ধুর নিমিত্ত কিছু করিতে সদা প্রস্তুত।

বাংলাতেই বলেন সাদুল্লা সাহেব, যখন যেখানেই থাক, তুমি মেয়েটার দিকে দৃষ্টি রেখো ভাই, এই অনুরোধ। এখানে অনেক রকম শুনি, মেয়ে বলেই ভাবনা হয়, পাছে না মেয়েকে হারাই।

ডাঃ মজুমদার অস্বস্তি বোধ করেন। সাদুল্লা বাংলায় কথা বললে তিনি তার প্রতি বিরক্ত বোধ করেন; কারণ, রান্নাঘর থেকে বারবারা মনে করতে পারে যে, তার অবোধ্য ভাষায় সাদুল্লা কোনো অতিরিক্ত অনুরোধ করছে এবং তার স্বামী তা মেনে নিচ্ছে।

অতএব, ডাঃ মজুমদার সাদুল্লার কথাগুলো কৌশলে অনুবাদ করে বলেন, তুমি বলিতেছ, তোমার কন্যার শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখিতে। হাঁ, ইহা বর্তমানে একটি অবাধ বন্ধুত্বের যুগ বটে, তুমি ভাবনা করিও না; কন্যা নিজেই নিজের যত্ন লইতে পারিবে, আমরাও দৃষ্টি রাখিব বৈকি।

আরো একটি কথা। আমার এক বন্ধু, তুমি চিনবে না, তার ছেলে এখানে আছে, পড়াশোনা করছে, জাহানারার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়— আমারও ইচ্ছে, ছেলের বাবারও খুব আগ্রহ। ছেলেটির নাম আন্দালিব, তার ঠিকানা এনেছি, তোমার সঙ্গে এনে আলাপ করিয়ে দেব। তুমি শুধু চোখ রেখো, ঐ ছেলেটি ছাড়া আর কেউ যেন ছবির সঙ্গে মেশামেশি না করে। তোমাকে সব খুলেই বলে গেলাম।

রান্নাঘরে বারবারার সঙ্গে টুকিটাকি সাহায্য করছিল জাহানারা. তার এক দিকে যেমন লজ্জা করছিল, আরেক দিকে তেমনি রাগ হচ্ছিল বাবার ওপর। এত ভাবনা কেন তাকে নিয়ে? সে কি ছেলেমানুষ?

ফোন নামিয়ে রেখে বাথরুম ঘুরে আসে বিবি সাডুলা; প্রয়োজন ছিল না, তবু যায়, কারণ সেই মুহূর্তে ঘরে যাবার পা ইতস্তত করছিল তার। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে প্রতিফলিত চেহারায় সে লক্ষ করে বিষণ্নতা এবং চমকিত হয়ে ওঠে; সে তৎক্ষণাৎ ঠোঁট প্রসারিত করে এবং হাসিশূন্য হাসির বিস্তার নিজের দিকে বাজিয়ে দ্যাখে; দু'হাতের দুই তর্জনী দিয়ে ঠোঁটের দু'পাশ নিচে টেনে নামায় এবং ছেড়ে দেয়; গাল ফিরিয়ে হঠাৎ বাঁ গালে দাঁতের নীলাভ দাগ লক্ষ করে এবং ভ্রু কুঞ্চিত করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্যাখে। তারপর ঘরে ফিরে এসে ঝুপ করে সোফায় বসে পড়ে।

তার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে জনাথান বলে, দূরে বসিলে যে?

হাঁ।

আমি নিতান্ত শীতবোধ করিতেছি।

হাঁ।

হাঁ এবং হাঁ। ইহা ভিন্ন উচ্চারণ নাই? আমাকে পুনরায় আবৃত করিয়া বল. হাঁ। পুনরায় চুম্বন দিয়া বলো, হাঁ। পুনরায় স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া, আইস আমরা উভয়ে বলি, হাঁ।

বিবি সাডুলার পরণে ছিল পাতলা কামিজ. নিচে কিছুই নয়. তার ওপরে জড়িয়ে নিয়েছিল

খোপ কাটা খাটো একটা হালকা কম্বল, ফোন ধরতে যাবার সময় জনাথান কম্বল ধরে টান দেয়, বস্ত্র হাতে আসে তার, ব্যক্তি আসে না।

জনাথান এতক্ষণ কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল, সে এবার ঘুরে উঠে দু'হাতে বিবিকে আকর্ষণ করে বলে, কেহ ফোন করিল, বিবির মন খারাপ হইল। বিবি বিষণ্ন হইল, বিশ্ব বিষণ্ন হইল।

তখন হেসে ওঠে বিবি।

হাঁ, বিবি হাসিল, জনাথান সংগীত শ্রবণ করিল।

তবে, সেই সংগীত রুদ্ধ হইল।

সংগীত রুদ্ধ হইল, জনাথান যন্ত্র হাতে লইয়া সংগীত করিতে লাগিল।

কম্বলের ভেতরে বিবি সাডুলাকে আকর্ষণ করে জনাথান ফিসফিস করে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি আবার বল।

তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি আবার বল।

আমি আবার বলিব, এবং উভয়ভাবে বলিব, ক্রিয়া এবং উচ্চারণে বলিব।

২

বিবিকে নিয়ে কিছুদিন থেকেই উড়ো খবর পাচ্ছে আন্দালিব; আজ সকালে জেদ করে বেরিয়েছিল বিবির সঙ্গে দেখা করেই ছাড়বে। কারো বাড়িতে টেলিফোন করে না যাওয়াটা এখানে নিতান্ত অসামাজিক বলেই, আন্দালিব ফিন্সবারি পার্কে বাস থেকে নেমে, এখান থেকে আরেকটা বাস নিয়ে মাইলখানেক গেলেও বিবির ঠিকানায়, বাস ডিপোর পাশে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করেছিল।

এখন সে একটা ক্রুদ্ধ অনিশ্চয়তার ভেতর দোল খেতে থাকে। এমন কী সে অবজ্ঞার বস্তু হয়ে গেল বিবির কাছে ?— সেই বিবির কাছে যে আন্দালিবকে এক শনিবার না দেখলে, তার সঙ্গে দিনে অন্তত একটিবার ফোনে কথা না বললে অস্থির হয়ে যেত ?

যাবে নাকি সে বিবির ঠিকানাতেই ? গিয়ে দরোজায় ঘা দেবে ? একবার গিয়ে পড়লে দেখাই যাক না মেয়েটি কী করে ?

আন্দালিব লম্বা লম্বা পা ফেলে পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে; কোন দিকে হাঁটছে, কোনো পরোয়া নেই। সে হাঁটছে, এই এখন সত্য।

শনিবারে শপিংয়ের ভিড়। সপ্তাহের বাজার করে নেবার জন্যে পাড়া ভেঙ্গে পড়েছে দোকানগুলোতে। আন্দালিব রীতিমতো সুস্থতার সঙ্গে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দ্যাখে, বিবিকে শারীরিকভাবে আঘাত করা তার উচিত কিনা ? গোটা কয়েক ভারী ওজনের থাপ্পড় ? লালছে করে রাখা ফাঁপানো চুল ধরে এলোপাতাড়ি টান ? ঢাকা হলে তো কথাই ছিল না, কবে হাওয়া করে ফেলত বিবিকে।

আন্দালিব থেমে যায়। অকস্মাৎ ব্যস্ত সড়ক, বাড়ি-ঘর, লাল বাস, সুপার মার্কেট তার কাছে

অচেনা বোধ হতে থাকে এবং এ সবের ভেতরে তার উপস্থিত থাকবার বিষয়টা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। নিতান্ত প্রবাসী বলে সে এখন অনুভব করে ওঠে নিজেকে। প্রবাসী এবং অসহায়। নখ ছাঁটা পশুর মতো চিড়িয়াখানায় সে এবং তার চারদিকে অগুনতি দর্শক।

অদূরে লাল রঙ; আরেকটি টেলিফোন বুথ। সম্মোহিতের মতো আন্দালিব সেদিকে অগ্রসর হয়। সে জানে কী করছে এবং সে জানে না সে কী করতে যাচ্ছে। সে বুথের ভেতরে ঢুকে, কাচের দরোজা বন্ধ করে একটি সিগারেট ধরায়, যেন সিগারেট ধরাবার জন্যেই তার এই ঘেরা টোপের ভেতরে আসা। হঠাৎ সে লক্ষ করে বুথের বাইরে কাচের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে আফ্রিকান এক তরুণ। তার দিকে চোখ পড়তেই তরুণটি শুভ্র দাঁত মেলে চোখের তারা ওপরে তোলে; ভঙ্গিটি খাস বিলেতি, অর্থাৎ ঈশ্বর জানেন তুমি কত সময় নেবে, আমি ফোনটি ব্যবহার করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। ইংরেজ হলে দাঁত না বের করেই ভঙ্গিটি করত। আফ্রিকান বলেই হতাশার সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিটুকুও ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

দ্রুত ডায়াল করে আন্দালিব। বিবির নম্বরই ডায়াল করে। শঙ্কা হয়েছিল, ফোন ব্যস্ত থাকবে বিবির, কিন্তু না, মুক্ত ফোনের ধ্বনি বাজতে থাকে।

এবার অনেকক্ষণ পরে অপর প্রান্ত ফোন তোলে। সঙ্গে সঙ্গে পয়সা গুঁজে দেয় আন্দালিব; লাইন পরিষ্কার হয়ে যায় কিন্তু অপর প্রান্ত এবার প্রথম সাড়া দেয় না।

আন্দালিব বলে, হ্যালো, বিবি ?

অ্যানডি, পুনরায় ?

হাঁ, অ্যানডি এবং পুনরায়।

নিঃশ্বাস ফেলে বিবি উচ্চারণ করে, যেন একটি শিশুর আবদার বহুক্ষণ ধরে শোনবার পর তাকে সে অনুমতি দান করে, উত্তম, কী বলিতে চাও ?

প্রথমত ইহাই যে, তোমার কী হইয়াছে ? কিছুদিন যাবত লক্ষ করিতেছি, তুমি বঙ্গ ভাষায় আর আমার সহিত কথোপকথন কর না। কেন ?

তুমি কি তোমার ইংরেজি বিস্মৃত হইয়াছ যে উহার অর্থ আর বুঝিতে পার না ?

পরিহাস করিও না এবং তরল হইও না। বিবি, বিবি, তোমার কী হয়েছে, আমার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত আজকাল বল না ? তোমার মনে আছে সেই শনিবারগুলোর কথা ?

কোন শনিবার ? বিবি বাংলায় উচ্চারণ করে।

এবং সেই বাংলা উচ্চারণ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দালিব এক মুহূর্তের জন্যে অনুভব করে ওঠে যে, না, বিবি সেই বিবিই আছে, সময় সেই সময়েই অগ্রসর হচ্ছে; তীব্র সুখ তাকে মূলসুদ্ধ রোমাঞ্চিত করে তোলে।

বিবি আবার প্রশ্ন করে, কোন শনিবার ?

স্খলিত কণ্ঠে আন্দালিব বলে, সেইসব শনিবার, তুমি আমার জন্যে, মনে আছে ?— হ্যাম্পস্টেড স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে ? অপেক্ষা করতে ? আবার কখনো আমিই তোমার পথ চেয়ে থাকতাম; তোমার আসতে দেরি হতো, মনে পড়ে, বিবি ? হ্যাম্পস্টেডের বনে, মাঠে আমরা ঘুরে বেড়াতাম, সড়কের পাশে আঁকা ছবি, তৈরি মূর্তি, হাতের জিনিসপত্র, মাটির বাসন, ফুলদানি, গয়না, এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দেখতাম, মনে

আছে? বিবি? বিবি?

নিচু গলায় বিবির উচ্চারণ ভেসে আসে, মনে আছে।

মনে আছে তোমার, বিবি?

আছে।

যদি আছে, তো, সেই মন কেন আর নেই, বিবি? সেই শনিবারগুলো কেন আর নেই? সেই তুমি কেন নেই?

তুমি অনুভূতিপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছ।

বাংলায় বল, বিবি।

অ্যানডি।

বল। কোমল ডাক শুনে বড় আশা করে উচ্চারণ করে আন্দালিব।

অ্যানডি, বঙ্গভাষা এত প্রয়োজনীয় বোধ করিলে, তোমার কর্তব্য হয় বঙ্গদেশীয় কোনো তরুণীকে সন্ধান করিয়া লওয়া।

তুমি কি বঙ্গদেশীয় নও?

প্রশ্নটি ইংরেজিতে করিলে যে?

কারণ, আমি সন্দেহ করিতেছি, বঙ্গদেশকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ। আমি সন্দেহ করিতেছি, তুমি প্রেমে পড়িয়াছ। আমি শুনিয়াছি যে, তুমি একটি ইংরেজ বালকের প্রেমে পড়িয়াছ।

বিবি তখন উত্তর দেয় একে একে।

তোমার বক্তব্য শেষ করিয়াছ? উত্তম। শ্রবণ কর, তোমাকে ত্যাগ করিবার অর্থ নহে, বঙ্গদেশকে ত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে প্রেম না করিবার ব্যাখ্যা ইহা নহে যে, অন্য কাহারো প্রেমে পড়িয়াছি। এবং শ্রবণ কর, বঙ্গদেশীয় তরুণেরা বঙ্গদেশীয় তরুণীকে করতলগত না করিতে পারিলেই ইংরেজ তৃতীয়পক্ষেব উপস্থিতি সন্দেহ করিয়া থাকে। ইহা প্রতিদিন দেখিতেছি।

টেলিফোন শব্দ করে ওঠে, আবার দু'পেনি পয়সা পুরে না দিলে লাইন কেটে যাবে, আন্দালিব পকেটে হাত দেয়, দু'পেনি মুদ্রা আর একটিও নেই। সে ব্যাকুল হয়ে রিসিভারের ভেতরে ডাকতে থাকে, বিবি, বিবি।— যেন তার এই আর্তনাদ কোনো মন্ত্র বলে টেলিফোন যন্ত্র অনুবাদ করে নেবে এবং বিনা মুদ্রাতেই লাইন মুক্ত রাখবে।

লাইন যখন কেটে যায়, তখনো আন্দালিব পকেটে পকেটে মুদ্রার সন্ধান করে চলেছে পাগলের মতো।

সব্জির দোকান থেকে খুচরো পয়সা এনে আবার সে ডায়াল করে বিবিকে, বিবির ফোন ব্যস্ত পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সে ডায়াল করে, আবার সে ব্যস্ত দেখতে পায়। আবার এবং আবারো ব্যস্ত। এবার এবং এবারো ব্যস্ত।

তিক্তকণ্ঠে আন্দালিব উচ্চারণ করে, সংগম।

এবং নিজেই যখন সে ইংরেজি শব্দটি শ্রবণ করে ওঠে, তার শরীর শিথিল হয়ে যায়। বিবি অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু আন্দালিব বহু জায়গায় শুনেছে যে বিবি এক ইংরেজ তরুণের

সঙ্গে প্রেম করছে এবং সেই তরুণ কি প্রেমকে পীচ ফলের মতো মনে করে নি ? সেই ফলের স্বাদ গ্রহণ করে নি ? বস্তুত, সেই তরুণ কি এই মুহূর্তে বিবির কামরায় উপস্থিত নয় ? শনিবার তো এদেশে প্রেমিকরা নিঃসঙ্গ যেতে দেয় না ? শুক্রবার সন্ধে থেকেই তো যুগলের সপ্তাহান্ত শুরু হয়ে যায় এ দেশে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকেই দেখা যায় পাতাল রেলের স্টেশনে, বাস স্টপে, পাবের ফুটপাথে অপেক্ষা করছে তরুণী, অপেক্ষা করছে তরুণ, এই মিলিত হচ্ছে, এই পাবে ঢুকছে, এই ট্রেনে উঠছে, এই বাসের ওপর তলায় সমুখের আসনে কাঁধে মাথা রেখে নগরীর আলোকমালার দিকে সমর্পিত তাকিয়ে আছে।

আন্দালিব বাসে উঠে পড়ে।

বিবির বাড়িতে সে কখনো যায় নি, কিন্তু লন্ডনের মানচিত্র বই দেখে বহু আগেই সে মুখস্ত করে রেখেছে কোথায় নামতে হবে, কোন সড়ক দিয়ে কোন সড়কে উঠতে হবে; এখন সে সাবলীলভাবে বিবির বাড়ির সমুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন কতবার সে এখানে এসেছে এর আগেও।

দরোজায় এক সারি নাম আঁটা চৌকো ঘর; বাঙালি নাম একটিও চোখে পড়ে না আন্দালিবের। বি, সাড়ুলা লেখা বোতামে সে চাপ দেয়। এবং একটি স্তম্ভিত ঝড় হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়, দরোজা খোলে না; সে আবার বোতাম টেপে। দরোজা খুলছে না কেন ? বিবি কি ওপরের কোনো জানালা থেকে তাকে চুরি করে দেখে নিয়েছে, তাই সাড়া দিচ্ছে না ?

দরোজা হঠাৎ খুলে যায়; জিন্স পরা, খালি গায়ের ওপর ঢিলে লাল সোয়েটার চড়ানো, লম্বা চুলো এক শ্বেতাঙ্গ তরুণকে দেখা যায়।

আধবোজা চোখে জড়িত গলায় তরুণ উচ্চারণ করে, হাঁ ?

কে এই তরুণ ? এই কি সেই বালক যার সঙ্গে বিবি প্রেম করছে বলে শোনা যাচ্ছে ? সে-ই যদি হয়, তাহলে অবশ্যই সে গত সন্ধ্যায় এখানে এসেছে এবং বিবি অবশ্যই তার সঙ্গে শয়ন করেছে।

মাথা খাড়া করে আন্দালিব বলে, আমি বিবির নিকটে আসিয়াছি।

তরুণ ধীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে, বিবির নিকটে আসিয়াছ ?

হাঁ।

বিবি ?

তরুণ কি অভিনয় করছে ? অথবা, সত্যি সত্যি বিবিকে সনাক্ত করতে পারছে না ? আন্দালিব দরোজার চৌকাঠে আঁটা নামগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, বিবি, বি. সাড়ুলা, যাহার নাম লিখিত আছে ঐখানে।

তরুণটি ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে নাম ফলকগুলোর দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিপাত করে; কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে সেখানে, যেন এই নাম ফলকও সে এই প্রথম দেখছে; তারপর আঙুল দিয়ে বি, সাড়ুলা লেখাটির ওপর চাপ দিয়ে আন্দালিবকে সে প্রশ্ন করে, হাঁ ?

হাঁ, ইহাই বটে।

তরুণটি তখন নির্মল নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, দৃষ্টিতে সহানুভূতি সকল কোমলতা নিয়ে ফোটে, তরুণ উচ্চারণ করে, অহো, এই ব্যক্তি এই গৃহ ত্যাগ করিয়াছে।

অর্থাৎ ?

সে অন্যত্র বাসা লইয়াছে।

অসম্ভব।

কী রূপে ?

আমি কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার সহিত ফোনে কথোপকথন করিয়াছি; সে আমাকে আসিতে বলিয়াছে।

তরুণটি এবার পাল্টা বলে, অসম্ভব।

এবং আন্দালিব এইমাত্র তরুণটির মতোই প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়, কী রূপে ?

এই রূপে যে, যে ব্যক্তি এই ঠিকানায় নাই তাহার সহিত কথা হইতে পারে না। সে তোমাকে আসিতে বলিতে পারে না। তুমি ভুল করিতেছ, কিংবা তুমি উন্মাদ।

তরুণ দরোজার ভেতরে দেহ টেনে নিয়ে যায়; দরোজা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই আন্দালিব হাত দিয়ে ঠেকিয়ে, বিবির ফোন নম্বর উল্লেখ করে বলে, এই নম্বর কি নয় ?

তোমার মস্তিষ্কের স্থলে একটি পচা টম্যাটো রহিয়াছে।

দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

দরোজায় এবার করাঘাত করে আন্দালিব এবং অচিরেই অনুভব করে যে কোনো লাভ নেই। সে দরোজার মাথায় নিকেলের সংখ্যায় লিখিত ৭৩ পাঠ করে; হাঁ, তেহাত্তরই তো বাড়ির নম্বর বলে সে জানে। পকেট থেকে ঠিকানার বই বের করে পাতা ওল্টায়; হাঁ কণ্ঠস্থ এই নম্বর তো ভুল হবার কথা নয়। আন্দালিবের আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, শ্বেতাঙ্গ তরুণটিই বিবির প্রেমিক বালক এবং সে তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেছে।

জনাথান ঘরের ভেতরে নীরব প্রশস্ত হাসি নিয়ে প্রবেশ করে। কার্পেটের ওপর তখন থেকে নতজানু হয়ে, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে, হৃৎস্পন্দন মুঠোর ভেতর নিয়ে অপেক্ষা করছিল বিবি, উদ্বিগ্ন চোখেই সে এখন তাকায় জনাথানের দিকে।

জনাথানের মুখে হাসিটা বিস্তৃততর হবার মতো জায়গা পায় না, অতএব জনাথান সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে মুখে বলে, গিয়াছে।

তবুও উদ্বিগ্ন চোখেই তাকিয়ে থাকে বিবি সাড়ুলা।

জনাথান ধপ করে তার পাশে বসে পড়ে বলে, হাঁ, হাঁ, সে গিয়াছে। বিশ্বাস হইতেছে না ? জানালায় গিয়া দৃষ্টি দাও নিঃসন্দেহ হইবে। দরোজা বন্ধ করিবার পর আমি কিছুকাল নিঃশব্দে দরোজার কাছেই অপেক্ষা করি এবং চিঠির ঢাকনা খুলিয়া দেখি সে ফিরিয়া যাইতেছে।

বিবি কাত হয়ে গড়িয়ে জনাথানের কোলে মাথা রাখে এখন; সুদূর কণ্ঠে একটি প্রশ্ন করে অনেকক্ষণ পরে, সে কি গণ্ডগোল করিতে চাহিয়াছিল ?

না।

তুমি তাহাকে ভয় প্রদর্শন কর নাই তো ?

না। কেন প্রশ্ন করিলে ?

আমার শঙ্কা হয়।

কীসের শঙ্কা ?

যদি অন্য সময়ে আসিয়া জোর করিয়া প্রবেশ করে ?

সে অনধিকার প্রবেশের জন্যে গ্রেফতার হইবে।

যদি পথে আমাকে আক্রমণ করে ?

আজকাল উহারাই আক্রান্ত হইতেছে।

হাঁ সত্য।

তবু শঙ্কা যাইতেছে না ?

বিবি দ্রুত উঠে বসে দু'হাতে নিজের বুক আবৃত করে বলে, তুমি কি শোন নাই ঈর্ষার বশে বঙ্গদেশীয় এক পুরুষ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে।

হাঁ শুনিয়াছি। কিন্তু তুমি তাহার বিবাহিতা স্ত্রী নও।

তুমি তবে জানিয়া রাখ, বঙ্গদেশীয় বালকেরা তাহাদের প্রেমিকদের স্ত্রীর অধিক করতলগত বলিয়া মনে করে। বস্তুত, তাহারা বিবাহের পরেই স্ত্রীর প্রতি উদাস হইয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রায়শই ঘটে যে, প্রেমে ব্যর্থ হইয়া বালকটি তাহার প্রণয়িনীকে ধর্ষণ করে, এমনকি সবান্ধবে ধর্ষণ করে এবং পরে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া রাখিয়া যায়। আমার ভীষণ ভয় করিতেছে।

ঠিক তখন হলঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে; যেন চমকে ওঠে পরিপার্শ্ব; প্রায় আর্তনাদ করে লাফিয়ে ওঠে বিবি।

ঐ আবার।

জনাথান বলে, আমি উত্তর দিতেছি।

তৎক্ষণাৎ তাকে নিরস্ত করে বিবি গায়ে আবার হালকা কম্বলটা জড়িয়ে নেয়। বলে, ইহা আমার দায়, আমিই কথা বলিব।

বরাহ। জনাথান উচ্চারণ করে কার্পেটে লম্বা হয়ে পড়ে।

বিবি টেলিফোনে ভয়ে ভয়ে সাড়া দেয়, হ্যালো।

রিসিভারের ভেতরে মুদ্রা পতনের শব্দ হয়।

বিবি রুদ্ধকণ্ঠে বলে, হ্যালো ?

অপরপ্রান্ত থেকে আন্দালিবের কণ্ঠ তখন বিরতিহীন উচ্চারণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তোমার ঠিকানায় গিয়াছিলাম, ঠিকানা সঠিক ছিল। তোমাকে যে নম্বরে ফোন করিয়াছিলাম, সেই নম্বরেই পাইলাম। তোমার বালক বন্ধু বলিল, তুমি বাসা বদল করিয়াছ, ফোন নম্বর ঠিক নাই জানাইল। হাঁ, সে আমাকে উন্মাদ বলিল। আমাকে তবে উন্মাদ বলিয়া তাহার নিকট পরিচয় দিয়াছ ? উন্মাদ আমি নহি, তুমি। হাঁ, তুমিই উন্মাদ হইয়াছ।

অ্যানডি।

কাহার নাম অ্যানডি ? বিবি, কাহাকে তুমি অ্যানডি বলিতেছ ?

তোমাকে বলছি, আমি তোমাকে বলছি। অ্যানডি পাগলামো কোরো না। প্লীজ, অ্যানডি, আমার কথা শোন, আমার একটা কথা তুমি শোন।

হাঁ, বঙ্গভাষা অবশেষে জিহ্বায় আসিল ? কীসে এই অলৌকিক সাধিত হইল ?

অ্যানডি, আমি বাংলায় বলছি, তুমি বাংলায় কথা বল।

না, মিস সাড়ুলা, না। বঙ্গভাষায় এই বক্তব্য সম্ভব নহে, বঙ্গভাষায় একদা তোমাকে প্রেমের কথা কহিয়াছি। তুমি প্রেমকে অপমান করিয়াছ, বঙ্গভাষাকে আমি অপমান করিতে পারি না।

বিবি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, তবে ফোন করিয়াছ কেন ? তুমি কি অবগত আছ, ফোন হয় রাণীর সম্পত্তি এবং উহার অপব্যবহার আইনত দণ্ডনীয় ?

পুলিশের নিকট নালিশ করিবে নাকি ? উহাও তুমি পার। তুমি সকল কিছুই এখন পার। আমি এখান হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গদেশের অতি সম্মানিত এক ব্যক্তির রূপসী কন্যা ষাঁড় এখন খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহার সম্মুখে সেই কন্যা বসন উন্মোচন করিয়াছে এবং সতৃষ্ণ নয়নে দণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। যাহার জননী একাত্তর সালে ধর্ষণের ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিল, সেই কন্যা এখন ধর্ষণকে স্বাগত করিতেছে। বঙ্গদেশ আবার ধর্ষিত হইতেছে এবং স্বেচ্ছায়।

তুমি কি নীরব হইবে ? তুমি কি নীরব হইবে ?

ফুঁপিয়ে উঠে বিবি সাড়ুলা টেলিফোন রেখে দেয়, তারপর চোখ মুছে ঘরের দিকে ফিরে দ্যাখে, জনাথান নিঃশব্দে বাম হাতের আঙুল দিয়ে অবিরাম চিবুক চষে চলেছে।

৩

সাদুল্লা সাহেব লন্ডনে আসছেন, আসছেন বলাটা সঠিক বর্ণনা নয়, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে লন্ডনে থামছেন জিনিভার পথে, সকাল সাড়ে সাতটায় বিমান নামবে হিথরো বিমান বন্দরে, দশটায় জিনিভার বিমান, এর ভেতরে বিমান শুধু বদল করাই নয়, টার্মিনালও বদল করতে হবে, আবার ঠিক সাড়ে সাতটাতেই বিমান পৌঁছোয় কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই, বলতে গেলে মেয়ের সঙ্গে চোখের একটা দেখা হয়ে যেতে পারবে, এইমাত্র। জাহানারাকে তিনি দু'দিন আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন হিথরো-তে এসে দেখা করার জন্যে। সাদুল্লা সাহেবের ইচ্ছে ছিল জিনিভা থেকে ফেরার পথে লন্ডনে দু'একটা দিন থেকে যান, মেয়েকে দেখে যান, রেখে গেছেন তারপর থেকে চোখের দেখা নেই, চিঠিপত্র ছাড়া যোগাযোগ নেই। ডাঃ মজুমদারও 'সে উত্তম রহিয়াছে' ভিন্ন বিশদ কিছুই লেখেন না, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইচ্ছেটা ভেঙ্গে যায়। জিনিভা থেকে সাদুল্লা সাহেবকে যেতে হবে আবুধাবীতে, অতএব এই যাওয়ার পথেই মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের যা একমাত্র সুযোগ।

এদিকে, সাদুল্লা সাহেব লন্ডনে নামছেন আবার এমন একটি দিনে, যেদিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের মিছিল বেরুবার কথা। কোনো কাগজেই ঠিক পরিষ্কার খবর বেরোয় নি, কিন্তু মিছিল যাদের বিরুদ্ধে তাদের কানে-কান ঠিকই খবর পেয়ে গেছে, বাঙালি-ভারতীয়-পাকিস্তানি পরিবারদের বসতি যেসব এলাকায় বেশি, এক কথায় যার বর্ণনা দেয়া হয় ইন্ডিয়ান পাড়া, সেইসব জায়গায় মানুষজন সব সতর্ক হয়ে আছে, বিশেষ করে হিথরো সড়ক পথে যাবার একটি রাস্তা সাউথ হলের ভেতর দিয়ে, যে সাউথ হলকে বলা হয় 'লিটল ইন্ডিয়া', সেখানে

ইন্ডিয়ান তরুণেরা সকাল থেকেই দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি হামলা হয় জান দিয়ে লড়বে।

এই ন্যাশনাল ফ্রন্টের কথা হচ্ছে— ব্রিটেন ব্রিটিশদের জন্যে। ব্রিটিশ বলতেও তারা আবার কেবল শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশদেরই বোঝায়। বাঙালি, পাকিস্তানি, ভারতীয়, কেনিয়ান, উগান্ডান, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর অনেকেই অনেক দিন থেকে বাস করছে ব্রিটেনে, অনেকেই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছে রাণীর প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের হাত তুলে, ন্যাশনাল ফ্রন্টের চোখে এরাও ব্রিটেনের শত্রু, ব্রিটেনের অর্থনীতির অধোনামীতার জন্যে এরাই দায়ী, এরাই শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশদের চাকুরি দখল করে রাখছে, ব্যবসা হস্তগত করছে, কারির ঘ্রাণে কলুষিত করে রেখেছে ব্রিটেনের স্পর্শকাতর নাসা, এদেরই দরুন ব্রিটিশ ফিশ অ্যান্ড চিপস কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়ান চিকেন তন্দুরি, অতএব এদের মেরে ভাগিয়ে দাও ব্রিটেন থেকে।

এই ফ্রন্টের সদস্যরাই লন্ডনের প্রধান বাঙালি পাড়া তথা সিলেটি এলাকা, লিটল সিলহেট, ব্রিক লেনে মারামারি বাঁধায় প্রায়ই, সেদিন এক সিলেটি শ্রমিকের বাঁ কানের লতি কেটে নেয় প্রকাশ্য দিনের আলোয়, সিলেট থেকে আগত এক নববধূর শাড়ি টান দিয়ে খুলে ফেলে দেয় ব্রিজের ওপর, আবার কারখানা থেকে ফিরছিল বাঙালি শ্রমিকেরা, তাদের দু'জনকে ছুরি মারে, এক ভারতীয় বাড়ির চিঠির বাক্সের ফোকর দিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়, পুড়ে মারা যায় তিনটি শিশু। ন্যাশনাল ফ্রন্টের পদ্ধতি হচ্ছে কালো আর বাদামিদের মনে ত্রাস সৃষ্টি কর, রক্ত, আগুন আর দৈহিক নির্যাতন চালাও-জ্বালাও, একদিন এরা নিজেরাই ব্রিটেন ত্যাগ করবে।

এই ন্যাশনাল ফ্রন্টের ক্রিয়াকলাপের প্রতি অধিকাংশ ব্রিটেনবাসীরই সমর্থন নেই, প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল— রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল এবং তৃতীয় ছোট দল উদারপন্থী দল, কেউই এদের সমর্থন করে না, এসব কথা ব্রিটেনের সব পত্রিকা লেখে, সব নেতারাই বলেন, বেতার-টেলিভিশনে প্রচার করা হয়, কিন্তু লক্ষ্যের যারা শিকার, যাদের বর্ণনা 'বহিরাগত', তারা বিশ্বাস করে না, তাদের বিশ্বাস রক্ষণশীল দল গোপনে ন্যাশনাল ফ্রন্টকে অনুমোদন করে, তাদের বিশ্বাস পুলিশ পর্যন্ত ন্যাশনাল ফ্রন্টের সমর্থক। এই বিশ্বাসের যে একেবারে কারণ নেই, তা আদৌ নয়, কিন্তু সরকারিভাবে বলা হয়— না, না, কোথাও কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ নেই, কোথাও কোনো নির্যাতন হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা নিতান্ত ব্যক্তি-বিশেষের কাণ্ড। এমনকি এটাও বলা হয়ে থাকে যে, যে-কোনো নগরীতে এ জাতীয় লুটপাট, আগুন লাগানো, ছুরি মারবার ঘটনা হয়ে থাকে, বিশেষভাবে কালো বা বাদামির প্রতি শাদার আক্রমণ বলে এসবকে ধরাটা নেহাত গ্রাম্যতা।

কিন্তু ছুরি যে খায়, রক্তপাত তার দেহ থেকেই হয়, আগুন যার বাড়িতে লাগে, তারই তো বাড়ি পোড়ে, যার শিশু নিহত হয়, সে-ই তো সন্তানহারা হয়। আজ ন্যাশনাল ফ্রন্টের মিছিল বেরুবে, কড়া পুলিশ পাহারা থাকবে তাও সত্যি, কিন্তু শংকিত হয়ে থাকে 'বহিরাগত' সকলেই, চারদিকে সতর্ক চোখ রাখে আজ, বিশেষ দরকার না থাকলে কেউ বেরোয় না।

বিবি সাডুলা হিথরো যাবে, কতদিন পরে বাবার সঙ্গে তার দেখা হবে, সে বহুদিন পরে সুটকেসের তলা থেকে শাড়ি বের করে।

যদি সে স্কার্ট পরতো, যদি সে ড্রেস পরতো, যদি সে জিন্স পরতো, তাহলে তার ফাঁপানো লালচে চুল আর ফর্সা রঙ থেকে বোঝা মুশকিল হতো 'ভারতীয়' বলে। বিলেতে বাঙালি, পাকিস্তানি ও ভারতীয় সবারই সাধারণ বর্ণনা 'ভারতীয়'। ঐ পোশাকে ঐ সজ্জায় তাকে মনে হতো স্পেনের কোনো মেয়ে, অথবা সাইপ্রাসের, কিংবা তুরস্কের বা গ্রিসের।

কিন্তু বিবি সাডুলা আজ বহুদিন পরে শাড়ি পরবে।

হিথরো বিমান বন্দরে, শোনা যাচ্ছে, ন্যাশনাল ফ্রন্টের সদস্যরা ভারতীয় উপ-মহাদেশ থেকে আগত বিমানগুলোর যাত্রীদের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। নিতান্তই শোনা কথা হতে পারে। আর যাই হোক, একদা বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য যাদের ছিল, তাদের সাম্রাজ্য চলে গেলেও হিসেবের বুদ্ধিটা তো আর বিদায় হয়ে যায় নি, পুলিশ নিশ্চয়ই তাদের বিমান বন্দরে ঢুকতে দেবে না। তা না দিক, বিমান বন্দরগামী পাতাল ট্রেন, বাসগুলোতে তারা ঘোরাফেরা করবে, সুযোগ খুঁজবে অপমান করবার জন্যে, মারধোর করবার জন্যে, হাত বাড়িয়ে থাকবে আগত যাত্রীদের পাসপোর্ট ছিনিয়ে নেবার জন্যে। ব্রিটেন কেন ?— কোনো দেশেই তো পুলিশ প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রতিটি মুহূর্তে পাহারা দিয়ে রাখতে পারে না।

জনাথান আবার ওয়েলসে গেছে তার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে।

টেডকে ফোন করে বিবি।

এডোয়ার্ড শনবার্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ওহায়ো থেকে লন্ডনে এসেছে কিছুদিন হলো। নাটক পাগল ছেলে, দূরবর্তী একটা বাসনা আছে তার— নাটকে কাজ করবে। নাট্যকার হবে ? পরিচালক হবে ? অভিনেতা হবে ? এখনো মনস্থির করতে পারে নি। লন্ডনে এসেছে, কারণ লন্ডনের এখনো পাশ্চাত্যজোড়া খ্যাতি নাট্যকর্মের রাজধানী হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাট্যশিল্পী ও কুশলীরা এখনো লন্ডনে কাজ দেখাতে না পারলে, নাটক এনে লন্ডনে মঞ্চস্থ করতে না পারলে স্বদেশের সুখ্যাতি লবণহীন বলে বোধ করে থাকে।

শনি আর রোববার বিবি বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে লন্ডনের অভিজাত শিল্পীপাড়া হ্যাম্পস্টেডের হ্যাভারস্টক হিল সড়কের ওপর এক হেলথ ফুড রেস্তোরাঁয়। এসব রেস্তোরাঁয় মাছ মাংসের কোনো খাবার নেই, শুধু বিভিন্ন ধরনের ডাল, সবজি, শস্য দানা, পাতা, পনির, ফল আর ফলের রস, তাও রান্না করা নয়, ভেজানো, কুঁচি কুঁচি করে কাটা, পাঁচ রকম এক সঙ্গে মেশানো, বড় জোর দু'একটি পদ ভাপে সেদ্ধ করা কি আঁচে একটু উষ্ণ করে নেয়। এসব রেস্তোরাঁয় এক সময়ে সেইসব তরুণ তরুণীর ভিড়ই কেবল হতো, যাদের বলা হয় 'ড্রপ আউট' অর্থাৎ সমাজের সনাতনী ধারা থেকে কেটে পড়া যারা। এখন এ খাবার রীতিমতো পদ পেয়ে গেছে, এখন ধনবান, নিয়মনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠিত মানুষেরাও আসে, হয়তো এখানে দু'দণ্ড বসে, এই আহার সমুখে নিয়ে, নিজেকেই তারা সুখের সঙ্গে প্রতারণা করে যে, তারাও বিদ্রোহী, অগ্রগামী ও জীবন প্রেমিক।

এই 'গ্রিন আর্থ' রেস্তোরাঁয় বিবির সঙ্গে টেডের আলাপ হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনবান পরিবারের ছেলে লন্ডনে এসেছে শৌখিন ছিন্ন বিদ্রোহী পোশাক গায়ে চড়িয়ে শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখে। সবাইকে সে জড়িয়ে ধরে কথায় কথায়, সবার সঙ্গেই পথে পা বাড়ায়, চারদিকের যাবত অভিজ্ঞতা এক মুহূর্তে শুষে নেবার জন্যে চোখ তার অনবরত ছটছট করে। বাস করে

সে তার মায়ের এক পুরনো বান্ধবীর হ্যাম্পস্টেডের বাড়িতে, কবি কীটসের খুব কাছেই ঘন লতা-পাতায় ছাওয়া, পাথরের ধাপ বসানো বাগান ঘেরা বাড়ি। সেই বাড়িতে বহুদিন বিবি গেছে রেস্তোরাঁয় কাজে যাবার আগে, মাঝে মাঝে কাজ শেষ করে এখানে এসে হাত পা ছড়িয়েছে কতদিন। বাড়িটা বড় ভালো লাগে বিবির, লন্ডনে অধিকাংশ মানুষ, বিবির চেনা মানুষেরা যে ঘিঞ্জি এলাকায় বাস করে, খুপরিতে বাস করে, সমুখে এক মাপে একভাবে সাজানো লন আর পেছনে কাপড় শুকোবার নাইলন দড়ি নিয়ে বাস করে, তা থেকে কত আলাদা এই বাড়ি, মনে হয় নির্জন অরণ্যের ভেতরে শান্ত একটি কুটির।

জনাথান এক পর্যায়ে একটু ঈর্ষিত হয়ে পড়েছিল; বিবি কি টেডের দিকে ঝুঁকে পড়ছে? মুখে কিছুই বলে নি, অনবরত সতর্ক হয়ে বিবির কথা, বিবির তাকানো, বিবির বেড়ানো লক্ষ করেছে সে। অচিরেই সে আবিষ্কার করেছে যে, বিবি কেবল বাড়িটার কথাই বলে, টেডের কথা মোটেই নয়, তখন সে আশ্বস্ত বোধ করেছে।

বাবার আসবার আগের রাতে টেডকে ফোন করে বিবি।

সঙ্গে সঙ্গে টেডের গলা, হাই, মধু কী বিস্ময়? সমস্ত শুনে সে নির্ঝরের মতো বলে ওঠে, অবশ্যই শিশু, অবশ্যই তোমাকে সঙ্গদান করিব। এমন কী কথা? তোমার প্রাচীন মানুষ আসিতেছেন, আনন্দিত হইলাম। অবশ্যই তোমাকে হিথরো লইয়া যাইব, মধু। কোথায় আমরা মিলিত হইব?

পাতাল রেলে যাইব। পিকাডিলি লাইন লইতে হইবে। আমরা লেস্টার স্কোয়ার স্টেশনে মিলিত হইব। লেস্টার স্কোয়ার আমাদের উভয়েরই সমান দূরত্বে প্রায়, কী বল?

বিমান বন্দরের টার্মিনালে এসে বিবি বলে, একটি কথা বলিব। কিছু মনে করিবে না?

বিস্মিত হয়ে টেড বলে, মনে করিব? এমন কী কথা?

আমার প্রাচীন মানুষটি রক্ষণশীল।

সুতরাং?

তিনি আমাকে কোনো যুবকের সহিত দেখিলে বিচলিত হইবেন।

শিস দিয়ে ওঠে টেড।

হাঁ, এখন বুঝিয়াছি, শাড়ি পরিয়াছ কেন? মধু, তুমি চিন্তিত হইতেছ কেন? আমি নিজেকে বাতাসের সঙ্গে মিলাইয়া ফেলিব, আমি ভোজনস্থলে বসিয়া কালো কফির সহিত রক্ষণশীলতাকে পান করিতে থাকিব। আমি এই মিলাইয়া গেলাম, দ্যাখো।

নির্মল হেসে পিছিয়ে যায় টেড। এত সহজে মেনে নেবে টেড, বিবি আশা করে নি। বড় কৃতজ্ঞ বোধ করে সে। দ্রুত এগিয়ে টেডের হাত ধরে গোড়ালি উঁচু করে তার ঠোঁটে ক্ষিপ্র সংক্ষিপ্ত শুকনো চুমো দেয় বিবি সাড়ুলা।

বিবি বলে, ধন্যবাদ। তোমার উপলব্ধির জন্য।

টেড তার চিবুকে তর্জনীর মৃদু আঘাত করে বলে, মধু, আমি বিশ্ব উপলব্ধি করি। এবং হঠাৎ বলে, হাঁ শিশু, তোমাকে অপরূপ দেখাইতেছে। মার্কিন প্রশস্তগণ এইরূপ দেখিলে মসৃণ ভূমিতেও আছাড় খাইবে। চুক।

টেড স্ন্যাক বারের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে, নাচের আধো ভঙ্গিতে, শিস দিতে দিতে চলে যায়, যেন তার চারিদিকে মানুষ নয়, মাছ, সেই মাছ সরিয়ে খেলা করতে করতে সে সাঁতার কেটে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

সাদুল্লা সাহেব মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে যান।

রাজশাহীর সবুজ সিল্ক শাড়ি, ফিকে সোনালি রঙের কোট, কপালে টিপ, ঐ যে রেলিং ধরে ব্যগ্র দাঁড়িয়ে আছে, ঐ কি তার মেয়ে ? ছবি ? এত সুন্দর হয়েছে দেখতে ? কত বড় একটা মেয়ের মতো মনে হচ্ছে ? ভিড়ের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে, ঝলমল করছে, টলটল করছে।

সাদুল্লা সাহেব বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে, চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে, কপালে চুমো দিতে দিতে বলেন, এসেছিস ? তুই সময় মতো আসতে পেরেছিস ? মেয়েকে দু'হাতে সমুখে মেলে ধরে হাসতে হাসতে বলেন, এত ভোরে এত দূর থেকে টেনে এনে বাবা খুব কষ্ট দিল, না ? কখন ঘুম থেকে উঠেছিস ? নাশতা হয়েছে ? ভালো আছিস ?

প্রশ্নের শেষ আর হয় না, প্রশ্নের উত্তরও কেউ আশা করে না। সাদুল্লা সাহেব মেয়েকে একবার কাছে টানেন, আবার দূরে সরিয়ে চোখ ভরে দেখেন; আর একবার বাঁ, একবার ডান দিকে চিবুক ফিরিয়ে ফিরিয়ে তার মেয়ে সেই ছেলেবেলার মতো খিলখিল করে হাসতে থাকে।

আব্বু, তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ। তোমার কানের পাশে চুল পাকা যে ? কবে ? যাহ্, তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। একী, তোমার চশমার কাচ পাল্টেছ বুঝি ? পাওয়ার বেড়েছে ? মা ভালো আছে ? বেবি ? রাশেদ ও লেভেল দিচ্ছে ? ঢাকায় পড়ে পাশ করতে পারবে ? ইস, কী মজা হতো, তুমি যদি দুটো দিন থাকতে।

শান্ত হয়ে দু'জনে রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে।

সাদুল্লা সাহেব হঠাৎ অনুভব করেন, সময় বড় কম, সময় কত কম, এক্ষুণি তাকে ইয়োরোপের বিমানে গিয়ে উঠতে হবে।

তিনি কেমন নিভে যান, অনেকক্ষণ চুপ করে মেয়ের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকেন। বিবি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে পড়ে, ঠাহর করতে পারে না, বাবার হঠাৎ কী হলো ? তিনি কি কিছু শুনেছেন ? এখন তিরস্কার করবার জন্যে নিজেকে তৈরি করছেন ? তিনি কি কিছু জেনেছেন ? এখন শাসন করবার জন্যে কঠিন হচ্ছেন ?

বিবির বুক থেকে পাষাণ নেমে যায়, যখন সে বাবাকে বলতে শোনে, মা, কী যে খুশি হয়েছি তোকে শাড়িতে দেখে। প্রথম যখন লন্ডনে দিই তোকে, আমার তো ভাবনায় ঘুম হয় নি কতদিন পর্যন্ত। কত লোকের কত মেয়ের কথা শুনি, লন্ডনে এসে নষ্ট হয়ে গেছে, দেশ ভুলে গেছে, আচার ভুলে গেছে, বাপ-মাকে ভুলে গেছে, দেশে ফিরে যেতে চায় না। তোকে দেখে কী যে শান্তি পেলাম, মা, তুই সে রকম হোস নি।

চোখ নিচু করে স্মিত মুখে কফির কাপ নাড়াচাড়া করতে থাকে বিবি।

দ্যাখ, এখন তো ফাইন্যাল ইয়ার তোর না ? আর বড়জোর একটা বছর। তারপরই আবার

আমাদের কাছে ফিরে আসবি। পাগলি, এদিকে মন খারাপ, ওদিকে হাসছিস যেন কিছুই হয় নি। বুঝি না ? এই তো আর একটা বছর। আমাদের দেশে এখন ভালো ইকনমিস্টের কত দরকার, কত স্কোপ, ফিরে এলেই দেখবি একটা নয়, পাঁচটা দশটা কাজ অপেক্ষা করছে তোর জন্যে। আমি প্রেসিডেন্টকে বলেই রেখেছি, আমার মেয়ে ইকনমিকসে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলে একটা ভালো জায়গা করে দিতে হবে, স্যার। উনি কী বলেছেন জানিস ? নো প্রবলেম। হাঁ, তোমার জন্য রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা করিতেছেন। এবং বলিবার আবশ্যকতা কী আছে, যে, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি। তোমার ভগ্নী অপেক্ষা করিতেছে। তোমার ভ্রাতা অপেক্ষা করিতেছে। হাসছিস যে ? আমার ইংরেজি শুনে হাসছিস ? ইংরেজের দেশে পড়াশোনা করছিস তুই, তোর বাপ তো আর ইংরেজের দেশে পড়ে নি। ইংরেজি তো একটু ভিকটোরিয়ান আমলের হবেই। হাঁ, আন্দালিব সম্প্রতি কী করিতেছে ?

বিবি ঈষৎ নড়ে বসে, বাবার দিকে চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নেয়।

সে তোমার খোঁজ খবর নিয়মিত লয় তো ?

সাদুল্লা সাহেব মেয়ের এই লাজুকতাটুকু বড় উপভোগ করেন। একবার ইতস্তত করেন বিয়ের কথা তুলবেন কিনা। আবার ভাবেন, থাক, এইটুকু তো মেয়ে, এখনো ভালো করে লজ্জাই ভাঙ্গে নি, হাতেও সময় কম, বিয়ে যখন হবে তখন হবে। মেয়ের হাত মুঠোর ভেতরে তুলে নেন সাদুল্লা সাহেব।

নিজের যত্ন নিস তো ?

হাঁ।

যেখানে আছিস, সেখানের সব লোকজন ভালো তো ?

কী যে বল, আব্বু ?

না, না, এমনি জিগ্যেস করলাম। আমি তো তোকে চিনিই, সেই শিক্ষাই তোকে আমি দিই নি। হাঁ রে, তা, সে বাড়িতে সব মেয়েরা থাকে তো ? ল্যান্ড লেডি আছে ?

হাঁ, আব্বু, হাঁ। বাবার হাতে চাপা দিয়ে বিবি বলে, তোমাকে কতবার কত চিঠিতে লিখেছি, তাও তোমার ভাবনা যায় না। সেখানে সব ভালো, সব ঠিক আছে, তারা খুব ভালো মেয়ে।

সাদুল্লা সাহেব তবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সময় এত কম। সময় থাকলে দেখে আসতাম জায়গাটা।

আব্বু। গাল ফোলায় বিবি। এইক্ষণে তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ। বলেই বিবির অনুতাপ হয়, সে বাবার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলবে না বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, তুমি আমার আব্বু তো, তাই মেয়ের জন্যে ভাবনা কেবল লেগেই থাকে। তোমাকে চিনি না, নেই কথা নিয়ে ভাবো। মা পর্যন্ত তোমাকে কত বকে এর জন্যে।

হেসে ফেলেন সাদুল্লা সাহেব। হাঁ, তোর মায়ের তো স্বভাবই ঐ, আমার কোনো কিছুই তার পছন্দ না।

সাদুল্লা সাহেব পকেট থেকে একটা খাম বের করে বিবির হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলেন, শ'দুয়েক পাউন্ড। লুকিয়ে আনতে হয়েছে। একটা কিছু কিনে নিস।

সাদুল্লা সাহেবের বিমানের ঘোষণা শোনা যায়। তিনি বড় বিষণ্ন ও চঞ্চল হয়ে যান। এত

শিগগির ? উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েকে পাশে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমি তোমার জন্য গর্বিত, কন্যা। আমি আনন্দিত যে, তুমি বালিকা হইয়াও বুঝিতে পারিয়াছ, যাহা তোমার নহে, তাহা আকাঙ্ক্ষা করিলে দুঃখই কেবল অর্জিত হয়। তুমি যখন লন্ডনে আসিলে, আমি তোমার জননীকে কত দুশ্চিন্তা শুনাইয়াছিলাম। এক্ষণে ফিরিয়া গিয়া পরাজয় মানিয়া বলিতে পারিব যে, তোমার কন্যা এখনো শাড়ি ত্যাগ করে নাই, বঙ্গভাষা ভুলিয়া যায় নাই, মেম সাহেব হইয়া যায় নাই, অথবা লিয়াকত সাহেবের কন্যাদের অনুরূপ লন্ডনে আসিয়া রহিয়া যায় নাই। খোদা হাফেজ।

বিবির চোখে পানি এসে যায়।

টেডকে যখন খুঁজে বের করে সে টেড বিস্মিত হয়ে বলে, প্রাচীন মানুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অশ্রু কী কারণে ?

বিবি ম্লান হাসে। তারপর টেডের হাত ধরে হঠাৎ একটা দোলা দিয়ে বলে, টেড, তুমি কত কষ্ট করিলে। আবার একটি ক্ষিপ্র সংক্ষিপ্ত চুমো দেয় তাকে বিবি। প্রাচীন মানুষ অর্থ দিয়াছেন, আইস, একটি চলচ্চিত্র আজ দেখি।

৪

ঘাড়ে হঠাৎ রদ্দা পড়লে পঁচিশ বছরের প্রবাসীও যেমন স্বভাষায় পিতাকে স্মরণ করে, তেমনি লন্ডনের বহু বাঙালি পুরো দস্তুর সাহেব হয়ে গিয়েও এখনো কারো গোমূর্খতা দেখে চার আঙুল জিভ বের করে কাটে।

আন্দালিবের মুখে তার বিবি-সাধনার ইতিবৃত্ত শুনে কাদের আলী ফস করে জিভ কাটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয় যে, নিতান্ত অসভ্যের মতো একটা ভঙ্গি করা হয়ে গেল। আপিসে সে এখন নয়, ইংরেজের ভাষায় গৃহস্বামী তার দুর্গের ভেতরে এখন ঢিলেঢালা পোশাকে, রোববারের খোশমেজাজ এবং এক আহাম্মক বন্ধুর সমুখে, তবু উদাহরণটা বড্ড বাজে হয়ে গেল, তাই, পলকের ভেতরে কাদের আলী জিভ টেনে নেয়। বলে, করেছ কী, অ্যাঁ ? ইটা কী করলাইন ?

লন্ডনে অনেক বাঙালিই সিলেটি না হয়েও বিস্ময়ে এবং পরিহাসে দু'একটা সিলেটি টান দিয়ে থাকে।

পরপর কয়েক শনিবার আন্দালিব বিবিকে ধাওয়া করে, ব্যর্থ হয়ে, গতকাল আর চেষ্টাই করে নি এবং এখন কী করা কর্তব্য, তা নিয়ে পরামর্শের জন্যে কাদের আলীর কাছে এসেছে।

কাদের আলী যে এ বিষয়ে চৌকশ তা নয়, তার নিজের রেকর্ডই বিপক্ষে যায়, এগারো বছরে সে তিনটি বালিকা বন্ধুকে হারিয়েছে, তারা তারই ঘরে থেকেছে, তারই উপার্জনে আহার করেছে, বিহার করেছে এবং প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত কাদের আলীরই কোনো না কোনো বন্ধুর সঙ্গে উড়াল দিয়েছে। শোনা যায়, দেশে একটি বিয়ে সে করেছিল, তার কোনো সাড়া শব্দ এ যাবত লন্ডনে কেউ পায় নি, দুর্জনেরা বলে, সে বৌও তাকে তালাক দিয়ে কেটে পড়েছে।

তবে, লন্ডনের বাঙালি ও বহিরাগত রাজনীতিতে কাদের আলীর বেশ বোলবোলাও, এক্ষেত্রে

মাথাটাও ব্যক্তিগত পরিস্থিতির তুলনায় তার খোলে ভালো, বেশ একটা প্রভাবও তার আছে, অন্তত বাঙালি মহলে— এই বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সঙ্গে ডিনার করছে, এই বর্ণ সম্পর্কে কমিটির চেয়ারম্যান গলদা চিংড়ির মতো লাল ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কথা বলছে, গ্রীষ্মকালে রাণীর প্রাসাদে বিশিষ্ট কমনওয়েলথ নাগরিকদের সম্মানে দেয়া চায়ের অপরাহ্নে যোগ দিচ্ছে, সেদিন তো ল্যামবেথ এলাকায় শাদা-কালো দাঙ্গা নিয়ে টেলিভিশন সংবাদে কাদের আলীর মতামত পর্যন্ত নেয়া হলো।

বিবি সাড়ুলাকে কী করা যায়, বাঙালির সুনাম এই দূর বিদেশে কী করে রক্ষা করা যায়, এইসব জটিলতা নিয়ে আন্দালিব কাদেরের কাছে উপস্থিত। আন্দালিবের একবার মনে হয়, সমস্যাটি নিতান্তই ব্যক্তিগত, আবার পরমুহূর্তেই রক্তে আগুন ধরে যায়, জাতির অবমাননা সে প্রত্যক্ষ করে।

দেখা যাক, কাদের আলী কী বলে।

আন্দালিব ডিভানে কাত হয়ে বিয়ারে চুমুক দেয়, অপেক্ষা করে। অচিরে কাদের আলী মুখে চুকচুক শব্দ করে মাথা নাড়তে থাকে।

নাহ্। না, না। উঁহু। উচিত হয় নি। এভাবে একটা মেয়ের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করা, টেলিফোনে বারবার বিরক্ত করা, গালমন্দ করা মোটেই উচিত হয় নি হে, পুলিশ-টুলিশ হয়ে যেতে পারত, সেই ইংরেজ ছেলেটি তোমায় মেরে তক্তা করে দিতে পারত, থানায় গিয়ে আরো ঝামেলায় পড়তে। নাহ্, না, না। উঁহুহু।

এই শান্তিপর্ব শোনবার জন্যে কাদের আলীর কাছে এসেছে আন্দালিব? সে লাফ দিয়ে উঠে বসে বলে, তো উচিতটা কী ছিল শুনি?

মেয়ে তোমাকে চায় না, মেয়েটার পাছায় গদাম করে লাথি কষিয়ে চলে আসা উচিত ছিল তোমার। বহু আগেই।

তাই?

তাই।

আন্দালিব ফেটে পড়ে। পাছায় যে লাথি মারব, সেই পাছাটাই পাচ্ছি কোথায়? সেটা আমাকে বলবে তো?

নাহ্, এর কাছে কোনো বুদ্ধিই আশা করা মূর্খতা হয়েছে। এই সরল প্রেসক্রিপশন বলেই তো তিন তিনটে মেয়ে ভেগেছে তার।

আন্দালিব বলে, দেখা একবার পেলে, বলে রাখছি কাদের, লাথি শুধু নয়, নকশা বদলে দেব। ছ্যাঁক দেবার শোধ তলায় ছ্যাঁকা দিয়ে নেব। হতো ঢাকা, এতক্ষণ দেখতে মেয়ে তো মেয়ে, মেয়ের বাপ এসে পায়ের ওপর পড়ে থাকত।

কাদের ঘোলা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আন্দালিবের দিকে, উত্তাপ যখন নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে তার বোধ হয়, সে বলে, তুমি দেখছি ন্যাশনাল ফ্রন্টের গুণ্ডাদের চেয়ে কম যাও না।

রাখ, রাখ, ভালো লাগে না। আমি শালা এর শোধ নিয়ে ছাড়ব।

সে তোমার করেছেটা কী?

আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে।

প্রেমে ?

আলবত।

প্রেমের বেইমানি দুনিয়ার দস্তুর হে. পেনাল কোডের কোনো ধারা নয়।

সেজন্যেই তো আমার কোডে আমি চলছি।

কাদের আলী আন্দালিবের পিঠে বার কয়েক চাপড় দিয়ে বলে, বিয়ার নাও, মৌজ কর, মাথা ঠাণ্ডা রাখ, তোমাকে একটা কথা বলি, এ বাবা স্বাধীন দেশ, এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার বড় দাম।

রাখ তোমার স্বাধীন দেশ, আমি কি পরাধীন দেশের লোক ?

হে হে করে হাসে কাদের আলী। যেই স্বাধীনই হও বাবা, একটা কথা মনে রেখো, এদেশে ডেফিনিশন আলাদা। এখানে যে যার রাজা, ফৌজদারি অপরাধ না করা পর্যন্ত যার যা খুশি করবার অধিকার আছে। তোমার বিবি-বেগম তোমাকে পাত্তা না দিয়ে কোনো অপরাধ করে নি, বরং তুমিই তাকে বিরক্ত করে অপরাধ করেছ, বেশি যদি এগোও জেল-জরিমানা কপালে লেখা আছে। ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দিয়ে ফেলেছ, বাবা।

রাখ, রাখ, ভালো লাগে না। আমি শালা এর শোধ নিয়ে ছাড়ব, কলা ব্যক্তি স্বাধীনতা। এদেশের সব আমি বুঝে গিয়েছি। মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে রেখেছে— ব্যক্তি স্বাধীনতা। যার যা খুশি কর, কেউ কিছু বলবে না, আইন তোমার পাশে আছে, ভোট দেবার অধিকার আছে, নিয়ম মতো নির্বাচন হচ্ছে, এই তো ? বেকার হলে ভাতা পাচ্ছ, বুড়ো হলে পেনশন পাচ্ছ, এই তো ? ব্যক্তির বড় মূল্য দিয়েছে সরকার, এই তো ? ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে আফিম খাইয়ে রেখেছে। মানুষ মনে করছে, বড় গুরুত্বপূর্ণ সে, বড় গুরুত্বপূর্ণ তার মতামত, তার স্বাধীনতা। ভেড়ার মতো আপিস করছে, সন্ধে হলে বিয়ার গিলছে, রঙিন টেলিভিশন দেখছে, ছুটির সময়ে সাগর পাড়ে চিৎ হয়ে দু'দিন পড়ে থেকে স্বর্গসুখ অনুভব করছে। আর এদিকে ওপর তলায় যারা, তারা দুনিয়ার গরিব দেশগুলো শোষণ করছে, ব্যবসার নামে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির নামে, অস্ত্র বানাচ্ছে, আমেরিকাকে সাহায্য করছে অপরের দেশে বোমা ফেলতে— এই ব্যক্তি স্বাধীনতা পাওয়া লোকগুলো তার কোনো প্রতিবাদ করছে ? না, একটি মুহূর্ত ভাবছে ? এদের মিছিল দেখি নি ? শালা, রাসলীলার শোভাযাত্রা। যাও কাদের মিয়া, দেশে যাও, দেখবা, দেখবা তুমি যে মানুষ যখন মিছিল করে, কেমতে করে, মানুষ যখন গুলির মুখে বুক পাইতা দেয়, কেমতে পাতে। বড় ব্যক্তি স্বাধীনতা দেখাও। আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে কি নাই, তার চেয়ে বড় কথা আমার ব্যক্তি সচেতনতা আছে। ঢাকার রিকশাওয়ালা ভি পলিটিক্সের যে ডিসকাশন করে, তার লহুতে যে আগুন ধইরা যায়, সেইটা তুমি এইখানে পাইবা না।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে কাদের আলী বলে, আচ্ছা, যাক। তোমার লহুর আগুনটা এখন নিবিয়ে ফ্যালো তো, ভাই।

হঠাৎ করে একেবারে ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে আন্দালিব নিজেই এখন ঠিক বুঝতে পারে না যে কাদের কী বলছে। সে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। তার গেলাসে নতুন ক্যান খুলে বিয়ার ঢেলে দেয় কাদের।

খাও, খাও। বিয়ারের মতো সব প্রস্রাব করে বের করে দাও।

বিয়ারের ফেনা মরে যেতে থাকে, আন্দালিব ঠোঁট ছোঁয়ায় না।

কাদের বলে, ইউস্টনের হালাল দোকান থেকে ইলিশ মাছ আর মিষ্টি কুমড়ো এনে রেখেছি। কতদিন ইলিশ মাছ খাও নি, বল তো?

ও আমি রোজই খাচ্ছি।

খাচ্ছি মানে? কোথায় খাচ্ছ?

কেন, আমি বাঙালি বাড়িতে থাকি না?

ওহো হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আবদুল জলিলের বাড়িতে না? তা বেশ তো, মিসেস জলিলের রান্না খাও, আজ আমার রান্না খেয়ে দ্যাখো।

চোঁ করে অনেকটা বিয়ার গলায় টেনে নেয় আন্দালিব।

চোখে টুসকি তুলে কাদের বলে, বিবির ভূত মাথা থেকে নামছে না বুঝি?

রক্তাভ চোখে আন্দালিব এবার নিরীক্ষণ করে কাদের আলীকে। হাত ঝাড়া দিয়ে তখন কাদের আলী বলে, নাহ তুমিও দেখছি সেই একই পালের গরু।

তার মানে?

কাদের আলী নিজের কোমরের কাছে ডান হাত রেখে দ্রুত তর্জনী খাড়া করেই নামিয়ে ফ্যালে এবং নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

আন্দালিব দাঁতে দাঁত চেপে বলে, শালা।

শালা বল যাই বল, ধরেছি ট্রু।

কলা ধরেছ।

হেঁ হেঁ বাপ, অস্বীকার করলে চলবে কেন? ইস্ট এন্ডের বাঙালিদের মতো তোমার তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হচ্ছে না? রেস্টুরেন্টের ওয়েটার হয়ে রাতদুপুর পর্যন্ত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে না? বাপের আছে টাকা। দেশ থেকে টাকা আসছে, লেখাপড়া ছাড়ান দিয়েছ, কাজও নেই, পেটের চিন্তা নেই, পেটের নিচের চিন্তা তাই সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ফাল পাড়ে। কোথায় বালিকা, কোথায় বালিকা। পথে ঘাটে মেয়ে মানুষের জানু দেখে খুন, বুক দেখে আগুন। বারো মাসই কার্তিক মাস।

শালা, আজ তোমারই রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

আন্দালিব কাদের আলীকে ধাওয়া করে, দু'জনেই চক্রকারে ঘরের ভেতর দৌড়ুতে থাকে। কাদের আলী হাঁসফাঁস করে ছোটে আর বলে— শোন, তোমারই উপকারের জন্যে বলছি, বাপ, বাপধন আমার, ছাড়ান দাও, কথাটা আগে শোন।

আন্দালিব কাদের আলীর হাত চেপে ধরে বলে, বল কী কথা?

অতি সাধারণ কথা।

অপমান করে এখন সাধারণ কথা?

আহা, শোনই তো। দু'একটা সওয়ালের জবাব দাও দিকিনি। সাফ সাফ জবাব চাই। তোমার দাবাই বাতলে দেব। কতদিনের পরিচয় বিবির সঙ্গে?

ঠিক উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারে না আন্দালিব, দম ধরে থেকে জবাব দেয়, তা কয়েক বছর। কেন ?

কোথায় পরিচয় ? ঢাকায়, না লন্ডনে ?

ঢাকায়, ঢাকায়, ঢাকায়।

প্রেম সেই ঢাকা থেকেই ?

হ্যাঁ।

চুমোচাটি ?

হা করে তাকিয়ে থাকে আন্দালিব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে কি হয় নি ?

ঢাকায় না। এখানে।

আর ?

আর মানে ?

আর মানে বোঝো না ? বিদ্রূপ করে ওঠে কাদের আলী। আর ? আর ? সেই আর, হয়েছে কি হয় নি ?

আন্দালিব মাথা নেড়ে বলে, না হয় নি। তারপর গাঢ় ব্যস্ত গলায় সে যোগ করে, কাদের, আমি বিবিকে ভালোবাসি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। ও জানে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তবু—

আহ, সেসব থাক, অ্যানডি মিয়া, সে পরের কথা। মাঝামাঝি কিছু ?

আন্দালিব দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বলে, না মাঝামাঝি কিছু হয় নি।

কাদের আলী পিঠ টান করে বসে সোফার ওপরে। বলে, এই জন্যেই গণ্ডগোল, বুঝেছ ? হয়ে যেত সব, মেয়ে ভালোবাসে কি না বাসে, তোমার বডি এত জাম হয়ে থাকত না। তোমার এখন এক চিকিৎসা, বালিকা, দেখবে, বিবির কথা আর এক ফোঁটা মনে নেই।

আন্দালিব হঠাৎ কাদের আলীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে, ঠিক ঠিক বলেছ। আমিও শালা চুটিয়ে প্রেম করব, আমিও শালা শনিবার শনিবার মৌজ করব। বিবিকে দেখিয়ে দেখিয়ে করব। তুমি একটা মেয়ে জোগাড় করে দাও তো।

মিটমিট করে হাসে কাদের আলী।

মেয়ে কি আর টমাটো, যে দোকান থেকে তুলে এনে তোমার হাতে তুলে দেব ? মেয়ে খুঁজতে হয়, তালে তালে থাকতে হয়, বর্শী ফেলে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে হয়, আর টোপ খেলে নিজেকেই বাবা সে মাছ খেলিয়ে তুলতে হয়। এ কি অন্যে ধরে দেবার জিনিস ?

তুমি তো কত জায়গায় যাও, কত ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ, কত রকম আপিসে-টাপিসে কত সেক্রেটারি তোমার জানাশোনা, তুমি শুধু একটার সঙ্গে একটিবার আমার আলাপ করিয়ে দাও, আর কষ্ট করতে হবে না।

একেবারে ইংরেজ ধরেই বসে আছ ?

ধরতেই যদি হয়, তো ইংরেজ। বাঙালি আর না। আর বাঙালিই বা পাচ্ছি কোথায় ?

কেন ? ঘরে।

ঘরে মানে ?

আরে, যে বাড়িতে থাক। যে বাড়িতে গিয়ে এই সেদিন উঠলে।

সেখানে আবার মেয়ে কাকে দেখলে ? অবাক হয়ে যায় আন্দালিব। কাদেরকে নিঃশব্দে হাসতে দেখে আবার সে প্রশ্ন করে, কোন মেয়ে ?

মিসেস জলিল।

যাহ, তোমার বুঝলে নেশা হয়েছে। তিন চার ক্যান খেয়েছ কি খাও নি মাতলামো করতে শুরু করেছ।

মাতলামো ?

আর নইলে আমাকে বোকা বানাচ্ছ।

শোন বাপ। নিমীলিত চোখে কাদের আলী নিবেদন করে, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, দাতব্য গৃহ হইতেই শুরু হয়। জান ?

আন্দালিব গা ঝাড়া দিয়ে বলে, ছি ছি, এসব কী বলছ ?

মিসেস জলিল দেখতে শুনতে ভালো।

তাতে কী ?

সাজন গোজন নয়ন লোভন।

হলেই বা।

সুরা পান করেন পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

অনেক বাঙালি বৌ-ই করে।

নাচ টাচ করে।

হ্যাঁ, করে, অনেকেই করে।

পরপুরুষের সঙ্গে নাচে।

নাচলেই বা।

গায়ে গা ঠেকে না ? তখন গা সরিয়ে নেয় তোমার মিসেস জলিল ? কোমর ধরে নাচে না ? গলা ধরে নাচে না ? মদ খেয়ে হেসে হেসে ঢলে ঢলে পড়ে না ? অনেক দেখেছি, অ্যানডি মিয়া, এই হাতের তলা দিয়ে দু'এক ডজন গুজার গেয়া। শোন, বিলেতি মেম এক কথা, আর বাঙালি মেম আরেক কথা। পার্টিতে গিয়ে বিলেতি মেমের গালে চুমো দিয়ে দরোজা পেরোও, সেটা তাদের বরাবরের ভদ্রতা. বাঙালি মেম যখন গাল পেতে দেয়, সেটা কোন কালের রেওয়াজ হে ? চুমোটি বড় নিষ্পাপ ? আমায় শেখাচ্ছ ? পরের ধানে নিজের চাল হয় কখনো ?

আন্দালিব ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ায়।

কই যাও, অ্যানডি মিয়া ?

তোমার নেশা হয়েছে।

আমার নেশা হয়, আমাকে তো ভালো লাগার কথা না। যদিও এ দেশে সেসবও আছে। ঘরে যাও, আমার কথাগুলো খারাপ লাগে, মিসেস জলিলকে যাওয়ার সময় এক বোতল মাল কিনে নিয়ে গিয়ে দিও। স্বামীটি তো রেস্টুরেন্টে ম্যানেজারি করেন। রাত একটার আগে বাড়ি ফেরেন না। তোমার ল্যান্ডলেডির হাতে দিও, চুকচুক করে খাবেন, তুমিও খাবে। যখন নেশা হবে, তখন একবার ল্যান্ডলেডির দিকে, তাকিয়ে দেখো। নতুন তাদের ভাড়াটে হয়েছ তো ? এখনো কিছুই তাকে চেনো নি।

একেবারে আউট হয়ে গেছ তুমি।

শোন, শোন। এই লন্ডনে, গুরুজনেরা বলেন, প্রেমের শিক্ষা ল্যান্ডলেডি হইতে শুরু হয়। আগে ইংরেজ ল্যান্ডলেডির কথা শোনা যেত। এখন বাঙালি ল্যান্ডলেডি বেরিয়েছেন। আবার সব সময় ল্যান্ডলেডিও নয়, এক বাড়িতে দুই ভাড়াটে, শিক্ষার শুরু ভাড়াটের অবলা স্ত্রীর কাছে, অবশ্য ততদিনে তিনি আর তত অবলা নন যেমনটি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

শালা, তোমার পাছাতেই লাথিটা এখন লাগাতে ইচ্ছে করছে।

যাক, অন্তত এরই মধ্যে এতটুকু উপকার হয়েছে যে, বিবির পাছায় লাথি মারবার খেয়ালটা ছুটেছে।

আন্দালিব বেরিয়ে না গিয়ে দুম করে বসে পড়ে বলে, রাঁধো শালা ইলিশ, খেয়েই যাব।

৫

এখন এই সন্ধেবেলায় 'গ্রিন আর্থ' রেস্তোরাঁয় জমজমাট ভিড়, কোনো টেবিল খালি নেই, চারজন দু'জন করে টেবিল, সেই একেক টেবিলেই দ্বিগুণ মানুষ ঠাসাঠাসি করে বসে আছে, টেবিলে টেবিলে লাল মোটা মোমবাতি জ্বলছে, বাতাসে ধূপকাঠির সুবাস, রেড ইন্ডিয়ান বাঁশির রেকর্ড বাজছে, সরু মোটা বাঁশির আরণ্যক উল্লাসিত, কখনো দুঃখমথিত সুর মানুষের কলকণ্ঠ ডুবিয়ে দিচ্ছে না, যেন কোমল করতলে কোলাহলকে ধারণ করে আছে। বিবি বড় ব্যস্ত, তার কাজের ভার শূন্য প্লেট টেবিল থেকে তুলে আনা, কাপড় দিয়ে ঘষে-মুছে পাইন কাঠের টেবিলগুলো পরিষ্কার করা, এখানে ধূমপান নিষিদ্ধ, কেউ সিগারেট ধরালে মিষ্টি গলায় শাসন করা এবং কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে আসন খুঁজে দেয়া। এরই ফাঁকে ফাঁকে সে উদ্বিগ্ন হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকায়, পথ থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এই রেস্তোরাঁ, জনাথানের আসবার কথা আছে।

বিবিই ফোন করে জনাথানকে আসতে বলেছে 'গ্রীন আর্থে'। নির্দিষ্ট সময় দেয়া নেই, আসবে জনাথান কোনো এক সময়ে, সন্ধে থেকে রাত এগারোটার ভেতরে, রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাবার আগেই, এখন সবে আটটা, তবু বড় উদ্বিগ্ন বোধ করে বিবি।

এক টেবিলে কয়েকজনের সঙ্গে বসেছিল টেড শনবার্গ, সে বিবির হাত ধরে বলে ওঠে— শিশু, তোমার পদযুগল হয় ক্লান্ত।

টেড হঠাৎ ওভাবে তাকে ধরে না ফেললে বিবি হয়তো টাল খেয়ে পড়েই যেত, এত দুর্বল সে হয়ে পড়েছে, এই প্রথম অনুভব করে বিবি।

বিবি নিজেকে সামলে নিয়ে অস্পষ্ট একটু হাসে।

হাঁ, কাজের চাপ পড়িয়াছে।

বিশ্রাম লও।

উপায় নাই।

মালিক ক্রীতদাস পরিচালক বটে। টেড বিদ্রূপ করে বলে ওঠে, ইহাদিগকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলাইতে হয়।

বিবি স্মিত মুখে অন্য টেবিলের দিকে অগ্রসর হয়।

জনাথান এখনো আসে না। সে দেরি করছে কেন? বিবি অবসন্ন বোধ করে। এবং এবার সে অনুভব করে, তার মাথা মৃদু যেন টলে উঠছে, ভেতরটা শূন্য লাগছে।

লীনা, বিবির মতোই আরেক তরুণী কর্মী এই রেস্তোরাঁর, বলে; কিঞ্চিত সুরা পান কর, সুস্থ বোধ করিবে। তুমি কি তারিখে রহিয়াছ?

চমকে ওঠে বিবি সাড়ুলা, সেটা দৃষ্টি এড়ায় না লীনার, মুহূর্তে সামলে নিয়ে বিবি বলে, না, এখনো বিলম্ব আছে।

লীনা তার কব্জির ওপর হাত রেখে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে, তারিখ পার হইয়া যায় নাই তো?

বিবি না-সূচক মাথা নাড়ে দ্রুত। বলে, কিঞ্চিত সুরা পান করিলেই সুস্থ বোধ করিব। তুমি কি পান করিবে?

এ রেস্তোরাঁয় সুরা পরিবেশন করা হয় না এবং সুরা পানের জন্যে তারা এখন বাইরেও যেতে পারবে না। বিবি কিছু পয়সা বের করে, লীনা কিছু পয়সা বের করে, হাঁ, এক বোতল রেড ওয়াইন হয়ে যাবে এতেই।

লীনা বলে, রন্ধনশালায় বিলকে গিয়া বলি, কিনিয়া আনিবে। আমিও সুরার জন্য তৃষিত বোধ করিতেছি।

লীনা আর বিল বিবাহিত নয়, তবে একসঙ্গে কিছুদিন থেকে বাস করছে, দু'জনেই পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এখন উপার্জনে মন দিয়েছে, জমানো পয়সায় ভারতে যাবে তারা। সেখানে কী করবে, সেখানে আদৌ তারা কেন যাচ্ছে, এসব বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তাদের। বিবির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতার প্রধান সূত্র, ভারত, ভারত সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর বিবির কাছে আশা করে। বিবি জীবনে ভারতে যায় নি, ভারত সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার নেই, তবু লন্ডনে আর দশটা বাঙালির মতো বিবিও ভারতীয় বলেই চিহ্নিত, এবং এটাও লক্ষণীয় যে, আর দশটা বাঙালির মতোই বিবিও ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে লজ্জিত হয়, বরং এক ধরনের দায়িত্ব অনুভব করে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে, দূরশ্রুত কল্পিত। বাংলাদেশের কথা দু'একবার যে বিলের কাছে তোলে নি বিবি, তা নয়। বলেছে, তোমরা কেন বাংলাদেশে যাও না?

বাংলাদেশ?

হাঁ, আমার সেখানে জন্ম হইয়াছিল, আমার পরিচিত ব্যক্তিরা আছেন, তোমরা আমার পত্র লইয়া যাইবে, অসুবিধা হইবে না।

ভাবিয়া দেখিব, আমরা অবশ্যই ভাবিয়া দেখিব। হাঁ, ভারত হইতে দু'এক সপ্তাহের জন্যে বাংলাদেশে যাইতে পারি।

দু'এক সপ্তাহ কেন ? অধিক দিন থাকিও।

তোমার গৃহদেশে শুনিয়াছি স্থিতিশীলতা নাই, কোনো গুরুর আশ্রমও নাই, গঙ্গা অথবা হিমালয় নাই। অধিক দিন থাকিয়া কী হইবে ? তুমি বলিতেছ, একবার না হয় যাইব।

বিল হঠাৎ জানতে চায়, বিবি, বাংলাদেশে গৃহের দরোজার কি কোনো বৈশিষ্ট্য আছে ?

গৃহের দরোজা ?

হাঁ, গৃহের দরোজা, আমি গৃহের দরোজায় উৎসাহী। আমি মনে করি যে, মানুষ যাহা কিছু উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহার মধ্যে গৃহের দরোজাই সর্বাধিক অর্থময়, সৎ এবং কাব্যময়।

অবাক হয়ে গিয়েছিল বিবি সাড়ুলা।

লীনাকে জড়িয়ে ধরে বিল বলেছিল, আমরা আমাদের জীবন গৃহের দরোজায় উৎসর্গ করিয়াছি। আমরা আজীবন গৃহের দরোজা নির্মাণ করিব, মানবের বাসগৃহে আজীবন দরোজা স্থাপন করিয়া যাইব। ইহার কোনো পারিশ্রমিক লইব না। পারিশ্রমিক লইয়া কোনো কিছু নির্মাণ করা পাপ। গৃহস্থ আমাদিগকে আহার দিবে, আশ্রয় দিবে, আমরা তাহার দরোজা নির্মাণ করিয়া দিব। আমরা কাঠে নকশা রচনা করিব, উর্বরতার নকশা, মিলনের নকশা, প্রজননের নকশা। দরোজায় বার্নিশ দিব না, কারণ কাঠ বার্নিশে লেপন করিবার মতো গুরুতর পাপ জগতে আর নাই।

আজীবন তোমরা দরোজাই নির্মাণ করিবে ? আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই ?

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ? বিল হো হো করে হেসে উঠেছিল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ? লীনা গীটারে টঙ্কার তুলে প্রতিধ্বনি করেছিল।

বিল বলেছিল, বিবি, কাহাকে বলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ? তাহার সংজ্ঞা কী ? বর্ণনা কী ?

সংজ্ঞা এই যে, মরণ শক্তি অর্জন করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হস্তগত করা, ইহাই এই জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এবং ইহার নিমিত্ত তোমাকে যে শ্রমে লিপ্ত হইতে হইবে, সেই শ্রমকাণ্ড যতই নিষ্পাপ বোধ হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখিবে যে, তুমি যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের উপকরণসমূহই নির্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছ। আমরা গৃহের দরোজা নির্মাণ করিব।

বিবি সাড়ুলা তো আসলে বাঙালিই, আসলে সে তো বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের মানুষ, আসলে তো রক্তপাত, আন্দোলন, যুদ্ধ এবং বিস্ফোরকে অনূদিত প্রতিবাদের দেশের মানুষ, তাই লীনা ও বিলের এই ব্যক্তিগত প্রতিবাদ তার কাছে হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু বিবি আবার এমন শ্রেণীর মানুষ, যারা পাশ্চাত্যের কোনো কিছু হাস্যকর বলে মনে করেও বিচলিত বোধ করে এবং নিজের ধারণা শক্তিকেই ভ্রান্ত বলে সিদ্ধান্ত করে, পরিণামে অভিনীত এবং তা নিজের কাছেই অজ্ঞাত সম্পূর্ণভাবে, এক অভিনীত আগ্রহের সঙ্গে এই জাতীয় প্রলাপকে বড় অর্থময় ও গভীর দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত বলে মাথায় তুলে নেয়।

সুরা পান করে সত্যি সত্যি বিবি বেশ চাঙ্গা বোধ করে, উদ্বেগের ধার কিছুটা কমে যায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে সে চুমুক দিয়ে আসে। এ রেস্তোরাঁয় সুরা ও সিগারেট নিষিদ্ধ, খদ্দের ও কর্মী— সকলের জন্যেই। কারণ, হেলথ ফুড ক্রাউড যাদের বলা হয়, এরা সুরা ও ধোঁয়া থেকে বাতাসকে মুক্ত রাখবার সংগ্রাম এক চূড়ান্ত সংগ্রাম বলে মনে করে, আর হেলথ ফুড ভক্ষণের মাধ্যমেই মানবের চরম মুক্তি আসতে পারে বলে গোঁড়া ধার্মিকের

চেয়েও গোঁড়ামির সঙ্গে বিশ্বাস করে।

জনাথান এখনো এসে পৌছায় নি, বিবি এখন স্বাভাবিকভাবেই এটা গ্রহণ করে। জনাথান হয়তো রেস্তোরাঁ ভাঙবার সময় আসবে, হয়তো সে বিবির সঙ্গে ফ্ল্যাটে রাত্রিবাস করবার জন্যেই তৈরি হয়ে আসবে, বরং তা ভালোই হবে, নিরিবিলিতে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে, বিবির উদ্বেগ আর থাকে না, অন্তত আপাতত আর নয়।

ভিড় কিছুটা কমে এসেছে, টেড এখনো তার টেবিলে জমিয়ে বসে আছে, হাত নেড়ে তুমুল আলোচনায় সে যে সেই সন্ধে থেকে ব্যস্ত, এখনো ভাঁটা নেই, মার্কিনিদের ভেতরে এই অফুরন্ত শক্তিটি লক্ষ করা যায়, আসলে, হ্যাম্পস্টেডের মতো আন্তর্জাতিক একটি এলাকায়, আন্তর্জাতিক অর্থ এক্ষেত্রে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ভেতরেই সীমাবদ্ধ, এখানে রেস্তোরাঁ, হামবার্গার প্লেস আর হেলথ ফুড শপগুলোতে শ্বেতাঙ্গ ভিড়ের ভেতরে এই অবিরাম চঞ্চল ও মুখর হয়ে থাকা দেখেই মার্কিনিদের সনাক্ত করে নেয়া যায়।

বিবিকে ডাকে টেড, মধু, শুনিয়া যাও।

হাঁ। চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে কোমর ঈষৎ বাঁকিয়ে দাঁড়ায় বিবি, এটা টেডের জন্যেই বিশেষভাবে রচিত কোনো ভঙ্গি বলে ধরে নিলে ঠিক হবে না, হেলথ ফুড রেস্তোরাঁয়, চলতি পোশাকের দোকানগুলোয়, 'উইথ ইট' অর্থাৎ উহার দস্তুর এই— খদ্দেরের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার কর, কর্মী যদি রমণী হয়, প্রেমিকার মতো চোখে ঝিলিক আন, ঈষৎ তার গায়ে এলিয়ে পড়, অথবা দূরেই যদি আছ তবে এমন হও যেন আমন্ত্রণ করছ।

বিবির কোমর বাঁ হাতে বেড় দিয়ে ধরে টেড, বিবির জন্যেই বিশেষভাবে সে কিছু অনুভব করছে তা নয়, মার্কিনি তরুণেরা বালিকাদের কোমরকে সামান্য পরিচয়েই হারের কব্জির মতো গণনা করে থাকে।

টেড বলে, তোমাদের নিকটে যিসাস ক্রাইস্ট সুপারস্টারের রেকর্ড অথবা ক্যাসেট আছে কি ?

বিবি চুক-চুক শব্দ করে বলে, নাটকটি দেখ নাই বুঝি ? তোমার আসিবার পূর্বেই সম্ভবত অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

হাঁ, এখানে বন্ধ হইয়া যায়। আমি কিন্তু নিউইয়র্কেই দেখিয়াছি। আমার এই বন্ধুদের বলিতেছিলাম, ঐ নাটকের সূচনাতেই জুডাসের যে গানটি রহিয়াছে, যে জুডাস পরে যিসাসকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরাইয়া দিবে, জুডাসের সেই গানটি একটি শ্রেষ্ঠ কবিতাও বটে, আমাদের জীবনে বহু ক্ষেত্রে উহার অর্থ প্রযোজ্য হইতে পারে। বলিতেছিলাম, ঐ গানটির কারণেই এ নাটক নাটক হইয়াছে, নতুবা পাদ্রীর পাঁচালিতে পরিণত হইত।

বিবি বলে, সেই গানটি তো ? যাহার শুরুতে রহিয়াছে— এক্ষণে আমার চিন্তা স্পষ্টতর হইয়া আসিয়াছে, অবশেষে আমি অতি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, অচিরেই আমরা কোথায় গিয়া পৌছিব।

বিবি মৃদু গলায় গানের প্রথম দু'টি চরণ গেয়েই শোনায়।

টেড শিস দিয়ে ওঠে। বলে, শিশু, তোমার কণ্ঠ কী সুন্দর!

সেই রেকর্ড দিয়া কী হইবে ? শুনিতে চাও বুঝি ?

হাঁ, আমার বন্ধুরা আমার বক্তব্যের সহিত একমত নহে। তাহাদের আমার মতে লওয়াইতে চাই। আমি সুখী হইব, যদি বাজাও।

বিবি রেস্তোরাঁর ম্যানেজার টিমের কাছে যায়। সে কাউন্টারে নিমীলিত চোখে বসে ছিল, গাঁজার দরুন ঠোঁটে তার দেবতার হাসি সন্ধে থেকে ঝুলে আছে। সে অনুরোধ শুনে বিড়বিড় করে মন্ত্রধ্বনি করে ওঠে, অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই।

গানটি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে টেড দূরে বিবির দিকে একটা দ্রুত চোখ টেপা উপহার পাঠায়।

বিবিও আগ্রহের সঙ্গে আবার শুনতে থাকে বহু শোনা এই গান, টেড এই গানের ভেতরে কী পেয়েছে শোনাই যাক না। বিবি কান পেতে থাকে।

পরের চরণে গায়ক গেয়ে ওঠে, 'ব্যক্তি হইতে যদি তুমি বর্ণনা বিচ্ছিন্ন করিয়া লও, তবে তুমি দেখিতে পাইবে যে, শীঘ্রই আমরা সকলে কোথায় গিয়া পড়িব। যিসাস, লোকে তোমাকে যাহা মনে করে এবং বলে, তুমি এখন তাহাই বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছ।'

ঠিক তখন সিঁড়ির ধাপে জনাথানকে দেখা যায়।

বিবি ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে।

প্রিয়তমা।

বিবির ঠোঁটে দ্রুত চুমো দেয় জনাথান।

বিবি জনাথানকে নিয়ে একটা খালি টেবিলের দিকে এগোয়, পাশ দিয়ে যাবার সময় টেড হাত টেনে ধরে এবং নিঃশব্দে সহাস্যে চোখ টেপে।

ম্যানেজার টিম ভ্রু তুলে তাকিয়ে থাকলে তার বুকে টোকা দিয়ে বিবি জানায়, সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে কি আসে নাই, উহা তোমার ব্যবসা নহে, সে মূল্য দিয়া আহার করিবে। তাকাইয়া আছ যে?

টিমের ঠোঁটে দেবতার হাসি আবার ফিরে আসে।

স্পিকার থেকে গায়কের কণ্ঠ গাইতে থাকে, 'নাজারেথ, তোমার ভূমির বিখ্যাত সন্তানটির উচিত ছিল মহান এক অজ্ঞাত ব্যক্তি রহিয়া যাওয়া, তাহার পিতার ন্যায় সূত্রধরের বৃত্তি অবলম্বন করা, তাহাতে সে উন্নতি করিত, মেজ, কেদারা ও ওক কাঠের সিন্দুক নির্মাণই তাহার পক্ষে উপযুক্ততম হইত, তবেই সে কাহারো ক্ষতি করিতে পারিত না, কাহাকেও বিচলিত করিতে পারিত না। শ্রবণ কর যিসাস, তুমি কি তোমার স্বজাতির শুভাশুভ চিন্তা কর?

জনাথানের সমুখে বসে আছে বিবি সাডুলা, খদ্দেরের ভিড় নেই, অতএব বিবির চেয়ারে বসাটা এখন আর টিমের কোনো ব্যবসা নয়। টিম এখন স্পিকারে গায়কের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিজেই গুনগুন করে গাইতে থাকে।

জনাথান বিবির দিকে ভ্রু তুলে প্রশ্ন করে, আমি দেখিতেছি তুমি নীরব।

বাক্য পরে হইবে।

বিশেষ কোনো প্রসঙ্গে?

হাঁ এবং না।

ইহা রোমান্টিকের উক্তি। কেবল তাহারাই কোনো প্রসঙ্গে নিশ্চিত হইতে পারে না। জনাথান ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, তার ইচ্ছে সে ভবিষ্যতে এমন একটি গবেষণাপত্র রচনা করবে যার প্রতিছত্রে সে রোমান্টিকতার অস্থি-মজ্জা চূর্ণ করবে।

বিবি তার এই পরিকল্পনা জানে বলেই এখন সে মৃদু হাসে। তার সেই হাসির ভিন্ন অর্থ করে জনাথান, তার ধারণা হয়, হাঁ এবং না বলার অর্থ আসলে কিছুই নয়, রহস্য করে খেলা করা।

আসলে, বিবি সাড়ুলা এখন জনাথানের আঙুল নিয়েই খেলা করতে থাকে।

জনাথান বলে, আমরা কি একত্র যাইতেছি?

হাঁ।

আমিও প্রস্তুত হইয়াছি। জনাথান চোখ টেপে।

জনাথানের পিঠে হঠাৎ চাপড় পড়ে। সে ঘুরে দ্যাখে, লীনা।

লীনা চোখ মটকে বলে, এই রেস্তোরাঁয় বালিকা তুলিবার রেওয়াজ নাই।

লীনার ঠাট্টা উপভোগ করে জনাথান তার নিতম্বে রাম চিমটি দেয়, সেই হাতের ওপর চড় মারে লীনা।

জনাথান দাঁত বের করে বলে, বালিকাই আমাকে তুলিতেছে।

লীনা বলে, পরিহাস করিও না। অচিরেই এমন দিন আসিবে, পুরুষেরা বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করিবে, রঙ মাখিয়া বর্তিকাস্তম্ভে হেলান দিয়া ভ্রু ভঙ্গি করিয়া ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা লইবে এবং রমণীরা রজনীতে তাহাদের একজনকে পছন্দ করিয়া শয্যায় লইয়া যাইবে। হাঁ, সত্য।

জনাথান আবার দাঁত বের করে বলে, দ্যাখো, এক্ষণ রজনীই বটে, আমিও পণ্য সাজাইয়া বসিয়াছি, এই ভ্রু ভঙ্গি করিলাম, তুমি কি আমাকে পছন্দ করিবে না?

ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করে বিবি সাড়ুলা এই চটুল কথোপকথনে, লীনার চোখ এড়ায় না সেটা, লীনা জনাথানের মাথায় চাঁটি মেরে সরে পড়ে।

পথে বেরিয়ে বিবি জনাথানকে বলে, আমি ঈষৎ বিচলিত, জনাথান।

হাঁ, লক্ষ করিয়াছি, লীনার পরিহাস মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

না, সে কথা নহে।

বাসের ওপর তলায় তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। বিবির ঠোঁটে সিক্ত চুমো দিয়ে জনাথান জানতে চায়, এবং সে কেন বিচলিত?

বিবি জনাথানের কাঁধে মাথা এলিয়ে দেয়। মুখে বলে, আমাকে ধারণ কর।

জনাথান তাকে জড়িয়ে ধরে অনুমান প্রকাশ করে, হাঁ? সেই উন্মাদ বালকটি কি আবার তোমাকে উত্যক্ত করিয়াছে?

না। সে কথা নহে।

তবে?

আমি শিশুর সহিত।

আলিঙ্গন শিথিল করে জনাথান বিবির মুখের দিকে তাকায়। বলে, তুমি কী বলিতেছ?

হাঁ, আমি অন্তঃসত্ত্বা।

কিছুক্ষণ পরে জনাথান বলে, তুমি কি বড়ি খাইতে না ?

না।

না ? কী বলিতেছ ?

আশ্চর্য হইতেছ কেন, জনাথান ?

এই কারণে যে, বড়ি সকলেই গ্রহণ করে, তুমি কি জান না ? বালক বন্ধু অথবা বালক বন্ধু নহে, বালিকারা ষোল বৎসর বয়স হইলেই বড়ি লয়। সম্প্রতি তো জননীরাই কন্যাদিগকে বারো বৎসর হইতেই বড়ি ধরায়।

আমার জননী কি এখানে রহিয়াছে ?

তোমার বয়স তো বারো বৎসর নহে।

তুমি রুষ্ট স্বরে কথা কহিতেছ কেন ?

রুষ্ট যদি হইয়া থাকি, তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া হইয়াছি।

বিবি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সরে বসে, রাতের সড়কে আলো দেখতে থাকে।

জনাথান তখন তাকে আকর্ষণ করে। বিবি কঠিন হয়ে সে আকর্ষণ ঠেকায়। জনাথান বলে, তবে আমারই নির্বুদ্ধিতা।

নহে ? অবশ্যই তোমার নির্বুদ্ধিতা।

আমাকে পূর্বেই বলা তোমার কর্তব্য ছিল যে, তুমি বড়ির সহিত নাই।

আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি স্বয়ং ব্যবস্থা লইয়াছ।

সে ক্ষেত্রে তুমি নিজেই তো অনুভব করিতে পারিতে।

আমার কি পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল ?

ছিল না ?

বিবি চাপাস্বরে তিরস্কার করে ওঠে, কী বলিতেছ ?

ক্ষিপ্ত হইবার মতো কী বলিলাম ? কোনো বালিকার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে ?

বিবির চোখ ভরে পানি আসে। কোনোমতে সে উচ্চারণ করে, আমাকে তুমি আঘাত করিতেছ।

জনাথান তাকে আদর করে ক্ষণকাল। দু'জনে নীরব হয়ে সমস্ত পথ কাটায়।

ঘরে এসে জনাথান জানতে চায়, কয়টি তারিখ পার হইয়াছে ?

তিনটি।

বল কী ?

বিবি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। তার পিঠের ওপর হাত বোলায় জনাথান। সে হাত হঠাৎ সরিয়ে দেয় বিবি।

তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ ?

বিবি নীরব থাকে।

চিন্তা করিতেছ কেন ? সত্য নাও হইতে পারে।

বিবি পাক দিয়ে উঠে বসে বলে, হাঁ, সত্য, সত্য। আমি পরীক্ষা করাইয়াছি।

জনাথান চুপ করে বসে থাকে। পাতাল রেলের কামরায় কত বিজ্ঞাপন দেখা যায়, 'অফিসে যাইবার পথে রাখিয়া যাউন, ফিরিবার পথে জানিয়া যাউন যে, আপনি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।' তাই এ বিষয়ে সে আর প্রশ্ন করে না।

অকস্মাৎ সে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, তুমি কি নিশ্চিত যে আমার দ্বারা হইয়াছে ?

তোমার সন্দেহ আছে ? বিবি বিছানায় উঠে বসে।

না, তাহা নহে। জনাথান ইতস্তত করে বলে, নষ্ট করিতে হইলে পিতার পরিচয় দিতে হয় তাই বলিতেছিলাম।

তুমি নষ্ট করিবার কথা বলিতেছ কি ? বিবি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

জনাথান নীরব দাঁড়িয়ে থাকে।

তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে না ?

বিবি জনাথানের গলা জড়িয়ে ধরে লতার মতো নিঃশব্দে পড়ে থাকে তার বুকে।

৬

নিজেরই হোক আর বাবারই হোক, পড়ে পাওয়া পয়সা তো আর নয় ?— দস্তুর মতো পয়সা দিয়ে ভাড়া করা ঘর, সেই ঘরে ফিরে যেতেই আজকাল আন্দালিব ইতস্তত বোধ করে, ঘরে যতক্ষণ থাকে চোর হয়ে থাকে, দরোজায় টোকা পড়লে কাঁটা হয়ে যায়, বাইরে থেকে আজকাল দেরি করে ফেরে, নিঃশব্দে দরোজার ফুটোয় চাবি দিয়ে পা টিপে টিপে ঢোকে।

তার ল্যান্ডলেডি মিসেস জলিলকেই তার এখন ভয়। কাদেরের মুখে প্রথম সেই ইঙ্গিতগুলো পাবার পর আন্দালিব মোটেই আমল দেয় নি, পরে এক সময় আবিষ্কার করে যে, কথাগুলো সে মনের মধ্যে নিজেই কখন নাড়াচাড়া করে দেখতে শুরু করেছে।

হাঁ, মিসেস জলিল আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারিণী।

হাঁ, মিসেস জলিলকে দেখে এখনো অবিবাহিতা মনে হয়।

হাঁ, এখনো তো ভ্রম হয় যে, হৃদয়ে তার আসনখানা শূন্যই আছে।

নাচে, হাঁ নাচে, এক নাচের পার্টিতেই তো তার সঙ্গে পরিচয় ? হাঁ, এখন মনে পড়ছে যে, মিসেস জলিলই তার সঙ্গে উপচে আলাপ করেছিল, সে পার্টিতে তো জলিল সাহেবের সঙ্গে তার কথাই হয় নি, যদিও অনুমান করতে পেরেছিল যে, এইই সেই ভাগ্যবান। হাঁ, আন্দালিব দেখেছে মিসেস জলিলকে নাচের সময় ঘন ছোঁয়াছুঁয়ি হতে এবং এখন তো মনেই হচ্ছে যে, মহিলা বেশ উপভোগই করছিল।

এবং মিসেস জলিল যে একটু বেশিমাত্রায় পান করে, সে আগেই লক্ষ করেছে। বেশ কয়েকটি পার্টিতে আন্দালিব লক্ষ করেছে, এখন তার মনে পড়ে যায়, সবার আগে মিসেস জলিল শূন্য পাত্র তুলে ধরে 'এই, এই' করে ডাকছে ভরে দেবার জন্যে।

সবাইকেই ঐ 'এই' ডাকটিই বা কী ? কিছু কি ইঙ্গিত দেয় না বক্তা সম্পর্কে ?

কাদের আলী এ কোন কুকথা তার মনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল ?

সকালবেলা নাশতাটা সে নিজেই বানিয়ে নেয়, বানাবার আছেই বা কী ? টোস্টারে রুটি ঠেলে দিলেই টোস্ট, মাখন জ্যাম জেলি মধু যেটা ইচ্ছে লাগিয়ে নাও, বাটিতে কর্ন ফ্লেক্স কী ঐ জাতীয় কিছু নিয়ে ফ্রিজের ঠাণ্ডা বোতল থেকে দুধ ঢালো, যতক্ষণ খাচ্ছ ইলেকট্রিক কেটলিতে পানি ফুটছে, চায়ের বস্তা ভিজিয়ে নিয়ে কাপ হাতে নিজের ঘরে চলে যাও। দুপুরবেলা বাইরে বাইরে। রাতে খাবার সময় তো আর এড়ানো যায় না, মিসেস জলিলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়ই, কষ্ট করে তিনি রান্না করেছেন, আবার একাকী তিনি আহার করবেন ? অতএব, ভদ্রতা করেই আন্দালিবকে সঙ্গ দিতে হয়। জলিল সাহেব তো সপ্তাহের ছ'দিন রাত একটায় বাড়ি ফেরেন রেস্তোরাঁর ক্যাশ বন্ধ করে, প্রায়ই তিনি আবার রেস্তোরাঁ থেকে চিকেন তন্দুরি বা অন্য কিছু নিয়ে আসেন, নান রুটি আনেন, চুপচাপ একা আহার করে ঘরে চলে যান।

ঐ যে রাতেরবেলায় খাবার সময় দেখা হয়ে যায় আন্দালিবের সঙ্গে মিসেস জলিলের, এমনকি মহিলা যে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত না খেয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, সেটাও এক কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় কাদের আলীর সঙ্গে কথা হবার পর।

আন্দালিব যখন ঘর ভাড়া নিয়েছিল, তখন বাড়তি কিছু পয়সার বিনিময়ে এদের সঙ্গেই খাবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। ঘর ভাড়া নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার রান্নাঘর ব্যবহার করবারও অধিকার বর্তে যায়, এটাই নিয়ম, কিন্তু রান্না সে একেবারেই পারে না বলে এই ব্যবস্থা করেছিল। এ দেশে এসে সবাই রান্না শিখে যায়, নিজে না রাঁধলে পয়সায় কুলোনো যায় না, আবার কুলোতে পারলেও বাইরের বিদেশী খাবার দিনের পর দিন মুখে রোচে না। অতএব, রান্নাটা বাঙালি ছেলের প্রথম অর্জিত বিদ্যা হয়ে যায় বিলেতের। বন্ধুরা বলে, আন্দালিবের বাপের সোনার খনি আছে দেশে, দেশী খেতে ইচ্ছে করে দেশী রেস্তোরাঁয় যাবে, বিদেশী খাবার তো হরেক রকম দামে মোড়ে মোড়েই পাওয়া যায়, সে কেন কষ্ট করে রাঁধতে যাবে ? তা ঠিক। তবে, বাইরে খেতে গেলে বাইরে যেতে হয়, এবং সবদিন বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না শুধু আহারের খোঁজে। তাই জলিল সাহেবের ঘরের সঙ্গে খাবার ব্যবস্থাটা করে নিয়ে বড় নিশ্চিত হয়েছিল আন্দালিব।

দু'দিন পরে সেই খাওয়ার পাটও চুকিয়ে দিল আন্দালিব।

মিসেস জলিল ভ্রু তুলে প্রশ্ন করে, আমার রান্না ভালো লাগছে না ?

নির্দোষ এই প্রশ্নটিতেও আন্দালিব গূঢ় অভিসন্ধি দেখতে পায়।

না, না, তা কেন ? ফিরতে রাত হয়, বাইরেই খাওয়া সুবিধে।

কার সুবিধে ? আপনার, না আমার ?

জালে পড়া পাখির মতো ছটফট করে আন্দালিব। মহিলার মতলব কী ? গলায় এত মাখো-মাখো কেন ? কাদের আলী কি তবে ঠিক কথাই বলেছিল ?

না, সে নির্মম হবে। সে কি গাছ দেখলেই জল ঢালবার মালী ?

আমারই সুবিধে। আমার সুবিধেটাই দেখছি, ম্যাডাম।

সকলেই দ্যাখে। আপনিই বা আলাদা হবেন কেন ?

অর্থ? এ কথার অর্থ?

নাহ, অন্য একটা ঘর দেখতে হয়। এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি জিগ্যেস করে বসে যে, ঘর ছাড়ছেন কেন? তখন কী জবাব দেবে আন্দালিব? বলবে, জলিল সাহেব, আপনার স্ত্রীকে ভয় করছি?

এ তো ভয়াবহ প্যাঁকে পড়া গেল।

যখন তখন দরোজায় টোকা।

আসুন, আসুন, টেলিভিশনে ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে।

কতদিন বলা যায় যে, হোক ভালো প্রোগ্রাম, আমি ব্যস্ত আছি?

আবার হয়তো করাঘাত।

লিকুইডাইজারের প্লাগটা বদলে দিয়ে যান না, ইলেকট্রিকের এসব ছুঁতে আমার বড্ড ভয় করে।

আচ্ছা এত ঘনঘন প্লাগটা নষ্ট হয় মিসেস জলিলের?

আগে এসব চোখে পড়ে নি, বরং নিজেই সে সঙ্গ দেবার জন্যে রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থেকেছে, টেলিভিশনে ভালো কিছু আছে কিনা ঘর থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করেছে নিজেই, এখন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মিসেস জলিল একদিন তো সরাসরি জিগ্যেসই করে বসে আন্দালিবকে, আচ্ছা, আপনার পেটে কোনো ব্যথা-ট্যথা আছে কিনা বলুন তো।

তার মানে?

হেসে খুন হয়ে সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ে মিসেস জলিল।

ইদানীং আপনার মুখ দেখে আমার তো সন্দেহ, নিশ্চয়ই ব্যথা। মদ খেয়ে খেয়ে লিভারটা দিয়েছেন তো শেষ করে?

বলা উচিত ছিল আন্দালিবের, যে, লিভার খারাপ হলে আপনারই হবে, ম্যাডাম। কিন্তু সে শংকিত হয়ে বসে থেকেছে। উঠে গেলে যদি মনে করে রাগ করে উঠে যাচ্ছে? এ মহিলা রাগ করতে দেখে হাত ধরেও টানতে পারে। এক বাড়িতে, ভরা রাতে, এক বিবাহিতা মহিলা তার হাত ধরে টানবে নাকি? তার চেয়ে বসেই থাকা যাক।

আন্দালিব একদিন আবার দ্যাখে যে, মিসেস জলিল অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর। মুখ থমথম করছে, গলার স্বর ভারী, বাক্য সংক্ষিপ্ত। এ আবার কী? নতুন কোনো কৌশল নয় তো? ঐ তো পাশে সুরার গেলাশ দেখা যাচ্ছে, কতক্ষণ ধরে খাচ্ছে কে জানে? হিতাহিত জ্ঞান কতটা আছে তাই বা কে এখন তাকে বলে দেয়? ত্রস্ত হয়ে নিজের ঘরে চলে যায় আন্দালিব। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয়, এই বুঝি দরোজায় টোকা পড়ল। না, পড়ে না। এটাই বা কেমন হলো?

আজকে অন্যান্য দিন যতটা দেরি করে ফেরে, তার চেয়ে অনেক আগে ফিরে আসে আন্দালিব। সে জানে, আজ জলিল সাহেবের ছুটির দিন, ছুটি মানে সন্ধেবেলাটা আজ তার মাফ, বাসায় থাকবে। অতএব আন্দালিবের তাড়াতাড়ি ফিরতে অসুবিধে নেই।

চাবি দিয়ে দরোজা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে যায় আন্দালিব।

দোতলায় জলিল সাহেবদের শোবার ঘর থেকে যে শব্দটা আসছে, দুঃস্বপ্নেও আন্দালিব তা শুনবে বলে আশা করে নি।

জলিল সাহেব তার স্ত্রীকে প্রহার করছে। আর, থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে মিসেস জলিল। আবার মনে হচ্ছে স্ত্রীর হাতে পাল্টা মার খাচ্ছে জলিল সাহেব। মিসেস জলিলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ তাদের দরোজা খুলে যায়, কে খোলে বোঝা যায় না, ভেতর থেকে জলিল সাহেবের চিৎকার শোনা যায়, 'হারামজাদি'। মিসেস জলিল চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে, 'বরাহশাবক, কুকুর'। এবং আন্দালিবকে দেখে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ওপরের খোলা দরোজা দিয়ে এক পাটি জুতো এসে পড়ে সিঁড়ির ওপর এবং জলিল সাহেব সবেগে বেরিয়ে এসে স্থানু হয়ে যায়।

আন্দালিব নিশ্চল নিষ্পলক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার দরোজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বেরিয়ে সে উদভ্রান্তের মতো পথ হাঁটতে থাকে। মোড়ের কাছে তখনো ভারতীয় মুদি দোকানটি খোলা, কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার জন্যে সে আশ্রয় নেয় এই দোকানে। জিনিসপত্র দ্যাখে, আধোচেনা দোকানির সঙ্গে খুচরো আলাপ করে, দোকানি বলে, এই একটু আগে দুই গোরা মাস্তান ছোঁড়া এসে দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস তুলে নিয়ে যায় দাম না দিয়েই। এমনকি একটা সান্ত্বনাসূচক কথা বলতেও সে প্রেরণা পায় না, যেন এ রকম গুণ্ডামির ঘটনায় শংকিত হবার কোনোই কারণ সে দেখে না।

নিজের চোখ কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কী দেখল সে ? এ কী শুনল ? আন্দালিব দোকান ছেড়ে বেরোয়, কারণ দোকানি তার কানের কাছে অবিরাম তার লোকসানের কথা বলে যাচ্ছিল, শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের নানা রকম কীর্তি সবিস্তার বর্ণনা করছিল এবং ইন্দিরা গান্ধী মার্গারেট থ্যাচারকে ধমকে দিচ্ছেন না বলে খোদ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিল।

দোকানের সমুখে পাঁচটি পথ এসে মিলেছে, জটিল মোড় পেরুবার সুবিধের জন্যে মাটির তলা দিয়ে পথিকের পায়ে হাঁটা পথ করে দেয়া আছে, পাঁচদিক থেকে পাঁচটি রাস্তার পাশ দিয়ে নেমে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে পাঁচটি প্যাসেজ, মাটির নিচেও এক গোল চক্কর, যদিও তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে কোন পথ ওপরে কোথায় গিয়ে উঠেছে, এখন আন্দালিবের মন নেই পড়ে দেখবার, আসলে তার কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যই নেই এখন।

যে-কোনো একটা নিয়ে সে এগোয়, সিঁড়ি বেয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে, দেখতে পায় যে, ভারতীয় সিনেমা হলের সমুখেই সে হাজির হয়েছে, ছবি শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই, তবু বড় কৃতজ্ঞ বোধ করে সে সিনেমা হলটির উপস্থিতির জন্যে, সে টিকিট করে ঢুকে পড়ে, হেমা মালিনীর মুখ পর্দায় অর্থহীন রঙ নিয়ে উপস্থিত, আন্দালিব পর্দায় অনবরত থেকে থেকেই মিসেস জলিলকে দেখতে পায়।

গভীর রাতে সে ঘরে ফিরে আসে, জুতোর কোনো শব্দ না করে, এমনকি নিঃশ্বাসও শাসন করে সে ঘরে ঢুকে যায়, সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, নির্বাপিত, জলিল সাহেব বা মিসেস জলিল বাড়িতে আছে কিনা, দু'জনেই আছে কিনা, এক ঘরেই আছে কিনা, লিভিং রুমে কেউ নেই তো ?— নানা রকম ভাবতে ভাবতে আন্দালিব শয্যায় যায়। অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

না, প্রাণের কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

নিহত নয় তো ?

লাফ দিয়ে উঠে বসে আন্দালিব, শীতের ভেতরেও তার কপাল ঘামে ভিজে ওঠে, অস্বাভাবিক গতিতে বুক টিপ টিপ করতে থাকে, হাঁ, এ রকম তো হয়, একাধিক হয়েছে, আন্দালিব ঘর ছেড়ে বেরোয়, পানির তৃষ্ণা পায় তার, লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে রান্নাঘরে যেতে হয়, দরোজার হাতল ঘুরিয়ে দ্যাখে, ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ কি ? অথবা তার স্নায়ু তাকে প্রতারণা করছে ? সে আবার হাতল ঘোরায়, অবিলম্বে দরোজাই খুলে যায়, ভেতর থেকে খোলে, আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দালিবের মুখের ওপর।

আন্দালিব আবিষ্কার করে, মিসেস জলিল আজ লিভিং রুমের সোফায় শয্যা নিয়েছে, আন্দালিব বড় নিশ্চিন্ত বোধ করে, হঠাৎ জ্বর ছেড়ে যায় যেন, মিসেস জলিল নিরাপদ আছে তাহলে।

দ্রুত চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে আন্দালিব ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে, শীতের দেশে হিম পানি ছাড়া পিপাসা যায় না, স্বাদ লাগে না, পুরো দু'গেলাশ ঢকঢক করে খেয়েও পিপাসা মেটে না তার। সে নীরবে নিজের ঘরে ফিরে যায়, পেছনে আবার বন্ধ হয়ে যায় লিভিং রুমের দরোজা, বড় শোবার ঘর থেকে জলিল সাহেবের নাক ডাকবার ধ্বনি আসে।

স্ত্রীকে প্রহার করবার পর লোকটি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ?

শয্যায় বসতে বসতে বিদ্যুৎ ছুঁয়ে ফেলবার মতো চমকে ওঠে আন্দালিব। সেও তো বিবিকে প্রহারই করতে চেয়েছিল ? সেও তো ভেবেছিল, বিবিকে প্রহার করতে পারলে তার চোখে শান্ত ঘুম সহজে নেমে আসত ? সে কি বিবিকে অশ্লীল ভাষায় তিরস্কার করে নি একদিন টেলিফোনে ? করেছিল তো ?

আন্দালিব দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। তার ভেতরটা মনে হয় কাঁদছে, কিন্তু চোখ ভিজে আসে না, শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে না, সে নিজেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বিস্মিত হয়ে যায় এবং মুখ তুলে ভাবতে থাকে, বিবিকে আমি কি এখনো প্রহার করতে চাই ?

ভোরবেলায় মিসেস জলিল তাকে বলে, দুঃখিত।

আন্দালিব বাইরে বেরুবার জন্য পা বাড়ায়, মিসেস জলিল পেছন থেকে ডাক দেয়। আন্দালিব ফিরে তাকিয়ে মহিলার বড় বিষণ্ন মুখ হঠাৎ আবিষ্কার করে এবং ধীর পায়ে ঘরে ফিরে আসে। মমতার স্পষ্ট গুঞ্জন সে শুনতে পায় নিজের ভেতরে। সে বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিল বিবির কলেজের উদ্দেশে, কথা না বলুক বিবি, আন্দালিব দূর থেকে একটিবার তাকে দেখবে, বিবিকে দেখবার জন্যে সে কলেজের লাগোয়া বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকবে, কাচের ভেতর দিয়ে চোখ রাখবে। চোখ তুলে সে দেখতে পায় মিসেস জলিল তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। মিসেস জলিল সজল চোখে তাকিয়ে আছে।

অপ্রতিভ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় আন্দালিব।

মিসেস জলিল বলে, আপনি তো সবই দেখেছেন। আপনার কি মনে হয় আমি খারাপ ? আমি নষ্ট ? বলুন না ?

আন্দালিব নিজেকেই বলতে শোনে এবং বুঝতে পারে না এটা তার সুচিন্তিত মত না প্রতিধ্বনিত উত্তর, না, না।

আপনি জানেন আন্দালিব ?— আমি পান করি, আমার অপরাধ। আমি নাচ করি— আমার বেহায়াপনা। আমি সবার সঙ্গে মিশি— আমার পাপ আছে মনে। আমার স্বামী বলে। অথচ, ও-ই একদিন আমাকে মদ তুলে দিয়েছে হাতে, আমাকে নাচের ক্লাশে ভর্তি করে দিয়েছে সে নিজে, আর আমি তার বন্ধুদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চললে আমার স্বামীই আমাকে বলেছে, আমি মফস্বলের মেয়ের মতো করছি। আমি ট্রাউজার পরতে চাই নি, রাগ করে একদিন সে-ই আমার সঙ্গে সারারাত কথা বলে নি, আর এখন আমি জিন্স পরলে আমাকে ওপরে ঝোলা জামা পরতে হুকুম করে।

আন্দালিব কী বলবে ? অনেকক্ষণ পর সে বলে, এসব আপনি তাকে মনে করিয়ে দিলে পারেন ? অথবা, অভ্যেসগুলো না হয় ছেড়েই দিলেন, উনি যখন পছন্দ করছেন না।

কেন ছাড়ব ?

ভ্রু তোলে আন্দালিব, নিঃশব্দে।

আমি জানি আমি কোনো পাপ করছি না; অন্তত আমার দেশের ছেলেরা এখানে যা করে, করে পার পায়, মাথা উঁচু করে চলে, বুক ফুলিয়ে গল্প করে নষ্টামির, আর দেশে গিয়ে আদর্শ স্বামী সাজে, তাদের তুলনায় আমি তো জায়নামাজের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, আন্দালিব। আমার সম্পর্কে আপনি অনেক কথা শুনবেন, লোকের মুখে, আমার স্বামীর মুখেও শুনবেন, কিন্তু আমি তা নই। পুরুষ সাহেব সাজলে সফিস্টিকেটেড বলে প্রশংসা পায়, মেয়েরা মেম সাজলে তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করা হয়। এই তো ? নয় ?

অস্বস্তিতে আন্দালিব ছটফট করতে থাকে।

দেখছেন তো, আপনার নিজেরই অসুবিধে হচ্ছে। শুনতে চাচ্ছেন না। শুনতে ইচ্ছে করে না। তা করবে না। তবু আপনাকে শুনতেই হবে, কাল রাতের পর আপনি আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন, আমি তা হতে দেব না।

না, আমি কোনো, মানে কোনোই ভুল ধারণা, বাহ, সব না জেনে না শুনে ভুল ধারণা কেন করব ?

মিসেস জলিল কিছুক্ষণ তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, আমি বিশ্বাস করি না। পুরুষেরা মেয়েদের নিয়ে ভুল ধারণা করতে এক পা বাড়িয়ে থাকে।

ক্রোধ হতে থাকে আন্দালিবের। না মিসেস জলিলের প্রতি নয়; বিবি সাড়ুলার কথা মনে পড়ে যায়, মমতা কখন উধাও হয়ে যায়, আন্দালিবের হাত মুঠো হয়ে আসে। কখনোই নয়, বিবির প্রতি তার সন্দেহ অমূলক নয়; সে শুনেছে, সে ঐ লম্বাচুলো শাদা ছেলেটিকে নিজের চোখে দেখেছে এবং বিবি তাকে দরোজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কারণ বিবির সাহস নেই তার মুখোমুখি হবার, এটাই বিবির বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ।

আন্দালিব ঈষৎ বাঁকা কণ্ঠে এখন উচ্চারণ করে, তাহলে আপনার স্বামী কি পুরো মনগড়া সন্দেহ করছেন ?

অর্থাৎ, আপনি এখন তার পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন।

আমার তো কারো পক্ষ নিয়ে কথা বলবার দরকার নেই। আমি এসব জানতেও চাই নি। আপনিই বলে যাচ্ছেন।

আন্দালিব উঠে দাঁড়ায়। মিসেস জলিলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

হাঁ, আমি বলে যাচ্ছি। কারণ, আপনিই বাইরে বলে বেড়াবেন কাল রাতের কথা, বাঙালি বিলেত এসেও বাঙালি, বিকেলের মধ্যে টেলিফোনে টেলিফোনে সারা লন্ডন শহর জানবে, লন্ডন মানে বাঙালির লন্ডন জেনে যাবে যে, আমার স্বামী আমার গায়ে হাত তুলেছে, তারা ধরেই নেবে যে, স্বামী যখন গায়ে হাত তুলেছে, তখন নিশ্চয়ই সে চোখে কিছু দেখেছে, আর একজন স্বামী চোখে কী দেখলে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে বলুন তো ? পুরো লন্ডনের প্রত্যেক বাঙালি ধরে নেবে যে, আমাকে আপনার সঙ্গে দেখেছে, হাঁ, কারণ আপনিই বাড়িতে আছেন। আর, আপনি যখন তাদের এই অনুমানটি শুনবেন, আমি আপনাদের চিনি, আপনি যদি আপত্তি করেনও তো এমনভাবে করবেন যেন কিছু কিছু সত্যি, আপনি ঠোঁট চেপে চেপে হাসবেন, লজ্জা পাবার ভান করবেন, কারণ আপনার তাতে আনন্দ হবে, বন্ধুরা আপনাকে ঈর্ষা করবে, আপনি নিজেকে পুরুষ বলে অনুভব করবেন।

মিসেস জলিল, আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, আজকেই, এখুনি।

না।

না ? বিস্মিত হয়ে আন্দালিব প্রশ্ন করে, কেন ?

এই জন্যে যে, তাতে গুজবটা আরো দানা বাঁধবে। আপনি এ বাড়িতেই থাকবেন। আমি লন্ডনের এই গুজব, এই ইঙ্গিত, এই যা নয় তাই শুনে শুনে, আর পারছি না। আমি যদি এই শহর ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারতাম, এই বাঙালিদের জিহ্বা থেকে দূরে যেতে পারতাম!

ইচ্ছে করলেই পারেন। আপনি দেশে ফিরে যেতে পারেন।

দেশে ?

হাঁ, দেশে।

ম্লান হাসে মিসেস জলিল।

কেন ? দেশে যেতে তো সব সময়ই পারেন, পারেন না ?

সেখানে গিয়ে কী করব ? জলিল কী করতে পারবে ? ক'টা পয়সা রোজগার করতে পারবে সে ?

কিন্তু দেশে তো মানুষ আছে ? তারা ভালোও তো আছে ?

হাঁ, আছে। আপনার বাবার মতো যারা, তারাই কেবল ভালো আছে। কথাটা বলেই মিসেস জলিল অপ্রস্তুত হয়ে যায়, বাবার প্রসঙ্গটা ঝোঁকের মাথায় টেনে এনে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বলে, তাছাড়া, আমার শ্বশুরবাড়ি ভালো নয়। আপনাকে এত আর কী বলব, বলুন। শুধু এই বলি যে, জলিল তার মায়ের কথায় ওঠে বসে, তার বোনের জন্যে হা-হুতাশ করে মরে। বোনের স্বামী গরিব, এখান থেকেই চুরি করে টাকা পাঠায় তাকে। দেশে গেলে ? এখানে বসেই আমার শাশুড়ির চিঠি পাই, আমি তার ছেলেকে পর করে ফেলেছি, আমি রাক্ষসী। ছেলে মায়ের কাছে ফিরে গেলে ? না, আমি দেশে ফিরে যাব না, যেতে চাই না। এত কথা

আপনাকে বললাম, আমার স্বামীকে তো বলা যায় না, [illegible]

হেসে ফেলে মিসেস জলিল, আঁচলে [illegible] মুছে বলে, আমি দেশে যেতে চাই না শুনে আমার স্বামী মনে করে, আমি এখানে থেকে যেতে চাই পরপুরুষের সঙ্গ পাবার জন্যে, মদ খাবার জন্যে, ঢলাঢলি করবার জন্যে। কাল রাতে জেদ করে বলেছিলাম, হ্যাঁ, তাই যদি মনে কর, তাই। তখন সে আমার গলা টিপে ধরে।

আন্দালিব শিউরে উঠে, বলে, বলছেন কী? আপনিই বা ওরকম বলতে গেলেন কেন? একটা কিছু যদি হয়ে যেত?

তখন কি আর অত ভেবেছি? বলল, এই বাড়ি বিক্রির জন্যে এজেন্টের কাছে বলে এসেছে। এই বাড়ি বিক্রি করলে নাকি হাজার দশেক পাউন্ডের মতো লাভ হবে। সেই টাকা দিয়ে দেশে ব্যবসা করবে। আমি তো জানিই, টাকা নিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজন অর্ধেক টাকা কেড়েছিঁড়ে কেঁদে কেটে নিয়ে নেবে। বাকি টাকাতে, ঢাকায় যে খরচ শুনি, একটা বছর পেরুতে পারবে না, সংসারে উড়ে চলে যাবে। তারপর?

কী কাণ্ড বলুন তো। আন্দালিব কথাটা বলে ঐ গলা টিপে ধরার স্মৃতি উদ্দেশ করে, মিসেস জলিল বোঝে ভিন্ন রকম।

মিসেস জলিল ধরে নেয় যে, আন্দালিব জলিলের নির্বুদ্ধিতা দেখে মন্তব্য করছে। তাই সে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে বলে, আচ্ছা, আপনিই তাহলে বলুন, দেশে ফিরে গিয়ে লাভ? আমি তো সব চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কই? এই যে আপনি, আপনার মুখে তো কখনো শুনি না যে দেশে না ফিরে গিয়ে আপনার জীবন বৃথা হয়ে যাচ্ছে?

কথা শেষ করেও অনেকক্ষণ হাতের ভঙ্গি ধরে রাখে মিসেস জলিল, মনে হয় যেন পায়রা উড়িয়ে মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে সে।

শ্বাস নিয়ে আন্দালিব বলে, আমার মুখে শোনেন না, তার কারণ কী জানেন?

মিসেস জলিলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এ যাবত তার নিজের মাথায় আসে নি এরকম কোনো ক্ষুরধার যুক্তির উচ্চারণে দেশে না যাবার সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হবার আশায়।

আন্দালিব বলে, কারণ, আমি দেশে ফিরে যাব।

আপনি? না, না। যাহ্।

কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?

আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনি দেশে ফিরে যেতেই পারেন না।

আপনি ভুল করছেন। আমি ফিরে যাবই।

তো বসে আছেন কেন? পড়াশোনাও তো ছেড়ে দিয়েছেন? কীসের আশায় বসে আছেন তবে?

ব্যক্তিগত।

ও, ব্যক্তিগত। প্রেম ট্রেম? ইংরেজ মেয়ে?

শেষ প্রশ্নটির উত্তর দেয় আন্দালিব, না।

তাহলে?

আন্দালিব ইতস্তত করে যে, সত্যি কথাটা বলেই ফেলবে কিনা— নিজের পড়াশোনা বড় কথা নয়, দেশে তার অন্য চিন্তা নেই, কিছুদিন বিলেতে বাস করাটা পারিবারিক সুনামের জন্য দরকার, সেটা পূরণ হয়ে গেছে, সে অপেক্ষা করছিল এতদিন বিবির শেষ পরীক্ষার জন্যে, যে একসঙ্গেই দেশে ফিরবে, আর এখন অপেক্ষা করছে বিবির শেষ দেখবার জন্যে।

আন্দালিব মনোভাব গোপন করে সংক্ষেপে বলে, দৃঢ় গলায়, আজ হোক, আর দু'দিন পরে হোক, দেশে তো আমি ফিরে যাবই। এখানে বাস করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কোন দুঃখে ?

ঐ 'দুঃখ' শব্দটাতে আহত বোধ করে মিসেস জলিল এবং তখন পাল্টা আঘাত করবার উদ্দেশে বলে, না, আপনাদের আবার দুঃখ কী ? ভুলেই গিয়েছিলাম। দেশে আপনাদের কোটি টাকার ব্যবসা, গুলশানে বাড়ি, দেশে যাবেন যখন ইচ্ছে দেশ থেকে বেরুতে পারবেন বলেই। কী জানেন ? দেশে যেতে চাইবে না তারাই, দেশে একবার ফিরে গেলে দেশ থেকে আর বেরুবার উপায় বা সঙ্গতি যাদের নেই। আপনি যে সে দলে নন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

আন্দালিব হেসে বলে, অপমান করছেন নাকি ?

বাংলাদেশে ধনী হওয়াটা কিন্তু খুব সুনামের নয়।

সেজন্যেই বিদেশে বুঝি ধনী হতে চাইছেন ?

কে ? আমি ? এদেশে বাড়ি গাড়ি থাকলেই কি ধনী হয় ? সবই যে ধারের টাকায় জানেন না ? বলতে পারেন, বাংলাদেশের তুলনায় এখানে ধনী না হই, ধনীর অভিনয় তো করতে পারছি ?

মহিলার প্রখর জিহ্বা আর চিন্তাকে প্রকাশ করবার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে, নিজের প্রায় অনিচ্ছাতেই আন্দালিব এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করে।

আন্দালিব আন্তরিকতার সঙ্গে অনুনয় করে বলে ওঠে, যান না, দেশে একবার গিয়েই দেখুন না ? আপনার ওসব ভয় টয় সত্যি নাও হতে পারে।

মাথা ঝাঁকিয়ে মিসেস জলিল বলে, না।

চোখ কুঞ্চিত করে আন্দালিব প্রশ্ন করে, যদি আপনাকে ফেলেই আপনার স্বামী চলে যায় ?

চমকিত চোখ তোলে মিসেস জলিল, এবং ক্ষণকালের জন্যে। আন্দালিব আবার প্রশ্ন করে, তখন কী করবেন ?

কী করব ? যদি একাই যায়, আমি কী করব ?

হাঁ, আপনি কী করবেন ? তাকে ছেড়ে দেবেন ?

মিসেস জলিল ঠোঁট তুলে অর্থহীন একটা ভঙ্গি করে, কেন করে, স্পষ্ট হয় না, তারপর বলে, কাল রাতের পর, এখন বলতে পারি, স্বচ্ছন্দেই তাকে ছেড়ে দিতে পারব।

এবং এখানে একা থেকে যাবেন ?

এবং এখানে থেকে যাব।

আন্দালিব লক্ষ না করে পারে না যে, মিসেস জলিল অসম্পূর্ণ প্রতিধ্বনি করেছে, প্রতিধ্বনি থেকে 'একা' শব্দটি অনুপস্থিত।

৭

বেল শুনে দরোজা খুলে দেয় ডাঃ মজুমদারের স্ত্রী বারবারা, বলে, অ্যানডি, ভিতরে আইস, ভিতরে আইস, তোমার ফোন পাইয়া তোমারই অপেক্ষা করিতেছিল জুম, হঠাৎ একটি জরুরি কল পাইয়া রোগী দেখিতে গিয়াছে। হ্রস্বকালেই ফিরিয়া আসিবে। তুমি কিছু পান করিবে ? কিছু দিতে পারি ?

ধন্যবাদ।

ইহা একটি অস্পষ্ট উত্তর। পান করিবে, কি করিবে না ?

না। আপনার স্বামীর উপস্থিতিতে আমি পান করি না। এক্ষণেই আসিয়া পড়িবেন, একটি পাত্র অপচয় করা হইবে।

বারবারা প্রাণহীন বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, হাঁ, আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, তোমরা গুরুস্থানীয়ের উপস্থিতিতে সুরা পান অথবা ধূম্রপান কর না। এই রীতি, হাঁ এই রীতি।

ঠিক কী বলতে চায় বারবারা, আন্দালিব ঠাহর করতে পারে না, তবে তাকে যে করুণা করা হলো ঐ অস্পষ্ট বাক্যাংশ উচ্চারণ করে, তা সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। আসলে, বারবারার সমুখে সে বরাবরই কাঁটা হয়ে থাকে, কারণ, বারবারার কাছে প্রাচ্যের কিছুই যথেষ্ট অগ্রসর বা পরিশীলিত নয়, সে কারণে এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে একটিবারও সে স্বামীর দেশে যায় নি। মাঝে মাঝে আন্দালিব কৌতুকের সঙ্গে না ভেবে পারে নি যে, প্রাচ্যের সবই যদি মন্দ তো তার প্রাচ্য দেশীয় স্বামীটি ব্যতিক্রম হয়ে গেল কীসে ? স্বামীটি ডাক্তার বলে ? ইংরেজ ডাক্তার কখনো ইংরেজ নার্স বিয়ে করে না বলে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বারবারা প্রাচ্য দেশীয় ডাক্তারের গায়ের রং আর ঘ্রাণ সহ্য করে নিয়েছে ?

বারবারা নিজের জন্যে একটি গেলাশ নিয়ে ফিরে আসে, নিজের জন্যে ঢালতে ঢালতে বলে, সত্য তুমি লইবে না ? এবং গেলাশে চুমুক দেবার আগে বলে, তোমার আনুগত্যের প্রতি পান করিতেছি।

কী বলবে অনেকক্ষণ কিছু বুঝতে না পেরে, নীরবতা বড় অস্বস্তিকর বিবেচনা করে এবং বারবারার ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকা দেখে, আন্দালিব বলে ওঠে, বাংলাদেশে কবে যাইবেন ?

বারবারা ত্রস্ত গলায় বলে, যাইব মানে ? যাইবার তো কোনো কথাই নাই।

না, বলিতেছিলাম মাত্র।

তুমি কি ফিরিয়া যাইতেছ ?

হাঁ, তবে তারিখ ধার্য করি নাই।

আশা করি যাইবার পূর্বে একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে।

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি হয়ে গেল, বারবারাও যথেষ্ট আত্মীয়তা প্রকাশ করা হয়েছে ভেবে বুক হালকা করে নিঃশ্বাস ফেলে গেলাসে চুমুক দিল।

ঈষৎ সতর্কস্বরে আন্দালিব কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করে, জাহানারা কি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে ?

এ বাড়িতে বিবির আসল ভালো নামটাই বহাল রয়ে গেছে।

বারবারা ভ্রু তুলে আন্দালিবকে একটু নিরীক্ষণ করে সংক্ষেপে বলে, কশ্চিৎ। তারপর গেলাশে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে, তোমাদের বিবাহ কবে পর্যন্ত হইতে পারিবে বলিয়া ধারণা কর ?

উহা আমার পিতা ও তাহার পিতা জানেন।

বারবারা আবার সেই প্রাণহীণ বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, হাঁ, আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, তোমাদের বিবাহ পিতা-মাতারাই স্থির করিয়া থাকেন।

ডাঃ মজুমদারের কোন পিতা-মাতার অপেক্ষায় তাঁর সঙ্গে বারবারার বিয়েটা ঠেকে ছিল, জানতে ইচ্ছে করে; আন্দালিব নিজেই অনুভব করে যে তার নিজের ঠোঁটে হাসির কুঞ্চনা দেখা দিচ্ছে, সে সংযত হয় এবং দুটো কারণে তা হয়— বারবারার চোখ বড় তীক্ষ্ণ, হাসির উপলক্ষটি তার কাছে গোপন থাকবে না, আর যে কথা বলবার জন্যে আজ সে ডাঃ মজুমদারকে ফোন করে এখানে এসেছে তার জন্যে নিজেকে কঠিন ও তৈরি রাখাটা জরুরি।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

দৃষ্টি, সে আসিয়া পড়িয়াছে।

বারবারা উঠে গিয়ে দরোজা খুলে দেয়।

ডাঃ মজুমদার আন্দালিবকে দেখতে পাবার আগেই হল থেকে উঁচু গলায় বলতে বলতে ভেতরে আসেন, অ্যানডি, দুঃখিত, বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। আন্দালিবকে দেখামাত্র, বলেন, তোমাকে উত্তম দেখাইতেছে। কতদিন পরে দেখিলাম। অবশ্যই ভালো ছিলে। ফোনে তোমার কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইল।

বারবারা আসন না নিয়ে স্বামীর হাতে একটা গেলাশ দিয়ে বলে, রন্ধন অপেক্ষা করিতেছে; তোমরা তো একটি কথোপকথন করিবে। হাঁ ?

বারবারা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ডাঃ মজুমদার জীন টনিকে চুমুক দিয়ে বলেন, কোনো ভনিতা না করেই— আমি শ্রবণ করিতেছি।

আন্দালিব নীরব থাকে।

চোখ ঈষৎ বুঁজে অপেক্ষা করছিলেন ডাঃ মজুমদার, এবার চোখ খুলে আন্দালিবের দিকে তাকান। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, ইহা কি জাহানারা বিষয়ে ?

আন্দালিব বাংলাতেই উত্তর দেয়, হাঁ।

ডাঃ মজুমদার ইংরেজিতেই কথা চালিয়ে যান। এবং অতঃপর ?

আপনার সঙ্গে তার এর মধ্যে দেখা হয়েছে ?

হাঁ।

কবে দেখেছেন শেষ ?

উহা দুই সপ্তাহ পূর্বে।

আপনার কিছু চোখে পড়েছে ?

ডাঃ মজুমদার চিকিৎসক, এবং একজন তরুণীর সাক্ষাতে তার কিছু চোখে পড়বার ইংগিত একটিই হতে পারে, তিনি এখন ভ্রু তোলেন প্রশ্নের গূঢ় ভঙ্গিতে। কিন্তু আন্দালিব চিকিৎসক নয় বলেই বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারে না যে, সে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এইমাত্র। আসলে, আন্দালিব এখনো জানে না যে বিবি সাড়ুলা অন্তঃসত্তা।

আন্দালিব বলে, আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি যে, জাহানারা এখন আর সেই জাহানারা নেই।

ডাঃ মজুমদার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে যান এ কথা শুনে; যাক, শারীরিক কোনো প্রসঙ্গ নয় তবে। তিনি বলেন, তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছ কি ?

আন্দালিব চুপ করে থাকে।

হাঁ, অবশ্যই বিবাদ করিয়াছ। আমি কি ইহাকে প্রেমিকের বিবাদ বলিতে পারি ? শীঘ্রই দেখিবে, তোমরা উভয়ে ভুলিয়া গিয়াছ; তুমি দেখিতে পাইবে যে জাহানারা, পূর্বের মতোই জাহানারা রহিয়াছে। আমাকে মধ্যস্থ মানিবার জন্য পরে স্বয়ং লজ্জিত হইবে।

না চাচা, না, আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি জানেন না। জাহানারা এখন যা হয়েছে, তার বাবা শুনলে হার্টফেল করবে। আপনাকে দোষ দেবে, যে আপনি কিছুই দেখেন নি, খোঁজ নেন নি, আপনার সামনেই, আপনি থাকতেই, একটা মেয়ে নষ্ট হয়ে গেল, তার মেয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

তুমি কী বলিতেছ ?

এসব বলবার জন্যেই আপনার কাছে আসা। জাহানারা কলেজে যায় না। কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, তারপর, জাহানারা কোনো বাঙালি বাড়িতে যায় না।

ইহা অপরাধ নহে, অ্যানডি।

আরো আছে, চাচা। আপনাকে বলতে লজ্জা হয়, তবু না বলে পারছি না, দোষ আপনার কাঁধেই পড়বে যে, আপনি দেখেন নি বা তার বাবাকে জানান নি, জাহানারা এক ইংরেজ বালকের সহিত একত্র বাস করিতেছে।

একত্র বাস করিতেছে ? ডাঃ মজুমদার গুম হয়ে যান। আবার বলেন, জাহানারা একত্র বাস করিতেছে ?

হাঁ, অনেকদিন থেকে।

বিমর্ষ কণ্ঠে ডাঃ মজুমদার বলেন, আমি তাহার পিতাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, দায়িত্ব লইতে পারিব না। বারবারা বারংবার আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। আমি জানি জাহানারার পিতা অত্যন্ত বিচলিত হইবেন। এবং বারবারা আমাকে ক্ষমা করিবে না। আমাকে এ বিবরণ তোমার বহু পূর্বে দেওয়া কর্তব্য হইয়াছিল।

ডাঃ মজুমদারকে চিন্তিত দেখে আন্দালিব এখন আরো জোর দিয়ে বলে, চাচা, আপনি নিজেই খোঁজ নিয়ে দেখুন, এক বর্ণ যদি মিথ্যে হয়। তাকে আপনি জোর করে দেশে পাঠিয়ে দিন, অথবা তার বাবাকে লিখে দিন, এসে মেয়ে নিয়ে যান।

কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে ডাঃ মজুমদার বলেন, তুমি নিশ্চিত, তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নাই ?

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, সে ইংরেজ ছেলের সঙ্গে আছে কিনা ?

ডাঃ মজুমদার এখন আরেকবার জীন টনিক নেন। আপন মনেই বলেন, কিন্তু সরবে— ইহাই যাহা ঘটিতেছে। কন্যার জন্য নহে, তাহার পিতার জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম।

বহুদিন পরে প্রাণের ভেতরে তৃপ্তি অনুভব করে আন্দালিব।

কিন্তু তার সে সুখবোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

ডাঃ মজুমদার উষ্মায় ফেটে পড়েন।

ইহা তোমারই দোষ, হাঁ, ইহা ছিল তোমারই দুর্বলতা, অ্যানডি, তুমি ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। বরং আমা হইতে তোমারই দায়িত্ব অধিক ছিল। আমি তাহার প্রণয়প্রার্থী ছিলাম না; আমি নিতান্তই পিতৃবন্ধু; তুমি ছিলে ভবিষ্যৎ স্বামী। সেই তুমি এখন বালিকা লোকসান করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। এখনো সময় আছে, আর কিছু হস্তগত করিতে না পার, এই সভ্য দেশ হইতে কিঞ্চিৎ বাস্তববোধ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাও। হাঁ, বঙ্গবাসীকে আমি ভালো করিয়াই জানি, তাহারা নিজেদের বিবাদে অপরকে ডাকিতে অভ্যস্ত; এই করিয়াই বঙ্গবাসী একদা ইংরেজকে ডাকিয়াছিল, দেশ হারাইয়াছিল; একদা পাঞ্জাবিদিগকে ডাকিয়াছিল, পাকিস্তান দেখিয়া অচিরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল; মাত্র গতকালের কথা, ভারতকে ডাকিয়া আনিল, ভারত এখন কান মলিতেছে। ইহা তোমাদিগেরই রক্তে রহিয়াছে বটে। তুমি এখন শুভরাত্রি বলিয়া বিদায় লও।

আন্দালিব অবশ্যই দেখিয়ে দিতে পারত এবং সেটুকু বুদ্ধি তার এখনো আছে, যে, ডাঃ মজুমদার কি অতঃপর বিবি সাডুলাকে নিজের করে নেবার কথাটি এখন ভাবছেন ? নইলে তাঁর দেয়া তুলনাগুলোর আর কী অর্থ করা যায় ?

আন্দালিব যা জানে না, তা হলো এই যে, দেশত্যাগী যে-কোনো মানুষকেই কারণে অকারণে দেশের দুর্বলতা আবিষ্কার করতে হয় এবং প্রসঙ্গ থাক আর নাই থাক, সেটা তিক্ততার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়।

বারবারা এসে উঁকি দেয়। ডাঃ মজুমদারের উচ্চকণ্ঠ শুনে সে আসে এবং শীতল চোখে পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করে।

হাঁ, বারবারা, অ্যানডি বিদায় লইতেছে, শুভরাত্রি বলিবার জন্য তোমার সন্ধান করিতেছিল। শুভরাত্রি।

দরোজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেন ডাঃ মজুমদার। শেষ মুহূর্তে তার কাঁধে দ্রুত হাত রেখে বলেন, অবশ্য আমি অনুসন্ধান করিব। এই বঙ্গবাসীরা সুদূর এই দ্বীপেও আমাকে শান্তিতে রহিতে দিল না। তুমি আমাকে তোমার ফোন নম্বর দিয়া যাও।

দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

আন্দালিব বেরিয়ে এসে পাতাল রেল স্টেশন থেকে টেলিফোন করে; বিবি সাডুলার নম্বর সে ডায়াল করে; অনেকক্ষণ ফোন বেজে চলে, কেউ তোলে না। বিবি কি ফ্ল্যাটে নেই ? অন্য বাসিন্দারা তো আছে, তারা কেন ফোন তুলছে না ? হঠাৎ সে ভ্রু কুঞ্চিত করে; তার চোখে

পড়ে যে, সে তার নিজের ঠিকানাতেই ডায়াল করে বসে আছে; এক্ষুণি হয়তো মিসেস জলিলের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে; সে দ্রুত ফোন নামিয়ে রাখে। বিবিকে নতুন করে ডায়াল করবে ?

বিবিকে কি এখন সে বলতে পারে, আন্দালিব নিশ্চিত বোধ করে না; সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ভূ-গর্ভে নেমে যায়।

৮

একজন স্কটিশ ও একজন তুর্কি ডাক্তারের সঙ্গে গ্রুপ প্র্যাকটিস করেন ডাঃ মজুমদার; তাঁদের সার্জারিতে পরপর তিনটি কামরা, বাইরে বড়সড় ওয়েটিং রুম, দু'জন সেক্রেটারি; সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত রোগী দেখা হয়, তারপর ডাক্তারেরা কলে বেরোন, যেসব রোগী শয্যাগত, তাদের দেখতে যান। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত দম ফেলবার সময় পান না ডাক্তারেরা, এলাকাটি বড়, লোকসংখ্যা অনেক; তার ওপরে সরকারি খরচে চিকিৎসা বলে এ দেশের অনেকেই বিনা কারণে বা সামান্য কারণেই এসে হাজির হয় সার্জারিতে; অনেকে তো শুধু চিকিৎসার সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে চোখের পানি ফেলতে; আবার অনেক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আসে কেবল দুটো কথা কইবার সুযোগের জন্যে। এগারোটার পরে রোগী দেখা শেষ করে ডাঃ মজুমদার স্যান্ডুইচে কামড় দেন কফি খান— এটুকুই যা দম ফেলবার সময়, তারপর কলে ছুটতে হয়।

ডাঃ মজুমদার রোগী দেখা শেষ করে সবে স্যান্ডুইচের মোড়ক খুলেছেন, এমন সময় তাঁর সেক্রেটারি মিসেস ম্যাকডারমিট এসে তার সুরেলা স্কটিশ উচ্চারণে জানায়, ডাক্তার, আরো একজন অপেক্ষা করিতেছে।

মিসেস ম্যাকডারমিট প্রৌঢ়া এবং স্কটিশ, উভয় কারণেই কিঞ্চিৎ বাৎসল্য-প্রবণ। ডাঃ মজুমদার ঈষৎ বিরক্ত হয়ে ভ্রু তোলেন প্রশ্ন করেন, আমাদের লিস্ট অন্তর্ভুক্ত রোগী ?

যা সন্দেহ করেছিলেন তিনি তাই, না, এর নাম লিস্ট অন্তর্ভুক্ত নয়, হাঁ সেই সকাল থেকে বসে আছে; না, সে অপর দু'জন ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। মিসেস ম্যাকডারমিট বলে, ধারণা করি, বালিকা কোনো বিপদে পড়িয়াই আসিয়াছে। মিসেস ম্যাকডারমিট নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অপেক্ষা করে এখন।

ডাঃ মজুমদার নিঃশব্দে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন; দ্রুত এবং কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে স্নেহশীলা সেক্রেটারি সেই অপেক্ষমানকে আনতে যায়, অবিলম্বে ফিরে আসে, মিসেস ম্যাকডারমিটকেই খোলা দরোজায় শুধু দেখা যায়, সে সুরেলা গলায় পেছনে তাকিয়ে আহ্বান করে— এইস্থলে তুমি হও।

ডাঃ মজুমদার বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ান।

ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে জাহানারা সাদুল্লা।

তার পেছনে দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

ডাঃ মজুমদার টেবিল ঘুরে সমুখে এসে বাংলাতে উচ্চারণ করেন, তুমি ?

মাত্র গতকাল সন্ধেবেলায় এসেছিল আন্দালিব, জাহানারা এই প্রাক-মধ্যাহ্নে। ব্যাপার কী ? তিনি তবে ঠিকই ধরেছিলেন, যে ওদের একটা বিবাদ হয়েছে আসলে। এখন চিন্তিত হন

এই ভেবে যে, বিবাদটি নিশ্চয়ই গুরুতর পর্যায়ে হয়েছে। ডাঃ মজুমদার চিকিৎসক, রোগীর গোপনীয়তা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অন্যক্ষেত্রেও তিনি পালন করতে তৎপর; তিনি মুহূর্তের ভেতরে সিদ্ধান্ত নেন— আন্দালিবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা তিনি বালিকার কাছে প্রকাশ করবেন না। এবং জাহানারাকে সহজ করবার জন্যে ডাঃ মজুমদার বলেন, কখন থেকে বসে আছ শুনলাম, স্লিপ লিখে পাঠালেই তো বেরিয়ে আসতাম। স্যান্ডুইচ খাচ্ছিলাম। খাবে একটা ?

জাহানারা মাথা নাড়ে নিঃশব্দে। তার নীরবতা উদ্বিগ্ন করে ডাঃ মজুমদারকে; জাহানারা কখনোই নীরবে থাকবার মেয়ে নয়; তাঁর স্মরণ হয়, সামান্য প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি আধ ডজন বাক্য উচ্চারণ করে থাকে।

ডাঃ মজুমদার বলেন, হঠাৎ এলে যে খবর না দিয়ে ? সার্জারিতে কখনো আস না। কোনো সমস্যা ? বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ডাঃ মজুমদার ইংরেজি ভাষায় ফিরে যান শেষ প্রশ্নটিতে।

জাহানারা নীরবেই মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ উত্তোলিত ভ্রূসহ অপেক্ষা করেন ডাঃ মজুমদার, কোনো সংলাপ উচ্চারিত হতে না শুনে তিনি নিজেই এবার বলেন, ব্যক্তিগত সমস্যা ?

হাঁ।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা ?

জাহানারা আবার নীরবে স্বীকৃতিসূচক মাথা দোলায়।

আমি দেখিলাম। বলে ডাঃ মজুমদার নিজেই এবার নীরব হয়ে যান।

জাহানারা স্খলিত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে, আমার আব্বুকে আপনি বলবেন না।

আমি দেখিতেছি, তুমি এখন আমার রোগী। আমি চিকিৎসক।

এবার কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাহানারা।

হাঁ, তুমি নির্ভয়ে বলিতে পার। আমি আনন্দিত যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ। সাধারণত বালিকারা এইসব ক্ষেত্রে ভুল জায়গায় সাহায্য প্রার্থনা করে।

জাহানারার বুক থেকে পাষাণ নেমে যায়, সে অনুভব করে যে, ডাঃ মজুমদার সমস্যাটির চেহারা বুঝতে পেরেছেন, বর্ণনা দেবার দরকার হবে না আর।

জাহানারা বলে, আমি উদ্বিগ্ন, আমি এই উদ্বেগ হইতে মুক্তি চাই।

ডাঃ মজুমদার চোখ নামিয়ে কী ভাবেন; জাহানারা আবার উদ্বেগ অনুভব করে; তিনি কি তাহলে সাহায্য করবেন না ?

ডাঃ মজুমদার হঠাৎ ক্রুদ্ধ বোধ করেন আন্দালিবের প্রতি। দ্রুত কিছু যুক্তি ও সিদ্ধান্ত তার মাথার ভেতরে শেকল বেঁধে গড়ে ওঠে। এক, আন্দালিব বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক, তবু সে মিলনকালে কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয় নি। দুই, জাহানারাকে অন্তঃসত্তা বলেই মনে হচ্ছে এবং বোঝাই যাচ্ছে যে, আন্দালিব তাকে একাই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। তিন, আন্দালিব তার দায়িত্ব অস্বীকার করছে এবং শুধু তাই নয়, সে এক কাল্পনিক ইংরেজ যুবককে আমদানি করেছে, যাতে দোষ সেই যুবকের ঘাড়েই সে দিতে পারে। চার, আন্দালিব এতেই ক্ষান্ত নয়, জাহানারার বাবাকে পর্যন্ত অবহিত করাতে চেষ্টা নিচ্ছে; কতদূর অধঃপাতে

গেলে সে কাল সন্ধ্যায় এসে একজন দায়িত্বশীল, করদাতা নাগরিক এবং প্রায় পিতার বয়সী ব্যক্তিকে স্বপক্ষে ব্যবহার করবার জাল বিস্তার করে যেতে পারে ?

ডাঃ মজুমদার জাহানারার সমুখে এসে টেবিলে এক পা ঝুলিয়ে বসেন, হাত রাখেন তার কাঁধে, তার নিজের মেয়েটি আর কয়েক বছরের ভেতরেই জাহানারার বয়সী হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, মেয়েকে তিনি বড়ি দিতে শুরু করবেন, বারবারাকে বলবেন, রাতে দুধের সঙ্গে বড়ি দিতে, মেয়েকে না জানিয়ে।

ডাঃ মজুমদার সস্নেহে জিগ্যেস করেন, কয়টি তারিখ পার হইয়াছে ?

এই লইয়া চারটি।

চারটি ?

হাঁ।

এতকাল অপেক্ষা করিয়াছিলে কেন ?

বুঝিতে পারি নাই।

ডাঃ মজুমদার তিরস্কারের স্বরে বলেন, আহ, বুঝিতে পার নাই। রমণী হইয়া কি তোমাদের জ্ঞান হয় না যে, সকল দুঃখের ভার তোমাদিগকেই বহন করিতে হয় ? বস্তুতপক্ষে, গর্ভ রমণীরই হয়, পুরুষের নহে। হাঁ, কবে শিখিবে ? আবার কোমল স্বরে তিনি উচ্চারণ করেন, জগত এইরূপই বটে, পরবর্তীকালে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে। তুমি নিশ্চিত হইলে কী করিয়া ?

পরীক্ষা করাইয়াছিলাম।

প্রভাতের প্রথম বর্জিত জলের পরীক্ষা ?

জাহানারা নীরবে স্বীকৃতি দেয়।

ডাঃ মজুমদার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। যে সব প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় পরীক্ষা করে থাকে, তারা দু'ধরনের হয়। একরকম আছে, তারা মিথ্যা ফল প্রকাশ করে বালিকাকে ভীত করে এবং তাদেরই পরিচিত, এমনকি তাদেরই অংশীদার, প্রতিষ্ঠানে গিয়ে গর্ভপাত করতে বলে, সেই কাজটিও অমূলক, অনভিজ্ঞা বালিকা বিশ্বাস করে এবং প্রচুর পয়সা দিয়ে নিশ্চিত মনে বেরিয়ে আসে। আরেক জাতের প্রতিষ্ঠান আছে, যারা সত্যি সত্যি পরীক্ষা করে এবং আসল ফলটাই জানিয়ে দেয়, কিন্তু ভারমুক্ত করবার দায়িত্ব নেয় না, বালিকাকে পরামর্শ দেয়, ডাক্তারের কাছে যেতে।

তোমাকে কি তাহারা ডাক্তারের সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছে ?

হাঁ।

একদিকে নিশ্চিন্ত হন ডাঃ মজুমদার, যে, জাহানারা ভালো প্রতিষ্ঠানেই গিয়েছিল, আবার দুশ্চিন্তায় পড়েন— জাহানারা সত্যিই তাহলে বিপদগ্রস্তা।

ডাঃ মজুমদার চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসেন এবং জাহানারার দিকে দীর্ঘক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বলেন, তুমি কি ভারমুক্ত হইতে চাও ?

হাঁ।

ইচ্ছা করিলে তো সন্তান রাখিতে পার।

না।

ইহাতে লজ্জার কী আছে ? বিবাহ্ করিয়া লও। এইরূপ বহু হইতেছে। তোমাকে বলিব কী ? আমার কন্যাও আমাদের বিবাহের পূর্বেই আসিয়াছিল।

জাহানারা ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ডাঃ মজুমদারের দিকে। তিনি নীরবে মাথায় সামান্য দোল দিয়ে আগের বক্তব্যটিকে সত্যি বলে চিহ্নিত করেন।

তুমি কী বল ?

না।

কেন ? আন্দালিব তোমাকে আর চাহে না ?

চমকিত হয়ে ওঠে জাহানারা এবং আবিষ্কার করে যে, আন্দালিবকেই তিনি সন্তানের পিতা বলে ধরে নিয়েছেন। এতক্ষণ তার আশংকা ছিল, এখানে আসবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় থেকে তার একটি সংকট যাচ্ছিল যে, পুরুষটির পরিচয় যদি জানতে চান ডাঃ মজুমদার সে কী উত্তর দেবে ?

সংকট আরো ভয়াবহ, জনাথানের নাম করবার অসুবিধে এই যে, জাহানারা তার বাবাকে জানে— তিনি হয়তো টাকা পাঠানোই বন্ধ করে দেবেন, তিনি হয়তো তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, জাহানারা দেশে ফিরে যেতে চায় না, ওর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতি এই যে, জনাথান এখন অনবরত সন্দেহ প্রকাশ করছে যে, দায়িত্ব তার নাও হতে পারে, অন্য কেউ হয়তো আছে যার কথা জাহানারা তাকে কখনো বলে নি এবং তবু সে জাহানারার সঙ্গে এক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিল, সেখানে ভারমুক্ত হবার ফিস সাড়ে পাঁচশো পাউন্ড শুনে জনাথান সরাসরি বলে দিয়েছে, এত অর্থ তার নেই, সংগ্রহ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, বলতে গেলে তারপর থেকেই জনাথান আর আশেপাশে ভিড়ছে না, এর আগে জনাথানকে বিয়ে করবার কথা গুরুত্বের সঙ্গে কখনোই ভাবে নি জাহানারা, এবার ভেবেছে এবং জনাথানকে বলেছে, কিন্তু জনাথান যে আপত্তি দেখিয়েছে তা কেবল বাংলাদেশেই শোনা যায় বলে জাহানারার ধারণা— জনাথানের বড় দু'ভাই এখনো বিয়ে করে নি, তার বাবা মা আগে তার বিয়েটা কিছুতেই মেনে নেবেন না। যদি সাড়ে পাঁচশো পাউন্ড জাহানারার থাকত, তাহলে সে জনাথানকেও আর খুঁজত না, বা ডাঃ মজুমদারের কাছে আসত না।

সুযোগটি অবিলম্বে গ্রহণ করে জাহানারা সাদুল্লা।

সে উচ্চারণ করে, না।

আন্দালিব দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছে ?

হাঁ।

তাহাকে উত্তমরূপে চাবকানো উচিত হয়। শ্বাস নিয়ে ডাঃ মজুমদার প্রশ্ন করেন, সে কি অপর কাহাকেও উল্লেখ করিতেছে ?

হাঁ।

কাহার কথা উল্লেখ করিতেছে ?

এক ইংরেজ বালকের কথা।

তাহার কোনো অস্তিত্ব আছে ? বন্ধু ? সহপাঠী ?

না, তাহার কোনো অস্তিত্ব নাই।

হাঁ, বঙ্গদেশীয় যুবকদেরই এইরূপ ব্যবহার হয় বটে। আমি দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারিতাম একদা, করি নাই, আমার নীতিবোধ ছিল। হাঁ, বঙ্গদেশীয় যুবকেরা এইরূপ ক্ষেত্রে স্বদেশীয় কোনো ব্যক্তিকে না দেখাইয়া ইংরেজ যুবক উপস্থিত করিয়া থাকেন। কেন জান ? লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে। বঙ্গদেশীয়রা শ্বেতাঙ্গ কাহাকেও তো চরিত্রবান বলিয়া মনে করে না, বিশেষত তরুণ ও তরুণীদিগকে। কিন্তু সেই পাপী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বঙ্গদেশীয় রাক্ষসটি জানে না যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার গাত্র বর্ণেই বুঝা যাইবে, পিতা বঙ্গদেশীয় অথবা শ্বেতাঙ্গ।

আঁতকে ওঠে জাহানারা; এ সম্ভাবনা তার মাথায় আসে নি; সে ঝরঝর করে চোখের পানি বইয়ে দিয়ে তখন বলে, চাচা, আমাকে উদ্ধার করুন, দোহাই, আমাকে উদ্ধার করুন।

চোখ মোছার জন্যে টিসু কাগজের বাক্স তার সমুখে ঠেলে দেন ডাঃ মজুমদার। সাদুল্লা সাহেবের কথা স্মরণ করেন তিনি; এ বিপদ থেকে জাহানারাকে উদ্ধার না করলে সাদুল্লা সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, গোড়াতেই এ দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার জন্যে আবার বারবারা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এবং বাঙালিদের আদ্যোপান্ত উদ্ধার করবে— ডাঃ মজুমদার নিজ মুখে যতই সমালোচনা করুন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর, বারবারার মুখে সে সমালোচনা শুনলে এখনো তিনি তীক্ষ্ণ অস্বস্তি বোধ করেন, অপরাধ ও গ্লানি বোধ হয় এবং সেটা যে কেন হয় সনাক্ত করতে না পেরে নিজের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে যান তিনি, এ সবই তার স্মরণ হয়।

ডাঃ মজুমদার বলেন, আমার উত্তম আমি করিব, কন্যা। না, আমি আন্দালিবকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না। তুমি ভয় পাইও না, আমি ব্যবস্থা করিব। এদেশে, একমাত্র জীবন সংশয় ক্ষেত্রে গর্ভপাত করা অনুমোদিত, আমি না হয় সেইরূপই বলিব। আমি আনন্দিত যে, তুমি এমন জায়গায় যাও নাই, যেখানে গলা কাটিয়া ফিস লয়, এবং নারীদেহের স্থায়ী ক্ষতি করিয়া ছাড়িয়া দেয়। হাঁ, এই সভ্য দেশেও হাতুড়ের অভাব নাই। আন্দালিব তোমাকে সেইরূপ কোনো জায়গায় লইয়া যাইতে পারিত। সে যে লয় নাই, বস্তুত সে যে তার পিতৃত্বই অস্বীকার করিয়াছে, ইহাই এখন স্বস্তি।

জাহানারা সাদুল্লা কৃতজ্ঞতায় হাত কচলাতে থাকে, প্রশ্ন আঁকা হয়ে থাকে কখন তাকে মুক্ত করবেন ডাঃ মজুমদার ? কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই এখনো তিনি বলেন না। হাসপাতালের আতংক, মুক্তি সম্ভাবনার আনন্দ, এবং আন্দালিবকে জড়িত করবার অপরাধবোধ, সমস্ত কিছু অনূদিত হয়ে দ্রুত হৃৎস্পন্দন হয়ে যায় জাহানারার।

ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে বেরোয় জাহানারা।

তুমি কাল আমাকে সার্জারিতে ফোন করিবে।

মিসেস ম্যাকডারমিট কাউন্টারে কাগজপত্র দেখছিল, চোখ তুলে সে বলে, নাম লিখিয়া লইব কি ?

ডাঃ মজুমদার দ্রুত বলেন, সে আগামীকাল আমরা দেখিব। বাংলায় জাহানারাকে বলেন, বুঝতে পেরেছে। মিসেস ম্যাকডারমিট থেকে দূরে সরে যাবার পর যোগ করেন, বহুদিনের মেডিক্যাল সেক্রেটারি প্রভাতে তোমাকে দেখিয়াই অনুমান করিয়াছে, নহিলে তোমাকে

অপেক্ষা করিতে না বলিয়া অন্য দিবসে আসিবার জন্য সাক্ষাৎ নির্ধারণ করিয়া বিদায় দিত। আমিও তাহার একটি সংলাপেই বুঝিয়াছিলাম, ইহা হয় অন্তঃসত্তা কোনো কুমারী।

রোগী দেখতে যাবার পথে হাসপাতালে রেল স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দেন তিনি জাহানারাকে। জাহানারা বিদায় নেবার সময় মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে, ধন্যবাদ।

হাঁ, অপর একটি কথা।

জাহানারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার কী কথা ?

অ্যানডি বিষয়ে।

শীতল হয়ে যায় জাহানারা সাদুল্লা। ডাঃ মজুমদার এতক্ষণ আন্দালিব বলে উল্লেখ করছিলেন, এখন অ্যানডি ব্যবহার করলেন, এই প্রথম— জাহানারার কানে বাজে।

হাঁ, অ্যানডি বিষয়ে।

ডাঃ মজুমদার গাড়ি থেকে নামেন; ভীত চোখে জাহানারা তার বেরিয়ে আসা লক্ষ করে। অ্যানডির কথা আবার কেন ?

ডাঃ মজুমদার জাহানারার কাঁধে হাত রাখলেন।

এ সবই তুমি একদিন বিস্মৃত হইবে। আমার বিশ্বাস অ্যানডিও তাহার ভুল উপলব্ধি করিবে। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, অ্যানডি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। ইহার পরও আমি সুখী হইব, অ্যানডির সহিত তোমার বিবাহ যদি হয়।

জাহানারা মাথা নিচু করে থাকে। কারণ, তার জানা নেই যে এই পরিস্থিতিতে কোন অভিব্যক্তির আশ্রয় নেয়া উচিত।

ডাঃ মজুমদার জাহানারার কাঁধে ঈষৎ চাপ দেন।

অ্যানডি তোমার স্বদেশীয়, তুমি অ্যানডিকে আমার নিকটে লইয়া আসিও। যদি পার, সাক্ষাতেই তাহাকে আন না কেন ? না, আমি তাহাকে কিছুই বলিব না। তিরস্কার করিব না। চিকিৎসা প্রসঙ্গও উল্লেখ করিব না। আমি শুধু পছন্দ করিব, তাহাকে তোমার সহিত একত্র দেখিতে।

মনের ভেতরে আবর্তিত ও নিরুদ্দিষ্ট বোধ করে জাহানারা। ডাঃ মজুমদারের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করে। যদি তিনি তাকে ভারমুক্ত করতে রাজি না হন ? এবং শুধু আন্দালিবের সঙ্গে তাকে একত্র না দেখে ?

জাহানারা মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে, সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

আমি বিশ্বাস করি না। গত সন্ধ্যায় আন্দালিবকে তিনি স্মরণ করেন; তিনি কি লক্ষ করেন নি যে, আন্দালিব জাহানারার বিরুদ্ধে যত কথাই বলুক, তার পেছনে ছিল মমতা, নইলে বারবার সে কেন সাদুল্লা সাহেবকে জানাতে বলছিল ? জাহানারাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বলছিল ? এত উদ্বিগ্ন কেন তাকে দেখাচ্ছিল ? ডাঃ মজুমদার বলেন, কন্যা, সে তোমাকে ভালোবাসে। এই প্রৌঢ়ের বাক্যে আস্থা রাখিও। তুমি তাহাকে লইয়া আইস।

সে বাসা বদল করিয়াছে। আমি তাহার ঠিকানা জানি না।

হাঁ, তোমরা এতদূর পর্যন্ত বিবাদ করিয়াছ ? তাহার টেলিফোন নম্বর আমার নিকটে আছে।

তুমি তাহাকে ফোন কর না কেন ? তোমার পিতা সুখী হইবেন। পিতা মাতাকে অসুখী করিও না, নিজে সুখ পাইবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ডাঃ মজুমদার। আন্দালিবের ফোন নম্বর না দিয়েই তিনি দ্রুত গাড়িতে গিয়ে বসেন ও চলে যান।

৯

আন্দালিবের দরোজায় টোকা পড়ে।

অ্যানডি। মিসেস জলিলের স্বর কোকিলের অনুকরণে ডেকে ওঠে, উ—হু—উ।

হাঁ।

ফো—ও—ন।

আন্দালিব বেরিয়ে আসে এবং মিসেস জলিলের চোখে দুষ্টুমি দেখতে পায়। ভ্রু কুচকে আন্দালিব বলে, আমার ফোন ?

একটি বালিকা।

ওহো, তাই এই সুর, এই চোখের ঝিলিক ?

হলঘরে পেছন ফিরে রিসিভার তোলে আন্দালিব, সে জানে লিভিং রুমে কান পেতে আছে এখন মিসেস জলিল।

বালিকা ? শুনেই বুকের ভেতরে ধ্বক করে উঠেছিল আন্দালিবের। এমন কোনো জানাশোনা তার নেই যে ফোন করতে পারে। নাকি, কাদের আলী শেষ পর্যন্ত একটি ব্যবস্থা করে ফেলেছে তার জন্যে ? ডুবিয়েছে।

নিচু গলায় সাড়া দেয় আন্দালিব, হ্যালো।

অপর প্রান্ত নীরব।

হ্যালো—ও।

অপর প্রান্তে খসখস শব্দ ওঠে। নিঃশ্বাস ফেলছে ? নড়েচড়ে দাঁড়াল ? না, সর্দি হয়েছে, নাকের শব্দ ?

হঠাৎ একটি অবিশ্বাস্য উচ্চারণ, নিমীলিত একটি স্বর, কেবল একটি ধ্বনি কম্পন, অ্যানডি।

বিবি ?

অপর প্রান্ত আবার নীরব।

বিবি ? তুমি ? কোথায় তুমি ? না, তুমি কেন আমাকে ফোন করিবে ? ইংরেজিতে আন্দালিব শেষ ভাগ উচ্চারণ করে। নিজের অভিমান সে লক্ষ করে এবং নিজেকে শাসন করতে পারে না বলে নিজের ওপরে দ্বিতীয় অভিমান হয় তার।

অপর প্রান্ত থেকে হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে আসে। বিবি সাডুলার স্বর শোনা যায়—কেন ফোন করিব ? তুমি হও একটি নির্বোধ গাভী, তাই ফোন করিব।

সেই নির্মল হাসি, সেই উচ্চারণ, এই তিরস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব, তিরস্কারটি ক্রোধের নয়, প্রেমের; বস্তুত, মানভঞ্জনের পালায় যার পদক্ষেপ প্রথম, তারই এই কণ্ঠ, পুরনো ক্রোধের উচ্চারণকে পরিহাসে বদলে দেবার পরেই এই অভিনয় রীতি। আন্দালিব

হাসতে হাসতে বলে, আমার নম্বর পাইলে কীরূপে ?

সাধনা করিতে হইয়াছে।

তাই ?

হাঁ, যুবরাজ। ফোন নম্বর সংগ্রহ করিতেই যদি এইরূপ সাধনা করিতে হয়, তবে তো সম্মুখে পর্বত রহিয়াছে।

বিবি, তুমি কোথায় ?

বিবি সাডুলার উচ্ছল উচ্চারণ ভেসে আসে, তোমার হৃদয়ে কি নহে ? হাঁ ?

অবশ্যই মিসেস জলিল কান পেতে আছে, তবে লিভিং রুমের দরোজা ঈষৎ ফাঁক।

আন্দালিব টেলিফোনে ফিসফিস করে বলে, ফোনে অসুবিধা রহিয়াছে।

সাক্ষাতেও কি অসুবিধা ?

আন্দালিব কি স্বপ্ন দেখছে ?

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, বিবি সাডুলা অপর প্রান্তে উচ্চারণ করে এখন— এই দ্যাখো, তোমার সঙ্গে ইংরেজি বলছি। আবার তুমি ক্ষেপে যাবে তো ?

না।

খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাকে। বেহায়ার মতো বলছি।

না, না।

ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

হাঁ।

সত্যি বলছি।

হুঁ।

ও, তোমার তো ওদিক থেকে কথা বলবার অসুবিধে আছে বললে। তাই বল ? আমি ভাবি, কী হলো ? শুধু হুঁ-হুঁ না-না করছ।

হাঁ।

আন্দালিবের পেছন দিয়ে মিসেস জলিল একবার ঘুরে যায়।

অপর প্রান্ত থেকে স্বর ভেসে আসে— অ্যানডি, আজ বিকেলে কী করছ ? ঠিক আছে, অসুবিধে আছে তো, তুমি উত্তর দিও না, আমি বলে যাই, তুমি হাঁ-না কর। সময় আছে বিকেলে ?

বিকেলে কেন, এখনই সময় আছে আন্দালিবের; আজীবন সময় আছে তার। মুখে সে বলে, হুঁ।

মিসেস জলিল দূর থেকে চায়ের কাপ দেখিয়ে নিঃশব্দে ভঙ্গি করে, অর্থাৎ, চা চলবে ? আন্দালিব মাথা দোলায়— না, চা চাই নে।

বিবি সাডুলা বলে চলে, বিকেল, ধর, তিনটে।

হুঁ।

হ্যাম্পস্টেড টিউব স্টেশনে ?

হুঁ।

স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে ?

হুঁ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে বিবি সাড়ুলা। আশেপাশে কান পেতে আছে, না ? রাখি তাহলে। রাখলাম। রাখি ?

তারপরেও কিছুক্ষণ লাইন বজায় থেকে যায়, রিসিভার রেখে দেবার শব্দ হয় অবশেষে, আন্দালিব নিজের ঘরে ফিরে যায়; অচিরে আন্দালিবের দরোজায় আবার টোকা পড়ে। আবার ফোন কি ? কই, শব্দ তো শোনে নি সে ?

মিসেস জলিল ঘাড় বাঁকিয়ে জানতে চায়, ইস্ত্রিটা যে নিয়েছেন, আর ফেরত দেবেন না ?

তাও ভালো। আন্দালিব আশংকা করেছিল, ফোনের কণ্ঠস্বর ছিল কার, জানতে এসেছে মিসেস জলিল। ছি! কী ভাবছে সে ? এতটা অভদ্র ভাবা তার উচিত হয় নি। আন্দালিব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চায়, সত্যি, বড় ভুল হয়ে গেছে, ছি ছি, কিছু মনে করবেন না। ইস্ত্রিটা তার হাতে তুলে দেয়; ইস্ত্রি পেয়েও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মিসেস জলিল, মূর্তির মতো। তারপর হঠাৎ যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, শরীর দোলা দিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়।

দরোজা বন্ধ করে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, পেছনে দূরে বনের ভেতর দিয়ে রেল সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে আন্দালিব, গুরু গুরু শব্দ ওঠে, হিস হিস করে ট্রেন বেরিয়ে যায়; আন্দালিব হঠাৎ শিস দিয়ে ওঠে।

ডাঃ মজুমদার। হাঁ, ডাঃ মজুমদার নিশ্চয়ই বিবিকে এমন শাসন করেছেন যে ভূত ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আন্দালিব গিয়েছিল, ঐ কথাগুলো বলেছিল, বিবিকে ফিরে পাবার আশায় নয়, বিবিকে নাকাল করবার জন্যে, শক্তি দেবার জন্যে, তার জীবনটাকে তছনছ করে দেবার জন্যে। বিপরীতে হিত হয়ে গেল যে। নিজের ঐ ক্রোধের জন্য, ঐ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবার জন্য নিজের কাছেই সে বড় অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। এবং আবার শিস দিয়ে ওঠে।

না, না, বিবি নিশ্চয়ই অন্য কারো প্রেমে পড়ে নি। এ সবই শোনা কথা এবং বাঙালির মুখে শোনা কথা। নিতান্ত শোনা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইংরেজ ছেলে ? বিবিই তো সেদিন ফোনে বলেছিল, বলে নি ? যে, বাঙালিরা নিজেদের মেয়েকে লন্ডনে একটু স্মার্ট দেখলেই, আর হাতে না পেলেই ধরে নেয় ইংরেজের পাল্লায় পড়েছে। ইংরেজ তো কত সহপাঠী আছে বিবির; লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে কি বাঙালি ছেলে শুধু ? সহপাঠী কেউ কেউ তো বন্ধু হবেই; ঢাকায় সব সহপাঠী বন্ধুই কি প্রেমিক!

ছি, ছি, সে বলেছিল কী ? সে সন্দেহ করেছিল কী ? ভাবতেও এখন লজ্জিত মথিত পরাজিত মনে হয় নিজেকে। সে কী করে ভাবতে পেরেছিল যে, বিবি শয্যায় শুয়ে আছে ঐ শ্বেতাঙ্গ তরুণটির সঙ্গে যাকে সে বিবির দরোজায় দেখেছিল। এমনও তো হতে পারে, তরুণটি গাঁজায় দম দিয়ে বুঁদ হয়ে ছিল, তাই আন্দালিবকে বলেছে, ভুল ঠিকানা, ভুল ফোন নম্বর, বিবি বলে কেউ নেই। আন্দালিবের মনে পড়ে যায় তরুণটির চোখ ছিল আধবোঁজা, উচ্চারণ ছিল শ্লথ ও জড়িত। অবশ্যই সে তখন নেশার জগতে ছিল; আর সেটা ধরতে না পেরে

আন্দালিব কী অশ্লীল কথাই না বিবিকে ফোনে বলেছে।

লন্ডনের সবচেয়ে গভীর তলে অবস্থিত পাতাল রেল স্টেশন হ্যাম্পস্টেড। কতকাল পরে আন্দালিব আবার আসে এখানে। বিবির সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার দিনগুলো মনে পড়ে যায় এই এলাকায়। বিবির ওপর অভিমান করেই সে যেন এতদিন বর্জন করে এসেছে হ্যাম্পস্টেড। লিফট নিয়ে ওপরে উঠে আসে আন্দালিব, আবার সে জগতে উঠে আসে, রৌদ্রে উঠে আসে, ভবিষ্যতের ভেতরে উঠে আসে। এত গভীর থেকে উঠে আসতে সেই মান্ধাতা আমলের লিফট বহু সময় নেয়, আন্দালিবের বুক অসহিষ্ণু হয়ে ফেটে পড়তে চায়। ছুটে এসে বিবি তাকে জড়িয়ে ধরে। এমনকি বিবির মুখও সে ভালো করে দেখবার অবকাশ পায় না, এত দ্রুত এসে সে তার বুকে মুখ লুকোয়।

ও অ্যানডি, অ্যানডি, অ্যানডি।

বিবি একটু পরেই মুখ তুলে নিজেকে সামলে নেয়, সরে যায়, কিন্তু আন্দালিবের বাঁ হাত পেঁচিয়ে ধরে রাখে; সমস্ত বিকেল তারা হ্যাম্পস্টেডের অরণ্যস্থলীর ভেতরে হেঁটে বেড়ায়।

জান অ্যানডি এতদূরে হ্যাম্পস্টেডে কেন তোমাকে আসতে বলেছি ? এখানে আমরা বেড়াতাম।

আমরা এখন আবার বেড়াচ্ছি।

মনে পড়ে অ্যানডি, ঐ লেকের পাড়ে বেঞ্চ ? আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে হাঁস দেখতাম।

আমরা এখন আবার হাঁস দেখছি।

ভুলে গেছ অ্যানডি, তুমি ঐ ঢালু বেয়ে আমাকে তাড়া করছিলে ?

আমরা এখন আবার তাড়া করছি।

আমি পড়ে গিয়েছিলাম।

তুমি আবার এখন পড়ে গেলে যে।

আবার তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরবে না ?

এই তোমাকে জড়িয়ে ধরছি।

চল, ঐ বনের ভেতরে যাই।

আমরা এখন বনের ভেতরে।

তুমি এখানে, মনে আছে ?

আমি এখানে, এই তো আছি।

এখানে প্রথম তুমি, আমার মনে আছে।

এখানে প্রথম তুমি চুমো নিয়েছিলে. এই আবার দিলাম।

বিবি সাডুলা এই জন্যেই তো আন্দালিবকে এখানে এনেছে, আন্দালিবের আবার সব মনে পড়বে; আন্দালিবের বিশ্বাস ফিরে পেতে প্রচুর কথা তাকে বলতে হবে না, স্মৃতিময় ভুবনই তাদের আলিঙ্গনে বেঁধে দেবে।

ঘাসের ওপর পাশাপাশি শুয়ে থাকে দু'জন; আন্দালিবের হাত বুকের ওপর টেনে নিয়ে খেলা করে বিবি সাডুলা; বিকেলের সোনার মতো রোদ তাদের দেহের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে লেগে থাকে।

ও বিবি, তোমার কী হয়েছিল ?

ভূতে পেয়েছিল।

মানুষ-ভূত নয় তো ?

না, অ্যানডি, না, কেউ না।

তুমি কি আমাকে এখনো ভালোবাস ?

আমার পাশে যে শুয়ে আছে, আমি তাকে ভালোবাসি, তোমাকে না।

তোমার পাশে এখন কি আমি নেই ?

আমার পাশে কি এখন তুমি নেই ?

দু'জনে নির্ঝরের মতো হেসে ওঠে।

ও বিবি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

অ্যানডি. তুমি আমার চোখের স্বপ্ন চুরি করে দেখছ।

দু'জনে চোখ বুঁজে নিঃসাড় পড়ে থাকে।

আন্দালিব কনুই ভর দিয়ে আধো উঠে বসে বিবির মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলে, বিবি, আমাকে ক্ষমা করবে না ?

বিবি সাডুলা কনুই ভর দিয়ে আধো উঠে আন্দালিবের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে বসে।

তুমি আমাকে ক্ষমা কর নি ?

করেছি। তুমি ?

তুমি কেন ক্ষমা চাইবে, অ্যানডি ? আমিই না কত খারাপ ব্যবহার করেছি ?

আমি যে তোমাকে যা নয় তাই বলেছি।

তুমি আমাকে ভালোবাসো বলেই তো রেগে গিয়েছিলে।

হাঁ, তাই। বিবি, তাই। আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। তুমি কেন আমার ফোন ধরতে না। ফোন ধরে কেন ভালো করে কথা বলতে না ? কথা বললেও কেন তুমি মন্দ বলতে ? তাই তো আমি রাগে দুঃখে অন্ধ হয়ে যাই। কেন ? কেন ? কী হয়েছিল তোমার, বিবি ?

আমার রাগ হয়েছিল।

তোমার।

আমার দুঃখ হয়েছিল।

কেন, বিবি, কেন ? আমি কী করেছিলাম ?

তুমি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলে, তাই।

উঠে বসে আন্দালিব।

আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, তাই তোমার রাগ হয়েছিল ?

হাঁ, হাঁ, হাঁ। আর দশটা ছেলের মতো তুমি নষ্ট হয়ে যাবে, আর আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখব? জেনেও হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমি চেয়েছিলাম আঘাত করতে, তোমাকে ফেরাতে। বাউণ্ডুলে স্বামী নিয়ে তো ঢাকায় ফিরতে পারব না, তাই তোমাকে পড়া ছাড়তে দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হয়েছিল।

আমি যদি আত্মহত্যা করে বসতাম?

যাহ। তার আগেই আমি হাজির হতাম না? তোমার গলা জড়িয়ে ধরতাম না? বলতাম না, দুষ্টু ছেলে?

আন্দালিব এতক্ষণ ভাবছিল যেটা, হঠাৎ বলে ফেলে, পড়া তো আমি আগেই ছেড়েছিলাম, বিবি, রাগ করলে তুমি কত পরে, তাই না?

বিবি শিথিল হয়ে, শীতল হয়ে শুয়ে পড়ে আবার। বলে, না, তুমি ভুল করছ। পড়া তুমি আগে ছাড়লেও আমি জানতাম না; আমি জেনেছি অনেক পরে। বিবি আন্দালিবের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে। তুমি আর কী গোপন করেছ আমার কাছে বল তো?

কী বলছ? গোপন করব তোমার কাছে?

হাঁ। বিবি হঠাৎ হেসে মুখ ফিরিয়ে আধো উঠে বসে। স্বীকার কর, কোথায় কী করেছিলে এতদিন?

কিছুই না।

প্রেম? উঁহু, হাসলে চলবে না? প্রেম কর নি?

দূর। মাথা খারাপ।

কোনো শাদা মেয়ে?

পাগল দেখছি একটা।

শাদা মেয়ে?

বিবি তর্জনী নাচিয়ে কপট শাসনের ভঙ্গিতে উত্তর দাবি করে।

আরে, আমি পাব কোথায়?

সে আমি জানি না।

সত্যি বলছি, আমি কাউকে চিনি না।

না?

আল্লার কসম, না, বিবি, আল্লার কসম।

খিলখিল করে হেসে ওঠে বিবি, আন্দালিবের মাথার চুল এলোমেলো করে দেয়, মুহূর্তে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, মনে হয় আমরা ঢাকায় আছি, না?

হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে বিবি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলে, এই জান? ডাক্তার চাচার সঙ্গে সেদিন দেখা।

আন্দালিব ঢোঁক গিলে বলে, তারপর?

তোমার কথা জিগ্যেস করলেন।

আন্দালিব শুকনো গলায় বলে, করলেন বুঝি ?

আন্দালিবের বুকে গোল মুঠির কিল দিয়ে বিবি বলে, করবেন না কেন ? তিনি জানেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, কতদিন তাঁর বাসায় তুমি গেছ, তারপর আমি যখন বাইরে থাকতে গেলাম, আমরা দু'জনে যাই নি এক সঙ্গে দেখা করতে ? সেদিন আমাকে একা দেখে কী সন্দেহ করলেন জান ? ভাবলেন, তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ।

আন্দালিব মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে ডাঃ মজুমদারের কাছে; ভাগ্যিস তিনি তার মনের কথাটা টের পেয়েছিলেন সেই জন্যেই তো বিবির সঙ্গে আবার তার আগের দিনগুলো ফিরে এল।

ধরা পড়ে যাওয়া বালকের মতো হাসতে হাসতে আন্দালিব বলে, তাই নাকি ? বাহ ? ছেড়ে দিয়েছি ?

আমাকে জেরার পর জেরা করলেন।

আন্দালিব সেটা অনুমানেই বুঝে নিয়েছে বিবির ফোন পাওয়া থেকেই।

কী জেরা করলেন ?

এই, আমাদের কী হয়েছে। আমরা কি ভালোবাসি না, নাকি। বিয়ে কবে হবে। তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছ কিনা। কত কী। বিবি হঠাৎ আন্দালিবের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, এই, চল না, ডাক্তার চাচার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি আর আমি। বেশ মজা হয়। বুড়ো বোকা হয়ে যাবে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখে। যাবে ? ওঠো, ওঠো, খুব মজা হবে।

আন্দালিবের তৎক্ষণাৎ বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। তারও কারণ আছে, এই সেদিন সে বিবির নামে একরাশ লাগিয়ে এসেছে, ডাঃ মজুমদারের জিজ্ঞাসার জবাবে বারবার সে বলেছে— না, তাদের ঝগড়া হয়েছে বলে সে দশ কথা বানিয়ে বলতে আসে নি, সে এসেছে বিবি সত্যি সত্যি নষ্ট হয়ে গেছে বলে। এখন কোন মুখে সেখানে গিয়ে হাজির হয় ?

আন্দালিব বলে, আজ থাক না। চল আজ আমরা এখানে কোথাও খেয়ে নিই। আর একটু পরেই তো সন্ধে হবে। চল না সেই গ্রীন আর্থে যাই।

বহুদিন আগে আন্দালিবই প্রথম বিবিকে গ্রিন আর্থ হেলথ ফুড রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়েছিল, সেই স্মৃতি ঝলমল করে ওঠে এখন আন্দালিবের চোখে মুখে।

কিন্তু বিষণ্ন অথবা উদ্বিগ্ন কেন দেখায় বিবিকে! আন্দালিব বিহ্বল বোধ করে।

না, ওখানে না।

কেন ? আজ আমরা সারা হ্যাম্পস্টেডে সব পুরনো জায়গাগুলোতে আবার এসেছি। গ্রিন আর্থ কী দোষ করল যে বাদ পড়বে ? মনে আছে, বিবি। তুমি ঐ কাঁচা খাবারগুলো দেখে বিশ্বাসই কর নি, খাওয়া যায় ?

বিবি ম্লান হাসে।

আন্দালিবও কেন যেন বিষণ্ন হয়ে যায়, মনের ভেতরে তার ছটফট করে ওঠে দিবসগুলো। বেপরোয়া হয়ে সে বিবির হাত ধরে টান দেয়। বলে, চল, গ্রিন আর্থে কতদিন যাই নি।

বিবি উঠে দাঁড়িয়ে আন্দালিবের কোমর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলে, আমার লজ্জা করছে।

আন্দালিব দাঁড়িয়ে পড়ে। লজ্জা ? কীসের ?

ওখানে যে আমি ছুটির দিনে কাজ করি।

তাই ? কাজ কর তুমি ? কোন দুঃখে ?

আমার বাবা তো তোমার বাবার মতো বড়লোক না।

কী জানি হতেও পারে, সাদুল্লা সাহেব যথেষ্ট পাঠান না. আন্দালিব চুপ করে থাকে এবং অবিলম্বে উৎসাহ দিয়ে বলে, অবশ্য, এদেশে সব ছাত্র-ছাত্রীই কাজ করে ছুটির সময়। তোমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভালোই তো।

বিবি আদুরে গলায় বলে, কাজ করি বলেই তো যেতে চাচ্ছি না। ওয়েট্রেস যদি প্যাট্রন হয় গম্ভীর গলায় অর্ডার করে রেস্তোরাঁয়, পরে সবাই আমাকে ঠাট্টা করবে না ? সে আমি পারব না। বিবি আন্দালিবের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে, চল আমরা ডাক্তার চাচার বাড়ি যাই, হুঁ, কেমন ?

হ্যাম্পস্টেড স্টেশনে যখন আন্দালিব এসে বাঁক নেয় বিবি সাডুলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

১০

আন্দালিব বড় বিচলিত হয়ে থাকে সারাটা রাত। ডাঃ মজুমদার তাকে বলেছেন, বিবির কিডনিতে পাথর হয়েছে, অপারেশন করতে হবে, সেই অপারেশন হবার কথা আগামীকাল।

প্রথমে যখন শুনেছিল অসুখটার কথা, আন্দালিব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

কিডনিতে পাথর ?

ডাঃ মজুমদার স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন আন্দালিবের দিকে, যেন বিবির কিডনিতে পাথর হবার জন্য সে-ই দায়ী।

বিবিকে বেরিয়েই আন্দালিব জিগ্যেস করেছিল, আমাকে কোনোদিন তুমি কিছুই বল নি তো ?

তুমি ডাক্তার ?

না, তা নই। তবে কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়ই, বল নি যে।

চুপ কর। ধমক দিয়ে উঠেছিল বিবি। আমি মরছি ভয়ে, আর উনি ফুলে আছেন অভিমানে।

বিবির হাত ধরে আন্দালিব তখন বলেছিল, ভয় কী ? আমি হাসপাতালে যাব; আমি তোমাকে একটুও চোখের আড়াল হতে দেব না, সারাক্ষণ কাছে থাকব।

ডাঃ মজুমদারকে ফোন করেছিল আন্দালিব।

না, অ্যানডি, না। তোমার উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে না।

আমি ওকে দেখতে পাব না ?

ডাঃ মজুমদার হঠাৎ কেন রূঢ় হন, বুঝতে পারে নি আন্দালিব। তিনি ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, আর ছেলেমানুষি করিও না। পুরুষ হও এবং সত্যকার অর্থে পুরুষ হও। এ যাত্রা তাকে একাকী উত্তীর্ণ হইতে দাও।

অপারেশনের দু'দিন পরে ছাড়া পায় বিবি সাডুলা।

ডাঃ মজুমদারকে ফোন করে কেবল এটুকু জানা যায়, অস্ত্রোপচার সফল হইয়াছে। সে সুস্থ আছে।

বিবিকে সে টেলিফোন করে, ও বিবি, আমি আসিতেছি।

না।

না, কী বলিতেছ ?

আমি বড় দুর্বল বোধ করিতেছি।

আমি এসে তোমার পাশে বসে থাকব। তোমার যত্ন করব।

কষ্ট করিও না।

কষ্ট কেন বলছ ? তুমি ওখানে পড়ে পড়ে কাতরাবে, আর আমি এখানে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারব ?

আমি সুস্থ ও চমৎকার রহিয়াছি।

এই যে বললে, দুর্বল ?

বলিয়াছি ?

আন্দালিবের বুঝতে বাকি থাকে না, যে, অপারেশনের পর বিবির এখন গুছিয়ে কথা বলবারও ক্ষমতা নেই। টেলিফোন সে রেখে দেয়।

তারপর সে রওয়ানা হয় বিবির বাড়ির দিকে, করুক তাকে তিরস্কার— এভাবে আসবার জন্যে, বিবির পাশে গিয়ে না বসা পর্যন্ত, তাকে একবার চোখে না দেখা পর্যন্ত শান্তি সে পাবে না।

দরোজা খুলে দেয় এক শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী।

আমি বিবির নিকট আসিয়াছি।

তরুণী তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দরোজা ছেড়ে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে সিঁড়ি নির্দেশ করে বলে, তোমার বাম দিকে দরোজায় সর্প বেষ্টিত আপেল দেখিতে পাইবে— পোস্টারে অংকিত। তরুণী বিস্মিত হয়ে ওঠে। উহাই বিবির গুহা হয়।

দরোজা খুলে সে বিবিকে ঘুমন্ত দেখতে পায়। বিস্ফোরিত চোখে আন্দালিব দেখতে পায় বিবি সাডুলার রক্তশূন্য মুখ, পাণ্ডুর ঠোঁট, নিভন্ত চুলের রাশ, কম্বলে ঢাকা যেন একটি মৃতদেহ। তার চোখে পানি এসে যায়।

পা টিপে আন্দালিব এগিয়ে যায়। আহা, যেন ঘুম না ভাঙ্গে তার; সে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে বসে, সন্তর্পণে একটি হাত রাখে বিবির বিছিয়ে থাকা হাতের পাশে; স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু যেন বড় ভঙ্গুর; আন্দালিব অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে বিবির দিকে; তার সমস্ত কষ্ট, রক্তহীনতা, দুর্বলতা, যন্ত্রণা সে নিজের স্নায়ুর ভেতরে অনুভব করতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে বিবি চোখ মেলে তাকায়, প্রথমে যেন আন্দালিবকে ঠিক সনাক্ত করতে পারে না, প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। আন্দালিব তার হাত মুঠোর ভেতরে নিয়ে বলে, বিবি, আমি, অ্যানডি।

বিবি দ্রুত নিঃশ্বাস টেনে উঠে বসে শয্যায়; আন্দালিব তার পাশে এসে বসে।

বিবি, তুমি আমাকে বকতে পারবে না। আমি থাকতে পারলাম না।

আন্দালিবের হাত ধরে বিবি বলে, আমার এখন শান্তি প্রয়োজন হইতেছে।

আমি তোমাকে শান্তি দিতে চাই, বিবি।

শান্তি, শান্তি। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে বিবি সাড়ুলা।

বিবির কপালে দ্রুত হাত রাখে আন্দালিব, বিবি চোখ বোঁজে।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে বিবি সাড়ুলা আন্দালিবের বুকে করতল রেখে বলে, অ্যানডি, তুমি কখন আসিয়াছ?

এইমাত্র।

তোমাকে একটি কথা বলিব, রাগ করিবে না?

না, তুমি বল।

তুমি এখানে আর আসিও না।

আর্তনাদ করে ওঠে আন্দালিব। আসিব না?

তখন বিবি দু'হাতে আন্দালিবের গলা জড়িয়ে বলে, না, না, চিরতরে নহে। সে নিষেধ করিতেছি না।

আন্দালিব হেসে ওঠে, তাই বল। বুকের ভেতর ধ্বক করে উঠেছিল।

বলিতেছিলাম, যে, সুস্থ হইয়া আমি তোমার বাড়িতে যাইব। এখানে দুইটি বালিকা উন্মুক্ত জীবন যাপন করে; আমি সকল সময় তাহাদের কটু সমালোচনা করি। একবার আসিয়াছ, উহারা মনে করিবে স্বদেশের বন্ধু আসিয়াছে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে। আবার আসিলে, আমাকে লইয়া পরিহাস করিবে, আমার মুখ লোকসান হইবে। আমার সমালোচনা আমাকেই ঘুরাইয়া দিবে। এই কারণে পূর্বেও কখনো তোমাকে এখানে ডাকি নাই, স্মরণ হয়?

হাঁ, হয়।

অ্যানডি, তুমি জানিও, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তবে, উহারা এবং আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ। আমাদের আচার আমরা রক্ষা করিব। নহে?

হাঁ।

তাই বলিতেছিলাম, তুমি আর আসিও না, আমিই তোমার নিকটে আসিব। আমি কি সেই দিন হ্যাম্পস্টেডে আসি নাই? আবার কি আমরা আমাদিগকে ফিরিয়া পাই নাই?

কিছুক্ষণ হাত ধরে চুপ করে বসে থাকে আন্দালিব।

আরো কিছুক্ষণ পরে তার হাতের ওপর মৃদু চাপড় দেয় বিবি সাড়ুলা।

আন্দালিব উঠে দাঁড়ায়।

তোমাকে না দেখলে ঘুমোতে পারতাম না, বিবি, তোমাকে না দেখলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। তাই তো জোর করে এলাম। তুমি ভালো আছ তো? তোমার কোনো কষ্ট নেই তো? না, না, এখন তুমি কথা বোলো না, তুমি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছ। পরে সব শুনব। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। আমি তোমাকে ফোন করব। ফোন ধরতে পারবে তো?

বিবি সাডুলা আধো উঠে বসে, হাত বাড়ায়, আন্দালিব তার হাত ধরে, তখন সে পিঠে বালিশ নিয়ে সোজা হয়ে বসে। এবং বাংলায় বলে, অ্যানডি, ফোন কোরো, কেমন ? আমি একটু গায়ে জোর পেলেই সোজা চলে আসব।

আন্দালিব ইতস্তত করে একটু, তারপর বিবির কপালে চুমো দিয়ে বলে, যত্ন লইও।

১১

প্রায় দু'সপ্তাহ ফোনেই প্রতিদিন কথা হয় আন্দালিবের সঙ্গে বিবি সাডুলার। একদিন ফোন করে সে বিস্মিত হয়ে যায়; তরুণী কণ্ঠ জানায়, বিবি এখানে নাই, বাসা ত্যাগ করিয়াছে।

আবার নিশ্চয়ই সে এক গাঁজাখোরের পাল্লায় পড়েছে, সেই সেদিনের মতো।

বাসা ত্যাগ করিয়াছে ? হেসে ওঠে আন্দালিব।

জারজ, তুমি হাসিতেছ কেন ? তরুণী ক্রুদ্ধ হয়ে ফোন রেখে দেয়।

সন্ধ্যার দিকে আবার ফোন করে আন্দালিব।

এক তরুণ কণ্ঠ উত্তর দেয়, বিবি। সে লন্ডন ত্যাগ করিয়াছে।

লন্ডন ত্যাগ করিয়াছে ? আবার হেসে ওঠে আন্দালিব।

হাঁ।

আমি বিবি সাডুলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হাঁ, আমি বিবি সাডুলার কথাই কহিতেছি। তরুণটি ফোন রেখে দেয়।

পরদিন সে নিজে যায় বিবি সাডুলার কাছে। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল করছে ওরা, অথবা, এমনও হতে পারে যে তাকে নিয়ে মজা করছে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। বিবি তো সেদিন বলছিল, যে, কারা যেন উন্মুক্ত জীবন যাপন করে এবং বিবির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে পরিহাস করতে পারে। তার সঙ্গেই যখন এহেন ব্যবহার, বিবিকে না জানি কত নাকাল করছে তারা। বড় উদ্বিগ্ন বোধ করে আন্দালিব।

দরোজায় বেল বাজাবার আগেই আন্দালিবের চোখে পড়ে— নাম লেখা বোর্ডে বি, সাডুলা লেখাটি নেই, খা খা করছে চৌকো শূন্যতাটুকু। এবং তখন জগৎ দুলে ওঠে তার।

তবু সে বেল বাজায়।

সেই সেদিনের তরুণটি আজো বেরিয়ে আসে এবং তাকে দেখেই বলে, বিবির নিকটে আসিয়াছ ? সে চলিয়া গিয়াছে।

কোথায় ?

বিশাল পৃথিবীতে।

তরুণটি নিমীলিত চোখে তাকিয়ে থাকে আন্দালিবের দিকে। সমস্ত কিছুই অবাস্তব ও অসম্ভব বলে বোধ হয় আন্দালিবের। সে 'ধন্যবাদ' বলে পথে নামে।

ডাঃ মজুমদার কি জানবেন ? ফোন করবে সে একবার ? এমনও হতে পারে, বিবির হঠাৎ অসুখ বেড়ে যায়, ডাঃ মজুমদার তাকে নিয়ে যান ? কিন্তু একবার সে গিয়েছিল বিবির নামে

নালিশ করতে, আজ আবার যদি গিয়ে বলে— বিবি কোথায় ? কী ভাববেন তিনি ?
গ্রিন আর্থে আসে আন্দালিব। এরা কি জানবে না ?
ম্যানেজার টিমের মুখে ধীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, বিবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছে। টেড শনবার্গের সহিত। তাহারা হয় আঠা দ্বারা সংযুক্ত।

টিমের মুখে দেবতার হাসি।
আন্দালিব দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করে না।
সে পাশের দোকান থেকে ওয়াইনের একটি বোতল কিনে বাসায় ফিরে যাবার জন্যে লন্ডনের সবচেয়ে গভীর ভূতলে হ্যাম্পস্টেডের প্ল্যাটফরমে নেমে যেতে থাকে।

নিষিদ্ধ লোবান

নবগ্রামে ট্রেন এসে যায়। আর এক ইস্টিশান পরেই জলেশ্বরী, এ লাইনের শেষ। বিলকিস যাবে জলেশ্বরীতে। ঢাকা থেকে তোরসা জংশনে এসেছে বেলা এগারোটায়। তারপর তিনটেয় পাওয়া গেছে জলেশ্বরীর গাড়ি। সাধারণত সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখন কোনো কিছুই নিয়মিত নয়। কেউ তা আশাও করে না।

এমনিতেই তোরসা থেকে জলেশ্বরী অবধি ট্রেন চলে খুব ধীর গতিতে। ছেলেবেলায় বাবার কাছে বিলকিস শুনেছিল, এই লাইনটি আসলে পুরনো ডিস্টিক বোর্ড সড়কের ওপর পাতা রয়েছে। তাই বাঁক বেশি, মাটিও পাকা নয়, ট্রেন চলে ধীর গতিতে। নইলে উল্টে পড়ে যাবে।

তবুও তোরসা থেকে জলেশ্বরী এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়। নবগ্রাম আসতে আজ দু'ঘন্টা কাবার হয়ে যায়।

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই যাত্রীদের ভেতরে কেমন একটা ফিস-ফাশ সে শুনে আসছিল অনেকক্ষণ ধরে। শহুরে এক মহিলার উপস্থিতিতে মানুষগুলো বড় একটা সপ্রতিভ ছিল না। তাছাড়া সময়টাই এমন যে, মানুষ নিচুকণ্ঠ ছাড়া কথা বলে না, অপরিচিত দূরে থাক, পরিচিতকেও বিশ্বাস করে না।

বরাবর দেখে এসেছে বিলকিস, নবগ্রামে ট্রেন দুই মিনিটের বেশি থামে না।

নির্ধারিত সেই দু'মিনিট পেরিয়ে যায়। অধিকাংশ যাত্রী ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে নেমে পড়ে। ইস্টিশানের বাইরে ঘন বুনো ঝোপের ভেতর সরু পথ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তারা কে কোথায় মিলিয়ে যায়। আর যারা বসে থাকে, যাদের গন্তব্য জলেশ্বরী, তারা দু'মিনিট পরেও যখন ট্রেন ছাড়ে না, ঢিল খাওয়া অবোধ পশুর মতো তারাও কামরা ছেড়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায় সারা ট্রেন।

জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকায় বিলকিস। কিছু বোঝা যায় না। ট্রেনের পুরনো ইনজিনটার বাষ্পীয় শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

হাত ঘড়িতে বিকেল এখন পাঁচটা দশ।

বিলকিস নামে। তার সঙ্গে তার ছোট একটা সুটকেস। এ সময় কুলির ওপর নির্ভরতা কমাবার জন্যেই সে ঢাকা থেকে বহনযোগ্য সুটকেসের বেশি আনে নি। সুটকেসটা নিয়েই সে নামে।

গার্ডকে দেখা যায়। সে খুব দ্রুত পায়ে ইস্টিশান ঘরের দিকে যাচ্ছিল। বিলকিস তাকে ধরে।

আমি জলেশ্বরী যাব।

গার্ড তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকে। যেন জলেশ্বরীর নাম সে এই প্রথম শুনেছে অথবা উজ্জ্বল রোদের ভেতরে নবগ্রামের মতো ঘোর পল্লীর ইস্টিশানে, বিলকিসের মতো চটপটে মহিলাকে দেখে গার্ড নিশ্চিত হতে পারছে না দৃষ্টির বিভ্রম কিনা! এ এমন একটা সময় যখন যা কিছু সম্ভব অথচ মানুষ তার মৌলিক বিস্ময়বোধ থেকেও মুক্তি পায় নি।

বিলকিস ব্যাকুল হয়ে আবার বলে, গাড়ি তো জলেশ্বরী পর্যন্ত যাবে!

আরো কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে গার্ড। লাল নীল নিশান দুটিকে সে অনাবশ্যকভাবে হাত বদল করে নেয়। তারপর কোনো উত্তর না দিয়ে অথবা একটা কিছু দেয়, বোঝা যায় না, শোনা যায় না, সে ইস্টিশানে খড় ছাওয়া নিচু চালার ভেতর ঢুকে যায়। আর কাকে জিগ্যেস করবে খুঁজে পায় না বিলকিস।

এখন সে কী করে ?

ঢাকা থেকে জলেশ্বরী, কতবার যাতায়াত করেছে সেই ছেলেবেলা থেকে। কতবার সে নবগ্রামের ওপর দিয়ে এসেছে, গেছে। কিন্তু কখনো নামা হয় নি। ইস্টিশানের ঝোপের ওপারও দেখা হয় নি।

এখানে কারা থাকে ?

কিছুক্ষণের জন্যে অচেনা এবং অপহৃত বোধ করে সে।

তার চোখে পড়ে ইস্টিশানের ঠিক বাইরে মাটির চাকি বসানো কুয়োর পেছনে একটি ছেলে। সতেরো আঠারো বছর বয়স। বিলকিসের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে নেয়। মুহূর্তে সে ঝোপের আড়ালে কোথায় চলে যায়।

হয়তো একে কিছু জিগ্যেস করা যেত, ট্রেনের বিষয়ে কিছু জানা যেত না সত্যি, কারণ ছেলেটি দৃশ্যতই ইস্টিশানের কেউ নয়, অন্তত একটি মানুষ পাওয়া যেত। সারা প্ল্যাটফরমে একটি প্রাণীও এখন নেই. বিলকিসের মনে হয় চারদিকের এই অচেনা গাছ এবং ঝোপগুলো দুর্বোধ্য কী একটা ষড়যন্ত্রে অবিরাম সরসর ফিসফিস করে চলেছে।

ইস্টিশান ঘরের ভেতর ঢোকে বিলকিস।

তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে টেবিলের ওপারের লোকটি। নিশ্চয়ই ইস্টিশান মাস্টার। গার্ডকে দেখা যায় দু'হাতের ভেতর মাথা রেখে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বসে থাকতে। সেও এখন তাকায়, দ্বিতীয়বার তাকে দেখা যায় বিহ্বল চোখে তাকাতে।

আমি জলেশ্বরী যাব।

ইস্টিশান মাস্টার তার দিকে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

কোথা থেকে আসছেন ?

ঢাকা থেকে।

ওদিকে গাড়ি চলেছে ?

হ্যাঁ চলছে। আমি তো এলাম।

ইস্টিশান মাস্টার দৃষ্টি ফিরিয়ে গার্ডের দিকে তাকান। ঠিক তখন ইনজিন ড্রাইভার এসে হাজির হয়।

খবর কী মাস্টার সাহেব ?

আর খবর! এখন তোরসায় ফিরে যান। ট্রেন আর যাবে না।

ড্রাইভার গজগজ করে ওঠে। আগে থেকে বললে হতো। তোরসার মাস্টার সাহেব কিছু বললেন না। ইনজিন ব্যাক করে চলে আসতাম, সোজা বেরিয়ে যেতাম এখন।

গার্ড রুষ্ট হয়ে ওঠে। এখন ব্যাক করে যেতে অসুবিধা কোথায় ?

আবার সেই তোরসায় গিয়ে ইনজিন ঘুরিয়ে, তিন মাইল চক্কর দিয়ে যে রাখতে হবে, সে আপনি রাখবেন, কি আমি রাখব ? তোরসার খবর রাখেন ? যে-কোনোদিন যে-কোনো সময়ে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

এতক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে কথাগুলো বিলকিস শুনছিল। শুনে না বোঝার কিছু নেই, তবু তার মনে হচ্ছিল আরো খানিকটা না শুনলে সে ঠিক বুঝতে পারবে না প্রসঙ্গটা। এবার সে বলে, ট্রেন এখন জলেশ্বরী যাবে না ?

তিনজন নীরবে তার দিকে তাকায়।

ইস্টিশান মাস্টার উত্তর দেন, না।

কেন ?

নীরবতা।

যাবে না কেন ?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইস্টিশান মাস্টার গার্ডকে বলেন, আর দেরি করবেন না। অর্ডার আছে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করে দিতে। পথে সন্ধে হয়ে গেলে, বলা যায় না, কী হয়।

গার্ড চকিতে মাস্টারের দিকে তাকান। দু'জনের ভেতর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। আর সে দাঁড়ায় না। নিশান দুটো তুলে নিয়ে সোজা ট্রেনের দিকে ধাবিত হয় সে। ইনজিন ড্রাইভার হয়তো আরো কিছু বিরক্তি প্রকাশ করতে চায়। সে সঙ্গে সঙ্গে নড়ে না। ইতস্তত করতে থাকে।

যান, যান, আপনি আর ঝামেলা বাড়াবেন না।

ড্রাইভার বেরিয়ে যায়।

ইস্টিশান মাস্টারও উঠে দাঁড়ান। তিনি ড্রাইভারের পেছনে পেছনে দরোজা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকেই গলা বাড়িয়ে ট্রেনটিকে দেখতে থাকেন।

বিলকিস বসবে কি দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝতে পারে না। ক্ষণকালের জন্যে তার এমনও মনে হয় এই ট্রেনে ফিরে যায়। কিন্তু সে ভালো করেই জানে, ফিরে যাওয়া নয়, জলেশ্বরীতেই তাকে যেতে হবে।

হঠাৎ সে দেখতে পায় ইস্টিশান ঘরের পেছনের জানালায় একটি মুখ। সেই ছেলেটির মুখ। আবার চোখ পড়তেই মুখটি সরে যায়।

ইনজিনের দীর্ঘ হিস শোনা যায়। বাঁশি বাজে না। চাকা নড়ে ওঠে। ঘরের ভেতর থেকে বগিগুলো সরে যেতে দেখা যায়। সবশেষে ইনজিন। পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে তোরসায় ফিরে যাচ্ছে। সে যে ঘরের ভেতর আছে ইস্টিশান মাস্টার হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। ট্রেন বেরিয়ে যাবার পর তিনি ঘরের ভেতরে মুখ ফিরিয়ে মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে যান। ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কে বসে আছে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ঘরটি এত নিচু, ঘরের জানালা এত ছোট যে যথেষ্ট আলো আসে না। দুপুরবেলাতেও সন্ধ্যাভাষ ফুটে থাকে।

আপনি ঢাকা থেকে আসছেন ?

হাঁ।

জলেশ্বরী যাবেন ?

আমার যাওয়া দরকার।

ইস্টিশান মাস্টার চিন্তিত মুখে চেয়ারে বসে পড়েন। হাত উল্টে বলেন, আমার কিছু করবার নেই। তারপর হয়তো তার মনে হয়, একজন বিপন্ন মহিলাকে এভাবে সরাসরি নিরাশ করাটা উচিত হলো না। কিন্তু আশা দেবারও আলো তার হাতে নেই। পুষিয়ে দেবার জন্যে তিনি সহানুভূতিশীল গলায় জানতে চান, জলেশ্বরীতে আপনার কেউ আছে ?

আছে। মা আছে। ছোট ভাই আছে, রংপুর কলেজে পড়ে। আমার বড় বোন বিধবা, সে আছে, তার দুটো ছেলেমেয়ে আছে।

জলেশ্বরীতে কী হয়েছে ? নিজের খবর দ্রুত গলায় দিয়ে যে প্রশ্নটি এতক্ষণ মনের ভেতরে কঠিন মুষ্ঠির মতো চেপে বসেছিল, বিলকিস উচ্চারণ করে।

সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাস্টার সাহেব বলেন, কিন্তু আপনি এখন যাবেন কী করে ? পাঁচ মাইলের পথ!

চোখের সমুখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। বিলকিস দেখতে পায় জলেশ্বরী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখতে পায় সে আগুন নিভে গেছে। জলেশ্বরীর বাড়িগুলো বীভৎস ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা শহরে একটিও প্রাণী নেই। বিকট জন্তুর মতো স্তব্ধতা হামা দিয়ে শহরটিকে খাবলে খাবলে খেয়ে চলেছে। ধড় ফড় করে উঠে দাঁড়ায় বিলকিস। তার ঠোঁট থেকে ভয়ার্ত প্রশ্ন গড়িয়ে পড়ে।

জলেশ্বরীতে কি যাওয়া যাবে ?

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে মাস্টার সাহেব উত্তর দেন— ঠিক বলতে পারছি না।

আপনি কী শুনেছেন ?

খুব ভালো না।

কী ভালো না ?

ভাই বোন, মায়ের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা তার কণ্ঠ ফুটে বেরোয়। একবার মনে হয়, আর কখনো তাদের মুখ দেখতে পাবে না। যেমন, সে তার স্বামী আলতাফের মুখ আর কখনো দেখতে পাবে আশা করে না।

মাস্টার সাহেব বলেন, ভালোই তো ছিল সব। এতদিন কোনো গোলমালই ছিল না।

আমিও তো চিঠি পেয়েছি মায়ের গত বুধবার।

বললাম তো, এদিকে কোনো গোলমালই ছিল না।

ইস্টিশান মাস্টার আড় চোখে একবার বিলকিসকে ভালো করে দেখে নেন। অচেনা একজনকে এত কথা বলা ঠিক হবে কি না, মীমাংসা করতে পারেন না। কোনো পুরুষ হলে হয়তো তিনি রূঢ়ভাবে বিদায় দিতেন, মহিলা বলে ইতস্তত করেন।

আবার সুশ্রী শহুরে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগটা এই আতংকশাসিত সময়ের ফাটলে অবিরাম পতনোন্মুখ অবস্থার ভেতরও একেবারে সংক্ষেপে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা তিনি বোধ করেন না।

এদিকে এই চার মাস সব চুপচাপ ছিল। মার্চ মাসে ঢাকার ঘটনার পর, এপ্রিলের প্রথম

সপ্তাহে রংপুর থেকে মিলিটারি আসে।

তখন সবাই জলেশ্বরী থেকে চলে যায়, আমার ভাই লিখেছিল।

এখান থেকেও অনেকেই সরে গিয়েছিল। শুধু জলেশ্বরী কেন ? আধকোশা নদী পার হয়ে সব ঐ পারের গ্রামে যায়। মিলিটারি ফিরে যাওয়ার পর, বিহারীদের লুটের ভয়ে, তারপর মিলিটারি বলে যায়— যারা ঘরে ফিরবে না তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, সেই ভয়ে আস্তে আস্তে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে। তারপর এই কয় মাস একেবারে কিছু না। মাঝে মাঝে শোনা যায়, ইন্ডিয়া যারা গেছে, তারা যুদ্ধ করতে আসছে। কিন্তু সে রকম কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ আজ খুব ভোরবেলায়, আমি যা শুনলাম, জলেশ্বরী ডাকবাংলা, তার ঠিক আগে যে খাল আছে, আধকোশায় গিয়ে পড়েছে, সেই খালের ওপর রেল-পুল, সেখানে ডিনামাইট ফাটে। তারপর আর কিছু শুনি নি।

অনেকে বলে মিলিটারি জলেশ্বরীতে গুলি করেছে।

মিলিটারি ছিল ওখানে ?

গত মাসে তারা একটা ক্যাম্প করে। এর আগে ছিল না।

লোকজন ?

কেউ কিছু বলতে পারে না।

বুকের ভেতরে শীতল বরফ অনুভব করে বিলকিস। আলতাফের কথা একবার মনে পড়ে যায়। এই ক'মাসের অনুপস্থিতিতে আলতাফের চেহারার চেয়ে তার অস্তিত্বটাই প্রথম উজ্জ্বলতরভাবে মনে পড়ে।

মা ভাই বোনকেও সে আর কোনোদিন কি দেখতে পাবে না ?

সুটকেস হাতে নিয়ে বিলকিস উঠে দাঁড়ায়।

ইস্টিশান মাস্টার হাত তুলে যেন বাধা দেবার চেষ্টা করেন। পরমুহূর্তেই আবার হাত ফিরিয়ে নেন তিনি।

তা হলে কী করবেন ?

জলেশ্বরীতে যাব।

পাঁচ মাইল হাঁটা।

আমাকে যেতেই হবে।

মাস্টার সাহেব একই সঙ্গে উদ্বেগ এবং বিস্ময় বোধ করেন। হেঁটে যেতে পারবেন ?

দেখি।

একা আপনি!

একটু থমকে যায় বিলকিস। কী করব ?

একটা লোকটোক না হয়, কিন্তু জলেশ্বরীতে এ অবস্থায় কেউ যেতে চায় কি না, সন্ধ্যাও হয়ে আসছে।

এই ক'মাসে নিজের সাহস এত বড় গেছে, বিলকিস আর অবাক হয় না।

আমি যেতে পারব।

প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রেললাইনের উত্তরযাত্রার দিকে সে ক্ষণকাল তাকায়। এখনো রোদের উজ্জ্বলতা আছে। ঘন গাছপালার ভেতরে লাইনটা হঠাৎ বাঁক নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। লাইনের ভেতরে দু'পা দিয়ে স্থির হয়ে আছে শাদা একটি গরু। আকাশে এক চিলতে খাড়া ধূসর মেঘ। বারুদের ধোঁয়ার মতো মনে হয়।

বিলকিস রেলের পাশে সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে জলেশ্বরীর দিকে এগোয়।

২

তার মনে হয় কেউ যেন তার সঙ্গে চলছে। একবার থমকে দাঁড়ায় সে। কান খাড়া করে রাখে। কিছু শোনা যায় না। দু'একটা পাখির ডাক, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের সরসর, ও পাশের বাঁশবনে একবার হঠাৎ ট্যাশ করে একটা শব্দ, আর কিছু না।

বাঁকটা পেরিয়ে যায় সে। পেছনের ইস্টিশান আর চোখে পড়ে না। এবার সমুখে দেখা গুমটি ঘর। আর অনেক দূর পর্যন্ত ফসলের খোলা মাঠ। রেললাইনটাও দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। হঠাৎ করে সে যেন একটা অনন্তের ভেতর গিয়ে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে অবসন্ন বোধ করে। কিন্তু চলার গতি সে থামায় না।

অচিরে তার চোখের সমুখ থেকে সমস্ত কিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে থাকে তার মা, ভাই, বোন, টিনের লম্বা সেই ঘর, ঘরের পেছনে টক আমগাছ। জলেশ্বরীতে অনেক দূর থেকে গাছটা চোখে পড়ে সব সময়। বিলকিস যেন সেই গাছটা লক্ষ করেই এক রোখার মতো এগোতে থাকে।

এবার সে পেছনে শব্দটা শুনতে পায় পরিষ্কার।

ঘুরে তাকিয়ে দ্যাখে, একটা ছেলে, সেই ছেলেটি কাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। বিলকিস ঘুরে তাকাতেই ছেলেটি দৌড়ের মুখে আরো কয়েক স্লিপার এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। না এগোয়, না ফিরে যায়।

মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, ছেলেটির ঐ স্থির দাঁড়িয়ে থাকা নিসর্গের অনিবার্য একটি অংশ। ছেলেটি ধীরে পায়ে আরো কয়েক স্লিপার এগিয়ে আবার থেমে যায়।

তখন মৃদু কৌতূহল অনুভব করে বিলকিস। হাত তুলে সে কাছে আসতে ইশারা করে ছেলেটিকে। নিজেও সে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

হাত দশেকের দূরত্বে স্থির হয় দুজন।

এই কী চাও?

তার ছোট ভাইয়ের চেয়েও ছোট হবে বলে বিলকিস তুমি বলতে ইতস্তত করে না। তার একটু রাগও আছে। ছেলেটি সেই ট্রেন থামবার পর থেকেই পিছু লেগেছে।

কী নাম তোমার?

ছেলেটি উত্তর দেয় না, দ্রুত চোখে বিলকিসকে আপাদমস্তক দেখতে থাকে।

তখন থেকে আমার পিছু নিয়েছ কেন?

কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে বিলকিস, ঠিক ভয় নয়, ভয়ের কাছাকাছি। অথচ করবার কিছু নেই। ছেলেটি বরং ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় বিলকিসের। কীসের ভয়?

এই এদিকে শোন।

ছেলেটি কাছে আসে। এবং এই প্রথম কথা বলে। আপনি ঢাকা থেকে আসছেন?

হাঁ।

জলেশ্বরী যাবেন?

হাঁ, তাই তো যাচ্ছি।

আপনি যাবেন না। ছেলেটির কণ্ঠস্বর হঠাৎ খুব ব্যাকুল শোনায়।

কেন?

আপনি যে একা!

ট্রেন ফিরে গেল। কী করব?

এখন না হয় না-ই গেলেন।

আমাকে যেতেই হবে।

আপনি যাবেন না।

ছেলেটি আবার নিষেধ করে। এবার তার কথার গুরুত্ব বিলকিস উপেক্ষা করতে পারে না। তার ধারণা হয়, ছেলেটি জলেশ্বরী সম্পর্কে ইস্টিশান মাস্টারের চেয়ে কিছু বেশি খবর রাখে।

তুমি মানা করছ কেন? জলেশ্বরীর অবস্থা খুব খারাপ?

খারাপ আর কত হবে। এরই ভেতরে অনেকেই তো যাতায়াত করছে।

আজ ভোরের ঘটনা কিছু জান?

এখনো ভালো করে জানি না। আপনি এভাবে যাবেন না।

সন্ধের আগে পৌঁছতে পারব না?

তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো পারবেন।

ছেলেটির ভেতরে কোথায় একটা সারল্য আছে, মিনতি আছে, বিলকিসকে হঠাৎ স্পর্শ করে যায়। সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বিলকিস বলে, তাহলে আমি আর দাঁড়াই না।

সে হাঁটতে থাকে। ছেলেটিও সঙ্গ নেয়।

বিলকিসের ধারণা হয় ছেলেটি সামনে কিছু দূর গিয়েই ফিরে যাবে। কিন্তু ছেলেটিকে নিয়ে তার ভাববার সময় নেই। পুরো পাঁচ মাইল পথ তাকে ভাঙ্গতেই হবে। তার মনে পড়ে না আর কখনো এতটা পথ সে একটানা হেঁটেছে।

ছেলেটি হঠাৎ বলে, আপনার মতো আমার একটা বোন ছিল।

থমকে দাঁড়ায় বিলকিস। সে আরো একটি দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে। ক্রিয়াপদের অতীত রূপটি একই সঙ্গে তাকে বিষণ্ন এবং উন্মুখ করে তোলে।

ছেলেটি আর কিছু বলে না। বিলকিস তখন আবার হাঁটতে শুরু করে। ছেলেটি নীরবে তার পাশে পাশে চলে।

দু'ধারে জনশূন্য মাঠ। এরকমও মনে হতে পারত মানুষের বসতি এখানে নেই। কিন্তু আছে। মানুষ এমন একটা সময়ে নিজেকে গোপন রাখতেই ক্রিয়াশীল। তাই জামগাছের তলা নির্জন, হঠাৎ যে একটা বসবার বাঁশের মাচা খাঁ খাঁ করছে। এমনকি গৃহস্থের পালিত

পশুও চোখে পড়ে না। ডোবার সবুজ পানিতে ঝুঁকে পড়া বেত গাছের তীক্ষ্ণ পাতা থির থির করে। একটি কাক স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে উড়ে যায়।

ছেলেটি এখনো ফিরে যায় নি দেখে বিলকিস কৃতজ্ঞ বোধ করে। মনে মনে সে আশা করে, আরো কিছুদূর তার সঙ্গে আসবে ছেলেটি। এই মুহূর্তে একটা সেতু রচনার প্রয়োজন সে অনুভব করে। বলে, ছেলেটির বোনের কথা মনে রেখে, মিলিটারি ?

হাঁ তারপর, ওরা ওকে মেরে ফেলে।

তারপর ? কীসের পর ? কিন্তু সে প্রশ্ন চিন্তায় আসা মাত্র শিউরে ওঠে বিলকিস।

ছেলেটি বিলকিসের হাত থেকে নীরবে সুটকেসটা এবার নেয়। বলে, আপনি যাবেনই ?

এতখানি এসে ঢাকায় ফিরে যাব ?

তা ঠিক।

তোমার বোন কোথায় ছিল ?

জলেশ্বরীতে।

বিয়ে হয়েছিল ?

হবার কথা ছিল। সব ঠিক হয়ে ছিল। তারপর এই সব হয়ে গেল।

বিলকিস ঠিক বুঝতে পারে না, অবিবাহিত বোন ছিল জলেশ্বরীতে, ছেলেটি নবগ্রামে, ওদের বাড়ি কোথায়— নবগ্রামে, না জলেশ্বরীতে ?

মানুষ অনেক সময় প্রশ্ন উচ্চারণের আগেই উত্তর পেয়ে যায়। ছেলেটি বলে, আমার বাবা মা ছোট ভাই, সবাই এক রাতে বিহারীদের হাতে খুন হয়। আমি ইন্ডিয়া চলে যেতাম, আমার এক বন্ধু নবগ্রামের, সে আমাকে জলেশ্বরী থেকে এখানে নিয়ে আসে। একা যেতে সাহস পাই নি।

বোঝা যায় ছেলেটি আসলে জলেশ্বরীর। বিলকিস আরো অনুভব করে, ছেলেটি তাকে বিশ্বাস করে নইলে ইন্ডিয়া চলে যাবার কথা বলতে পারত না। তার একটু কৌতূহল হয়, ছেলেটি অচেনা একজনকে এতটা বিশ্বাস করতে পারছে কী করে ?

অনেকখানি চলে এসেছে তারা, আবার রেললাইনের দু'ধারে জঙ্গল চেপে আসছে। দূরে সুড়ঙ্গের মতো দেখাচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে পথটুকু।

বিলকিস জিগ্যেস করে, তুমি আর কতদূর আসবে ?

চলুন না দেখি।

তোমার ভয় করে না ?

কীসের ভয় ?

জলেশ্বরীতে আজ নাকি মিলিটারি গুলি করেছে ?

শুনেছি।

ওরা যদি তোমাকে ধরে ?

আমি তো পথঘাট চিনি। আপনি তো তাও চেনেন না।

আমার জন্যে বিপদে পড়বে কেন ?

ছেলেটি এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাকে লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত দেখায়।

তার চেয়ে তুমি ফিরে যাও।

দু'জন এক সঙ্গে থাকলে ভয় নেই।

তারপর নবগ্রামে ফিরে আসবে কী করে ? রাত হয়ে যাবে না ?

আপনাদের বাড়িতে যদি থাকতে দেন।

তুমি চেনো আমাদের বাড়ি ?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বলে, কেন চিনব না ? আপনি তো কাদের মাস্টারের—

আমার বাবাকে তুমি দেখেছ ?

দেখেছি, খুব ভালো মনে নেই। যেবার আমি মাইনর স্কুল থেকে হাই স্কুলে গেলাম, উনি তার আগেই মারা গেলেন তো। ওঁর কাছে যদি ইংরেজি শিখতে পারতাম!

কেন ?

সকলেই বলে, কাদের মাস্টারের মতো ইংরেজি কেউ জানে না।

সবুজ সুড়ঙ্গের ভেতর এখন ঢুকে যায় ওরা। ভারি শীতল লাগে। বুনো ঝোপের পাতাগুলো সজল ঝকঝক করে। পায়ে চলা সরু পথটা এখানে হারিয়ে গেছে বলে দু'জনের লাইনের ওপর উঠে আসতে হয়।

তোমরা থাক কোথায় ?

প্রশ্ন করেই বিলকিসের মনে পড়ে যায়, এখন তো ছেলেটির কেউই বেঁচে নেই। বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেওয়াতে সে অপরাধ বোধ করতে থাকে। বিষণ্ন হয়ে যায়।

ছেলেটি ইতস্তত করে বলে, পোস্টাপিসের পেছনে জলার ঐ পারে।

বিশদ জিগ্যেস করে আর তাকে কষ্ট দিতে চায় না বিলকিস। অপ্রত্যাশিতভাবে জুটে যাওয়া তরুণ এই সঙ্গীটির অদেখা বাবা, মা, বোনের কথা সে ভাবে।

পথ চলে। তার নিজের কথা মনে পড়ে যায়। আলতাফ কি বেঁচে আছে ? যে খবরের কাগজে আলতাফ কাজ করত, পঁচিশে মার্চ রাতে মিলিটারি সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতের শিফটে ছিল আলতাফ। সে আর ফেরে নি। যে দুটি লাশ পাওয়া গেছে, আলতাফের বলে সনাক্ত করা যায় নি। আলতাফের বন্ধু এক সাংবাদিক, অন্য কাগজের শমশের, সে কয়েকবার বলেছে— ভাবি, আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি আলতাফ বেঁচে আছে।

তাহলে সে ফিরল না কেন ? প্রতিদিন বিলকিস রাতের অন্ধকারে কানের কাছে রেডিও নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনেছে। প্রতি রাতে সে আশা করেছে হয়তো আলতাফের গলা শোনা যাবে। কিন্তু যায় নি। শমশের আবার বলেছে, ভাবি, আলতাফ ইন্ডিয়াতে গেছে। গেলে তো আর খবর দেওয়ার উপায় নেই, খবর আপনি পাবেনই। আজ হোক কাল হোক, আপনি দেখবেন আলতাফ বেঁচে আছে।

বিলকিস ছেলেটিকে হঠাৎ জিগ্যেস করে, কই, তোমার নাম বললে না তো।

আমার নাম ? আমার নাম সিরাজ।

সিরাজ ?

ছেলেটিকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখায়। কারণটা ঠাহর করতে পারে না বিলকিস। আশে পাশে কিছু টের পেয়ে গেছে সে, যা বিলকিস বুঝতে পারে নি?

দু'পাশে এখনো ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর মিলিটারি ওঁৎ পেতে নেই তো?

বিলকিস ছেলেটির কাছে সরে আসে চলতে চলতে।

সিরাজ, আমরা কতদূর এসেছি?

এখনো অনেক দূর আছে।

অনেক দূর?

কতটুকু আর হেঁটেছেন?

দু'মাইল হবে না?

সিরাজ হেসে ফেলে। বলে, কী যে বলেন, দিদি। পরমুহূর্তেই সিরাজ সজাগ হয়ে বিলকিসের মুখের দিকে তাকায়। ভীত গলায় বলে, পা চালিয়ে চলতে হবে। নইলে সন্ধে হয়ে যাবে।

জঙ্গল পেরিয়ে আবার ফাঁকা মাঠের ভেতর পড়ে তারা।

সিরাজ পরামর্শ দেয়, আপনি যদি স্লিপারের ওপর দিয়ে চলতে পারতেন তাহলে তাড়াতাড়ি হতো।

শাড়ি পরে স্লিপার লাফানো যায় না, বাধ্য হয়েই লাইনের পাশ দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়।

সিরাজ বলে, একটা গরুর গাড়িও যদি পাওয়া যেত। জলেশ্বরীতে ভোরে ডিনামাইট ফাটার কথা শুনে কেউ আর ওদিকে যেতে চাইল না।

কখন চেষ্টা করলে?

আপনি যখন ইস্টিশান মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

বিলকিস অবাক হয়ে যায়। ছেলেটি সেই তখন থেকে তাহলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবছে! তার বাবার যারা ছাত্র তারা এখনো নাম শুনলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সিরাজ তাঁর ছাত্র নয়, তবু সে তাঁর মেয়ের জন্যে এতটা ভাবছে, ভেবেছে। বিলকিসের গর্ব হয় বাবার জন্যে।

মায়ের মুখ চোখের সমুখে ভেসে ওঠে বিলকিসের।

হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারেন নি বাবা, মা পদে পদে গঞ্জনা দিতেন তাঁকে। বাবা বলতেন, আমি না হই, আমার ছাত্ররা তো হয়েছে।

জলেশ্বরীতে আজ ভোরের ঘটনার পর মা, ভাই বোন ভালো আছে তো? বিলকিস বড় বিচলিত বোধ করে।

সিরাজ, সত্যি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিলকিস স্লিপারের ওপর পা রাখে। তারপর শাড়ি একটু তুলে, হাতে গুটিয়ে নিয়ে, লম্বা পা ফেলে ডিঙোতে থাকে। প্রথমে একটু বেসামাল ঠেকে, অচিরে অভ্যেস হয়ে যায়।

আর কতদূর, সিরাজ?

আপনি হাঁপিয়ে গেছেন?

না, না।

একটু দাঁড়িয়ে যান, না হয় ?

না দেরি হয়ে যাবে। মন কেমন করছে। বাড়ির কথা ভেবে কিচ্ছু ভালো লাগছে না, সিরাজ।

মাস্টার বাড়িতে কেউ কিছু করবে না।

ঢাকার কথা তুমি জান না। ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের বাড়িতে ঢুকে গুলি করে মেরেছে। হিন্দু প্রফেসরদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

সিরাজ শিউরে ওঠে।

তুমি শোন নি ?

সিরাজ ভয়ার্ত চোখে ম্লান হাসে।

আর কতদূর আছে আমাকে বল।

মাইল দুয়েক।

তুমি না হয় ফিরে যাও, সিরাজ। তোমার জন্যেই এখন আমার ভয় করছে। তুমি জান না, তোমার বয়সী ছেলেদেরই মিলিটারি ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ইনজেকশন দিয়ে সব রক্ত টেনে নেয় ওরা, হাত বাঁধা অনেক লাশ পাওয়া গেছে, নদীতে ভেসে আছে, তোমার বয়সী সব। তুমি ফিরে যাও, আমি ঠিক যেতে পারব।

সিরাজ দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়তো সে মনের ভেতর অনুরোধটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কেবল তাকে মূর্তির মতো স্থির দেখায়।

তারপর সে নীরবেই আবার চলতে শুরু করে। যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ফিরে যাবে না।

তুমি অদ্ভুত ছেলে তো!

সিরাজ উত্তর দেয় না।

৩

সন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ওরা জলেশ্বরীর ভেতরে পা রাখে। তিন সড়কের মোড়ে ডাকবাংলা থেকেই সীমানা ধরা হয়। কিন্তু সড়ক ধরে আসে নি। তার আগে ছিল সেই খাল, যে খালের পুলের ওপর সকালে ডিনামাইট ফেটেছিল। সে জায়গাটা ঘুরে, বনের ভেতর দিয়ে ওরা কবরস্থানের পাশ দিয়ে আবার রেললাইনের ওপর জলেশ্বরীর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এসে দাঁড়ায়।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমনকি দূরে যে দু'একটা ঘর চোখে পড়ে তাতেও কোনো বাতি নেই।

এতক্ষণ ফসলের মাঠে যে স্তব্ধতা ছিল, তা থেকে শহরের এই স্তব্ধতা একেবারে আলাদা। এখানে টের পাওয়া যায় মানুষ আছে, কিন্তু নিঃশ্বাস পতনের শব্দ নেই। শব্দের সম্ভাবনা আছে কিন্তু শব্দ নেই।

বিলকিস উদ্বিগ্ন চোখে সিরাজের দিকে তাকায়।

সিরাজ গুম হয়ে থাকে।

রেললাইন ধরে গেলেই বিলকিসের বাড়ি সংক্ষিপ্ত পথে পৌছুনো যায়। সেই পথেই এগোয় তারা। কান খাড়া করে রাখে। কিন্তু কিছুই টের পাওয়া যায় না।

দ্রুত পায়ে ওরা দুজনে চলে। আর কিছুদূর গেলেই ছোট একটা সড়ক লাইনটাকে কাটাকুটি করে গেছে। তার বাঁ হাতিতে কয়েক পা দূরেই কাদের মাস্টারের বাড়ি।

অন্ধকারের ভেতরেও দূর থেকে চোখে পড়ে লম্বা ঘরের পেছনে টক আমের গাছটি।

শেষ কয়েক হাত বিলকিস দৌড়ে যায় বাড়ির দিকে।

বাড়ির সদর দরোজায় থমকে দাঁড়ায় সে। সিরাজ এসে যায়।

সিরাজ বলে, বাড়িতে কেউ নেই মনে হয়।

সদর দরোজায় পা দিয়েই রক্তের ভেতরে সেটা টের পেয়েছিল। দরোজা হা খোলা। ভেতরে জমাট অন্ধকার।

ত্রস্ত পায়ে দু'জনে ঢোকে। অন্তত বাইরের চেয়ে নিরাপদ। অন্ধকারের ভেতরেই চোখে পড়ে বাড়ির কিছু কাপড় ঝুলছে, বারান্দায় বালতিতে রাখা পানি, বদনা। রান্নাঘরে মেঝের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বাসনকোসন যেন এইমাত্র কেউ খেতে খেতে উঠে গেছে। দাওয়ার নিচে পড়ে আছে শাদা-কালো খোপ কাটা ফুটবল।

শোবার ঘরের বারান্দায় কাঠের পুরনো যে চেয়ারটাতে কাদের মাস্টার বসতেন, সেই চেয়ারটা এখনো আছে। সারা বাড়িতে চেয়ারের এই শূন্যতা আরো বিকট মনে হয়।

সমস্ত ঘরগুলো দৌড়ে এসে বিলকিস চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ায়।

কোথায় গেল সব?

বুঝতে পারছি না। পাশের কোনো বাড়ি থেকেও আওয়াজ পাচ্ছি না।

কী হবে, সিরাজ?

আপনি একটু বসুন।

বিলকিস তবু চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনি বসুন তো। এতটা পথ হেঁটে এসেছেন।

প্রায় জোর করে সে চেয়ারে বসিয়ে দেয় বিলকিসকে। যে ছেলেটিকে সারা বিকেল সদ্য কৈশোর পেরুনো অপ্রতিভ তরুণ বলে মনে হচ্ছিল, এখন তাকে অন্য রকম মনে হয়। একটি সন্ধেয় সে অনেকগুলো বৎসর পেরিয়ে এসেছে। তার গলায় নিশ্চয়তা এসেছে, চিন্তায় তৎপরতা।

আপনি বসুন। উতলা হবেন না।

সিরাজ নিজে এবার সারা বাড়ি ঘুরে আসে। প্রতিটি ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। তারপর সদর দরোজা দিয়ে বাইরে যায়। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে।

বিলকিস ব্যাকুল হয়ে তার হাত ধরে।

পাশের কোনো বাড়িতেও মানুষ নেই। মনে হয়, পালিয়েছে।

তার চেয়ে অন্য কিছু তো হতে পারে? মানুষগুলো খুন হতে পারে। বিলকিসের চোখে সেই উদ্বেগ ফুটে বেরোয়। সে আর বসে থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়ায়।

তাহলে?

আপা, আপনি বসুন।

আবার তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয় সিরাজ। কিছুক্ষণ পরে কী চিন্তা করে বলে, আপনি একা থাকতে পারবেন ? আধ ঘন্টা ?

তুমি কোথায় যাবে ?

দেখি যদি খবর পাওয়া যায়।

তার হাত ধরে বিলকিস। না, তুমি বেরিও না।

আমার কিছু হবে না।

কোথায় খবর পাবে ? কে আছে ?

দেখি না, ইস্টিশানের পাশে কয়েকটা দোকান আছে, বাসা আছে, তারা হয়তো কিছু বলতে পারবে।

অত দূরে যাবে ? যদি তোমাকে ধরে ?

সিরাজ হাসে।

বাহাদুরি কোরো না।

আপনি জানেন না দিদি, মিলিটারি সন্ধের পর বেরোয় না। ওদের সব দিনের বেলায়।

হাত ছেড়ে দেয় বিলকিস।

আপনি একা থাকতে পারবেন তো ? আমি বেশি দেরি করব না।

সিরাজ বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

আপনি বারান্দাতেই বসবেন ?

কেন ?

সদর দরোজায় কেউ দাঁড়ালে সোজা দেখা যায়। দরোজা বন্ধ করে যেতে চাই না। কেউ হয়তো সন্দেহ করবে ভেতরে লোক আছে। কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না তো। আপনি বরং রান্নাঘরের ওদিকটায় থাকুন, আমার গলা না পাওয়া পর্যন্ত সাড়া দেবেন না, কোনো শব্দ হলেও বেরুবেন না। আমি এসে আপনাকে ডাকব।

সিরাজ নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকারের ভেতর মিলিয়ে যায়। তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন রোঁয়া ফুলিয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। রান্নাঘরের পাশে কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করে ওঠে বিলকিসের। সেখান থেকে দ্রুত পায়ে সে সরে আসে।

রান্নাঘরের পেছনের বেড়ার ওপারে পাশের বাড়ি। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার আঙিনা দেখা যায় দিনের বেলায়। মা অনেক সময় বেড়া ফাঁক করে পাশের বাড়ির বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেন। সাইকেলের দোকান আছে ওদের; স্বামীটি হাঁপানিতে ভোগে। যখন টান ওঠে, এ বাড়িতে সারা রাত ঘুমানো যায় না তার শ্বাস নেবার আর্তিতে।

এখন সে বাড়ি নিঃস্তব্ধ। বেড়া ফাঁক করে দেখে সে। কঠিন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কান খাড়া করে। মানুষের উপস্থিতির কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

বিলকিসের মনে হয়, রান্না ঘরের দরোজায় কে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে সে ঘুরে তাকায়। কেউ না। কেউ যদি এসে দাঁড়াত তার পালাবার পথ থাকত না। লাফ দিয়ে সে ঘর থেকে বেরোয়। উঠোনের কাপড়গুলো ছুঁয়ে দেখে। শুকিয়ে খটখট হয়ে আছে। একটা শার্ট, বাচ্চাদের কয়েকটা জামা, গামছা, দুটো শাদা শাড়ি। মৃদু বাতাসে শাড়ির ভাঁজ করা পেট

ফুলে ফুলে ওঠে। আবার ঝুলে পড়ে অনবরত পতাকার মতো সখেদে কাঁপে। একটা শাড়ির কোণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বিলকিস তার মুখে চেপে ধরে। সাবান দিয়ে ধোবার পরও মানুষের সুবাস এখনো যায় নি। সে তার মায়ের বোনের উপস্থিতি অনুভব করে।

ওদের কি মেরে ফেলেছে ?

তাহলে লাশ গেল কোথায় ? তাহলে তো রক্তের দাগ থাকত। অন্ধকারে হয়তো রক্তের দাগ চোখে পড়ে নি। বাতি জ্বালালেই দেখতে পাবে। জ্বালাবে সে বাতি ? নিশ্চয়ই রান্নাঘরে ছেলেবেলা থেকে পরিচিত পূর্বদিকের তাকে কুপি লণ্ঠন সাজানো আছে। পাশে রাখা আছে দেশলাই।

রান্নাঘরে সে আবার আসে। অতি পরিচিত ঘরে তাকে হাতড়াতে হয় না। ঠিক পৌঁছে যায় তাকের কাছে। হাত দিয়ে অনুভব করে দুটো কুপি, একটা লণ্ঠন। পাশে খড়মড় ওঠে দেশলাইয়ের বাক্স।

সন্তর্পণে সে লণ্ঠন নামায়।

সিরাজ সাবধান করে গিয়েছিল, কেউ যেন টের না পায় বাড়িতে মানুষ আছে। বাতি জ্বালালে যদি কারো চোখে পড়ে ? কিন্তু মিলিটারি তো রাতে বেরোয় না। চোখে পড়বে কার ? লণ্ঠনের চিমনি তুলে ধরে বিলকিস। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে কাঠিটা ধরে রেখে সে কান খাড়া করে, পেছনে তাকিয়ে দ্যাখে। তারপর সলতে ধরিয়ে খুব ছোট করে দেয়।

সেই অল্প আলোতেও চোখে পড়ে— নিভে যাওয়া উনোনের ওপর খোলা কড়াই। রান্না শেষ হবার আগেই চলে যেতে হয়েছে। ঘরের এক কোণে হয়তো চাল বাছা হচ্ছিল, কুলোর ওপর এখনো কিছু চাল। মেঝের ওপর একটা থালায় দু'খানা আটার রুটি, আধ-খাওয়া কলা।

লণ্ঠনটা আঁচলে ঢেকে সে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে যায় প্রথমে। কী জানি কেন, এখন আর তার তেমন ভয় করে না। এমন এককেটা মুহূর্ত আসে, মানুষ যখন বাস্তব থেকে উন্নীত হয়ে যায়।

ঘরের ভেতরে সে প্রথমেই মেঝের ওপর সন্ধান করে। কোথাও কি রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে ?

খাট দেখে, দেয়াল দেখে, পাশে পার্টিশন করা তার ছোট ভাইয়ের ঘর। খোকা কি রংপুরে ছিল ? না, বাড়িতেই ছিল ? বিছানা ব্যবহার করা মনে হয়। হয়তো খোকা কলেজে আর ফিরে যায় নি। জলেশ্বরীতেই বসে ছিল। খোকার জন্যে হঠাৎ বুকের ভেতরে মুহূর্তে কাঁপন ওঠে তার।

এই বয়সের ছেলেদেরই তো ওরা মেরে ফেলে।

সিরাজের কথা এতক্ষণ সে ভুলেই গিয়েছিল।

উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে সে। কতক্ষণ হয়ে গেছে, সিরাজ এখনো ফিরছে না কেন ?

বাড়ির সকলে গেছে কোথায় ? কখন গেছে ? মেরে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে না তার সব দেখেশুনে। কিন্তু হঠাৎ এমন করে চলে যেতে হলো কেন ? একবার তো নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল, আবারো কি সেখানেই গেছে ?

লণ্ঠন নিভিয়ে, চেয়ারটাকে কোনো শব্দ না করে টেনে এনে বারান্দার শেষ প্রান্তে রাখে বিলকিস। এখান থেকে সদর দরোজা চোখে পড়ে না। সে বসে।

এই প্রথম তার সারা পা টনটন করে ওঠে। পাঁচ মাইল হাঁটার ক্লান্তি অনুভব করে সে। ব্যথাটা আস্তে আস্তে পা থেকে সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে তার। বড় পিপাসা পায়। পেটের ভেতরে পাকিয়ে ওঠে। সারা দিন কিছু পেটে পড়ে নি। ব্যথার সঙ্গে এখন যুক্ত হয় ক্ষুধার যন্ত্রণা।

মাথার ভেতরটা ভয়াবহ রকমে শূন্য মনে হয়।

আলতাফ ফিরে আসবে সে আর আশা করে না। তবু ঢাকায় ছিল, যদি কখনো কোনো খবর পাওয়া যায়। যদি এমন হয় যে, সে ঘুমিয়ে আছে, দরোজায় সাবধানী করাঘাত, দরজা খুলতেই আলতাফ।

হাতের টাকা সব শেষ হয়ে আসে। বাড়ি ভাড়া দু'মাসের বাকি পড়ে। বাড়িওয়ালাকে আজকাল আর চেনা যায় না। এখন সে দাড়ি রেখে দিয়েছে, মাথা থেকে টুপি নামে না। সে এসে ভাড়ার জন্যে যত না চাপ দেয়, তার চেয়ে বেশি করে পরামর্শ দেয়— দেশের বাড়িতে চলে যান, এখানে একা থাকা তো ভালো মনে করি না।

তারপর শমশের এসে বলে, ভাবি, ঢাকায় এখন শুরু হয়ে গেছে। শোনেন নি পরশু দিন গুলির শব্দ? ফার্মগেটে? আমাদের ছেলেরা হামলা করেছিল।

শমশেরের সন্দেহ, মিলিটারি এখন তৎপর হয়ে যাবে, খুঁজে বের করবে, কোন বাড়ির সঙ্গে ইন্ডিয়ার যোগাযোগ আছে। আলতাফ যদি ইন্ডিয়ায় গিয়ে থাকে, তাহলে মিলিটারি একদিন বিলকিসকেই ধরবে।

আমার মনে হয়, আপনি দেশের বাড়িতে চলে যান ভাবি।

আলতাফ কি ইন্ডিয়ায় গেছে? যদি এমন হয়, যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সে? এই যে শোনা যায়, ছেলেরা এখানে পুল উড়িয়ে দিয়েছে, ওখানে গ্রেনেড ছুঁড়েছে, এক গাড়ি সৈন্য খতম করেছে— যদি তার কোনো একটি আলতাফের কাজ হয়? ঢাকায় রাতে যে প্রায়ই গুলির শব্দ শোনা যায়, তার সবই কি মিলিটারির? কোনো একটি কি আলতাফের নয়?

বিলকিস একই সঙ্গে বুকের ভেতরে মঙ্গল কামনায় কাঁপন এবং প্রতিরোধের গৌরব অনুভব করে।

যদি গত বছরও তারা নিষেধ তুলে নিত তাহলে আজ তার কোলে থাকত সন্তান। আলতাফের।

বুকের ভেতরে হঠাৎ ক্ষোভ জমে ওঠে। বিয়ের পর তো পাঁচ বছর গেছে! এবার একটি ছেলে হবার কথা ভাবা উচিত ছিল তাদের।

ছেলে হলে, এখন এই পরিস্থিতিতে মুশকিল হতো। না হয়েছে, ভালোই হয়েছে।

কিন্তু আলতাফ যদি আর ফিরে না আসে! যদি সে রাতেই তার মৃত্যু হয়ে থাকে! আলতাফ কি ইচ্ছে করে নীরব থাকবে? আলতাফ কি তাকে ভালোবাসে না? বিলকিস কি তাকে ভালোবাসা দেয় নি?

আপা।

চমকে ওঠে বিলকিস। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঠিক বুঝতে পারে না, সত্যি কি মানুষের স্বর ? না তার কল্পনা ?

অন্ধকার ফুঁড়ে সিরাজ দেখা দেয়। আপা, আমি। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় সে। কেউ এসেছিল ?

না। আমি ঠিক ছিলাম। কিছু শুনলে ?

হু।

কী ?

খালের পুলটা ঠিক ভাঙতে পারে নি। একদিকের রেলটা গেছে।

পুলের কথা নয়, মা ভাইবোনের কথা শুনতে চায় বিলকিস। কিন্তু সাহস করে জিগ্যেস করতে পারে না। উদ্বিগ্ন চোখে অন্ধকারের ভেতর সিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোথা থেকে একটা ফোঁটা আলো এসে সিরাজের চোখ দুটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মনে হয়, ছলছল করছে।

সিরাজ বলে, আর যা শুনলাম, আপনার সকলেই ভালো আছে।

কার কাছে শুনলে ? কোথায় আছে ওরা ?

নদীর ওপারে, বিশেষ করে টাওনের এ দিকটার সবাই আজ দুপুরে বেরিয়ে যায়। আপনার সকলকেই দেখা গেছে। ওদিকের কেউ বিশেষ সরতে পারে নি। ওদিকে বিহারীদের বাড়ি অনেকগুলো। মিলিটারি ওদের বন্দুক দিয়েছে।

সিরাজ প্রায় মুখস্থের মতো না থেমে বলে যায়। এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়, যেন বক্তব্য শেষ করতে পারলেই নিষ্কৃতি পায় সে।

বিলকিস সেটা লক্ষ করে। হয়তো, একাকী বাইরে বিপদের মধ্যে ঘুরে আসবার উত্তেজনায় সিরাজের গলার স্বরও পাল্টে গেছে।

আপনি কী করছিলেন এতক্ষণ ? আমার একটু দেরিই হয়ে গেল।

বসে ছিলাম।

ভয় পান নি তো ?

বিলকিস ছোট্ট করে মাথা নাড়ে। ভয়ের অনুভূতিটাই তখন তার কাছে অচেনা বলে বোধ হয়।

তুমি সত্যি শুনেছ, ওরা নদীর ওপারে গেছে ?

হাঁ, এখানকার কয়েকজন ছেলে, বাড়ি বাড়ি এসে মেয়েদের তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতে বলে। ওরাই সকলকে নদীর ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যায়।

শুধু মেয়েদের উল্লেখ শুনে বিলকিস বিচলিত হয়ে পড়ে।

আর খোকা ?

আপনার ভাই ?

হাঁ, খোকা সঙ্গে যায় নি ?

সবাই গিয়েছে। আপনার কিছু ভাবতে হবে না। রাতে ঠিক সুবিধে হবে না। কাল দিনের

বেলায় দেখি, আপনাকে ওপারে দিয়ে আসা যায় কি না।

তুমি যে বললে, রাতে মিলিটারি থাকে না, দিনে অসুবিধে হবে না?

আপনি একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে নেবেন। দেখে যেন চাষীদের বাড়ির মনে হয়।

তুমি ভাই অনেক করলে আমার জন্যে। বিলকিস তার হাত ধরে বলে। সিরাজের ভেতরে কোথায় যেন সে খোকাকে দেখতে পায়। কখনো কখনো সমস্ত মানুষের মুখ এক হয়ে যায়। এখন এমনি একটা সময়।

দ্রুত কণ্ঠে সিরাজ বলে, আপনার তো কিছু খাওয়া হয় নি!

না, না, আমার খিদে পায় নি। তোমার?

দিদি, আপা, সামনে পুরো একটা রাত। না খেয়ে থাকবেন? রান্নাঘরে কিছু নেই?

দাঁড়াও বাতি জ্বালি।

না। বাতি জ্বালাবেন না।

একটু আগে লণ্ঠন ধরিয়েছিল বিলকিস। সেটা মনে করে বুক চমকে ওঠে এখন।

আসলে, আপা, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।

কেন?

এ পাড়ায় কেউ নেই। বিহারীরা জানে। লুট করতে আসতে পারে। ওদের তো এখন রাজত্ব।

তাহলে?

আসুন আগে রান্নাঘরে যাই। মুড়িটুড়ি কিছু থাকলে নিয়ে চলুন বেরোই।

কোথায়?

যেখানে হোক। এখানে না, আপা। এখানে আজ রাতে ভয় আছে, আমি শুনে এসেছি।

বলতে গিয়ে সিরাজের গলাও কেঁপে যায়।

বিলকিসই তাকে সাহস দেয়; সে সাহস মুখের নয়, অন্তরের ভেতর থেকে বোধ করে সাহস।

ভয় পেও না। ঢাকায় এ ক'মাস একা একটা বাড়িতে থেকেছি।

কিন্তু এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে।

যাব। আগে দেখি রান্নাঘরে কিছু আছে কিনা। লণ্ঠন জ্বালি। একটু আগেও জ্বেলেছিলাম।

৪

রান্নাঘরে কিছুই পাওয়া যায় না। চাল আছে, কিন্তু রান্না করতে হবে।

সিরাজ তাড়া দেয়— থাক। মুড়ি বোধহয় ওরা যাবার সময় নিয়ে গেছেন।

হাঁ, সঙ্গে বাচ্চারা আছে।

বিধবা বোনের শিশু দুটির মুখ ক্ষণকালের জন্যে বিলকিসের চোখের ভেতরে খেলা করে।

ঘরের ভেতরে একবার দেখে নেবেন নাকি?

কী দেখব?

দামি কিছু ফেলে গিয়ে থাকলে না হয় সঙ্গে নেওয়া যেত।

কী আর সঙ্গে নেব সিরাজ? কত কিছুই তো ফেলে দিতে হলো।

ফুঁ দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দেয় সিরাজ।

তোমার কিছু খাওয়া জুটল না।

আপনিও তো না খেয়ে আপা!

নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা। পথের ওপর দাঁড়িয়ে সিরাজ একবার সামনে পেছনে দেখে নেয়। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে না।

ফিসফিস করে বলে, কেউ নেই। তবু সাবধান থাকা ভালো। পথ ছেড়ে এদিক আসুন।

বাড়িগুলোর ধার ঘেঁষে, ড্রেনের পাড় দিয়ে দ্রুত সন্তর্পণে হেঁটে চলে ওরা।

রেললাইন পার হয়ে কাঠের গুদামগুলো পড়ে। বড় বড় গাছ কাত হয়ে আছে। কিছু চেরাই হয়েছে। কাঠের সোঁদা গন্ধে বাতাস ম ম করছে। বিলকিসের মনে পড়ে যায়, ছোটবেলায় এখানে এসে হাঁ করে সে কাঠ চেরাই দেখত। প্রতিদিনই চোখে কাঠের গুঁড়ো পড়ত। চোখ লাল হয়ে যেত।

গন্তব্য ঠিক বুঝতে পারে না বিলকিস।

এর পরেই তো সিনেমা হলের রাস্তা!

হাঁ। আপনার মনে আছে?

কেন মনে থাকবে না?

ফিসফিস করে কথা বললেও সিরাজ এখন নিজের ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে কথা না বলবার ইশারা দেয়।

গন্তব্য আর জিগ্যেস করা হয় না।

কখনো থেমে চারদিকে দেখে নিয়ে, কখনো দ্রুত পায়ে খোলা একটা জায়গা পার হয়ে ঝোপের সমান মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে সিরাজ। বিলকিস তার অনুসরণ করে।

অচিরে একটা পাড়ায় এসে ঢোকে তারা।

কথা বলবার নিষেধ সত্ত্বেও বিলকিস না বলে পারে না, মোক্তার পাড়া না?

হাঁ। প্রায় এসে গেছি।

একটা বাড়ির সমুখে এসে সিরাজ দ্রুত একবার দেখে নেয় চারদিক। তারপর হঠাৎ বিলকিসের হাত ধরে একটা চালার পেছনে টেনে নিয়ে যায়।

জলেশ্বরীতে এই প্রথম মানুষের সাড়া পায় বিলকিস।

দূরে, কাঁকর বিছানো বড় সড়কের ওপর পায়ের শব্দ। কে যেন ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে! চালার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁঠাল গাছের নিচ দিয়ে একটা বাড়ির ভেতরে ঢোকে দু'জনে।

প্রশস্ত আঙ্গিনা ভেতরে। অন্ধকারও অনেকটা তরল। আঙ্গিনা জুড়ে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। বাঁ দিকে তিনটি কাঁঠাল গাছ ঘিরে বেড়া চলে গেছে। ডান দিকে বড় একটা টিনের ঘর। সমুখে শেষ মাথায় রান্নার চালা। তার পাশে স্তূপ করে খড়ের গাদা, গরুর

গোয়াল। গোয়ালটা শূন্য।

বাড়িটাকেও জনশূন্য মনে হয়।

কেউ নেই বাড়িতে?

ফিসফিস করে সিরাজ বলে, আছে।

বিলকিস অবাক হয়। আঙ্গিনা দেখে তার মনে হয়েছিল, কতকাল মানুষ এখানে বাস করে নি।

বিলকিসকে নিঃশব্দে দাঁড়াবার ইশারা করে বেড়ালের মতো লঘু পায়ে সিরাজ টিনের ঘরের বারান্দায় উঠে যায়। তখন চোখে পড়ে বিলকিসের, বারান্দায় জলচৌকির ওপর স্থির বসে থাকা একটা মানুষের আদল। তার সঙ্গে কথা হয় সিরাজের। তারপর সে বারান্দার কিনারে এসে ইশারায় বিলকিসকে কাছে ডাকে।

কাছে আসতেই সিরাজ লোকটিকে বলে, কাদের মাস্টারের মেয়ে।

লোকটি প্রাণহীন মূর্তির মতো সমুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কথাটা শুনেছে কি শোনে নি, বিন্দুমাত্র বোঝা যায় না। লোকটির দৃষ্টি আঙ্গিনার দিকে স্থির নিবদ্ধ।

সিরাজ চাপা গলায় বলে, ইনি আলেফ মোক্তার। এখন চোখে দেখতে পান না।

অস্ফুট কাতর ধ্বনি করে ওঠে বিলকিস।

এককালের জাঁদরেল মোক্তার বলে খ্যাতি ছিল তার। বৃটিশ আমলে মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা ছিলেন। বিলকিসের এখনো মনে আছে, ভোটে জেতার পর, তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে জলেশ্বরীতে মিছিল বেরিয়েছিল। পাকিস্তান হবার বছরে বালিকা বিদ্যালয় ঈদ পুনর্মিলনীতে আবৃত্তি করে বিলকিস ফার্স্ট হয়েছিল। পুরস্কার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আলেফ মোক্তার। তারপর, চুয়ান্ন সালের ভোটে যখন নবগ্রামের কাশেম মিয়ার কাছে তিনি হেরে যান তখন, বিলকিসের মনে পড়ে, মা গঞ্জনা দিচ্ছিলেন বাবাকে— কই ছাত্রের জন্যে তোমার না এত গর্ব! তোমার ছাত্রই তো এখন জিতেছে। মনখারাপ করছ কেন? এতকালের বন্ধুর জন্যে মন খারাপ না করে কাশেমের জন্যে লাফাও। দেখি ছাত্রের দিকে তোমার কত টান?

বাবার সেই অপ্রস্তুত মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পায় বিলকিস।

এই সেই আলেফ মোক্তার!

পাতা ঝরা আঙ্গিনার দিকে তিনি স্থির তাকিয়ে থাকেন কিংবা চোখ হারিয়ে ফেলবার পরও তাকিয়ে থাকার অভ্যেস মানুষের যায় না।

ঠিক কী বলবে বুঝতে পারে না বিলকিস।

সিরাজ তাকে ঘরের ভেতরে আসতে ইশারা করে।

উনি ঐ রকমই বসে থাকেন। সারা দিন-রাত।

ঘরের ভেতরে সেকালের ভারি দুটো আলমারি, অতি প্রশস্ত একটি খাট, অন্ধকারেও বার্নিশের কোথাও কোথাও আলোর বিন্দু ধরা পড়ে আছে। আর একটা ভ্যাপসা গন্ধ, কাপড় ভিজে ভালো করে না শুকোবার মতো তীব্র ঘ্রাণ।

বাড়িতে আর কেউ নেই?

না।

বৌ, ছেলে, মেয়ে ?

এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল নেভির এক লোকের সঙ্গে, কোথায় আছে জানি না। বাকি দুই ছেলে, দু'জনেই পাবনায়। একটু থেমে সিরাজ যোগ করে, মানসিক হাসপাতালে। একটু দাঁড়ান তো আপা।

সিরাজ বাইরে যায়। অনুচ্চ স্বরে আলেফ মোক্তারের সঙ্গে কী কথা বলে। আবার ফিরে আসে ঘরে।

বিলকিস জিগ্যেস করে, বৌ ?

বলতে পারব না কেন, বৌ তার বাপের বাড়িতেই অনেকদিন থেকে আছে। চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল প্রায় সেই থেকেই।

আসে না ?

কী জানি! অনেকদিন দেখি নি।

উনি এভাবে থাকেন, দেখে কে ? রান্না খাওয়া ?

ওর পুরনো মুহুরি, সে-ই দেখাশোনা করত। গণ্ডগোলের সময় সে পালিয়েছে।

এখন ?

সিরাজ চুপ করে থাকে।

এখন কে দেখে ?

আপা, এখন কে কাকে দেখবে ?

সিরাজের এই নিষ্ঠুর উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় বিলকিস! একটা মানুষ, অন্ধ, বয়স প্রায় সত্তর, তাকে কেউ দেখছে কিনা, সে প্রশ্নে এতটা তাচ্ছিল্য আশা করা যায় না। অন্তত সিরাজের কাছ থেকে, যে বিলকিসকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে নবগ্রাম থেকে এ পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে এবং কেবল এই আশংকায় যে বিলকিসের কোনো ক্ষতি বা বিপদ হতে পারে।

পা আবার টন টন করে ওঠে। বিলকিস অনুমানে খাটের কোণ হাতড়ে বসে পড়ে।

সিরাজ, অন্ধ বুড়ো মানুষ, কেউ তাকে দেখছে না, বলতে গিয়ে হাসলে কেন ?

সিরাজ আবার হাসে। খুব সংক্ষিপ্ত মৃদু তরঙ্গের হাসি। কাছে আসে সে।

আপা, আমি হাসছি না। এটা হাসি নয়, আপা। শুনবেন আলেফ মোক্তারের অবস্থা ? কে তাকে দেখে ? বিহারী কতগুলো ছোকরা আছে, তারা।

বিহারী ?

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে বিলকিস। এ কোথায় নিয়ে এলো তাকে সিরাজ ?

হাঁ, বিহারী কয়েকটা ছোকরা। প্রথমবার জলশ্বেরীতে যখন মিলিটারি আসে, তার আগের রাতে টের পাওয়া গিয়েছিল, ওরা আসবে। ছেলেরা সবাইকে সাবধান করে দেয়। মাঝরাতে সবাই শহর ছেড়ে নদীর ওপারে চলে যায়। বাঙালিদের ভেতরে পড়ে থাকে শুধু আলেফ মোক্তার। মিলিটারি আসবার পর বিহারীরা দলেবলে বেরোয়, প্রতিটা বাড়ি ঢুকে তছনছ করে, লুট করে। একদল এসে দেখা পায় মোক্তার সাহেবের। তারপর অন্ধ দেখে

বদমাশগুলোর ফুর্তি হয়। আলেক মোক্তারের গলায় জুতোর মালা দিয়ে, বুকের ওপর জয় বাংলার নিশান লাগিয়ে কোমরে গরু বাঁধার দড়ি বেঁধে সারা শহর তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অন্ধ মানুষ, হাঁটতে পারে না, বার বার পড়ে যায়, বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে খাড়া করে, লাথি মারে, টেনে নিয়ে বেড়ায়। তারপর ফিরিয়ে এনে একা বাড়িতে রেখে যায়। আবার পরের দিন তাকে নিয়ে বেরোয়, আবার সেই এক বৃত্তান্ত। এরপর মাঝে মাঝেই তাকে নিয়ে এরকম করে। মজা করবাব জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারাই কখনো কিছু এনে খেতে দেয়।

হতভম্ভ হয়ে যায় বিলকিস।

শুনলাম, আজো নিয়ে সারা বিকেল ঐভাবে ঘুরিয়েছে। তারপর থেকে চুপ করে জলচৌকির ওপর বসে আছেন। সিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলে, এখানে যা লুট করবার সব নিয়ে গেছে। ঘরের ভেতরে কেউ আসে না আর। তাই এখানে আপনাকে নিয়ে এলাম। এখানে ওরা আজ রাতে আর আসবে না। আর এলেও ভেতরে ঢুকবে না। জানেন তো, পালাবার সবচে' ভালো জায়গা শত্রুর ঘাঁটির ভেতরে।

বয়সের তুলনায় সিরাজ তার কথায় যে অভিজ্ঞতার পরিচয় অবলীলাক্রমে দেয়, বিলকিস অবাক না হয়ে পারে না। তার ভাই খোকাও কি এ রকম সাবালক হয়ে গেছে?

বিলকিস আস্তে আস্তে বাইরে আসে। এসে, আলেফ মোক্তারের কাছে দাঁড়ায়।

কে? আঙ্গিনার দিকে চোখ রেখেই চমকে প্রশ্নটা করেন আলেফ মোক্তার।

আমি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু আর বলেন না। সিরাজ নিঃশব্দে এসে বিলকিসের পাশে দাঁড়ায়।

হঠাৎ গলা পরিষ্কার করেন আলেফ মোক্তার। সেই অপ্রত্যাশিত শব্দে সমস্ত পরিবেশ যেন চমকে ওঠে! তারপর তিনি, আঙ্গিনার দিকে স্থির চোখ রেখেই, অত্যন্ত দৃঢ় গলায় বলেন, তোমার বাবা আমার খুব বন্ধু লোক ছিলেন।

তারপর তিনি চুপ করে যান। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বিলকিস, কিন্তু মোক্তার আর কিছু বলেন না।

আপনি ভেতরে যাবেন না?

সাড়া নেই।

ভেতরে আপনাকে শুইয়ে দিই?

তবু কোনো সাড়া নেই।

সিরাজ অসহিষ্ণু গলায় বলে, উনি এখানেই থাকুন না? আপনি ভেতরে যান। আমি ওর কাছে বসছি।

এখানে কতক্ষণ বসে থাকবেন?

বিলকিস সিরাজকে উপেক্ষা করেই মোক্তার সাহেবকে আবারো সম্বোধন করে।

আলেফ মোক্তার হঠাৎ হাহাকার করে ওঠেন, কোথায় যাব? কবরে যাব? আজ এতগুলো ছেলে মেরে ফেলল।

কী? কী বললেন? আর্তনাদ করে ওঠে বিলকিস।

দেখতে পাই না, তবু ওদের মুখ দেখতে পাই।

ফুঁপিয়ে ওঠেন আলেফ মোক্তার।

সিরাজ অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড করে বসে। বিলকিসের হাত ধরে, টান মেরে সরিয়ে এনে, ঘরের ভেতর ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। চাপা গলায় গর্জন করে ওঠে, আপনি ভেতরে থাকুন।

না।

পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে বারান্দায় ছুটে আসে বিলকিস।

কাদের মেরেছে ? কোন ছেলেদের ?

বিলকিসের বুকের ভেতর ঠাস করে এসে আছাড় খায় খোকার মুখ।

আলেফ মোক্তার এই প্রথমবার আঙ্গিনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাতড়ে খপ করে বিলকিসের হাতখানা ধরে ফেলেন।

দুর্বল কম্পিত হাতে দ্রুত গতিতে সারা হাত ছুঁয়ে দেখেন। তারপর বলেন, সব লাইন করে। বাজারে। তোমার ভাইয়ের নাম খোকা না ?

৫

আপনি এদিকে আসুন।

সিরাজের কণ্ঠস্বর থমথমে। বিলকিস বিস্ফারিত চোখে একবার সিরাজ, একবার আলেফ মোক্তারের দিকে তাকায়। তারপর, সিরাজকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে ঢোকে।

আপনি বসুন।

নিজেই অবাক হয়ে যায়, বিলকিস অত্যন্ত শান্তভাবে খাটের কোণে গিয়ে বসে। সিরাজ একটুক্ষণ সমুখে দাঁড়িয়ে থেকে পাশে বসে তার। আলমারির নকশায় একটা উজ্জ্বল ছোট্ট আলোর বিন্দুর দিকে তাকিয়ে সে বলে. আপনার ভাই খোকা মারা গেছে। এতক্ষণ আপনাকে বলি নি। ভেবেছিলাম, বলব না।

কথাটা বলেই সিরাজ একহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

বিলকিসের কান্না পায় না। তার মনে হয়, একটা জানা খবরই দ্বিতীয়বার কেউ তাকে শুনিয়ে গেল।

সিরাজের পিঠে হাত রাখে সে।

তখন আরো ফুঁপিয়ে ওঠে সিরাজ। এই ক' মাসের প্রতিটি মৃত্যু একের পর এক তরঙ্গের মতো তার দিকে ধেয়ে আসে।

শান্ত কণ্ঠে বিলকিস উচ্চারণ করে, খোকা নেই ?

নিজেকে সামলে নেয় সিরাজ। সামলাতে একটু সময় লাগে। সেটুকু অপেক্ষা করে বিলকিস।

তারপর জিগ্যেস করে, কী হয়েছিল ?

অনেকগুলো ছেলে। বাজারে দাঁড় করায়। এক সঙ্গে গুলি করেছিল।

খোকা ছিল ?

হাঁ।

তুমি কখন জানলে ?

তখন খোঁজ নিতে বেরুলাম। মোক্তার সাহেবের কাছে শুনলাম।

খোকার নাম করে বললেন ?

না, বললেন, অনেকে ছিল, মফিজ, নান্টু, এরফান, চুনি মার্চেন্টের ছোট শালা, তারপর বললেন কাদের মাস্টারের ছেলে। বাজার করতে এসেছিল কিছু লোক, মারা গেছে, কয়েকজন দোকানদার, কয়েকটা বাচ্চা ছেলেও আছে।

দুপুরবেলায় ?

কখন ঠিক জানি না।

কিছুক্ষণ শূন্যতার ভেতরে নিক্ষিপ্ত থেকে বিলকিস জিগ্যেস করে, উনি দেখতে পান না। কেউ তাকে বলেছে গুলির কথা। কে বলেছে ?

প্রশ্ন করে সিরাজের কাছে উত্তর আশা না করে সে উঠে দাঁড়ায়।

কোথায় যাচ্ছেন ?

ওর কাছে শুনতে চাই।

আর কী শুনবেন ? বিহারীরা বিকেলবেলায় ওকে কোমরে দড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাজারে। সেখানে ওরাই ওকে বলে ছেলেদের নাম।

ঠিক তখন দরোজার কাছে এসে দাঁড়ান আলেফ মোক্তার। হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে এগিয়ে আসেন তিনি। বিলকিস উঠে তাঁর হাত ধরে। বিছানায় নিয়ে আসে।

আলেফ মোক্তার কাতর একটা আহ্ ধ্বনি করে নীরব হয়ে যান। তাঁকে কিছু জিগ্যেস করবার মতো নিষ্ঠুর হতে পারে না বিলকিস।

অনেকক্ষণ পরে আলেফ মোক্তার বলেন, এত বড় পাষাণ, মানুষের অন্তঃকরণ নেই, হুকুম দিয়েছে, লাশ যেখানে আছে সেখানে থাকবে। কেউ হাত দিতে পারবে না। কচি ছেলেগুলোকে কাক শকুনে ছিঁড়ে খাবে, দাফন হবে না।

কে হুকুম দিয়েছে ?

মিলিটারি। মিলিটারি ছাড়া হুকুম দেবার আছে কে ?

তাদের মরতে হবে না কোনোদিন ? তাদের মাটি দেবার দরকার হবে না কোনোদিন ? ছেলেদের প্রাণ নিয়েছিস, মায়ের কোল খালি করেছিস, মায়ের মতো মাটি, তার কোলে রাখতে দিবি না এজিদের দল ? যেখানকার লাশ সেখানে থাকবে ? মাটি সর্বত্র, মূর্খের দল। মাটি তাদের নিজের বুকে টেনে নেবে। আল্লাহ্‌র ফেরেশতা দাফন করবে। ফেরেশতার কাছে তোর হুকুম টিকবে না।

খসখসে গলায় বিলাপ করে চলেন আলেফ মোক্তার।

তার সে বিলাপ সহ্য করা যায় না। কিন্তু চুপ করতে বলবে. মনে হয় বাতাস হাহাকার করছে, অন্ধকার বিলাপ করে চলেছে। মানুষের সাধ্য নেই তা থামিয়ে দেয়।

ওঠে।

সিরাজ।

আপা।

বারান্দায় এসো।

বাইরে এসে জিজ্ঞাসু চোখে সিরাজ বিলকিসের দিকে তাকায়। সিরাজ, তুমি বলছিলে না, মিলিটারি রাতে বেরোয় না?

কেন?

আমি যাব। বাজারে যাব। খোকার লাশ না দেখলে বিশ্বাস হবে না, খোকাকে আমি দেখব। তাকে আমি নিজের হাতে মাটি দেব।

কথাটা শুনে চঞ্চল হয়ে পড়ে সিরাজ।

তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

৬

বিলকিসের গলায় নিষ্কম্প ঋজু উচ্চারণ শুনে সিরাজ ভীত হয়ে পড়ে।

যাবে কি যাবে না?

এ একেবারে অসম্ভব কথা আপা।

তুমি না যাও, আমি একাই যাব।

সিরাজ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমার কথা নয়। আমার জন্যে বলছি না। যাওয়াই সম্ভব হবে না। খোলা জায়গা। বিহারীদের চোখে পড়ে যাবেন।

তাই বলে, আমার মায়ের পেটের ভাই, তার দাফন হবে না, আমি চুপ করে থাকব?

আপনি শুধু শুধু পাগলামি করছেন।

আমি যাব, সিরাজ।

ওরা দেখামাত্র গুলি করে।

করুক। আমার লাশও পড়ে থাকবে।

এতক্ষণ যে বিলকিসকে সিরাজ জানত, এখন অন্য কেউ মনে হয়। এমন কেউ যে একটা প্রবল ঝড়ের ভেতর স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

সিরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে। সন্ধের সময় বিলকিসকে রেখে যখন খবর নিতে বেরিয়েছিল, তখন কেবল আলেফ মোক্তার নয়, মিষ্টি দোকানের মকবুলদার কাছেও শুনেছিল, লাশ যেখানে আছে সেখানে পড়ে থাকবে, কেউ ছোঁয়া দূরে থাক, কাছে গেলে পর্যন্ত গুলি করা হবে। কৌশলটা আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্যে, না লাশের নিকটজন কারা আসে তাদের ধরবার জন্য, স্পষ্ট নয়।

তোমার যদি ভয় করে, সিরাজ তুমি না হয় থাক, আমি একাই যাব। ঢাকা থেকে ভাইয়ের মরবার খবর শোনার জন্য যদি এসে থাকি তো তার মরা মুখও আমি দেখে যাব, নিজের হাতে মাটি দেব।

বেশ দেবেন। আপনার ভয় না করলে আমার কী ? কথাটা বেপরোয়া শোনাতে পারত। শোনাল কিন্তু অভিমানকম্পিত।

বিলকিস তার হাত ধরে জলচৌকির ওপর বসায়। তারপর বলে, মোক্তার সাহেব কী করছেন, দেখা দরকার।

উঠে ভেতরে যায় সে।

কাটা একটা গাছের মতো পড়ে আছেন তিনি। মুখের ওপর ঝুঁকে দেখে, ঘুমিয়ে গেছেন। মরে যান নি তো ? বুকের পরে আলতো করে হাত রাখে বিলকিস। খুব ধীরে শ্বাস বইছে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বিক্ষোভ অত্যন্ত নিচু পর্দায় চলছে। তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে। বাবার কথা মুহূর্তের জন্যে মনের ভেতরে নড়ে ওঠে। আবার শান্ত হয়ে যায়।

বিলকিস বাইরে এসে সিরাজের পাশে বসে।

কখন বেরুলে ভালো ?

আরো কিছু পরে। দুপুররাতের দিকে।

তখন ওরা টহল দেয় না ?

রাতদুপুরের পরে বড় একটা না। বিহারী হোক, আর মিলিটারির যত চেলাই হোক, ওদেরও তো ভয় আছে।

কীসের ভয় ?

বারে, দেখছেন না চোখের সামনে পুলে ডিনামাইট মেরে গেল ? রাতেই ওরা আসে। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থাকে। ছায়ার মতো চলাফেরা করে। হামলা করে কোথায় মিশে যায় কেউ বলতে পারে না।

খোদ ঢাকাতেই তার প্রমাণ পেয়েছে বিলকিস। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে খবরে শুনেছে।

সিরাজ বলে, সেই রাগেই তো আজ এতগুলো খুন করল। এর প্রতিশোধ দেখবেন ওরা নেবে।

ছেলেটির ভয় অনেকটা কমে গেছে। তার কথা শুনলে মনে হয়, পারলে সে এক্ষুণি প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিলকিস বলে, আচ্ছা সিরাজ, একটা কথার উত্তর দেবে ? এত ঝুঁকি নিয়ে আমার সঙ্গে জুটে গেলে কেন ? আমি সত্যি চাই না, আমার জন্যে তোমার কোনো বিপদ হোক। অনেক করেছ তুমি।

বিলকিস সস্নেহে তার হাতে কয়েকবার চাপড় দেয়। আসলে সে বুঝে দেখতে চায়, কাঁচা বয়সে মেয়েদের জন্য মোহ থেকেই সিরাজ এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইছে কিনা। তা যদি হয় তার উচিত হবে না তাকে প্রশ্রয় দেয়া।

বল। সেই নবগ্রাম থেকে এতদূর এলে, এত ঝুঁকি নিলে কেন ? খোকার মতো তুমিও যদি ধরা পড়তে ? তোমাকেও যদি মেরে ফেলত ?

সিরাজ চুপ করে ভাবে। ক্রমশ মাথাটা তার ঝুঁকে আসে সমুখের দিকে। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ মাথা তুলে বলে, হাঁ, ধরা পড়তে পারতাম।

তবু এলে কেন ?

আমি যে কাজ করছি।

তার মানে ?

কাজ করছি।

সিরাজ অপ্রস্তুতভাবে একটুখানি হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, বাবা-মা-বোন সবাই চলে যাবার পর, আপনাকে বলেছি তো, ইন্ডিয়ায় চলে যেতে চেয়েছিলাম। সাহস হয় নি। কয়েক সপ্তাহ পালিয়ে বেড়িয়েছি। একদিন কী একটা সোর উঠল, রাতদুপুরে উঠে পালাতে হলো। জানেন দিদি, এমন জায়গা দিয়ে ঘোর অন্ধকারের ভেতরে আমাকে পালাতে হয়েছিল, যেখানে গোক্ষুর সাপের আস্তানা! সবাই জানে। দিনের বেলাতেই আমরা কেউ ওদিকের ধারে কাছে যেতাম না। সেখান দিয়েই আমাকে পালাতে হয়, আপা।

সিরাজের মুখে একবার 'আপা' একবার 'দিদি' এই প্রথম কানে লাগে বিলকিসের। জলেশ্বরী হিন্দুপ্রধান জায়গা ছিল এক সময়। এখনো এখানে অনেক মুসলমান পরিবার দাদা-দিদি ব্যবহার করে। 'আপা' চল হয়েছে পাকিস্তান হবার পর। তার আগে 'বুবু' চলত। বুবু ডাক আশা করে নি বিলকিস, কিন্তু 'আপা' আর 'দিদি' এর কোনো একটা হলে তার কানে লাগত না। সম্বোধনের দুটোই ব্যবহার করাতে সিরাজকে তার বয়সের চেয়েও ছোট মনে হয়, বেড়ে ওঠা একটা কিশোর মনে হয়, যে এখনো ঠিক অভ্যস্ত নয় অচেনা কোনো মহিলার সঙ্গে দীর্ঘকাল কথা বলতে।

সিরাজ বলে চলে, প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, এই সাপের কামড়ে মরব, এই সাপ ছোবল দেবে। জানেন তো রংপুর গোক্ষুর সাপের জন্যে কেমন বিখ্যাত ? কিন্তু কী আশ্চর্য কী করে বেঁচে গেলাম! পরদিন মনে হলো, কেন যাব ইন্ডিয়ায় ? যাব না। এখানেই থাকব। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন যেখানে গেছে, সেখানেই থাকব, শেষ দেখব।

তুমি খুব সাহসী।

না, সাহস নয়, আপা। সাহস ওদের, আমার কয়েকজন বন্ধু ওরা গোড়াতেই ইন্ডিয়া গেছে। সেখানে ট্রেনিং নিয়েছে, দেশের ভেতরে ঢুকে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করছে, সাহস ওদের। ওরা সাহসী।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিরাজ যেন বন্ধুদের কল্পনায় দেখে নেয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে তার।

কী হলো ?

কিছু না।

তুমি সাহসী। নইলে ডিনামাইটের ঘটনা শুনেও তুমি আমার সঙ্গে জলেশ্বরী চলে আসতে পারলে ?

মনসুরদা বলেছেন বলেই তো এলাম।

মনসুরদা ?

আপনাকে বলা হয় নি। এই কথাটাই আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। খেই হারিয়ে ফেললাম। মনসুরদার সঙ্গে কাজ করছি। ওপার থেকে যারা আসে তাদের সাহায্য করি। মনুসরদা করেন। আজ ডিনামাইট হয়ে যাবার পর এক ট্রেন সৈন্য আসে। তারপর আমার ওপর ডিউটি পড়েছিল, ইস্টিশানের দিকে চোখ রাখার। বিকেলের ট্রেনে আপনি এলেন।

আমি লক্ষ করেছিলাম, তুমি আমাকে প্ল্যাটফরমে দেখেই ঝোপের আড়ালে চলে [illegible] আপনি তো আর দশজন যাত্রীর মতো নন। আপনাকে দেখেই চেনা যায়, [illegible] এসেছেন।

তাই ?

হাঁ। আমি তো এক নজরেই বুঝেছি। মনসুরদাকে বলতেই তিনি ভালো করে দেখলেন। আপনি তখন ইস্টিশানের ঘরের ভেতরে। জানালা দিয়ে দেখেই মনসুরদা আমাকে বললেন, কে চিনেছিস ? কাদের মাস্টার, আমার স্যারের মেয়ে।

তোমার মনসুরদা আমার বাবার ছাত্র ? কে বল তো ?

আপনি কি চিনবেন ? পরাণ হকারের নাতি। বৃটিশ আমলে ইংরেজ সাহেবের কাছ থেকে যে মেডেল পেয়েছিল। সে মেডেল আমি দেখেছি। এখনো ওদের ঘরে আছে। মনসুরদা আমাকে বললেন, বোধহয় জলেশ্বরীতে যেতে চায়, কিছুতেই যেতে দিবি না। আর যদি যেতেই চায়, পৌঁছে দিয়ে আসবি।

তোমার মনসুরদা এল না কেন সামনে ?

তার অনেক কাজ। তাছাড়া ভোরবেলার ঐ হামলাটার পরে মনসুরদা তো কিছুতেই জলেশ্বরীতে যেতে পারেন না। আপনি যদি জলেশ্বরীতে যেতে চাইতেন ? কী করতেন তিনি ? তাই আমাকে পাঠালেন। আমি তো আপনাকে অনেকবার নিষেধ করলাম। আপনি শুনলেন না।

তোমার মনসুরদা তো বলেই ছিল, আমি যদি যেতে চাই, আমাকে পৌঁছে দেবে।

তাই তো দিলাম।

উনি তো বলেন নি, আমার সঙ্গে বাজারে যাবে খোকার লাশ দাফন করতে।

সিরাজ চিন্তা করে।

ধর, উনি মানা করলেন, তাও তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

সিরাজকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়। অবশেষে বলে, আমার মনে হয়, মনসুরদাও আপনার সঙ্গে যেতেন।

কেন বলছ ?

আপনি যে একটা কথা বললেন তা আমার মনে গেঁথে গেছে।

কোন কথা ?

ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে শুনেও থাকতে পারেন না।

সিরাজের কণ্ঠস্বরে গাঢ় বিষণ্নতা এবং খেদ ফুটে বেরোয়।

জানেন আপা, আমর মনে হয়, আমি খুব নিচু ধরনের ভীতু।

আবার ও কথা কেন ?

বিহারীরা যখন এল, আমি বাবা-মাকে ফেলে পালিয়ে গেলাম কেন ? আমি তো জানতাম ওরা কিছুতেই প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে না কাউকে। সবাইকে ফেলে আমি একা পালিয়ে গেলাম, ভীতু নই তো কী ? আপনার মতো আমার সাহস নেই কেন ? ভাইয়ের জন্যে আপনার যে রকম টান, আমার ছিল না কেন ?

সিরাজ [illegible] ...শ করতে থাকে। তবু

কাঁদছ [illegible]

যদি আমার [illegible]

পারবে? বিশ্বাস হয় [illegible]

মারা গেছে শুনেছি, আলতাফ যদি [illegible]

লোকের মৃত্যু আমার কাছে কাহিনী হয়ে থাকত। আলতাফ নেই, আমার মৃত্যু-[illegible]
মৃত্যুর জন্যে আমার শোকও নেই। খোকাকে গুলি করে মেরেছে, খোকার লাশ পড়ে আছে, খোকার লাশ কেউ ছুঁতে পারবে না, কই, আমার চোখে তো পানি আসছে না, পানি এল না। ছ মাস আগেও কেউ যদি খোকার মৃত্যু-সংবাদ আমাকে দিত, পৃথিবীটা চৌচির হয়ে যেত না? এখন তো আমি ঠিক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। খোকাকে কবর দেওয়ার কথা ভাবছি। কেউ ভীত নয় সিরাজ। কেউ ভেঙ্গে পড়ে না, শোক কখনও এত বড় নয় যে, মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। একটু চুপ থেকে বিলকিস যোগ করে, কখন বেরুব?

সচকিত হয়ে ওঠে সিরাজ। এতক্ষণ সে যেন অন্য একটা জগতে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বেরুবার আগে আমি বরং একবার ঘুরে দেখে আসি।

কদ্দূর যাচ্ছ?

বেশি দূর না। মোড় পর্যন্ত। তখন পায়ের আওয়াজ পেলেন না? শান্তি কমিটির ছোকরাগুলো টহল দিচ্ছিল। ওরা যতক্ষণ আছে, মোড় পেরুনো মুশকিল। তবে, বেশিক্ষণ থাকে না, এই যা। আমি দেখে আসি।

আবার বেড়ালের মতো আঙ্গিনাটি মুহূর্তে পার হয়ে সিরাজ বেড়ার আড়ালে হারিয়ে যায়।

একবার ধক করে ওঠে বিলকিসের বুক। একবার খোকার মুখ মনে পড়ে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, নিজের জমাট বাঁধা রক্তের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খোকা।

বিলকিসের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে।

৭

কলেরায় উজাড় কোনো গ্রামের মতো পড়ে আছে জলেশ্বরী। কুকুরগুলো পর্যন্ত পথে নেই। অন্ধকারে নিঃশব্দে সন্তর্পণে মোড়ের কাছে এসে দাঁড়ায় বিলকিস আর সিরাজ। ঝাঁপ বন্ধ একটা পানের দোকানের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে বড় সড়কের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

এখন চাঁদ উঠে গেছে। পেট উঁচু তার ঘোলাটে আলোয় সড়কটিকে অস্বাভাবিক স্থির এবং অন্য কোনো জনপদের বলে মনে হয়।

দূরে একটা শব্দ পাওয়া যায়।

ওরা এখনো আছে।

ফিসফিস করে ওঠে সিরাজ।

শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু শব্দের উৎস দেখা যায় না। ফলে সতর্ক থাকতে হয় আরো বেশি করে। কখন কোথা থেকে উদিত হয়, কে জানে!

পায়ের শব্দ মসমস করে। নিস্তব্ধ রাতের ভেতরে সামান্য শব্দও তীব্র আকার ধারণ করে।

দিকভ্রম হয়ে শ্রোতার। বিলকিস আর সিরাজ অনবরত ডাইনে-বাঁয়ে দেখে। এমনকি পেছনেও, যেখানে খাড়া দেয়াল উঠে গেছে পরিত্যক্ত কালী মন্দিরের।

মনে হচ্ছে, ভালো করেই টহল দিচ্ছে।

দেখতে পেলেও হতো।

দেখতে পেলে টুক করে পেরিয়ে যাওয়া যেত বড় সড়ক। এখন ঝুঁকি অনেক। যদি দেখে ফেলে, বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওরা পেরিয়ে যাবে সত্যি, কিন্তু হুশিয়ার হয়ে যাবে। বেজায়গায় আটকে পড়তে হবে। তারচে' অপেক্ষা করাই ভালো।

সিরাজ ?

কী ?

শব্দের দিকে কান রেখে ফিসফিস করে বিলকিস বলে, এখনো তুমি ফিরে যেতে পার।

সিরাজ কিছু বলে না।

খোকা সত্যি নেই ?

মকবুলদাও বললেন।

তুমি তো দেখে এলে, তখন লোক ছিল না।

তখন মনে হলো, কেউ নেই। এখন আবার শব্দ শুনছি।

মোক্তার সাহেব আর কী বললেন ?

কীসের কথা ?

খোকা।

আপনাকে বলা যাবে না।

যাবে। আমার কিচ্ছু হবে না।

সিরাজ চিন্তা করে খানিকক্ষণ। মটাস করে একটা শব্দ হয়।

ও কী ?

কলা গাছের পচা পাতা খসে পড়ল।

কালী মন্দিরের ওপাশে কলা গাছের মাথাগুলো বাতাসে দোলায়।

খোকার কথা বল। কী বলেছেন মোক্তার সাহেব ?

খোকার লাশের কাছে নিয়ে বলেছে, এই দ্যাখ কাদের মাস্টারের ছেলে। তারপর লাঠি দিয়ে মোক্তার সাহেবের তলপেটে বার বার খোঁচা দিয়েছে।

কেন ?

ইতস্তত করে সিরাজ।

কেন খোঁচা দিয়েছে ?

লাশের ওপর প্রস্রাব করতে বলে।

বিলকিসের গলার ভেতরে বাষ্প ঠেলে উঠতে চায়।

সিরাজ বলে, অনেকবার খুঁচিয়েছে। তারপর উনি অজ্ঞান হয়ে যান। ওরা হয়তো করেছে।

শিউরে ওঠে বিলকিস। নিঃশব্দ অস্থিরতায় সে মাথা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। তবু চোখের ওপর থেকে সরে যায় না। খোকার মুখ সে দেখতে পায়।

ও কী করেছিল সিরাজ ? ওদের এত রাগ কেন ?

ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখে সিরাজ। কান খাড়া করে। এক পা এগিয়ে যায়। দোকানের আড়াল থেকেই গলা বাড়িয়ে দেখে। তার পর হাত নেড়ে ইশারা করে বিলকিসকে।

চলে আসুন। আমি আগে যাচ্ছি। ওপারে গিয়ে হাত দেখালে আসবেন।

প্রায় হামা দিয়ে সড়কটা পার হয়ে যায় সিরাজ। মিলিয়ে যায় ওপারের দু'বাড়ির মাঝখানে আটকে পড়া অন্ধকারে। আবার তাকে দেখা যায়, খুব অস্পষ্টভাবে। সিরাজ গলা বাড়িয়ে আবার ডাইনে-বায়ে দ্যাখে। তারপর হাত তুলে সংক্ষিপ্ত ইশারা করে অন্ধকারে গলা টেনে নেয়।

ঘোলাটে চাঁদের আলোর ভেতরে সড়কটা পেরুতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে নিজেকে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে স্তম্ভিত বলে বোধ হয় বিলকিসের। অন্ধকারের নিরাপত্তা উষ্ণ মনে হয়। সিরাজ তার হাত ধরে, কোনো কথা না বলে দু' বাড়ির ফাঁক দিয়ে দ্রুততর করে টেনে নিয়ে যায়। অনেকটা দূরে গিয়ে একটা জলা জায়গা পড়ে। পাঁকের পচা গন্ধ নাকে এসে জ্বালা ধরায়।

দূরে একটা কুকুর ডেকে ওঠে।

সড়কে টহলদারের পায়ের মসমস শব্দ ছাড়া এই প্রথম জীবিত কারো সাড়া পাওয়া গেল। কান খাড়া করে রাখে তারা। কুকুরটা হয়তো এক্ষুনি ঘেউ ঘেউ করে উঠবে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে টহলদারেরা।

চাপা গলায় সিরাজ বলে, এইজন্যেই সোজা ছুটে এসেছি। এদিকে সরে না এলে ভয় ছিল।

একটা বিপদ পেরুবার উল্লাস লক্ষ করা যায় সিরাজের গলায়।

কুকুরটা ডাকে না।

যাক, এমনিতেই ডেকে ছিল।

আপা, এই জলার ধার ঘেঁষে যেতে হবে। মোটেই জায়গা নেই। ফসকালেই পাঁকে গিয়ে পড়বেন।

জলার ওপারে কবেকার সিংহ বাবুদের লাল একতলা দালান। বহু দিন আগেই কলকাতায় চলে গেছে ওরা। বাড়িতে কালী মন্দিরের পুরোহিত থাকত। তার কোনো খোঁজ নেই। চাঁদের আলোয় দরোজা-জানালা ভাঙা দালানটিকে এক ধরনের নির্মাণ বলে বোধ হয়।

আমার হাত ধরুন।

প্রথমে খুব ধীরে পা ফেলে ওরা। তারপর সাহস বাড়ে কিংবা অভ্যেস হয়ে যায়, গতি কিছুটা দ্রুতি পায়।

জলা পেরিয়ে কাছারি পাড়ার পেছন দিয়ে অনেকটা যাওয়া যাবে। প্রায় অর্ধেক রাস্তা।

পাঁকের ভেতর হঠাৎ পা বসে যায় বিলকিসের। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠতেই সিরাজ তাকে দু'হাতে টান দেয়। কাদায় সংক্ষিপ্ত মন্থর শব্দ উঠে আবার সব নীরব হয়ে যায়। বিলকিসের দ্রুত শ্বাস নেবার শব্দ শোনা যায়।

দাঁড়াও, শাড়িটাকে ঠিক করে নিই।

এখন চলে আসুন, ওপারে গিয়ে করবেন। সাপ-খোপের জায়গা।

ওপারে এসে বিলকিস হাঁপাতে থাকে।

একটু দাঁড়িয়ে যাবেন ?

না, না।

একটা জায়গায় জন্ম নিলেই কি তার প্রতিটি ধুলিকণা, গাছ, আকাশ, চাঁদ, বাড়ি চেনা হয়ে যায় ? কাছারি পাড়ার পেছনে যে এত ঘন বন, আগে কখনো জানা ছিল না বিলকিসের। পাড়ার সড়ক দিয়ে যাতায়াত করছে। পেছন থেকে এখন পাড়াটিকে সম্পূর্ণ নতুন আর অচেনা মনে হয়।

ঠিক বন নয়। অসংখ্য আম, লিচু, জামের গাছ। বকশি বাবুদের বাগান বাড়ি ছিল।

বকশি বাবুদের বাগানে রাস্তা ভালো, আপা। শুধু খেয়াল রাখবেন, অনেক শুকনো পাতা তো, শব্দ না হয়। এখান থেকে সোজা শর্টকাট করে পোস্টাপিসের পেছনে গিয়ে পড়ব। তারপর বাজারের রাস্তা। আগে পোস্টাপিস পর্যন্ত যাই তো।

যে সিরাজ আলেফ মোক্তারের বাসায় ইতস্তত করছিল, আপত্তি করছিল, সেই সিরাজই এখন হাল হাতে নিয়েছে।

চাঁদের আলোয় বিচিত্র হয়ে উঠেছে বনের তলদেশ।

বিলকিস বলে, তুমি তো বললে না, ওদের এত রাগ কেন খোকার ওপর ?

খোকা ভাইয়ের খুব ভালো গলা ছিল গানের।

রংপুর রেডিও থেকে দু'দিন গান করেছিল। ঢাকায় আমার কাছে আসতে চেয়েছিল। ঢাকা রেডিও থেকে গান গাইবার খুব শখ ছিল। তুমি চিনতে খোকাকে ?

চিনতাম। আলাপ ছিল না আপা।

কেন খোকার লাশের ওপর ওরা ওরকম করল ?

বোধহয়, গান গাইত, খোকা ভাই এখানে সবাইকে 'আমার সোনার বাংলা' শিখিয়েছিল। মার্চ মাসের মিছিলগুলোতে খোকা ভাই সবার আগে থাকত, একেকটা মোড়ে দাঁড়িয়ে সকলে 'আমার সোনার বাংলা' গাইত। সবার চোখে পড়ে গিয়েছিল খোকা ভাই।

কেন পালিয়ে যায় নি ?

সকলে তো পারে না। আমিও পারি নি।

মা বুড়ো মানুষ। বোধহয় তাই যায় নি।

খোকা ভাই কিন্তু মোটেই পথে বেরুত না। কী করে যে ধরা পড়ল ?

বাড়ি থেকে ?

না। মকবুলদা বলল, ছেলেরা যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরে যেতে বলে, খোকা ভাই তখন বাড়িতে ছিল না।

কোথায় গিয়েছিল তবে ?

নীরবে দুজনে বাগানটা পেরোয়। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফাঁকে ফাঁকে এখনই দেখা যাচ্ছে পোস্টাপিসের হলুদ দালান। দালানের পাশ ঘিরে ছোট একটা বাঁশবন। পতাকাশূন্য দণ্ডের মতো খোলা আকাশে স্থির হয়ে আছে।

তারপর সেই দৃশ্য দেখা যায়। বাজারের খোলা চত্বরময় ছড়িয়ে আছে লাশ! বেড়াহীন উলঙ্গ দোকানের খুঁটি আঁকড়ে পড়ে আছে লাশ। আলোর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে গলিটা, তার ওপরে উপুড় হয়ে আছে লাশ। লাশের পর লাশ। এক, দু, তিন, চার, ছয় সারি চোখে পড়ে— বাজারে হয়তো ফল বেচতে এসেছিল গাছের, দুটো বাচ্চা উল্টে থাকা গরুর গাড়ির ছাউনি জড়িয়ে ধরে— লাশ; সমস্ত চত্বর আর খালের ঢালু জুড়ে ইতস্তত বাঁশের গোল গোল ঝাঁকা, কলস, সব্‌জি; আর সমস্ত কিছুর ওপরে স্তব্ধতা, স্থিরতা, প্রত্যাবর্তনের আশাহীন অক্ষমতা।

মৃত্যুর মতো স্পন্দনহীন হয়ে যায় দু'জন। বাস্তবের অতীত অথচ সত্যের সীমানার অন্তর্গত দৃশ্যটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে বিলকিস আর সিরাজ।

তারপর, দুজনেই একসঙ্গে, রক্তের ভেতরে অভিন্ন বোধ প্রবাহ নিয়ে একে অপরের দিকে তাকায়। ক্ষণকাল পরে সিরাজ হঠাৎ মুখ ঢাকে দু'হাতে। টিনের বেড়ার ওপর মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চল হয়ে যায়।

বিলকিস আবার ফিরে তাকায় চাঁদের মেঘাক্রান্ত আলোয় উদ্‌ঘাটিত চত্বরের দিকে। খোকার মুখে প্রস্রাব করে দেবার কথা শোনার মুহূর্ত থেকে যে ক্রোধ তার ভেতরে তলোয়ারের মতো খাড়া হয়ে ছিল, এখন তা ঝলসে ওঠে। তার দ্যুতিতে ম্লান হয়ে যায় সব কিছু। লাশগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না তার। সে সমুখের দিকে পা ফেলে।

ছায়ার মতো কী একটা অপসৃত হয়!

বিলকিসের চেতনায় সেই ছায়া কোনো রেখাপাত করে না।

কিছুটা দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লাশের দিকে স্থির চোখ রেখে সে এগোয়। অচিরে সে পাট গুদামের ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে; আসে খোলা আলোর নিচে, অস্পষ্ট তার ছায়া তাকে অনুসরণ করে; সে এগিয়ে যায়।

বিস্ফারিত চোখে সিরাজ তাকিয়ে দ্যাখে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে। তার মনে হয়, ঘুমন্ত অনেকগুলো মানুষ, তার ভেতরে প্রেতের মতো হেঁটে চলেছে এক রমণী; সেই রমণীকে বর্তমানের মনে হয় না, অতীতেরও নয়, কিংবা কোনো আগামীর। স্তম্ভিত সময়ের করতলে ক্ষণকাল ছবিটি উদ্ভাসিত থেকে নাতিধীর গতিতে মলিন হয়ে যায়।

সিরাজ তাকিয়ে দ্যাখে, এক খণ্ড ধূসর মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। ধূসর সেই মেঘের পেছনে অতি দ্রুত গতিতে আরো অনচ্ছ আরো ধূসর মেঘ ছুটে আসে এবং চাঁদটাকে গ্রাস করে ফেলে।

সম্মুখে তাকিয়ে দ্যাখে, বিলকিসকে আর দেখা যায় না।

লাশগুলোকে খণ্ডিত কিছু অন্ধকার বলে বোধ হয়।

চত্বরে দৌড়ে যায় সে। প্রথমে খুঁজে পায় না বিলকিসকে। যেন এই বাস্তবতাকে নিঃশব্দে গ্রাস করে ফেলেছে অথবা মৃতেরা তাকে দলে টেনে নিয়েছে।

পায়ের কাছে নরম একটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় সিরাজ। দ্যাখে, বিলকিস মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একটি লাশের মুখ উপুড় হয়ে দেখছে।

মধ্যবয়সী কৃষকের চোখ দুটি বিস্ফারিত, ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছিল, জমাট বেঁধে আছে;

দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে একটু, যেন সাক্ষাতে সাড়া দিয়ে মৃদু হাসছে।

বিলকিসকে টেনে তোলে সিরাজ— আপা।

বিলকিস স্থির কণ্ঠে বলে, এত লাশ, সিরাজ!

চারদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিপাত করে সিরাজ হাত ধরে টান দেয়— এদিকে আসুন।

একটা চালার আড়ালে তাকে টেনে এনে সিরাজ তিরস্কার করে। আপনার কি মাথা খারাপ? কে কোথায় আছে না আছে।

না। নেই।

কী করে বুঝলেন?

একটা শিয়াল দৌড়ে গেল। শেয়াল মানুষ থাকলে আসত না।

সিরাজ কান খাড়া করে। কিছু শুনতে পায় না কোথাও। কেবল খালপাড়ে জলের মৃদু অনবরত অভিঘাত বেজে চলে। শ্রুতির ভেতর যতটা নয়, আত্মার ভেতর দিয়ে জলের সেই শব্দ বয়ে যায়।

তবু সাবধান হবেন না?

আবার চারদিকে তাকায় সিরাজ।

জানেন, ওরা লুকিয়ে থাকতে পারে? হুকুম দিয়েছে লাশ কেউ ছুঁতে পারবে না। কাছে এলেই গুলি করবে।

জানি।

ওরা কি একা ফেলে রেখেছে, মনে করেন? কখনো না।

তুমি ফিরে যাও, সিরাজ।

আপনি?

আমি খোকাকে খুঁজে বের করব। নিজের হাতে মাটি দেব।

চাঁদ মুক্ত হয়ে যায়। যখন তারা চত্বরের দিকে তাকায় কাফনের মতো ধবধব করে সবকিছু।

বিলকিস বলে, আমার মৃত্যুভয় নেই সিরাজ। আমি পারব ওদের হুকুম উপেক্ষা করতে।

সিরাজ কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আপা, আপনি মনে করেন, প্রাণের জন্য আমার মায়া আছে? আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলে নি, আমার বোনকে ওরা নিয়ে যায় নি?

সিরাজের কাঁধে হাত রাখে বিলকিস। চুপ। কাঁদতে নেই।

আমি কাঁদছি না। আমি আর একটা বোন হারাতে চাই না।

বিলকিস এক মুহূর্ত সময় নেয় কথাটা বুঝতে। তারপর সিরাজকে বুকের কাছে টেনে নেয়।

ছিঃ কাদে না। কাঁদতে নেই। আমি কি চাই না আমার ভাই আমার সঙ্গে থাকবে, আমরা এক সঙ্গে খোকাকে কবর দেব?

বাজার সড়কের শেষ বাঁকে, পাট গুদামের সারিগুলো পেরিয়ে, ব্যাপারিদের টিনের আপিসঘর ছাড়িয়ে চত্বরটা চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব যে দুলে উঠেছিল এতক্ষণে তা স্থিরতর হয়।

যেন দূরের একটি লক্ষ্যস্থল স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হয়ে যায়।

বিলকিস আর সিরাজ নিঃশব্দে চত্বরে নামে।

বিলকিস ফিসফিস করে বলে, তুমি ঠিক বলেছ, ধরা পড়ে গেলে খোকাকে কবর দিতে পারব না।

আপা দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। বসে পড়ি।

ধরা পড়তে চাই না, সিরাজ। আমরা ধরা পড়তে চাই না। ধরা না পড়ে, খোকাকে কবর দিয়ে, আমি দেখিয়ে দিতে চাই, খোকা মানুষ, খোকা পশু নয় যে তার লাশ পড়ে থাকবে।

বিলকিস কথাগুলো একটানা বলে না। থেমে থেমে বলে, আর হামাগুড়ি দিয়ে একেকটা লাশের কাছে যায়। তার মুখ ফিরিয়ে দ্যাখে, আবার নিঃশব্দে নামিয়ে রাখে। সব লাশের কাছে যায় না। মুখ না দেখেও বোঝা যায়। পোশাক দেখে অনুমান করা যায়, খোকা নয়, দোকানদার, বাজারের কুলি, গ্রামের গৃহস্থ।

দূরে একটা লাশ দেখে দুজনেই একসঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে।

পরনে ট্রাউজার, গায়ে হাফশার্ট, পেটে হঠাৎ ব্যথা উঠলে মানুষ যেভাবে যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পেট চেপে ধরে, অবিকল সেই ভঙ্গিতে পড়ে আছে। তার শরীরের গড়ন দেখে যুবক মনে হয়।

খোকা ?

মুখ দেখে আর্তনাদ করে ওঠে সিরাজ।

কে ?

এরফান।

আস্তে করে মাথাটা নামিয়ে রাখে বিলকিস।

ভালো ফুটবল খেলত এরফান। ফুটবলের জন্য পড়া হয় নি। বাজারে লাইব্রেরি দিয়েছিল।

অদূরে আরও একটি যুবকের লাশ চোখে পড়ে। তার মুখ পাশ ফেরানো। বুকের কাছে পা ভাঁজ করে, শীতের দিনে পাতলা কাঁথার নিচে শুয়ে থাকার মতো গুটিশুটি হয়ে আছে। একটা হাত, যেটা ওপরে, পেছনের দিকে টানটান প্রসারিত।

নান্টু।

কোন বাড়ির ?

ভোলা ডাক্তারের বড় ছেলে।

বিলকিসের মনে আছে ভোলা ডাক্তারকে। ছোটবেলায় কত ওষুধ খেয়েছে তার। বায়না ধরলে মাঝে মাঝে ছোট শাদা মিষ্টি বড়ি দিতেন খেতে। জলেশ্বরীর সবচে' নামকরা হোমিওপ্যাথ।

বিলকিস বলে, নান্টুকে কতদিন দেখি নি!

নান্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিলকিস। আবার ঝুঁকে পড়ে দ্যাখে। আলতো একটা হাত রাখে নান্টুর গালে। তার বিস্ময় যায় না, সেই ছোট্ট নান্টু কত বড় হয়ে গেছে! দাড়ি কামায় এখন। মুখের আদালটা একটু একটু করে স্মৃতির ছোট ছেলেটির সঙ্গে মিলে যায়।

নান্টু এত বড় হয়েছিল ?

সিরাজ এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। নান্টুকে সে এভাবে দেখতে পারছিল না। মুখ ফিরিয়ে রেখেই সে অবরুদ্ধ গলায় বলে, সময় চলে যাচ্ছে, আপা।

দাঁড়াও। নান্টুকে ভালো করে শুইয়ে দি।

তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আঁধারে আবার তারা এগোয়। খোকাকে তবু পাওয়া যায় না।

সিরাজ, খোকাকে ওরা নিয়ে যায় নি তো ?

না। মনে তো হয় না।

খোকা সত্যি এখানে ছিল ?

মকবুলদা, আলেফ মোক্তার, দুজনেই বলেছেন। আলেফ মোক্তারকে, বললাম না. ওরা কী করতে বলেছিল ?

লাফ দিয়ে ক্রোধ ফিরে আসে। সটান হয়ে দাঁড়ায় বিলকিস।

সিরাজ, শোনো।

বিলকিসের কণ্ঠস্বরে কী ছিল, ভয় পেয়ে যায় সিরাজ।

সে উঠে দাঁড়াতেই বিলকিস তার হাত শক্ত করে ধরে, সিরাজ, আমরা সবাইকে কবর দেব। হ্যাঁ, সবাইকে।

খোকা ভাইকে খুঁজব না ?

খুঁজতে হবে না। খোকা এখানেই আছে। একটার পর একটা কবর দিতে দিতে খোকাকেও আমরা পেয়ে যাব।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নীরবতা প্রথম ভাঙ্গে বিলকিস। আগে একটা জায়গা দেখতে হয়।

উল্লেখ করতে হয় না, কীসের জায়গা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সিরাজ বলে, বেশি দূরে তো যেতে পারব না খালপাড়ের মাটি নরম আছে। সেখানে কবর দিলে আপনাদের কোনো কিছু অশুদ্ধ হবে না তো ?

বিস্মিত হয়ে বিলকিস সিরাজের দিকে তাকায়— আমাদের মানে ?

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সিরাজ। থতমতো খেয়ে বলে, আমি ঠিক জানি না কবর কীভাবে দেয়। গোরস্তানে যেতে পারব না, তাই বলেছিলাম। খালপাড়ে কবর দিলে অসম্মান হবে কিনা, আর কিছু না। আচ্ছা, আমি না হয় দেখে আসি।

সিরাজ গলি দিয়ে খালপাড়ের দিকে চলে যাবার পরও বিস্ময়টুকু তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। তারপর চত্বরের দিকে চোখ পড়তেই বলবান বাস্তব সমস্ত কিছুকেই পরাজিত করে ফেলে মুহূর্তে। লাশগুলোর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনের ভেতরে ছবি তুলতে চায় বিলকিস, আজ দুপুরে কী হয়েছিল।

আলেফ মোক্তার লাইন করে দাঁড় করাবার কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে যায়। নান্টু আর এরফানের লাশ দেখে অনুমান করা যায়, এক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাহলে খোকা কি সেই লাইনে ছিল না ? দ্বিতীয় একটি লাইন করা হয়েছিল। শুধু দুটি ? তৃতীয় লাইন কি হয় নি ?

আবার কিছু বিক্ষিপ্ত লাশ দেখে, তাদের হাতের কাছে ঝাঁকা, ব্যাগ, সবৃজি দেখে মনে হয়, বেপরোয়া গুলি চলেছিল অকস্মাৎ। মানুষগুলো দৌড়ুতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

কোনটা আগে হয়েছিল ? লাইন করিয়ে গুলি, না, বাজারের জনতার ওপর গুলি ?

আপা, খালপাড়ে একটা গর্ত করা আছে। আপনি দেখবেন ?

দু'সারি দোকানের ভেতর দিয়ে খালের দিকে গলি। কোনো দোকানে ঝাঁপ ফেলা নেই। ভেতরের তাক, আলমারি, আসন সব ভেঙেচুরে উল্টে, হা খোলা পড়ে আছে।

লুটও করেছে ওরা।

তা করবে না ? এর আগেও দু'বার লুট করেছিল।

বিলকিস এমনভাবে হেঁটে যায়, যেন ধরা পড়বার ভয় নেই। হয়তো ধরা পড়বার কথা সে ভুলে গেছে অথবা এতক্ষণে নিশ্চিত হয়েছে, বাজারে কেউ পাহারায় নেই।

সিরাজ যাকে গর্ত বলেছিল, ঠিক গর্ত নয়। খালপাড়ের ভাঙন ঠেকাবার জন্যে বাঁশের বেড়া লম্বা করে দেওয়া আছে। তবু ভেতর থেকে মাটি খসে যায় বলে মাঝে মাঝে মাটি কেটে ভরাট করতে হয়। সেই মাটি কেটে নেবার দরুন কিছুটা দূরে পাগারের মতো হয়ে আছে। তার ভেতর নেমে পড়ে বিলকিস। মাটিতে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে। মাটি ঝুরঝুরে নরোম বালির মিশেল।

উৎসুক চোখে সিরাজ তাকিয়ে থাকে বিলকিসের দিকে।

বিলকিস বলে, তবু একটা দিক আরো একটু খুঁড়তে হবে। ওদিকে গর্ত কম। তারপর সে গর্তের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একবার হেঁটে আসে। বলে, খুব হলে আট ন'জনের মতো জায়গা হবে। আরেকটা বড় কবর খুঁড়তে হবে যে!

আগে যেটা আছে, আমরা কবর দিয়ে নি ?

তা ভালো।

সিরাজ ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে। এমন একটা কিছু সে খোঁজে, যা দিয়ে গর্তটা গভীর করা যায়। কিন্তু কিছু চোখে পড়ে না।

বিলকিস বলে, বাজারে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

দু'জনে আবার উঠে আসে চত্বরে। এ দোকান সে দোকান উঁকি দেয়, অন্ধকারে ভালো ঠাহর করা যায় না। কোদাল বা খন্তা জাতীয় কিছুই চোখে পড়ে না। লাশগুলোও এখন আর তাদের নিশ্চল বা স্তম্ভিত করে না। যেন এ ব্যাপারে অনেক আগেই একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে; লাশগুলো সহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করছে তাদের শেষকৃত্যের।

হঠাৎ টিনের একটা টুকরো পাওয়া যায়। আঁশটে গন্ধ। এমনকি মাছের আঁশ লেগে আছে। জেলেদের কেউ ঝাঁকার ওপর এই টিন বিছিয়ে মাছ বেচত।

এটাই বেশ।

সিরাজ সায় দেয়।

আরেকটা দরকার।

আঁশটে গন্ধ ধরে এগোতেই মাছ-এলাকায় এ রকম আরো কয়েকটা টিনের টুকরো পাওয়া যায়। দুজনে টিন দুটো নিয়ে তরতর করে ফিরে যায় খালপাড়ে।

যতটা সহজ মনে হয়েছিল, মাটি যত নরম মনে হয়েছিল, ঠিক তা নয়। বালির পাতলা স্তরের পরেই কালো শীতল এঁটেল মাটির পুরু স্তর। সর্বাঙ্গে মাটি-কাদা মাখামাখি হয়ে যায়। তবু একরোখার মতো দুজনে গর্ত গভীর করে চলে। চাঁদ কখনো আলো দেয়, কখনো মেঘের আড়ালে কৃপণ হয়ে যায়।

আধ ঘণ্টাখানেক খুঁড়বার পর বিলকিস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, এই থাক।

এতক্ষণে টের পায়, পিঠ টনটন করছে। গর্তের খাড়াইতে বসে পড়ে বিলকিস। বসে হাঁপাতে থাকে। সিরাজও এতক্ষণ পরিশ্রম করে ঘামে ভিজে উঠেছিল। এক হাতে কপালের ঘাম মুছে সেও বসে পড়ে।

বিলকিস বলে, লক্ষ করেছ সিরাজ, সারা বাজারে একটা পাহারা নেই?

হাঁ, তাই দেখছি।

সিরাজ তবু সাবধানী দৃষ্টিপাত করে চারদিকে। খালের অপর পাড়েও দেখে নেয় সে। ফসলের মাঠের পর কালো ফিতের মতো অন্ধকার গাছপালার সার।

হুকুম শুনে মনে হয়েছিল, দিনরাত পাহারা দিয়ে আছে।

আশ্চর্য!

কীসের আশ্চর্য, সিরাজ? রাতের অন্ধকারকে ওরা ভয় করে।

সিরাজ তবু সতর্কতা ত্যাগ করে না। ঘন ঘন সে মাথা ফিরিয়ে ডানে-বায়ে দেখে নিতে থাকে।

বিলকিস উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যেখানে সবচে' কঠিন হুকুম জারি করেছিল, সেখানেই ওদের সবচে' বেশি ভয়।

আমার মনে হয়, তবু আমাদের তাড়াতাড়ি করা দরকার।

সিরাজও উঠে দাঁড়ায়।

খালপাড়ে উঠে গিয়ে নিচে কবরটার দিকে ফিরে তাকায় দুজনে। গর্তের শূন্যতাকে বাস্তবের চেয়েও অনেক গভীর এবং ব্যাপকতর বলে বোধ হয়।

গলিটা চত্বরে গিয়ে পড়বার মুখেই একটা লাশ কাৎ হয়ে পড়েছিল। মধ্যবয়সী গরীব কোনো রমণী। খাটো শাড়ি হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। বুক খোলা। নিচের চোয়াল বিকৃত হয়ে এক পাশে ঠেলে সরে গেছে। রুক্ষ চুলে আধখানা ঢেকে আছে তার মুখ।

নীরবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়। রমণীটিকে দিয়েই শুরু করে।

সন্তর্পণে, যেন এখনও প্রাণ আছে— ব্যথা পাবে, বিলকিস রমণীর হাত দুটি মুক্ত করে নেয়, পাঁজরের নিচ থেকে।

তুমি পায়ের দিক ধরো, সিরাজ।

তুলতে পারলে ভালো হতো। তোলা মুশকিল হয়ে পড়ে। মানুষ মৃত্যুর পরে ভারী হয়ে যায়। আত্মাই মানুষকে লঘু রাখে। যতক্ষণ সে জীবিত, পাখির মতো ঊর্ধ্বে উঠে যাবার সম্ভবপরতাও তার থাকে। প্রাণ এবং স্বপ্নের অনুপস্থিতিতে মানুষ বিকট ভারে পরিণত হয়। লাশটিকে তখন টেনে নিয়ে যায় ওরা, আস্তে আস্তে গলিটা পার হয়ে ঢালু বেয়ে নিচে নামে। তার পর গর্তের এক প্রান্তে শুইয়ে রেখে আবার ওরা ফিরে যায় চত্বরে। আবার একটি লাশ

আনে। প্রথমে যাকে পায় তাকেই আনে। এমনি করে করে ছ'টি লাশ নামিয়ে আনে তারা। বিলকিস অনুমান করেছিল আট ন'জনের মতো সংকুলান হবে। দেখা যায়, ছজনেই আর জায়গা নেই। তখন মুহূর্তের জন্য অবসন্নতা পেয়ে বসে দুজনকেই। মোট কত লাশ গুণে দেখে নি, কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড় কবরের যে দরকার হবে, তা তারা অনুভব করে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিলকিস বলে, হয়তো এখানেই বাচ্চা দুটোর জায়গা হয়ে যাবে। পায়ের দিকে কিছুটা জায়গা খালি আছে। সেদিকে তাকিয়ে সিরাজ বলে, আপনি উত্তর দিকে মাথা দিতে বললেন, বাচ্চাদের তো উত্তর দিকে হবে না।

না হোক।

সিরাজ তবু ইতস্তত করে।

দেরি করো না।

দুজনে বাচ্চা দুটোকে কোলে করে নিয়ে আসে খালপাড়ে। হঠাৎ চোখে পড়ে, দূরে কী জ্বলজ্বল করছে দুটো! এক পলকের জন্যে শীতল হয়ে যায় শিরদাঁড়া। পরক্ষণেই বুঝতে পারে— শেয়াল। মৃতের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে জীবিত দুজনকে সে অতটা ভয় করে নি। অথবা পশু তার রক্তের ভেতরে অনুভব করতে পেরেছে, এরাও প্রায় মৃত কিংবা অবসন্ন।

তাড়াতাড়ি কবরের ভেতরে বাচ্চা দুটোকে পায়ের কাছে শুইয়ে দেয় ওরা। ফিরে তাকিয়ে দেখে, শেয়ালটা সেখানে আর নাই। চারদিকে দৃষ্টিপাত করেও তার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

কবরের ভেতর থেকে উঠে আসে ওরা। ওপরে দাঁড়িয়ে বিলকিস বলে, তুমি কি জান, মাটি দেবার সময় কোন সূরা দোয়া পড়তে হয়?

সিরাজ চুপ করে থাকে কবরের ভেতরে শায়িত লাশগুলোর দিকে চোখ রেখে।

তুমি আল্লাহ্ বিশ্বাস কর?

সিরাজ বিলকিসের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে কয়েকবার ঠোঁট কেঁপে ওঠে তার।

সিরাজ বলে, না।

বিলকিস সচকিত হয়ে সিরাজের দিকে তাকায়। তারপর নিজেই অনুভব করে তার নিজের ঠোঁট প্রসারিত হচ্ছে। বড় পরিচিত সেই সম্প্রসারণ— খুব ভেতর থেকে, সুদূর থেকে হাসি পেলে ঠোঁটের পেশিতে এই পরিবর্তন হয়।

বিলকিস বলে, তাহলে, আমরা না হয় বলি, যে মাটি থেকে এসেছিলে সেই মাটিতে ফিরে যাও।

ঝুঁকে পড়ে দু'মুঠো মাটি তুলে নেয় দুজন। সযত্নে ধীরে কবরের ভেতর মাটি ঝরে পড়ে জীবিত দুটি মানুষের আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে। হাত শূন্য হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

সিরাজ?

দিদি।

হয় আমাকে আপা বল, না হয় দিদি! হাত চালাও, মাটি দিয়ে ভরে দিতে হবে না?

যতটুকু মাটি সদ্য খুঁড়ে তোলা হয়েছিল তাতে অর্ধেক কবর কোনো রকম ভরাট হয়। আবার তারা সেই টিনের টুকরো দুটি হাতে নেয়। পাড় থেকে ঢালু মাটি কেটে আনতে সুবিধে হয়। সেই মাটি এনে ভরে দিতে থাকে কবর।

ঠিক তখন পটপট করে গুলি শোনা যায়।

৯

সঙ্গে সঙ্গে পাড়ে ঢালুর ওপর ছিটকে উপুড় লম্বা হয়ে পড়ে বিলকিস আর সিরাজ। একবার মনে হয় খালের ওপার থেকে, আবার মনে হয় বাজারের দিক থেকে শব্দটা আসছে। শব্দ থেমে যায়, শব্দের অনুপস্থিতির ভেতরেও তারা দীর্ঘ অনুরণন শুনতে পায়। তারপর স্তব্ধতা ফিরে আসে।

কোথায়?

বুঝতে পারছি না।

গুলির শব্দ আর ফিরে আসে না। খালের অপর পাড়ে তাকিয়ে আগের মতোই সব কিছু মনে হয়। বাজারের দিকেও কোনো মানুষের সাড়া বা পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না।

আস্তে গা ছেড়ে দেওয়াতে ঢালু বেয়ে কবরের পাশে এসে পড়ে তারা। সময় পেলে মাটি সমান করে দেওয়া যেত, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসছে, আগে বুঝে দেখা দরকার।

এখানে থাকা বোধহয় ঠিক হবে না, সিরাজ।

গুলিটা কোনদিকে হলো, বুঝতে পারলে হতো।

আমার মনে হয় দূরে কোথাও।

খুব দূরে নাও হতে পারে।

এখনো অনেক লাশ বাকি।

খোকা ভাইকে পেলেও হতো।

খোকাকেও আমরা মাটি দেব, সিরাজ। ফিরে যাব না।

ভীত কণ্ঠে সিরাজ বলে, রাত তো বাকি নেই।

তাহলে কাল আবার আমরা শুরু করব।

কিন্তু এখান থেকে এখন চলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

এখানে?

হাঁ, এখানে। এত বড় একটা বাজার, একটা দিন লুকিয়ে থাকা যাবে না?

খুব মুশকিল হবে।

এর চেয়ে অনেক বড় মুশকিলের ভেতরে আমরা আছি। বাজার থেকে এখনো কোনো শব্দ পাচ্ছি না, আপা।

বিলকিস কান খাড়া করে এখনো শোনবার চেষ্টা করে।

বাজারে কেউ নেই।

তাহলে কী করবে ?

আগে এসো, মাটি সমান করে দিই কবরের। লাশের তাতে কোনো লাভ নেই। আমাদের মন বলবে, একটা কাজ আমরা ভালো করে শেষ করেছি।

আপা, আমার একটা কথা মনে এল।

কী, সিরাজ ?

এত ঝুঁকি নিয়ে এলাম, কবর দিলাম, যারা মরে গেছে তাদের তো কোনো লাভ নেই।

নেই ? কে বললে নেই ?

আমি তো দেখি না।

ঐ যারা মরে গেছে, তুমি ওদের আলাদা করে দেখছ বলেই একথা বলতে পারছ। যদি মনে করতে পারতে ওরা তোমারই অংশ, তাহলে দেখতে ওদের সৎকার করে তুমি জীবনকে শ্রদ্ধা করছ, সম্মান দিচ্ছ।

টিনের সেই টুকরো দুটো দিয়ে কবরের মাটি সমান করে উঠে দাঁড়ায় ওরা। গলিপথে এসে থামে। তারপর সন্তর্পণে চত্বরের মুখে গিয়ে সতর্ক চোখে চারদিকে দেখে নেয়। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আগের মতোই সব মনে হচ্ছে। তবু সাবধানের সঙ্গে পা ফেলে। দোকানগুলোর গা ঘেঁষে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যথাসম্ভব মিশে থেকে চলে।

কোথায় যাবেন ?

আমি ঠিক করে ফেলেছি। এসো আমার সঙ্গে।

বাজারের চত্বরটা পেরিয়ে পাটগুদামের পাশে টিনের ঘরগুলোর ছায়ায় দাঁড়ায় বিলকিস। সেখান থেকে লাশগুলোর দিকে আবার পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ চোখে সে তাকায়।

সিরাজ, যদি পারতাম, আজ রাতে আমি সবাইকে মাটি দিতাম। দেখতাম ওদের হুকুম কত বড়! ওরা দেখত আমরা পশু নই, আমরা আমাদের মৃতদেহ ফেলে রাখতে দেই না, আমরা শকুনের খাদ্য হতে চাই না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিলকিস আবার বলে, আমাদের দুটি করে মাত্র হাত, লাশ তো অনেক।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

তাই তো।

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে।

সিরাজ, এই পাট গুদামগুলোর কথা ভাবছিলাম। এর ভেতরে নিশ্চয়ই আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব।

সারাদিন ?

দরকার হলে দিনের পর দিন। খোকাকে, সবাইকে কবর দিয়ে, তবে আমি যাব।

গুদামের বড় বড় লোহার দরোজা বিরাট তালা দিয়ে আটকানো। দু'একটাতে টান দিয়ে দেখে সিরাজ, যদি দৈবাৎ খোলা থাকে। অবশেষে ব্যাপারিদের টিনের আপিস ঘরের পাশে দরোজা-জানালাহীন ছোট একটা গুদামের দরোজায় দেখা যায় আংটা দুটো পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধা। তালা নেই। সন্তর্পণে ভেতরে সরে যায় ওরা। একটু পর আবার আসে। ধীরে,

অতি ধীরে দরোজা একটু ফাঁক করে প্রথম সিরাজ ঢোকে, তারপর বিলকিস।

ভেতরে ঢুকতেই সারা গায়ে যেন আগুনের হলকা লাগে, ভেতরটা এত গরম। আর সেই সঙ্গে তীব্র খসখসে গন্ধ। বোধ আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চায়। এক ধরনের নেশায় মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। চোখের সম্মুখে অন্ধকার সূচীভেদ্য মনে হয়। পেছনে সামান্য ফাঁক করা দরোজায় তরল আঁধারের রিবনটিকে উজ্জ্বলতর দেখায়।

সিরাজ চাপা উত্তেজিত গলায় বলে, এখানে থাকতে পারবেন না, আপা।

পারতেই হবে।

পাটের ভীষণ গরম হয়। দু'এক ঘণ্টার ব্যাপার না। সারাদিন থাকলে মরে যাবেন।

দরোজাটা সাবধানে বন্ধ করে দাও।

দরোজা বন্ধ করে দিতেই কবরের মতো নিরেট হয়ে যায় ভেতরটা। হাতড়ে হাতড়ে একটু এগিয়ে এসে সিরাজ ফিস ফিস করে ডাকে— 'আপা'। সাড়া পায় না। আবার সে হাতড়ে হাতড়ে কিছুদূর এগোয়। যতদূর হাত পৌঁছোয় ওপরে। পাহাড়ের মতো স্তূপ করা পাট। আরো খানিক এগোতে আর পথ পায় না। সে আবার ডাকে— 'আপা'। অকস্মাৎ তার মনে হয় সে একটা দুঃস্বপ্নের ভেতরে আকণ্ঠ ডুবে আছে, বিলকিস তাকে ছেড়ে গেছে, এখান থেকে আর কোনোদিন সে বেরুতে পারবে না। হয়তো আর্তনাদ করে উঠত, এমন সময় বিলকিসের গলা শোনা যায়।

সিরাজ, তুমি কোথায়?

পিছু হটে এসে একটা খোলা জায়গা অনুভূত হতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আপা।

বিলকিসের হাত তার গায়ে ঠেকতেই হাতটা আঁকড়ে ধরে।

আপা, কী অন্ধকার!

ভয় করছে?

আপনার সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি ওদিকটা হাতড়ে দেখে এলাম। সারা ঘরে পাটের বেল। এক্ষণি একটা দুটো টেনে দরোজার ওপরে ঠেসে রাখা দরকার। বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা কেউ করলে বাধা পাবে। এসো।

বিলকিস তার হাত ধরে বাঁ দিকে নিচু একটা স্তূপের দিকে নিয়ে যায়। দুজনে মিলে একটা বেল সরাতে প্রাণান্ত হয়ে যায় তাদের। কিন্তু মানুষের শক্তি আসে তার প্রয়োজনের মাত্রায়। অচিরেই তারা একটা বেল এনে দরোজার কাছে ঠেলে ফেলে।

আরো একটা হলে ভালো হয়।

আরো একটা বেল এনে দরোজার আরেক পাটে রাখে। দরেজার কাছে কিছুটা হাওয়া, পাটের প্রচণ্ড গরমের তেজ কিছুটা পরিমাণে সহনীয়। তবু দরোজার কাছে বসা ঠিক নয়। সিরাজের হাত ধরে বিলকিস তাকে আবার অনন্ত অন্ধকারের গহ্বরে নিয়ে যায়। অনুমানে বোঝা যায়, দুদিকে দুসার চলে গেছে, মাঝখানে সরু গলির মতো। গলিটার একটু ভেতরে ঢুকে বিলকিস মাটিতে বসে পড়ে।

বোসো।

পাছে গায়ের ওপর পড়ে যায়, সিরাজ অনেকটা সরে, আস্তে আস্তে বসে।

কোথায় তুমি ?

এই যে!

খুব যখন ছোট ছিলাম, পাট গুদামে লুকোচুরি খেলতে আসতাম। সবচে' মজা কি জান, এর মধ্যে যতই তুমি হাঁট, চল, কথা বল, মানে খুব জোরে যদি না বল, বাইরে কেন, ভেতর থেকেই কারো টের পাবার জো নেই। লুকোবার জায়গার কথা মনে হতেই ছেলেবেলার খেলা মনে পড়ে গেল। একটা খেলাও পেয়ে গেলাম। তুমি যে তখন বললে, আল্লাহ্ বিশ্বাস কর না, দ্যাখ তো, এখন পর্যন্ত সব ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কী করে হচ্ছে, কেউ যদি ওপরে না থাকেন ?

উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিলকিস।

কই, কিছু বলছ না ?

ওপরে কেউ থাকলে আমার মা-বাবা খুন হতেন না, আমার বোনের লজ্জা নষ্ট হতো না, আপনার ভাই গুলি খেয়ে বাজারে পড়ে থাকত না, দিদি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনেছেন ? লক্ষ লক্ষ লোককে ওরা মেরে ফেলেছে। বেতার কেন, নিজের হাতে আজ কবর দিলেন না ? কতজনকে দিতে পেরেছেন ? তারচে' অনেক বেশি পড়ে আছে না, ওদের ছুঁলে পর্যন্ত গুলি করার হুকুম আছে না ? আপনি বলেছেন, ওপরে কেউ আছে। কে আছে ? কেউ নেই। থাকলেও ঐ ওদের জন্যে আছে, আমাদের জন্যে নেই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সিরাজের আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। বিলকিস, সে নিজেই কি এখন বিশ্বাস করে আল্লাহ্কে ? নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে বিলকিস ? মানুষের মৃত্যু দেখে বরং এখনো তার চোখ ভিজে ওঠে, কিন্তু আল্লাহ্র ওপর আস্থা হারিয়েও এখন সে বিচলিত বোধ করে না।

তাহলে কেন মিছেমিছি আল্লাহ্র কথা তুলতে গেল সে ? অভ্যাস বলে ? রক্তের অন্তর্গত বলে ? না, রক্ত থেকেও সে বিদায় দিয়েছে তাঁকে। জলেশ্বরীতে পা রাখা অবধি, পদে পদে এত ঝুঁকি, এত মৃত্যু, তবু তো সে একবারও আল্লাহ্কে স্মরণ করে নি ?

সিরাজ।

কোনো উত্তর আসে না।

রাগ করেছ ?

নীরবতা।

বিলকিস হাতড়ে হাতড়ে একটু এগোয়। সিরাজের শরীর হাতে ঠেকে। তার চিবুকের নিচে হাত রাখে বিলকিস। আঙুল দিয়ে অতি ধীরে বুলিয়ে দেয়।

তোমার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে। তুমি তো একা নও। আমার মা কোথায় আমি জানি না, ভালো আছে কিনা কে জানে, আমার বোন, তার বাচ্চারা। আমি তো ভাইকে হারালাম। ওর সুন্দর মুখটাকে ওরা নোংরা করে দিয়েছে তাই তো শুনতে হলো। আর আমি জানি না, আমি বিধবা না সধবা। মনের একটা দিক বলে, আলতাফ বেঁচে আছে, আরেকটা

দিক হাহাকার করে ওঠে, নেই নেই। আমার মনের ঠিক যে দিকটা বলে নেই ঠিক সেই দিকটাই একদিন আল্লা'কে বিশ্বাস করত, বিচার আছে বলে মনে করত, মানুষের ভেতরে মানুষ সব সময়ই আছে বলে নিশ্চিন্ত থাকত।

চিবুকের নিচে বিলকিসের হাতটা হঠাৎ দু'হাতে চেপে ধরে সিরাজ।

বড় অকস্মাৎ বড় অপ্রত্যাশিত মনে হয় তার এই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা।

মুহূর্তকাল পরে একই আকস্মিকতার সঙ্গে হাতটা ছেড়ে দিয়ে সিরাজ বলে, দিদি, আমি আপনাকে একটা মিথ্যে কথা বলছি।

তার এই ঘোষণাটি আরো প্রত্যাশিত।

আমি সিরাজ নই। মনসুরদা আমাকে এই নাম দিয়েছেন। আমি প্রদীপ।

প্রদীপ?

শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস।

তবু তুমি এখানে আছ?

আছি। ইন্ডিয়া যাই নি। এখানে থেকে এখানেই আবার আমি প্রদীপ হতে চাই। দিদি, আপনি বুঝতে পারেন আমার দুঃখ? মা-বাবা-বোন, আমার নাম, আমার পরিচয় একটা মাত্র রাতে আমার সব কিছু হারিয়ে যাবার দুঃখ? দিদি, আমাদের ধর্মে বলে, ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে। কই, আমার ধর্ম তো আমাকে রক্ষা করতে পারল না?

কথাগুলো বিলকিস ভালো করে শুনতে পায় না। তার মনের ভেতরে বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত ছেলেটির টুকরো টুকরো কথা, আচরণ, প্রতিক্রিয়া, সম্বোধন দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে।

প্রদীপ।

দিদি।

কে বলে তুমি ভীতু? তোমার জন্যে আমার গর্ব হয়।

১০

রাত কেটে যায়। বাইরে ভোর হয়ে গেলেও ভেতরে অন্ধকার কাটে না। তারপর সূর্য যখন প্রবল হয় তখন ভেতরটা একটু ফিকে হয়ে আসে। সেই অস্বাভাবিক গোধূলিতে দেখা যায় স্তূপাকার পাটের ভেতরে সরু পথের দুই প্রান্তে আছে দু'জন। মৃত্যুর যে কনিষ্ঠ ঘুম, মৃত্যুর মতোই আমোঘ ও অনিবার্য। এই দুটি মানুষের গতকালের শ্রম, শোক, আকস্মিকতা এখন নিপুণ হাতে নিরাময় করে চলছে ঘুম। বাইরে, পাটের স্তূপের পেছনে টিনের একটা দেয়ালের ওপারেই লাশের সংখ্যা কম দেখে বিহারীদের বিস্ময়, কোলাহল, দৌড়, সৈন্যদের খবর পেয়ে আসা, শেয়ালে খুড়ে ফেলা খালপাড়ের ঐ কবর আবিষ্কার, আকাশে সৈন্যদের গুলি ছোঁড়া, কিছুই ঘুমের চিকিৎসাধীন মানুষ দুটির শ্রবণে পশে না। বিহারীরা বাঙালিদের একটা পাড়া দৃষ্টান্ত হিসেবে পুড়িয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্থানীয় ছাউনির অধিনায়ক মেজর সংক্ষিপ্ত 'না' বলে তাদের নিরস্ত করে। মেজর তাদের জানায় না যে, গত রাতে রংপুর জলশ্বরী একমাত্র সড়কটির ওপর পাতা মাইনে সেনাবাহিনীর একটা জিপ উড়ে যায়, তিনজন নিহত হয়। বিহারীরা জলেশ্বরীতে কোনো বাঙালির সন্ধান না পেয়ে আলেফ

মোক্তারের বাড়িতে ঢোকে এবং গলায় ফাঁস টেনে তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। তাদের অগোচরে জলেশ্বরী বাজারেই দুটি বাঙালি অকাতরে ঘুমায়। যেখানে তারা ঘুমিয়ে সেই গুদামের ঠিক বাইরে দিনের রৌদ্রোজ্জ্বল নিরাপত্তার ভেতরে বিহারী কয়েকটি যুবক বন্দুক ঘাড়ে করে টহল দেয়। তাদের কিছু আত্মীয়, কিছু বন্ধু, বিক্ষিপ্ত লাশগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বসে থাকে, সিগারেট ফোঁকে। কারো কারো গলায় জরির সরু মালা। সৈন্যরা জলেশ্বরীতে প্রথম আসবার পর থেকে এই শখটি বিহারীদের কারো কারো ভেতরে দেখা যায়।

১১

অন্ন কিংবা জল কিছুই নয়, এখন তারা অপেক্ষা করে থাকে মধ্যরাতের জন্য। বিলকিস বলেছিল, পাটের গুদামের ভেতরে কথা বললে বাইরে থেকে শোনা যায় না, তবু জেগে ওঠার পর, নিজেদের এই মসৃণ খসখসে আঁশের স্তূপের ভেতরে আবিষ্কার করবার পর বাইরে পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর শোনবার পর, একটি কথাও নিজেদের ভেতরে তারা বলে নি। গত রাতের মাটি, কাদা, স্বেদে বীভৎস মূর্তি দুটি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বসে থাকে সারা দিন।

সন্ধে হয়ে যায়। মনে হয়, বাইরে উপস্থিত লোকের সংখ্যা একে একে কমে যাচ্ছে। তারপর, এক সময় বাইরেও অখণ্ড এক স্তব্ধতা ঝপ করে ঝুলে পড়ে।

এতক্ষণ দু'জন দূরত্ব রেখে বসে ছিল, স্তব্ধতার নিঃশব্দ ঘণ্টাধ্বনির পর একই সঙ্গে তারা পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে, তাদের নিঃশ্বাসের গতি দ্রুততর হয়, হাতে হাত রাখে এবং উৎকর্ণ হয়ে তীব্র অপেক্ষা করে।

কথা বলে বিলকিস প্রথম। অনেকক্ষণ নীরব থাকবার জন্যে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত এবং প্রেতলোকের মতো শোনায়। কানের কাছে মুখ রেখে সে বলে, আজ রাতেই শেষ করে ফেলতে হবে।

বাইরে, কবরটা ওরা আবিষ্কার করতে পেরেছি কিনা, লাশের সংখ্যা কম দেখে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সিরাজকে জাগ্রত প্রতিটি মুহূর্তে শঙ্কিত এবং ভাবিত করে রেখেছিল।

সন্ধের আগেই গুদামের ভেতর নিকষ অন্ধকার দেহ বিস্তার করে ফেলেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বিলকিসের দিকে তাকিয়ে সে আবিষ্কার করে, তার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। সেই আবিষ্কার মুহূর্তের ভেতরে তার আত্মায় ফিরিয়ে আনে মৃত্যুর সান্নিধ্য, চিতার আগুন, কবরের মাটি এবং যোজনব্যাপী নিঃশব্দ প্রবল ঘণ্টাধ্বনি।

সময় বয়ে যায়। পনেরো মিনিট কি পাঁচ ঘণ্টা, অথবা একটি জীবনকাল, বোধিতে ধরা পড়ে না।

বিলকিস সিরাজের পাশ থেকে উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে কানে কানে বলে, ওদিকে টিনের একটা ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কেউ নেই। ভালো করে দেখেছি। এই সময়।

দরোজার কাছ থেকে পাটের বেল দুটো আবার সেই পরিশ্রম করে সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোয় তারা। বেরিয়ে দরোজার পাশেই অন্ধকারে চুপ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।

বাইরে খোলা হাওয়া জলের মতো তাদের ধৌত করে যায়। শরীরের সমস্ত ক্লেদ, ক্লান্তি,

কাদার অনুভব নিঃশব্দে মুছে যায়। আবার পূত পবিত্র বলে বোধ হয় নিজেদের। একটু একটু করে হামাগুড়ি দিয়ে তারা এগোয়। গুদামের সমকোণ ঘুরে, সরু গলি পথ অতিক্রম করে, ঠিক বাজারের চত্বরের মুখে স্থির হয় তারা। বিলকিসই প্রথম মাথা বাড়িয়ে দেখে নেয় চত্বরটা।

অবিকল গত রাতের মতো। লাশগুলো তেমনি পড়ে আছে। অন্ধকার তেমনি খণ্ডিত হয়ে ইতস্তত লম্বমান, যেন সেগুলোও একেকটি লাশ। বস্তুত, কোনটা লাশ, কোনটা অন্ধকার ভালো করে বোঝা যায় না। পেট উঁচু সেই আধখানা চাঁদও আবার ফিরে আসছে, বাজারের পেছনে গাছপালার ঝাঁকড়া মাথার ভেতর থেকে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

সিরাজকে ইশারা করে কাছে আসতে। সিরাজও আবার সেই দৃশ্য দ্যাখে।

চিবুকের সংক্ষিপ্ত একটা দোলন তুলে নীরবে বিলকিস তার পরামর্শ জানতে চায়। এগুবো ?

নিঃশব্দে সিরাজ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

বসে বসেই এগিয়ে যায় তারা। গলি ছেড়ে দোকানের বারান্দায় পড়ে। এমনও একবার মনে হয়, তারা নয় বরং দৃশ্যটাই সচল হয়ে তাদের সমুখ দিয়ে সরে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ফিরে আসে আস্থা, অভ্যাস এবং লক্ষ্য। তারা পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়।

এবার আরো অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আরো লাশ চোখে পড়ে। আজ মৃতের অনৈসর্গিক ঘ্রাণ টের পায় তারা। ঠিক গলিত শবের নয়, লোবানেরও নয়। বিয়োগের বিষণ্নতার ঘ্রাণ।

কান খাড়া করে রাখে তারা। দূরে কাছে কোনো শব্দ ওঠে না। পৃথিবীকে জীবিতের বসতি বলে মনে হয় না। সেই শেয়াল কিংবা অন্য কোনো শেয়াল দ্রুত দৌড়ে চলে যায়। তার পেছনে আজ আরো একটিকে দেখা যায়। তারা খালপাড়ের দিকে গলি পথ দিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

ফিসফিস করে বিলকিস বলে, ধারে কাছে কেউ থাকলে ওরা আসত না।

সিরাজের কাছে আজ এটি নির্ভরযোগ্য সংকেত বলে বোধ হয়।

দোকানের বারান্দা ছেড়ে আরো খানিক এগিয়ে যায় তারা। কেন যায়, কীসের টানে যায়, তারা জানে না। সিরাজের এমন বোধ হয়, বিলকিস খোকাকে সন্ধান করতে এগোয়।

বিলকিস বলে, কাল ওদিকে দেখা হয় নি।

মাছের আঁশটে গন্ধ পেরিয়ে বাঁক নিতেই আবার একটা এলাকা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে দুটি লাশ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাঝখানে বেশ কিছুটা ব্যবধান। তাদের একজন হয়তো খোকা। না বিলকিস, না সিরাজ, কেউই প্রথম উদ্যোগ নেয় না। হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা আশা করে অপরজন এগোবে।

শেষ পর্যন্ত দুজনই ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দুজনেই আবার বিস্তৃত চত্বরের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষ ও অন্ধকারে লাশ দেখে কিংবা দেখে না। এখন সমস্ত কিছুই বাস্তবের অনিবার্য অংশ বলে দর্শকের ঔদাস্য জন্ম নেয়। মৃতেরাও একই ঔদাস্যের সঙ্গে জীবিতের উপস্থিতি সহ্য করে।

আবার তারা ফিরে আসে চত্বরের মাঝামাঝি পূর্ব দিকে ঘেঁষে দোকান ঘরগুলোর ছায়ার ভেতর দিয়ে। স্থির হয় আবার। মানুষ যে স্বাভাবিকতা নিয়ে তার নিজের বাড়ির বারান্দায়

দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে, অস্বাভাবিক এই সংস্থাপনে সেই স্বাভাবিকতাই একমাত্র হয়।

সিরাজ।

দিদি।

তার দিদি সম্বোধনে এই একটা ফল হয় যে, বিলকিস বাস্তবের নির্মমতার ভেতরে ফিরে আসে।

বিলকিস সংশোধন করে আবার ডাকে, প্রদীপ!

একই সঙ্গে সেও সংশোধনে সাড়া দেয়— আপা। এবং একই সঙ্গে দুজনের দিকে স্মিত চোখে তাকায়। নির্মল সেই মুহূর্তটি ক্ষণজীবী হয়।

পলকের ভেতরে বিষণ্ন গলায় বিলকিস বলে, তোমাকে সিরাজ বলেই ডাকব।

বিলকিস সেই দিনটির জন্যে ক্ষণকাল প্রার্থনা করে যখন তাকে প্রদীপ বলে সে ডাকতে পারবে।

সিরাজ, মনে হয় খোকা ওদিকে আছে।

আমারও মনে হলো।

নীরবতা।

ওরা কি টের পেয়েছে, সিরাজ, যে আমরা কাল কবর দিয়েছি?

সিরাজ, এখানে শেষ হয়ে গেলে আমাকে নবগ্রামে নিয়ে যাবে।

নবগ্রামে?

তোমার মনসুরদার কাছে।

নীরবতা।

সিরাজ, আমি কাজ করব।

নীরবতা।

নদীর ওপারে যাবেন না?

বিলকিস প্রসঙ্গটা বুঝতে পারে না।

নদীর ওপারে কেন?

আপনার মা, বোনকে খুঁজবেন না?

তখন মনে পড়ে যায় বিলকিসের। মনের ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখে, মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কোনো আকুতি সেখানে অবশিষ্ট নেই।

ওদের জন্যে আমি কাজ করতে চাই।

নীরবতা।

আজ একটি লাশও যেন পড়ে না থাকে।

নীরবতা।

চল।

সিরাজের ধারণা হয়, প্রথমে তারা নতুন আবিষ্কৃত লাশ দুটির কাছে যাবে। বিলকিস কিন্তু সেদিকে যায় না। সে এগিয়ে যায়, যেখানে বসে ছিল, তার নিকটতম লাশটির দিকে। পড়ে ছিল ফাঁকা একটা জায়গায়। লাশটির সারা শরীর অন্ধকারে ঢাকা। দূর থেকে অন্ধকার বলেই ভুল হয়। বিলকিস একা সেই লাশ টেনে সোজা করে চিৎ করে শুইয়ে দেয়।

এসো, এর পাশে আমরা সবাইকে রাখি।

মুহূর্তের ভেতরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দুজন। নিঃশব্দে একের পর এক লাশগুলো টেনে এনে তারা জড়ো করতে থাকে। সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। চাঁদ আরো সরে আসে আকাশে। আজ মেঘ নেই। চত্বরের ওপর বীভৎস শ্বেতীর মতো ছেঁড়া আলো পড়ে থাকে।

যখন সমস্ত চত্বর খালি হয়ে যায়, অবসন্ন চোখে একবার তাকিয়ে দ্যাখে দুজন সারি সারি মানুষগুলোর দিকে। গণনার যে স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের, তা তারা দুজনেই বিস্মৃত হয়। তারপর এগোয় সেই শেষ প্রান্তের দিকে, যেখানে আরো দুটি লাশ তারা আজ আবিষ্কার করেছে।

কতদিন খোকাকে দেখে নি বিলকিস। হার্মোনিয়াম কেনার টাকা চেয়ে পায় নি বলে রাগ করে যে চিঠি দিয়েছিল সেই শেষ চিঠি।

ঝুঁকে পড়ে স্থির তাকিয়ে থাকে বিলকিস।

বুকের ওপর নীল জামাটা কুঁচকে আছে। ধীর হাতে মসৃণ করে দেয় সে।

খোকাকে দ্যাখ, সিরাজ।

সিরাজ তার পাশে বসে পড়ে। দু'হাত মাটিতে রেখে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে।

খুব ভালো গান গাইত?

হাঁ।

নীরবতা।

আমার কাছে হার্মোনিয়াম চেয়েছিল।

নীরবতা।

মাকে খুব ভালোবাসত। মা'র কাছে থাকবে বলে ঢাকায় আমার কাছে আসে নি।

বিলকিস মৃতদেহের বুকের ওপর হাত রেখে নিজের ভেতরের বিকট শূন্যতার সঙ্গে নীরবে লড়াই করে।

ঠিক তখন পিঠের ওপর শক্ত একটা কিছু অনুভূত হয়।

অস্ফুট ধ্বনি করে পেছন ফিরে দ্যাখে, ছায়ার মতো চারটি যুবক। তাদের হাতে বন্দুক।

১২

ঘুম থেকে উঠে আসে স্থানীয় ছাউনির অধিনায়ক মেজর। উর্দি পরেই শুয়েছিল, কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে সমুখে এসে দাঁড়ায়। বিলকিস আর সিরাজের দিকে ঈষৎ কুঞ্চিত চোখে তাকিয়ে থাকে সে।

যারা তাদের ধরে এনেছে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা উৎসুক চোখে। বার বার দৃষ্টিপাত করে মেজরের দিকে। কারো কারো মনে মেজরের সর্বশক্তিমান দেহ কাঠামো, দৃষ্টির স্থির তীক্ষ্ণতা

ঈর্ষার উদ্রেক করে।

মেজর চোখ ফিরিয়ে ছোকরাগুলোকে একবার দেখে নেয়। তারপর ক্লান্ত একটা হাত তুলে তাদের চলে যেতে ইশারা করে। তারা আশাহত হয় এবং সংক্ষিপ্তকাল ইতস্তত করে বেরিয়ে যায়।

জলেশ্বরী হাই স্কুলের এই ঘরটা ক্লাশ নাইন বি সেকশনের ঘর, এখন একেবারে অপরিচিত মনে হয় সিরাজের।

মেজর একটা চেয়ারে বসে, সমুখে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে, যেন তার কোনো তাড়া নেই, ডান হাতের তর্জনী নাচিয়ে ইশারা করে।

দরোজার একজন সৈনিক বেঁটে চওড়া বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। বিলকিস এক পা এগিয়ে আসতেই মেজর তর্জনী তোলে। দাঁড়িয়ে পড়ে বিলকিস। মেজর সিরাজকে নীরবে নির্দেশ করে। সিরাজ এগিয়ে আসে এক পা। থামে। মেজর আবার তর্জনীর ইশারা করে। তখন সিরাজ আরো কাছে আসে।

দূরত্বটা মনঃপূত হলে মেজর সিরাজের চোখের দিকে স্থির কঠিন দৃষ্টিপাত করে এবং একই সঙ্গে ঠোঁটে বিপরীত মৃদু হাসি সৃষ্টি করে নিচু গলায় জিগ্যেস করে, হু ইজ শি ?

সিরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

উর্দুতে আবার সেই একই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। এবার প্রশ্ন করে সে বিলকিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কান ফেলে রাখে সিরাজের উত্তর শোনার জন্যে।

বিলকিস উত্তর দেয়, আমি ওর বোন।

আপাদমস্তক দেখে নেয় বিলকিসকে, তারপর প্রতিধ্বনি করে, বহেন ?

হাঁ।

সিরাজের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে বলে, ভাই ?

হাঁ

ভাই-বোন ?

হাঁ।

আপন ভাই-বোন ?

হাঁ।

মেজর দুজনের দিকে কয়েকবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বলে, দুজনের ভেতর বয়সের তফাত অনেক। মাঝখানে আরো ভাই-বোন আছে ? তোমাদের মা-বোন নিশ্চয়ই আরো কিছু বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দিয়েছে। দেয় নি ?

চুপ করে থাকে দুজনেই।

ঠিক আছে, জবাব দিতে হবে না। আমরা জানি পশুর মতো বাঙালিরা সন্তান উৎপাদন করে। বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দেয়। তবে, বিশ্বাসঘাতক হলেও কখনো কখনো তারা সুশ্রী হয়।

মেজর উঠে দাঁড়িয়ে কাছে আসে বিলকিসের। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে দুজনকে ঘিরে ধীর চক্কর দিয়ে আবার সমুখে স্থির হয়।

বাজারে গিয়েছিলে ?

নীরবতা।

লাশ নিতে ?

নীরবতা।

হুকুম শোন নি।

নীরবতা।

কবর দিতে চেয়েছিলে ? কাল কয়েকটিকে কবর দিয়েছে কারা ?

বিলকিস ও সিরাজ দুজনেই সচকিত হয়।

মেজর এবার কেবল বিলকিসকেই প্রদক্ষিণ করে সমুখে ফিরে আসে।

জানোয়ার খুঁড়ে তুলেছে।

ধীরে ধীরে বিলকিসের ভেতরটা কঠিন হয়ে আসে।

মেজর হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, জান না, কুকুরের কখনো কবর হয় না ?

হাতের ছড়ি দিয়ে সিরাজের পেটে খোঁচা দিয়ে মেজর তাকে বিলকিসের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর চেয়ারে ফিরে গিয়ে দুজনকে এক সঙ্গে সে আবার দেখতে থাকে।

১৩

মৃতদের আমরা সৎকার করব।

অবলম্বনহীন দ্বিতলের মতো, অসংলগ্ন মেঘ ও চিত্রকণার মতো, অসম আকার ও গতিবেগের মতো এই বর্তমান অন্তঃস্থলে স্থির কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে স্থাপিত। মানুষ তার নিগূঢ় শক্তির সংবাদ রাখে না। যে সারল্য সে লালন করে তা কাচের মতো ভংগুর এবং একমাত্র হীরক, কঠিনতম পদার্থই তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে। তখন সারল্যের অংশগুলো বিস্মৃতির ভেতরে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

প্রযুক্তি ব্যতীত জীবন নয়।

বস্তুতপক্ষে আঘাত বিনা প্রতিরোধ একটি অসম্ভব প্রস্তাব। বীভৎস বাস্তবের বিপরীতে গীতময় স্বপ্ন অথবা বধির দুঃস্বপ্নের বিপরীতে রৌদ্র ঝলসিত বাস্তব; মানুষকে এই বিপরীত ধারণ করতেই হয় এবং তার ভূমিকা, অন্তত এতে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়, এক ব্যায়াম প্রদর্শকের, যে আয়নায় আপনারই প্রতিবিম্বের সমুখে একটি ইস্পাত খণ্ডকে বাঁকিয়ে তার দুই বিপরীত প্রান্ত নিকটতর করে আনবার পর অবসর কিংবা করতালি পায় না, অচিরে দ্বিতীয় ইস্পাত খণ্ড তার হাতে পৌঁছে যায়।

'নিশ্চয় আমি মাটি থেকে মানুষকে উৎপন্ন করেছি।'

মাটি ভিন্ন মানুষের মৌলিক কোনো অভিজ্ঞতা নয়। এবং প্রত্যাবর্তনের সুদূরতম সম্ভাবনা নেই জেনেও মানুষ মাটির সঙ্গেই তার শ্রেষ্ঠতম সংলাপগুলো উচ্চারণ করে যায়। বস্তুত উচ্চারণও মাটির তীব্র আকর্ষণ থেকেই কাতর কিংবা সুখের যোগ অথবা বিয়োগ ধ্বনির নামান্তর। জননীর কাছে পুত্রশোকও কালক্রমে সহনীয় হয়ে যায়, ইউলেসিস অমরত্ব লাভের প্রস্তাব হেলায় উপেক্ষা করে ফিরে আসে অনুর্বর ইথাকার।

'মৃতদের আমরা সেই মাটিতেই ফিরিয়ে দেব, নতজানু হয়ে মুঠো মুঠো মাটিতে ঢেকে দেব তাদের দেহ, আমরা কেশ মার্জনা করব না, আমরা মুখ সংস্কার করব না, জীবিত এই দেহে মাটির প্রলেপ ধারণ করে আমরা বিপন্ন বাস্তবের ভেতর দিয়ে জনপদের দিকে ফিরে যাব।'

স্মৃতির চেয়ে সম্পদ আর কী আছে? জনপদে এখন কণ্টিকারী ও গুল্মলতার বিস্তার, শস্য অকালমৃত, ফল কীটদষ্ট, ইঁদারা জলশূন্য। সড়কগুলো শ্বাপদেরা ব্যবহার করে এবং মানুষ অরণ্যে লুকোয়। দিন এখন ভীত করে, রাত আশ্বস্ত করে। বাতাস এখনো গন্ধবহ, তবে কুসুমের নয়, মৃত মাংসের। তবু, স্মৃতি বিনষ্ট অথবা নিঃশেষে ধৌত নয়। রমণীর গর্ভ বন্ধ্যা নয়। পুরুষের বীর্য ব্যর্থ নয়। গ্রন্থগুলো দগ্ধ নয়। প্রতিভা অন্তর্হিত নয়। মানুষ সেই লুণ্ঠিত জনপদেই স্মৃতি বীজের বাগান আবার করে।

বিলকিসও নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে।

বিলকিস ও সিরাজ দুটি আলাদা ঘরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

একাকী ঘরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে থাকে।

তোমার নাম?

সিরাজ।

বাড়ি?

জলেশ্বরী।

তোমার বোনের নাম?

বিলকিস।

ধর্ম?

ঠিক আগেই বিলকিসের উল্লেখ ছিল, তাই মিথ্যা না বলেও নিরাপদ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মুসলমান।

ইন্ডিয়া কবে গিয়েছিলে?

ইন্ডিয়া যাই নি।

ইন্ডিয়া থেকে কবে এসেছ।

আমি এখানেই ছিলাম।

ইন্ডিয়া থেকে কজন এসেছে?

জানি না।

ইন্ডিয়া থেকে কারা এসেছে?

জানি না।

তাদের নাম কী?

জানি না।

কোথায় আছে?

জানি না।

খালের পুলে ডিনামাইট কে পেতেছে?

জানি না।

সড়কে মাইন কে পেতেছে?

জানি না।

কী জান?

নীরবতা।

কলমা জান?

নীরবতা।

নামাজ জান।

নীরবতা।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে মেজর চিৎকার করে ওঠে, বোনের সঙ্গে শুতে জান?

স্তম্ভিত হয়ে যায় সিরাজ।

তার গালে চড় মেরে এক ধরনের উপশম হয় মেজরের। বিলকিসের শরীর এবং সম্ভাবনা তাকে অনবরত তাড়না করে চলেছিল। সৈনিককে সে নির্দেশ দেয় প্রহার চালিয়ে যাওয়ার জন্যে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে বিলকিসকে যে ঘরে রাখা হয়েছে, সেখানে ঢোকে।

সেখান থেকে সিরাজের তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়।

মেজর ঘরে ঢুকতেই বিলকিস তার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

না, তোমাকে প্রহার করব না। স্বীকারোক্তির জন্যে তোমাকে বাধ্য করব না।

মেজর কাছে এগিয়ে আসে।

স্বীকারোক্তি তোমার ভাই করবে।

নীরবতা।

কোনো কিছুর জন্যেই তোমাকে বাধ্য করব না, এমনকি তোমার দেহের জন্যেও নয়।

বিলকিস মেজরের দিকে ঘুরে তাকায়।

মেজর নিঃশব্দে হাসে।

তুমি নিজেই আমার কাছে আসবে।

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয় বিলকিস।

দূরে সিরাজের আর্তনাদ এখন গোঙানিতে পরিণত হয়। তারপর হঠাৎ তা স্বব্ধ হয়ে যায়।

দিনের সূর্য অস্ত যায়। রাতের চাঁদ উঠে আসে। ইস্কুলের মাঠে ফুটবলের গোলপোস্টকে আতিবিস্তৃত ফাঁসি কাষ্ঠের মতো দেখায়। টিনের ছাদের নিচে চামচিকে ঝুলে থাকে। দূরে কোথায় তক্ষক ডেকে ওঠে। বহুক্ষণ অনুপস্থিতির পর মেজর আবার আসে।

হাঁ, তুমি নিজেই আমার কাছে আসবে।

নীরবতা।

আমি বাধ্য করব না। কাউকে আমি বাধ্য করি না।

মেজর মনে করতে চায় না কিন্তু মনে না করে পারে না তার নিজের একটি শারীরিক

অক্ষমতার কথা। বড় দ্রুত ব্যয়িত হয়ে যায় সে। সেই অভাবটুকু তাকে পূরণ করতে হয় আত্মম্ভিরতা দিয়ে। রমণীর প্রতি একই সঙ্গে প্রবল আকর্ষণ ও গভীর বিরক্তি সে বোধ করে থাকে।

আসলে আমি অত্যন্ত সহৃদয়।

নীরবতা।

সহৃদয়তার পরিচয় তুমি পেয়েছ আমার সহিষ্ণুতায়। নিশ্চয়ই শুনেছ, আমার বন্ধুদের অনেকে রমণীদের বাধ্য করেছে। আমি করি নি।

নীরবতা।

তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

নীরবতা।

পানি দেওয়া হয়েছে, গোসল কর নি কেন?

নীরবতা।

খাবার দেওয়া হয়েছে, খাও নি কেন?

নীরবতা।

লেখাপড়া কতদূর করেছ? দেখে শিক্ষিত মনে হয়।

নীরবতা।

ইংরেজি বলতে পার?

নীরবতা।

যে মেয়ে ইংরেজি বলতে পারে, আমি তাকে পছন্দ করি।

নীরবতা।

তারা বোঝে। মনের প্রয়োজন বোঝে। শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজন বোঝে।

নীরবতা।

তুমি বিবাহিতা? অবশ্যই তুমি বিবাহিতা। তোমাকে দেখায় বিবাহিতা। তোমার স্বামী, কী বলে, তোমার সঙ্গে, কী বলে, একইভাবে প্রতি রাতে মিলিত হয়?

নীরবতা।

তোমার স্বামী কোথায়? ইন্ডিয়ায়? জান, হঠাৎ হাসি পেল কেন? আমাদের হাতে কেউ মৃত্যুদণ্ড পেলে আর তার আত্মীয়স্বজন খোঁজ নিতে এলে আমরা বলি— ইন্ডিয়ায় চলে গেছে।

নীরবতা।

একইভাবে না বিভিন্নভাবে?

নীরবতা।

মেজর ফ্লাক্স খুলে হুইস্কি ঢেলে নেয়। নিঃশব্দে পান করে অনেকক্ষণ ধরে। বিলকিসের থেকে চোখ এক মুহূর্তের জন্যে ফিরিয়ে নেয় না। বাইরে টহলদার সৈনিকদের পদচারণা শোনা যায়।

আচ্ছা, অন্তত একটা কথার উত্তর দাও। আমি তোমাকে আকৃষ্ট করি ?

নীরবতা।

আমি অপেক্ষা করতে পারি। আজ রাতে আমার ডিউটি নেই। উত্তর পেলে কালও আমি ছুটি নিতে পারি। উর্দু না জানলে ইংরেজিতে উত্তর দাও। যারা ইংরেজি বলে আমি পছন্দ করি। তুমি আমাকে পছন্দ কর ?

চেয়ার টেনে কাছে সরে আসে মেজর।

ভরসা দিতে পারি, তুমি আমাকে পছন্দ করবে।

মেজর আরো খানিকটা সুরা ঢেলে নেয়।

কেন করবে না ? আমার বীজ ভালো। আমার রক্ত শুদ্ধ। রমণী স্বয়ং উদ্যোগী হলে অবশ্যই আমাতে তৃপ্ত হতে পারবে। আমি কি তোমাকে আকৃষ্ট করি ? আমি তোমায় সন্তান দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানি হবে, চাও না সেই সন্তান ? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, শ্লোগান দেয় না, কমিউনিস্ট হয় না। জাতির এই খেদমত আমরা করতে এসেছি। তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাব, তোমাদের গর্ভে খাঁটি পাকিস্তানি রেখে যাব, ইসলামের নিশান উড়িয়ে যাব। তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে, তোমরা আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমরা আমাদের সুললিত গান শোনাবে। আমি শুনেছি, বাঙালিদের গানের গলা আছে। আমি কি তোমাকে আকৃষ্ট করি ?

ঢক ঢক করে অনেকটা সুরা এবার গলায় ঢেলে নেয় মেজর। এতক্ষণের বিরতি পুষিয়ে নেয় একবারে। স্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে বিলকিসের দিকে। সেখান থেকে সাড়া আসে না। বিলকিস স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ থাকে।

দেয়ালের গায়ে অকস্মাৎ গেলাস ছুঁড়ে দিয়ে মেজর চিৎকার করে বলে, আমি বলেছি, বাধ্য তোমাকে করব না। আমি এখন কুকুরের সঙ্গে কুকুরের মিলন দেখব।

শরীরের ভেতরে মেজর প্রবল আকর্ষণ বোধ করে নিজের হাতে বিলকিসকে বিবসনা করবার জন্যে। এক পা কাছেও আসে। কিন্তু অন্তঃস্থল থেকে দুর্বল বোধ করে সে। গুলি করতে ইচ্ছে হয়, করে না, তার বদলে আর্দালীকে ডাকে। নির্দেশটা তাকেই দেয়।

আর্দালি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে রূঢ় গলায় বিলকিসকে উঠে দাঁড়াতে বলে। বিলকিস যেন শুনতে পায় নি। তখন তার বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান দেয় আর্দালি।

মেজর ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলে, আহ্, ধৈর্যের সঙ্গে কাজ কর।

আর্দালির বলবান দেহটিকে সে ঈর্ষা করে আর সেটা চাপা দেবার জন্যে আরো খানিকটা পান করে।

হাজার হাজার বছর কাপড় পরে মানুষের রক্তের ভেতর আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা ঢুকে গেছে। পোশাক তার দ্বিতীয় ত্বক। সেই ত্বকে টান পড়তেই বিলকিসের প্রতিক্রিয়া হয় বাধা দেবার। সে দেয়, কিন্তু সফল হয় না। আর্দালি অবিলম্বে তার শাড়ি হরণ করে নেয়।

আহ, ধৈর্য, ধৈর্য।

চেয়ারে বসে মেজর ক্রমাগত মাথা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।

আর্দালির হাতে বিলকিসের দেহ-স্পর্শ কল্পনা করে সে নিজের হাতের তালু অনবরত কচলাতে থাকে।

জুম্মা খাঁ, ধৈর্য।

বিবসনা হয়ে যায় বিলকিস। দৃষ্টিপাত করেই চোখ ফিরিয়ে নেয় মেজর। চোখের পাতা অন্তিম পর্যন্ত বুজে, হাত কচলে নগ্ন রমণীর স্মৃতি যেন সে পিষ্ট করে ফেলতে চায়। মুখ সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ফিরিয়ে রেখেই আর্দালিকে সে কাছে ডেকে অস্ফুট স্বরে আদেশ করে সিরাজকে নিয়ে আসতে।

আর্দালি বেরিয়ে যেতেই মেজর ধীরে ধীরে মুখ ফেরায়, চোখ ফেরায়, প্রথমে মিটমিট করে, তারপর পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে দ্যাখে। উঠে দাঁড়িয়ে বেশ দূরত্ব সত্ত্বেও কণ্ঠ না তুলে, ফিস ফিস করে বলে, সুন্দর দেহ!

খাটো বন্দুকধারী এক সৈনিক সিরাজকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসে।

সিরাজ তার প্রহরাধীন বলে সৈনিক চলে যায় না। নগ্ন রমণী দেখে তার মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সে দরোজার কাছে সটান দাঁড়িয়ে থাকে দরোজার পাল্লার দিকে তাকিয়ে।

ঘরে ঢুকেই বিলকিসকে দেখে চোখ বুজে ফেলে সিরাজ। অবসন্ন দেহে চোখ বুজেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। বিলকিস চোখে বোজে না। তার চোখ উন্মুক্ত এবং স্থির।

সিরাজের চারপাশে একবার ঘুরে আসে মেজর। তারপর আর্দালিকে নির্দেশ দেয় এবার উচ্চ কণ্ঠে, একেও ন্যাংটো কর।

চমকে উঠে সিরাজ চোখ খোলে। চোখ খুলতেই বিলকিসকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে সে দুহাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে নিজের কোমরের নিচে চেপে ধরে।

আর্দালি তার শার্ট খোলার চেষ্টা করেও যখন পরাস্ত হয়, টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে শার্ট। সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে সিরাজ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত কোলের ওপর চেপে ধরে মাথা নিচু করে গুটিয়ে রাখে নিজেকে। তার শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে।

তখন মেজর লাথি মেরে কাৎ করে দেয় তাকে। আর্দালি ঝাঁপিয়ে তার বুকের ওপর উল্টোমুখো বসে ট্রাউজারের বোতাম বদ্ধমুষ্ঠির ভেতর থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে।

সিরাজ চিৎকার করে ওঠে, না।

নিঃশ্বাসরুদ্ধ করে বিলকিস দাঁড়িয়ে থাকে। শরীর চৈতন্য থেকে স্বাধীন হয়ে যায় এবং তার শরীরও থরথর করে কাঁপতে থাকে।

নাআআ।

মেজর পা দিয়ে সিরাজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলে, বাঙালিরা কুকুরের অধিক নয়। কুকুরের ভাইবোন নেই।

সিরাজের হাত দুটো ছাড়িয়ে আর্দালি নিজের ভাঁজ করা দুই হাঁটুর তলায় চেপে ধরে রাখে। তারপর বোতামে হাত দেয়।

না না না।

পটপট করে বোতামগুলো খুলে ফেলে আর্দালি।

বিলকিস চোখ বন্ধ করে। একটু আগে সে থরথর করে কাঁপছিল, এখন স্থির হয়ে যায়।

আর্দালি প্রথম অনুধাবন করতে পারে না। মুহূর্তের জন্যে সে বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে সে বলে, স্যার, ইয়ে তো হিন্দু হ্যায় ?

১৪

শাড়িটা পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নেয় বিলকিস। শাড়ি পরবার নানা রকম কৌশল জানার সুখ্যাতি যার, সে এখন লজ্জা নিবারণ করে মাত্র।

কয়েকজন সৈনিক ও একজন ক্যাপ্টেন ছুটে এসেছিল, মেজর নিঃশব্দে তাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করে।

ক্যাপ্টেন জানতে চায়, কোনো সাহায্য করতে পারি, স্যার ?

মেজর মাথা নাড়ে।

ক্যাপ্টেন ও সৈনিকেরা চলে যায়। কেবল দরোজার প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে। তারই প্রহরাধীন ছিল। মেজর নিঃশব্দে তাকে ইশারা করে সরিয়ে নিয়ে যেতে। সৈনিকটি উবু হয়ে হাত ধরে টেনে নেবার উদ্যোগ করতেই এই প্রথম বিলকিস কথা বলে ওঠে। সংক্ষিপ্ত প্রবল একটি শব্দ।

না।

তার কণ্ঠস্বরে আকস্মিকতায় বিস্ময় বোধ করে মেজর।

না।

মেজর একটু চিন্তা করে প্রহরী সৈনিকটিকে চলে যেতে ইশারা করে। অনেকক্ষণ নিষ্ক্রিয়তার পর মেজর ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে বলে, মৃতদেহ আমি পছন্দ করি না। পরাজয়ের কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

বিলকিস অতি ধীর পায়ে প্রদীপের লাশের পাশে এসে দাঁড়ায়।

একই ধীর গতিতে সে হাঁটু গেড়ে বসে। অনেকক্ষণ ধরে প্রদীপের টক-টকে লাল রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। পেট্রোম্যাকসের আলোয় অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল দেখায়, এমনকি কৃত্রিম মনে হয় এই রক্ত। গেলাসটা খুঁজে না পেয়ে মেজরের স্মরণ হয় নিজেই সে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তখন সরাসরি ফ্ল্যাক্স থেকেই গলায় খানিকটা ঢালে সে। গেলাস অথবা প্রদীপের জন্য খানিকটা খেদ তার কণ্ঠস্বরে লক্ষ করা যায়।

ওকে এখন তোমরা কী করবে ? প্রদীপের দিকে চোখ রেখেই বিলকিস উচ্চারণ করে।

মেজর সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

বন্দুক কেড়ে নিতে গেল কেন ? প্রাণটা হারাল।

নীরবতা।

মেজর বলে চলে, প্রাণ অবশ্য হারাত। স্বীকারোক্তি পাবার পর ইন্ডিয়ায় পাঠানো হতো। রসিকতাটি মনে করে মেজর মৃদু হেসে ওঠে।

তোমারা কি ওকে ফেলে রাখবে ?

মেজর নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসে।

যেমন বাজারে ফেলে রেখেছ ?

মেজর ফ্ল্যাক্স থেকে শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত গলায় ঢেলে পা সমুখে লম্বা করে দেয়।

আমার দিকে ফিরে তাকাও।

বিলকিস নত হয়ে প্রদীপের চোখ দুটো বুজিয়ে দেয়।

জান ? আমি কখনো হিন্দু মেয়েকে ন্যাংটো দেখি নি।

অন্তত সে বিশ্বাস করেছে এরা ভাইবোন। তাই বিলকিসকেও হিন্দু ধরে নিয়েছে।

চোখ বুজিয়ে দিয়ে হাত সরিয়ে নেয় না বিলকিস। প্রদীপের গালের ওপর তার দুটি হাত স্থির হয়ে থাকে।

আমাকে একটা কথা বল, হিন্দু কি প্রতিদিন গোসল করে ?

নীরবতা।

হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটু গন্ধ ?

নীরবতা।

তাদের জায়গাটা পরিষ্কার ?

নীরবতা।

শুনেছি, মাদী কুকুরের মতো। সত্যি ?

নীরবতা।

শুনেছি, হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেওয়া যায় না ?

নীরবতা।

আমাকে কতক্ষণ ওভাবে ধরে রাখতে পারবে ?

বিলকিস প্রদীপের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেজরের দিকে তাকায়— আমি এর সৎকার করতে চাই।

তোমাকে এখন বাধ্য করতে ইচ্ছে করছে।

আমার ভাইয়ের সৎকার আমি করব।

বিলকিস উঠে এসে মেজরের সমুখে দাঁড়ায়। দ্রুত নিজের পা টেনে নেয় মেজর। কাপড় খুলে ফ্যালে।

চোয়াল চিবিয়ে মেজর উচ্চারণ করে। তার চোখ বিস্ফারিত হতে থাকে। কপালের পাশে শিরা দপ দপ করে।

বিলকিস স্থির কণ্ঠে বলে, আগে আমার ভাইয়ের সৎকার করব।

ধীরে চোয়াল শিথিল হয়ে আসে মেজরের, মিলিয়ে যায় কপালের শিরা, চোখ স্মিত হয়। উঠে দাঁড়িয়ে মেজর বিলকিসের কাঁধে হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় বিলকিস।

ঠিক আছে। সৎকার হবে। আমি বলি নি, অত্যন্ত সহিষ্ণু আমি ?

১৫

মাটি খুঁড়তে কতক্ষণ আর লাগে ? ইস্কুলের পাশেই ?

না।

তাহলে আবার কোথায় ?

কবর নয়।

হঠাৎ খেয়াল হয়। শিস দিয়ে ওঠে মেজর।

ভুলেই গিয়েছিলাম, হিন্দু। হিন্দুরা কবর দেয় না। পোড়ায়। পোড়ায় কেন ?

নীরবতা।

খোদা মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন। আর শয়তানকে আগুন থেকে। সেইজন্যই হিন্দুরা আগুনে ফিরে যায়।

নীরবতা।

আগুন।

মেজর মৃদু স্বরে শব্দটা উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নেয়।

দু'টিন পেট্রল হলেই চলবে তো ?

না।

একটা মানুষ পোড়াতে দু'টিনের বেশি লাগে না। যথেষ্ট।

কাঠ চাই।

কাঠ ?

সম্ভব হলে চন্দন কাঠ চাইতাম।

মেজর আবার শিস দেয়।

স্যান্ডল উড ?

কাঁধ ঝাঁকুনি দেয় সে। অদ্ভুত মনে হয়। কৌতুক অনুভব করে।

আর বিলকিস ফিরে পায় তার সেই অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতা, গত রাতের মতো স্থির প্রেরণা।

কাঠ চাই।

এত রাতে কাঠ কোথায় পাবে ?

আমি জানি না।

আমার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করছ না তো ?

নীরবতা।

তাহলে ভোর হোক। বিহারীদের খবর দেব নিয়ে আসতে। আমি অপেক্ষা করতে তৈরি। তুমি ?

অপেক্ষা কাঠের জন্যে নয়, বিলকিসের জন্যে অপেক্ষা করতে সে প্রস্তুত, এটা স্পষ্ট হয় মেজরের নিঃশব্দ হাসিতে বিদীর্ণ মুখ দেখে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে বিলকিস যে উত্তর দেয় মেজরের তা বোধগম্য হয় না, তাই বিচলিত বোধ করে না।

আমিও তৈরি।

প্রদীপের গালে একটু আগে, দু'হাত স্থাপন করবার মুহূর্তেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল বিলকিস। তাই তার কণ্ঠস্বর এখন উদাস, বর্তমান থেকে বিযুক্ত এবং উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত।

কাঠ এখানে নয়।

তাহলে কোথায়?

নদীর তীরে।

নদীর তীরে কেন?

মেজর হঠাৎ তীক্ষ্ণ চোখে বিলকিসকে বিদ্ধ করে। মুহূর্তের জন্যে সুরা ও নারীর নেশা অন্তর্হিত হয়ে যায়। হিন্দু মেয়েটার কোনো মতলব নেই তো? নদীর ওপারে ইন্ডিয়া খুব বেশি দূরে নয়। মাত্র তিরিশ মাইল, পাখির উড্ডয়নে।

হিন্দুদের সৎকার নদীর তীরে হয়।

অদ্ভুত!

আবার কাঁধ ঝাঁকুনি দেয় মেজর।

আচ্ছা, বিহারীদের জিগ্যেস করব। যদি তারা বলে হিন্দুদের দাহ নদীর তীরে হয় তো নদীর তীরেই হবে। আরেকটা কথা বল—। তোমাদের কোন দেবীর নাকি পাঁচ স্বামী ছিল?

ছিল!

মেজর লম্বা করে শিস দেয়।

ভোর হয়ে যায়।

প্রদীপের লাশের পাশে খোদিত মূর্তির মতো বসে থাকে বিলকিস। অনেকক্ষণ। তারপর শাড়ি দিয়ে প্রদীপের দেহ থেকে রক্ত মুছে ফেলতে চেষ্টা করে সে। কিছু ওঠে, কিছু ওঠে না। মানচিত্রে দ্বীপের মতো রক্তের চিহ্ন প্রদীপের শরীরে অংকিত হয়ে থাকে।

দুপুরের দিকে মেজর ফিরে আসে।

চল।

জনা চারেক বিহারী ছোকরাকে দেখা যায়। সম্ভবত এরাই বাজারে দেখা দিয়েছিল। এখন তারা প্রদীপের লাশ নিয়ে বাইরে পিকআপ ভ্যানে তোলে। বিলকিসকে উঠতে ইশারা করে মেজর। তারপর দুজন সৈনিকের সঙ্গে সে সমুখে গিয়ে বসে। আরো দুজন সৈনিক লাফিয়ে ওঠে পেছনে।

ইস্কুলের মাঠ ছেড়ে জলেশ্বরীর জনশূন্য সড়ক দিয়ে চোখ ঝলসানো রোদ্দুরের ভেতরে ভ্যান আধকোশা নদীর দিকে ছুটে যায়। মোটরের গর্জন স্তব্ধতাকে আরো বিকট করে তোলে।

আধকোশার নিকটতম তীরে এসে দেখা যায় সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে আরো কয়েকজন বিহারী ছোকরা। তারা একস্তূপ কাঠের অদূরে বন্দুক হাতে নিয়ে লম্বা পায়ে টহল দিচ্ছে। নদীর তীরও একই প্রকার জনশূন্য। জল বয় না। পাখি ওড়ে না। নদী শুকিয়ে পাড়ে

যে বিস্তৃত বালির বিছানা হয়ে আছে, রোদ্দুরে উত্তপ্ত হয়ে আছে, খালি পায়েও বিলকিস তা অনুভব করতে পারে না।

ভ্যান থেমে যাবার পর মেজর নেমে এসে ভ্যানেরই পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবার প্রস্তুতি নিয়ে সে পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়ায়।

অতঃপর কী কর্তব্য বুঝতে না পেরে বিহারী ছোকরাগুলো একে অপরের কাছাকাছি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলে। বার বার জিজ্ঞাসু চোখে মেজরের দিকে তাকায়। বন্দুক হাতে সৈনিকদের দিকে সসম্ভ্রমে ঘনঘন দৃষ্টিপাত করে তারা।

বিলকিস কখনো চিতা রচনা দূরে থাক, দাহ-সৎকার পর্যন্ত দ্যাখে নি। মানুষের রক্তের ভেতরে মৌলিক কিছু কর্তব্য সম্পাদনের নীল-নকশা থাকে। বিলকিস নীরবে দ্রুত হাতে কাঠগুলো বিছানার মতো করে সাজায়। উনোনে কাঠ দেবার স্মরণে সে দু'সারি কাঠ ঢালু করে সাজায়, যেন আগুনের বিস্তার সহজ ও সতেজ হয়। তারপর মেজরের দিকে তাকায়। মেজরের নিঃশব্দ ইশারা পেয়ে বিহারী ছোকরাগুলো প্রদীপকে ভ্যান থেকে নামিয়ে আনে। চিতার দিকে এগোয় তারা। চিতার কাছে, বিলকিসের পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে। অচিরে বিলকিসের নীরব অথচ স্পষ্ট নির্দেশ পেয়ে লাশটিকে তারা চিতার ওপর শুইয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে সরে যায়। তারা আগের জায়গায় ফিরে না গিয়ে আরো দূরে ভ্যানের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

রোদের ভেতরে প্রদীপের মুখ ধৌত দেখায়। একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করেই বিলকিস চোখ ফিরিয়ে নেয়। আর সে তাকায় না। প্রদীপের সমস্ত দেহ ঢেকে দেয় কাঠ দিয়ে। তারপর মাথার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সে। সুদূর কোনো চিত্রের মতো বাজারে শায়িত খোকার লাশের কথা মনে পড়ে যায় তার।

মেজর ঢালু বেয়ে নেমে আসে। নদীর তীরে বিলকিসের একাকী তৎপরতা এতক্ষণ সে দেখছিল। দীর্ঘ সময় নেবে আগুন ধরে উঠতে, সে উপলব্ধি করে একজন সৈনিককে পেট্রলের টিন নিয়ে অনুসরণ করতে বলে। সৈনিকটি চিতার চারপাশ ঘিরে পেট্রল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

বিলকিস তা লক্ষ করে না। ছায়ার মতো সঞ্চরণ তার পাশে সে অনুভব করে, কিন্তু চেতনায় তা প্রবেশ করে না।

অচিরকালের ভেতরের একটি বোধ জেগে ওঠে। সমুখে শায়িত মৃতদেহটিকে সে আর বিশেষ বলে গণনা করে না। স্বয়ং মৃত্যুই তার সমুখে শায়িত মনে হয়।

বিহারী একটি ছোকরা মেজরের ইশারায় দেশলাই ছুঁড়ে দেয় বিলকিসের দিকে।

মৃত এবং মৃত্যু দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের আলিঙ্গনে দৃষ্টির অতীত হয়ে যায়।

অপলক চোখে সেই লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে থাকে বিলকিস।

মেজরের নির্দেশে বিহারী দুটি ছোকরা বিলকিসের কাছে এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হাত ধরে। বিলকিস নড়ে না। আবার তারা টান দেয়। এবার আরো জোরে।

দূরে মেজর বিড়বিড় করে, ধৈর্য ধৈর্য।

ছোকরা দুটো নারী দেহের কোমলতা অনুভব করছে, তার ঈর্ষা হয়। বিরক্তির উদ্রেক হয়।

সে নিজেই ঢালু বেয়ে নেমে আসে নিচে। ছোকরা দুটো থতমতো খেয়ে সরে দাঁড়ায়। নারীবাহুর কোমলতা তারা ভুলতে পারে না।

মেজর এসে বিলকিসকে বলে, এরপর কী ?

বিলকিস সাড়া দেয় না।

তার পেছনে নদীর জল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পোড়া মাংসের গন্ধে পেটের ভেতর থেকে সব উল্টে আসতে চায়, সে সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও। আগুনের প্রবল হলকা অনুভব করে। নাকমুখ ঢাকবার চেষ্টা করে মেজর প্রাণপণে। বিলকিসকে আকর্ষণ করে।

ঠিক তখন বিলকিস তাকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে বিস্মিত হয়ে যায় মেজর। পর মুহূর্তেই বিস্ফারিত দুই চোখে সে আবিষ্কার করে, রমণী তাকে চিতার ওপর ঠেসে ধরেছে, রমণীর চুল ও পোশাকে আগুন ধরে যাচ্ছে, তার নিজের পিঠ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রমণীকে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু রমণীকে আগুন দিয়ে নির্মিত বলে এখন তার মনে হয়। তার স্মরণ হয়, মানুষ মাটি দিয়ে এবং শয়তান আগুন দিয়ে তৈরি। জাতিস্মর আতঙ্কে সে শেষবারের মতো শিউরে ওঠে।

মশালের মতো প্রজ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঠেসে ধরে রাখে বিলকিস।

মৃগয়ায় কালক্ষেপ

সারারাত শীতে কষ্ট পেয়েছে আবদুল হাদী। সারারাত তার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তুন্দ্রার নীরব হট্টহাসি। কতো দীর্ঘকাল পরে, ছোটবেলার সেই ভূগোল বইয়ের পরে মাত্র গতকালই সে আবার শুনেছিল তুন্দ্রার কথা। তাও প্রথমে বুঝতে পারে নি, কারণ ইংরেজি উচ্চারণে কথাটা ছিল 'টানড্রা'— পল কোলিয়ার মরিনের কোমর জড়িয়ে ধরে উত্তাপ ধার করতে করতে বলছিল, টানড্রা হইতে শীতল বায়ু প্রবাহ আসিতেছে।

আবদুল হাদী বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'টানড্রা' ?

পল কোলিয়ার কখনোই তাকে খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিয়েছিল, মানচিত্র নামক বিষয়টি তোমার বাংলাদেশের বাহিরে সম্প্রসারিত। বস্তুতপক্ষে, ভদ্র কোনো মানচিত্রে বাংলাদেশের চেয়ে টানড্রাকে শনাক্ত করা সহজতর বটে।

গতকাল বিকেল থেকেই হঠাৎ শুরু হয় তাপমাত্রার দ্রুত নেমে আসা, অন্ধকার হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকে বৃষ্টি। বাংলাদেশের যে বৃষ্টির সঙ্গে আজন্ম সে পরিচিত সে বৃষ্টি নয়; এর পতন অনেক মন্থর এবং ভারি; হাত বাড়িয়ে দিলে মুহূর্তের জন্যে মনে হয় বৃষ্টির ধারাটি জমাট, কিন্তু শরীর স্পর্শ করা মাত্র তা গলে যায়; এত ঠাণ্ডা সে পানি যে শরীরের যেখানে পড়ে সেখানে ফোসকা পড়বার মতো জ্বলতে থাকে।

সে বৃষ্টি সারা রাতে কমে নি। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই আবদুল হাদী ক্যালেডোনিয়ান রোডে বাহাউদ্দিনের বাড়িতে ফিরে এসেছে। ততক্ষণে রাতের খাওয়া সেরে জোড়া সোফার ওপরে গায়ে গা ঠেকিয়ে টেলিভিশন দেখছিল বাহাউদ্দিন আর তার বৌ রোজি। আবদুল হাদী বাইরে খায়, এখানে রাতে শুধু সে ঘুমিয়ে থাকে এই জোড়া সোফার ওপর। তার ইচ্ছে করছিল তক্ষুণি কম্বল টেনে শুয়ে পড়ে সে মাথা পর্যন্ত ঢেকে, কিন্তু টেলিভিশনে দুর্দান্ত কী একটা ছবি দেখানোর কথা রাত সাড়ে দশটায়; আবদুল হাদীকে ঠায় বসে থাকতে হয়েছিল মাঝরাত পর্যন্ত। ঘরে একটা প্যারাফিন হিটার ছিল, সেটা পুরো দখল করে বসেছিল স্বামী-স্ত্রী। রোজি একবার কেবল বলেছিল, দরকার হলে হিটারটা আপনার দিকে করে নিন না। কিন্তু নেয় নি আবদুল হাদী, হিটারের প্রয়োজন সেই মুহূর্তে তারই সবচে' বেশি হলেও সে স্মিত মুখে শীতলতার ভেতর বসে থেকেছে টেলিভিশনের দিকে চোখ করে। ঢাকায় থাকতে, এই সেদিনও তো সে ঢাকায় ছিল— এখন কত সুদূর মনে হয় ঢাকা— তার প্রয়োজন হয় নি নিজের দরকারকে এতখানি তুচ্ছ করবার, গোপন করবার এবং শুধু তাই নয়, সে যে অত্যন্ত ভালো আছে, যত্নে আছে, এই অভিনয় করবারও পরিস্থিতি আগে কখনো হয় নি। শীত তার অস্তিত্বকে এতখানি খামচে ধরে রেখেছিল যে, টেলিভিশনে কী হচ্ছে কিছুই সে সচেতনভাবে অনুভব করে নি। একবার কেবল সে শীতের কথা ভুলে যেতে পেরেছিল, যখন খবর হচ্ছিল; সে উদগ্রীব হয়ে ছিল হয়তো মুক্তিযুদ্ধের কোনো খবর থাকবে, হয়তো আজ রাতেই নাটকীয় একটা কিছু শোনা যাবে; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নি খবরে। পৃথিবী যেন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের শ্যামল অববাহিকাটিকে উপেক্ষা করে, পাশ কাটিয়ে, ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও আসর জমিয়ে তুলেছে। খবর শেষ হয়ে যাবার পর শীত দ্বিগুণ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রক্তের ভেতরে। বাহাউদ্দিন একবার গা মোড়া দিয়ে, বৌয়ের ভাঁজ করা হাঁটুর তলায় মোজা পরা পা আয়েশে গুঁজে দিয়ে এবং দুর্দান্ত সেই ছায়াছবিটি এক্ষুণি শুরু হবার সূচনায় লম্বা একটা সুখী নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল— ভাবিয়াছিলাম দেশ স্বাধীন হইলে বড় দিনের ছুটিতে বাড়ি যাইব। তাহা সম্ভবত আর হইবে

না। অন্য জাতির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাঙালি যদি বাক্যের তুলনায় কর্মে অধিক আস্থাবান হইত, তরুণেরা যদি পিতৃ-অন্ন ধ্বংস করিবার ন্যায় মহৎ সাধন হইতে বিরত থাকিত, তাহা হইলে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের অন্তেই পাকিস্তানিরা কচ্ছপ উল্টাইত। নাহ্, আমাদিগের উন্নতি নাই।

নাতিদীর্ঘ এই বক্তৃতাটি দিয়ে সেই যে মুখ বন্ধ করে টেলেভিশনে ছবি দেখতে শুরু করেছিল বাহাউদ্দিন, রাত সোয়া বারোটায় শুতে যাবার সময় 'শুভ রাত্রি' বলা ছাড়া সে মুখ আর সে খোলে নি।

শুতে যাবার সময় হিটারটা নিভিয়ে দিয়েছিল রোজি। প্যারাফিন হিটার জ্বালিয়ে নাকি ঘুমুতে নেই; দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আবদুল হাদীর কিন্তু মনে হয়েছিল, যুক্তিটা ভিন্ন। হিটার নিভিয়ে দেবার উদ্দেশ্য— পয়সা বাঁচানো। আবদুল হাদী কি এই কয়েক সপ্তাহ লন্ডনে এসেই লক্ষ করে নি বাঙালিরা কীভাবে প্রতি মুহূর্তে পয়সার হিসেব করে? তার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য বলে যা তার মনে হয়েছিল, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, লন্ডনের মতো জায়গায় তোমাকে রাত্রিবাসের জায়গা দিয়েছি, এতেই খুশি থেকো, আর যত তাড়াতাড়ি পার অন্য কোথাও সরে যেও। হিটারের আরামে ডুবে এটাই যে তোমার স্থায়ী ঠিকানা বলে মনে করবে, সেটি হচ্ছে না।

মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখলে, অভিযোগ করবার কোনো কারণ নেই আবদুল হাদীর। বাহাউদ্দিন তার এমন কিছু কাছের আত্মীয় নয়। ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে লন্ডনে পয়সা দিয়ে ঘর-ভাড়া করে থাকবার সঙ্গতি যখন তার নেই, তখন এত স্পর্শকাতর হলে চলে না। তবু কালরাতে, ওরা চলে যাবার পর সোফার ওপর চাদর বিছিয়ে ট্রাউজার ছেড়ে এবং রোজি-বাহাউদ্দিনের ঘর পেরিয়ে বাথরুমে যেতে হয় বলে আবার তাগিদটা চেপে রেখে, বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ভীষণ কান্না পেয়েছিল।

বরফ হয়েছিল চাদর-কম্বল; তার স্পর্শে শরীরটা ভয়াবহভাবে কন-কন করে উঠবার যন্ত্রণায় অঝোর ধারে বেরিয়ে এসেছিল অশ্রু: আশ্চর্য হয়ে সে আবিষ্কার করেছিল, পৃথিবীতে এখনো উত্তাপ আছে, উষ্ণতা আছে, আর সে উষ্ণতা তারই অশ্রুতে। তখন আর নিজেকে সে শাসন করে নি, অশ্রুকে অবিরল ধারে বেরিয়ে আসতে দিয়েছে; তার গাল-চিবুক-কণ্ঠে অশ্রুর উষ্ণতা অনুভব করে সে বারবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে বিকৃত কণ্ঠে অব্যয়ধ্বনি করেছে অনেকক্ষণ। তারপর শংকা হয়েছে, পাশের ঘরে ওরা হয়তো শুনে ফেলবে, তাই বালিশে মুখ গুঁজে উচ্চারণের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে সে তখন।

কিন্তু অচিরেই সে আবিষ্কার করেছিল, কান্না যত সহজ, থামানো ততখানি কঠিন। প্রথমে তার কান্না পেয়েছিল, নিজের জন্যে, নিজের একটা ঘরের জন্যে, হিটারের উত্তাপের জন্যে। তারপর, কেন বাহাউদ্দিন টেলিভিশনে ছবি চলাকালে একটিবারও তার সঙ্গে কথা বলল না, ছবির কোনো দৃশ্য নিয়ে রোজি কিংবা বাহাউদ্দিন তার সঙ্গে একবারও কোনো মন্তব্য বিনিময় করল না কেন? এটাই বড় হয়ে উঠেছিল। চিরকাল তো সে তাদের শখের শোফায় শুয়ে শুয়ে কুশন নেতিয়ে দেবে না, অন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই সে চলে যাবে, তাদের বসবার ঘর তাদেরই থাকবে, কুশন থাকবে দোকানের মতো ফুলো-ফুলো নতুন, তবু কেন ওরা ভালো করে কথা বলে না?

এক সময়ে নিজের নিঃসঙ্গতা, অন্যের হৃদয়হীনতা, ভবিষ্যতের নিরন্ধ্র অন্ধকার সমস্ত কিছু তলিয়ে গিয়ে দেশের স্মৃতি জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। শরীরকে দুমড়ে-মুচড়ে গোল করে আরো খানিক উত্তাপ সৃষ্টি করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে তার চোখের সমুখে চলমান ছবির মতো ভেসে উঠেছিল সিদ্ধেশ্বরীর সরু গলি, পানের দোকান, গা ছমছম করা মন্দিরের ভেতরটা; কানে শুনতে পেয়েছিল রিক্‌শার বেল, শিশুর কান্না, পথের মোড়ে হো-হো হাসি; তার নাকে এসে লেগেছিল ধোঁয়া-ওড়া গরম ভাতের ঘ্রাণ, ভাজা ইলিশের গন্ধ, তারপর গুলির শব্দ, বারুদের ঘ্রাণ, সৈন্যদের চলাচল। বিদ্ধ, খণ্ডিত, সচকিত হয়ে সে স্মরণ করেছিল পঁচিশে মার্চের কথা। তখন নিজের জন্যে নয়, কারো জন্যে নয়, দেশের জন্যে তার অশ্রু প্রবলতর হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

তারপর সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শীত তার অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিয়েছিল, যেন তাকে উলঙ্গ করে কাফন পরিয়ে দেবে আজ রাতে। বরফের তীক্ষ্ণ সূঁচ সে অনুভব করেছিল মাংসের প্রতিটি কোষে। বারবার উঠে বসেছিল, পাগলের মতো আরো একটা কম্বল, একটা আচ্ছাদন, একটা যা হোক কিছুর সন্ধান করেছিল সে সারা ঘরে; হতাশ হয়ে আবার শুয়ে পড়েছিল, পরক্ষণেই আবার উঠে বসেছিল— খ্যাপার মতো শোফার কুশনগুলো তুলে নিয়ে নিজের চারদিকে শীতের বিরুদ্ধে বর্ম বানাবার চেষ্টা করেছিল, ঘরের কোণ থেকে স্তূপ করে রাখা পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে নিজের দেহ জড়াবার উন্মত্ততা তাকে পেয়ে বসেছিল, আর তার ভেতরেও তার মনে হয়েছিল এটা করলে রোজি হয়তো তাকে তক্ষুণি চলে যেতে বলবে, তখন সে সোফার ওপরে পা তুলে বসে হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে দিয়েছিল, শীতকে সে বুড়ো আঙুল দেখাবার জন্যে নিজেই সে নিজের শরীর কাঁপিয়ে তুলছিল, যেন সে এটা দেখাতে চেয়েছিল যে শীতের চেয়েও তার শরীরের শক্তি এবং ইচ্ছা এখনো প্রবলতর। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয় নি। আসলে, কাজ হয়েছিল কিনা তা সে বলতে পারবে না। আসলে, সে তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও তার স্মৃতি মরে যায় নি; স্মৃতি বরং উজ্জ্বল কিছু বল নিয়ে তার মাথার ভেতরে অবিরাম খেলা করছিল, আর সে অচেতন হয়ে গিয়েও অন্য এক চেতনার চোখ দিয়ে দেখে যাচ্ছিল স্মৃতির উন্মত্ত খেলা।

লন্ডনের শীতের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে সে তার বাবার কাছে। তিনি নিজে কখনো বিলেতে আসেন নি, এমনকি পাবনা শহর ছেড়ে কোথাও বেরোন নি; ছেলেকে লেখাপড়া করতে বিলেত পাঠাবেন সেই স্বপ্ন দেখতেন আর কী উপায়ে বিলেত সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করে ছেলেকে পাখিপড়া করে মুখস্থ করাতেন।

সে পাবনার শীত না বাজান, বিলাতের শীত। পায়ে দিবা ডাবল মুজা, হাতে দিবা দস্তানা, গায়ে দিবা কম্বলের কোট, তবু শীত তোমার পিছ ছাড়বে না।

বাবার মুখে শোনা সেইসব কথা সারারাত আবদুল হাদীর মাথার ভেতরে গোলার মতো নিঃশব্দে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে পড়েছিল।

বিলাতে যায়া হুমায়ূন কবিরের মতো লেখাপড়া কইরা মালা গলায় দিয়া জাহাজ থিকা নাইমবা তুমি। তবে সাবোধান, হুমায়ূন কবিরের মতো মোছলমানের খেলাপ কইরবা না। হিন্দু বিয়া কইরা তার পরামর্শে কংগ্রেসে যোগ দিয়া পাও চাইটো না, বাজান। এই এককথা কয়া দিলাম— তুমি মোছলমান, তোমার আছে পাকিস্তান।

লন্ডনে আসবার পথে করাচি বিমান বন্দরে তার পাসপোর্ট আবার সেই অফিসারটি দেখতে শুরু করে। শীত প্রবলতর হয়ে ওঠে। তিন আকারের তিন রঙের, তিনটি খাতা একের পর এক অফিসারটি দেখে আর তার পাসপোর্টের সঙ্গে মেলায়। আটক করবার মতো কোনো কিছুই খুঁজে পায় না সে, তবু পাসপোর্টটি ফিরিয়ে দেয় না আবদুল হাদীকে। তারস্বরে লাউড স্পীকার থেকে ঘোষণা শোনা যায়, 'শেষবারের মতো যাত্রিগণকে বলা যাইতেছে, আমস্টারডামগামী এস-এ-এস বিমান উড্ডয়নের জন্য এখন প্রস্তুত— অবিলম্বে বিমানে আরোহণ করুন।'

চমকে ওঠে আবদুল হাদী। অফিসারটি তার গালে আচমকা চড় মারে। নিজের হাত গালে ছোঁয়াতেই বরফের মতো শীতল বোধ হয়। সে বুঝতে পারে না, অন্ধকারে, কোথায় আছে ? এখনো সে করাচিতে ?

কী হবে ? কী হবে এখন তার ? তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবে ?

শ্যালক তুমি পাকিস্তান হইতে পলায়ন করিতেছ ?

না।

অবশ্যই পলায়ন করিতেছ।

না, সত্য বলিতেছি, চামড়ার রফতানি বাজার সন্ধান করিতে লন্ডন যাইতেছি।

শ্যালক, তোমার ইংরেজি ভাষা গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিব। আমি উর্দুতে কথা কহিতেছি, উর্দুতে উত্তর দাও।

কীসের গোল ? কী হইয়াছে ? বলতে বলতে আরেকজন অফিসার এগিয়ে আসে। আবদুল হাদীর পাসপোর্ট, টিকিট দেখে নতুন অফিসারটি বলে, উহার বিমান ছাড়িয়া যায় যে! আটক করিয়াছ কেন ? কিছু পাইয়াছ ? না ? বংগজ ছুচুন্দর, দৌড় দাও, দৌড়াইয়া যাও।

এই শীত কি তার চেয়েও নির্মম ?

আবদুল হাদী দৌড় দিতে-দিতে শুনতে পায় পেছন থেকে প্রথম অফিসারটি চিৎকার করে বলছে, অতঃপর আমরা বাঙালিদের নিতম্বের চামড়া বিশ্বে রফতানি করিব হে।

তুন্দ্রার বরফের ওপর দিয়ে বাবার অট্টহাসি ভেসে আসে ক্যালডোনিয়ান রোডের এই ঘরের অন্ধকার ভেতরে।

হা-হা-হা। বিলাতে জিরা হলুদ মরিচের কারবার নাই, বাজান। খালি সিদ্দো-আনাজ সিদ্দো, গোছ সিদ্দো, ভাত নাই, ডাইল নাই, পাউরুটি। খাইবা ছুরি কাঁটা দিয়া, এক হাতে ছুরি, আরাক হাতে কাঁটা। তবে না তুমি সায়েব হইবা, বাজান। সায়েব হয়া তুমি ডিনার খাইবা, বাইরে তোমার আর্দালি খাঁড়ায়া থাকপে, কত লোক কত কামে তোমার কাছে আসপে, তাদের ঠেকাবে কেটা ? সেই আর্দালি।

আবার একটা গোলা ফেটে পড়ে, শব্দ হয় না, কিন্তু প্রচণ্ড আলো হয়, শুধু আলো, ক্ষণকালের জন্য আলো, সে আলো উত্তাপ সৃষ্টি করে না। সারা রাত আবদুল হাদীর উষ্ণতা সন্ধান শেষ হয় না। হাড়ের ভেতর থেকে বরফের কুঁচিগুলো অবিরাম সে সরিয়ে চলে, চোখের পলকে তারা ফিরে ফিরে আসে। চোয়ালের কাঁপুনি থেকে-থেকে শাসনের বাইরে চলে যায়, একবার জিভ কেটে গিয়ে মুখ লোনা হয়ে যায়। কেবল লোনা নয়, রক্তের

উষ্ণতায় ক্ষণকালের জন্যে আরামে স্থির হয়ে যায় তার দেহ। আবার ধীরে ধীরে শীত এসে তাকে আক্রমণ করে।

তখন নিকোলার মুখ তার চোখের সমুখে ভেসে ওঠে। শীত ইতস্তত করে তার নখর বসাতে। আবদুল হাদী আর কিছুর জন্যে না হোক, শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মাথার ভেতর থেকে সমস্ত স্মৃতি, সব শব্দ সরিয়ে ফেলে নিকোলার মুখ দেখতে থাকে অন্ধকারের ভেতরে।

নটিং হিল গেটে যে ফ্ল্যাটে নিকোলা তার বান্ধবী মরিন আর লিসবেটের সঙ্গে থাকে সেখানে গল্প করতে করতে একদিন রাত হয়ে গিয়েছিল। নিকোলা তাকে বিছানা করে দিয়েছিল নিজের ঘরে আর নিজে সে রাতের মতো শয্যা ভাগ করে নিয়েছিল লিসবেটের। নিকোলা দুটো কম্বল দিয়েছিল, পুরু দুটো কম্বল, মেঘের মতো তুলতুলে কম্বল, সুবাসিত কম্বল, রাতের পর রাত নিকোলার শরীর থেকে সঞ্চিত উত্তাপমাখা কম্বল।

আজ রাতেও হয়তো সে নিকোলার ফ্ল্যাটে থেকে যেতে পারত। কিন্তু পল কোলিয়ার এসে হাজির। মরিনের প্রেমিক বন্ধু সে, নিকোলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু পলের উপস্থিতিতে আবদুল হাদী সব সময়ই অস্বস্তি বোধ করে। পল এলেই যেন গোটা ফ্ল্যাট তার দখলে চলে যায়। আর আবদুল হাদীর দেখা পেলে তো অবিরাম হুল ফোটাতে থাকে সে। আজই যেমন পল কোলিয়ার বলেছিল, শুনিয়াছি, তোমরা নাকি একই সঙ্গে একাধিক বিবাহ কর। তুমি কয়টি করিবে? বাজি রাখিয়া বলিতে পারি তুমি ডজন পুরা করিবে।

নিকোলার মুখ স্মৃতি থেকে নিভে যায়। চেষ্টা করেও আর সে তাকে সতেজ রাখতে পারে না। আবার শীত এসে তাকে বরফ তীক্ষ্ণ শিঙ দিয়ে ঘরের ভেতরে উন্মত্ত তাড়া করে বেড়ায়।

২

ঢাকায় যে কলেজে আবদুল হাদী বাংলা পড়াত সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন মনসুর সাহেব। লোকে বলত মনের ভেতরে ছুরি চালাতে তার দ্বিতীয় নেই বলেই নাম তার 'মনসুর'। কথাটা কিন্তু কোনো রকম মালিন্য না নিয়েই বলে লোকে, কারণ মনসুর সাহেব পৃথিবীতে হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন না, আর সে সমালোচনা তিনি করেন আঞ্চলিক ভাষায় এবং তা পরতে পরতে রসের ভিয়েন দিয়ে। লোকে তা উপভোগ করে, ইচ্ছে করেই নতুন নতুন প্রসঙ্গ তার কাছে তুলে ধরে যাতে কিছু বচন শোনা যায়।

সেই মনসুর সাহেবের একটা কথা লন্ডনে এসে আবদুল হাদীর মনে পড়ে যায়।

মিয়া, বাঙালির পোলা লন্ডন নগরিৎ যায় বাপের ধন আর নিজের ধন এই দুই ধন লইয়া। বুঝছ নি? কী বুঝছ? হেই দ্যাশে গিয়া পরথমেই যে ম্যামের সাথে দেহা, হেই ম্যামেরই প্র্যাম। হে গয়লানি কি ম্যাথরানি তা দেখব না পোলা— ম্যাম ইংলিশ কয়, চামড়া ধলা, বাঙালির পোলারে আর বাইন্ধা রাখতাম পার? আর হেই বেডীও জানে, দ্যাশে বিয়া করলে ডেরেন পরিষ্কার কি বাস ডেরাইভারের উপরে কোনো খসম হইত না, এইডা লেখাপড়াও জানে, দ্যাশে ফিরা গেলে বাংলা বাড়িৎ থাকব, বেয়ারা খানসামা পায়ে পায়ে ঘুরব, এইডারেই কলমা কইরা লও, তা হইক না পোলার চামড়া কালা। আন্ধারে কালা আর ধলা এক সমান।

ঐ যে মনসুর সাহেব বলেছিলেন, মেম দেখলেই প্রেমে পড়ে বাঙালি ছেলে— ঐ কথাটা নিকোলার সঙ্গে প্রথম আলাপের পরই মনে পড়ে গিয়েছিল তার। প্রথম আলাপেই নিকোলাকে তার ভীষণ ভালো লাগলেও আবদুল হাদী তা নিজের কাছে অস্বীকার করেছে বারবার। যতবার মনে হয়েছে, এই বুঝি ভালোবাসা, ততবার সে মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়িয়েছে মনে মনে। না, ভালোবাসা আবার কী ? নিকোলা আমার বন্ধু। বন্ধু, বন্ধু। ব্যাস! এর বেশি নয়।

কিন্তু এই যে নিকোলার কথা মনে পড়ে, এমন করে মনে পড়ে, কারণে অকারণে মনে পড়ে মনে করে ভালো লাগে, মনে করলে লন্ডন আর নির্বান্ধব পুরী মনে হয় না, মনে করলে মন আর দুঃখের দিকে ধাবিত হয় না— এ নিয়ে মাঝে মাঝেই বিব্রত বোধ করে আবদুল হাদী, জোর করে নিকোলাকে সরিয়ে দেয় মন থেকে, নিজেকে উচ্চারণ করে স্মরণ করিয়ে দেয়— দেশ স্বাধীন হলেই দেশে ফিরে যাবে সে, আবার সে অধ্যাপনা করবে, এ বছরই বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিল তার, সেই ইচ্ছেটা পূরণ করবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি নেবার চেষ্টা করবে, নিকোলা তখন কোথায় পড়ে থাকবে সেই নিকোলাকে নিয়ে তার এত মাথা ব্যথা কীসের ? কিন্তু এ কথা ভাবতেও কেমন কষ্ট হয়। নিকোলা তার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করে, দেখা হলে এত আপনজনের মতো গ্রহণ করে, সেই নিকোলার সঙ্গে অভিনয় করছে সে তাহলে ? যদি তাকে ভুলে যাওয়াই স্থির করে থাকে সে, তাহলে এখনই তাকে ভুলে যাওয়া কর্তব্য।

কিন্তু নিকোলারই যদি কোনো আকর্ষণ থেকে থাকে তার জন্যে ? ভাবতেও ভেতরটা রিমঝিম করে ওঠে তার। যত ভাবে ততই বেশি করে মনে হয়— তাই, অবশ্যই তাই, নইলে প্রথম দিনেই নিকোলা অমন করে নিমন্ত্রণ করবে কেন তাকে ?

সেই দিনটি তো ভোলা যায় না। লন্ডনে এ পর্যন্ত তার সবচে' বিচ্ছিরি, সবচে' সুন্দর দিন ঐটি। সেদিন সারাদিন আকাশ মেঘলা হয়ে ছিল, আবদুল হাদীর কোথাও যাবার ছিল না। লন্ডনে এসেছে মাত্র দুসপ্তাহ, এমনিতেও তার যাবার কোনো জায়গা নেই। কলেজে শরীফ আলীর সঙ্গে পড়ত, কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই শরীফ আলী বহুকাল আগে এসেছিল লন্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে, পড়াও শেষ করে নি, দেশেও ফিরে যায় নি, এখন সে বাঙালিদের নিয়ে রাজনীতি করে। আবদুল হাদী আসবার সময় শরীফের ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে এনেছিল, তারই সঙ্গে রোজ একবার দেখা করতে যেত সে। সেদিন সেও ব্যস্ত। ম্যানচেস্টারে বাঙালিদের সভা আছে, সেখানে ভোরে রওয়ানা হয়ে গেছে। শরীফের সঙ্গে আবদুল হাদী কয়েকবার গিয়েছিল লন্ডনের বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আপিসে। সেদিন শরীফকে না পেয়ে সেখানে একাই গিয়েছিল সে। দু'একজনের সঙ্গে আগে আলাপ হয়েছিল, ভেবেছিল সময়টাও কেটে যাবে, দেশেরও নতুন কিছু খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনোটাই হলো না।

একজন তো তাকে শুনিয়েই বলল, এই কিছু লোক আছে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে আর মাঝে মাঝে এসে খোঁজ করবে দেশ স্বাধীন হলো ? আরে যান না, দেশে গিয়ে ফাইট করুন, করে দেশে স্বাধীন করুন, আর নয় তো এখানে আমাদের কাজে কিছু সাহায্য করুন।

আবদুল হাদীর মনে হয়েছিল, তার চেয়ে অধম এই বিশ্বে আর কেউ নেই। মন্তব্যটি শুনে একই সঙ্গে তার দু'রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দেশের জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে সে কিছু করতে চায়, অবশ্যই চায়, কিন্তু সে জানে না কী সে করতে পারে। অস্ত্র হাতে নেবার মতো সাহস তার নেই, সে জানে; রক্ত দেখলে তার শরীর হিম হয়ে যায়, সে প্রমাণ পেয়েছে অতীতে, সড়ক দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে। একবার তারই রিকশাওয়ালা জখম হলে কর্তব্য ছিল তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া, কিন্তু সে ভিড়ের ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে। তার বক্তৃতা দেবারও যোগ্যতা নেই। কলেজে যতটুকু সে বক্তৃতা দেয় ক্লাশে, খোদা জানেন তাকে কতটা ঘেমে নেয়ে উঠতে হয় ভেতরে-ভেতরে। তার হাতের লেখা ভালো নয় যে সাইক্লোস্টাইল করবার জন্যে সে কপি লিখতে পারবে। তাঁর আঁকার ক্ষমতা নেই যে পোস্টার আঁকবে। তাহলে সে কী করবে? অথচ তার তো কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে।

ঢাকায় যদি থেকে যেত, তাহলে অন্তত বলতে পারত— দেশের কোটি কোটি অসহায় মানুষের সঙ্গে ছিলাম, প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তার ভেতর ছিলাম, গোরস্তানের স্তব্ধতার ভেতরে আমিও বাস করেছিলাম।

কিন্তু ঢাকা থেকেও তো পালিয়ে এসেছে সে লন্ডনে। লন্ডনে আসবার তেমন কোনো যুক্তি ছিল না তার; কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না। আরো কম খরচে, আরো সহজে সে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যেতে পারত; কিন্তু তা সে যায় নি। কেউ যদি আবদুল হাদীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জিগ্যেস করে, আপনি কি শত্রুকবলিত দেশ থেকে পালাবার অছিলায় পাশ্চাত্যের উন্মুক্ত রঙিন জীবন উপভোগ করার জন্যেই লন্ডনে আসেন নি? তাহলে কী উত্তর দেবে সে? আবদুল হাদী জানে, এই জীবনের স্বাদ নেবার জন্যে তার যে সঙ্গতি, চিত্তের যে স্থিরতার দরকার— তা নেই, নির্মমভাবে নেই। হাতে যে ক'টা পাউন্ড ছিল তা দশ দিনের মাথায় নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখন সে বেঁচে আছে শরীফ আলীর কাছে ধার করে, বাহাউদ্দিনের বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা করে। এদেশে কাজ করবার পারমিট নেই বলে সে তার উপযুক্ত কোনো কাজও পাবে না। হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় হয়তো নাম ভাঁড়িয়ে, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে কাজ পেতে পারে— বাসন ধোয়ার কাজ, টেবিলে খাবার পরিবেশন করবার কাজ। শরীফ আলী একবার সে রকম পরামর্শও দিয়েছিল; কিন্তু আবদুল হাদীর ভেতরটা কি কুঁকড়ে যায় নি এ ধরনের কাজ করবার সম্ভাবনায়? তার চেয়ে সে কি বেছে নেয় নি ভিক্ষা আর সাহায্য প্রার্থনার পথ?

বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আপিসে প্রত্যেক মানুষকে তার সেদিন মনে হয়েছিল সুখী, সমৃদ্ধ, স্থিরলক্ষ্য। কেবল তারই কোনো উদ্যোগ নেই, উদ্দেশ্য নেই। কেবল সে-ই অবাঞ্ছিত এই দেবদূতের দলে। আপিসের প্রত্যেক মানুষের পেছনে যেন আলোর একেকটি উজ্জ্বল চক্র। তারা কেউ ঝুঁকে পড়ে দ্রুত কলমে কিছু লিখে চলেছে, কেউ হুমড়ি খেয়ে কাগজ পড়ছে আর লাল পেন্সিলে কিছু অংশ চিহ্নিত করছে, কেউ পোস্টার আঁকছে, আবার কয়েকজন গোল হয়ে মাথা একত্র করে উত্তেজিত অথচ ফিসফিস গলায় কী পরামর্শ করছে; এমনকি যারা কিছু করছে না, তাদেরও দেখে মনে হচ্ছে আসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে টেবিলের ওপর পা তুলে শরীর এলিয়ে দিয়ে; আর ক্রমাগত, একের পর এক টেলিফোন আসছে, টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠছে, যেন মহাকাল এই মণ্ডলীকে অবিরাম তাড়া দিয়ে চলেছে।

এখানে আবদুল হাদীর জায়গা কোথায় ? কার সময় আছে তার সঙ্গে দুটো কথা কইবার ? নিঃশব্দে সে যে বেরিয়ে এসেছিল, তাও তো কারো চোখে পড়ে নি।

সে বেরিয়ে এসেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিল পেটের ভেতরে ক্ষিদের নখর। সামান্য কিছু পয়সা ছিল তার পকেটে, কিন্তু সে ভেবেছিল শরীফের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তার ওপরেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেবে। সেই শরীফও আজ ম্যানচেস্টারে। এক দুপুর না খেলে কী হয় ? সন্ধেবেলায় সামান্য কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয় ? ট্রেনের সাপ্তাহিক টিকিট করাই আছে; বাহাউদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই আর একটা দিন পার হয়ে যাবে।

কিন্তু বাহাউদ্দিনরাও আজ দেরিতে ফিরবে বাড়িতে। ভোরে আপিসে যাবার আগেই বাহাউদ্দিন বলেছিল, আজ আমাদের ফিরতে দেরি হবে। রোজি আর আমি একটা জায়গায় যাব। দশটার মধ্যেই ফিরব। আপনি তো দেরি করেই রোজ ফেরেন। নাকি চাবি রাখবেন ? এ-বাড়িতে উঠেছে অবধি বাহাউদ্দিন তাকে বাড়ির চাবি দেয় নি। আসলে, চাবি নেবার দরকার বোধ করে নি আবদুল হাদী। দেশে থাকতে তো বাড়ির চাবির বালাই ছিল না— কেউ না কেউ বাড়িতে সব সময় থাকত, মা, ছোট দুবোন, বুড়ি ঝি। এখানে এসে দেখে, পকেটে পয়সা থাকার মতোই জরুরি চাবি থাকা। চাবি না নিয়ে কেউ বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না; প্রত্যেকেরই কাজ আছে, নিজের নিজের সময় হলে বাড়ি ফেরে। এই যে রোজি আর বাহাউদ্দিন— দুজনে প্রায় পাশাপাশি অফিসে কাজ করে, এক সঙ্গে আপিস যায়, এক সঙ্গে ফেরে, তবু দু'জনের কাছে দুটো চাবি। কখন কাকে আলাদা ফিরতে হয়, দেরিতে ফিরতে হয়, বলা তো যায় না। আবদুল হাদী একটু অবাক হয়েই লক্ষ করেছে, বাড়িতে কেউ থাকলেও এরা দরোজায় এসে বেল না বাজিয়ে চাবি দিয়েই দরোজা খুলে ঢোকে।

বাহাউদ্দিনের মুখে 'নাকি চাবি রাখবেন ?' শুনে আবদুল হাদী 'না, না' করে উঠেছিল। না, চাবি সে নেবে না। দায়ে পড়ে অতিথির মতো যাকে থাকতে হচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ডুপ্লিকেট চাবি নেবার মতো জোর তার কোথায় ?

অতএব রাত দশটার আগে সেদিন তার বাড়ি ফেরাও চলবে না। যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক তাকে রাত দশটার পর ফিরতে হবে। লন্ডন এমন জায়গা নয় যে যেখানে দরোজা বন্ধ দেখে মোড়ে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকা যায়। এখানে পথে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না বিনা কাজে, মোড়ে এখানে জটলা নেই, পাড়ার দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায় সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে। তাই আবদুল হাদীকে ফিরতে হবে দশটারও অনেক পরে, যেন বাহাউদ্দিনরা তখনো বাড়ি ফেরে নি বলে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় নির্জন সড়কে, শীতের ভেতরে; হঠাৎ বৃষ্টি এলে বাঁচাবার মতো কোনো বারান্দাও নেই ধারে কাছে।

কী করে আবদুল হাদী ? কোথায় যায় ? এত নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব আর কখনো মনে হয় নি লন্ডনে এসে যেমন সেদিন বিকেলে তার হয়েছিল। ভেবেছিল সন্ধের পর কিছু খেয়ে নেবে, কিন্তু এখুনি তার প্রচণ্ড খিদে পায়; হয়তো সে নিজেই বোঝে না, খিদের চেয়েও তখন তার বেশি করে প্রয়োজন ছিল কোথাও একটু বসবার, মানুষের সঙ্গ পাবার, তা হোক রেস্তোরাঁর মানুষ তার অপিরিচিত। কোথাও খাবারের জন্য বসলে আশেপাশে মানুষের উপস্থিতি তাকে আবার মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে, এমন করে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হবে না— এটা স্পষ্ট করে অনুভব না করলেও, মানুষের ভেতরে মাথা তুলে থাকবার যে অনমনীয় প্রেরণা

আছে, সেটাই তাকে এখন একটা গ্রীক শস্তা রেস্তোরাঁর ভেতর ঠেলে দেয়।

কিন্তু ভালো করে খেতেও পারে নি সে সেদিন। কাবাব তার কাছে বিস্বাদ মনে হয়েছিল, গলার কাছে আটকে যাচ্ছিল প্রতিটি গ্রাস, সরু করে কাটা বাঁধাকপির টুকরোগুলো কাগজের মতো রসহীন লাগছিল। বেরিয়ে এসে সে হাঁটতে শুরু করেছিল। কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই তার; প্রতিটি পথিকের আছে। যার কোনো গন্তব্য নেই সে কোথায় যায় ? তার সুমখ কি প্রবাহিত হয় সমুখেই, পেছন কি পড়ে থাকে পেছনেই ?

কখন সে এসে পড়েছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ঢুকবে ? তবু তো একটা গন্তব্য। দরোজার কাছে এসে আবিষ্কার করে সে ঢুকতে— পয়সা লাগে। আকাশ ছোঁয়া বিশাল সব স্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে নিজেকে তখন আরো ক্ষুদ্র মনে হয় তার।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছিল তখন, কিছুটা হেঁটে গেলেই বুশ হাউস। সেখানে বিবিসি'র বাংলা বিভাগের আড্ডায় শরীফ আলী তাকে দু'দিন নিয়ে গিয়েছিল। আলাপ হয়েছিল মাবুদ খানের সঙ্গে। বাংলা বিভাগে রোজই আসে মাবুদ, নিয়মিত চাকরি করে না কিন্তু মাঝে-মাঝেই খবর পড়ে, নানা রকম প্রোগ্রাম করে, আবদুল হাদীর মতোই ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছে কয়েক মাস হলো। প্রথম আলাপেই মাবুদ আবদুল হাদীকে পাঁচটা পাউন্ড দিয়েছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। বিদায় নেবার জন্যে শেকহ্যান্ড করতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল মাবুদ আর সেই বাড়ানো হাতের ভেতরে ছিল নোটখানা।

কী, এটা কী ?

হাত ছাড়িয়ে মাবুদ তার পিঠের পেল্লায় এক চাপড় বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, রেখে দিন, রেখে দিন। আমরা সকলেই ফুটো নৌকার যাত্রী। বলেই কী প্রাণখোলা হা-হা করে হেসে উঠেছিল লোকটা।

মাবুদের কাছে গেলে হয় না এখন ?

কিন্তু বুশ হাউসের কাছে গিয়েও সেদিন ভেতরে যেতে পারে নি আবদুল হাদী। কেউ তাকে বাধা দেয় নি, তবু সে যেতে পারে নি। মর্মর বাঁধানো সমুখের চত্বরে উঠে পড়েও ইতস্তত করে নেমে এসেছে সে, দ্রুত হেঁটে ভারতীয় হাইকমিশনের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাবুদ যদি না থাকে, তাহলে বিবিসি'র বাংলা বিভাগে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা তাকে কীভাবে নেবে সেই আশংকা ভয়াবহ তাড়া করছে তাকে। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আপিসের মতো বিবিসি বাংলা বিভাগেও যদি একই অভ্যর্থনা তার ভাগ্যে জোটে ? যদি তাঁরাও তাকে পাশ কাটিয়ে যান, কিংবা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে দেখেন. বসতে না বলেন, কিংবা যদি জিগ্যেস করেন, তার কোনো দরকার আছে কিনা ? তাহলে কী উত্তর সে দেবে ?

মানুষের সবচে' বড় প্রয়োজন মানুষের সঙ্গ. আর সেই প্রয়োজনটির কথাই মানুষ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারে না কখনো; ঠিকানা আছে, সংসার আছে, চাকরি আছে, ব্যস্ততা আছে—এমন মানুষের কাছে 'মানুষের সঙ্গ চাই' আর্জি মোটেই সারবান বলে বোধ হয় না, বরং গভীর সন্দেহের জন্ম দেয় তাদের মনে।

ঠিক তখন আবদুল হাদী দেখতে পেয়েছিল ডাস্টবিনে একটা খবরের কাগজ। নতুন, ভাঁজ করা, এতটুকু ময়লা লাগে নি। সেদিনেরই কাগজ, কেউ পড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

কাগজখানা একটু ইতস্তত করে তুলে নিয়েছিল সে। মৃদু ভয় হচ্ছিল, কাজটা ঠিক হচ্ছে

কিনা। জানে ডাস্টবিনে কাগজ মানেই মালিক এর স্বত্ব ত্যাগ করেছে, তবু শঙ্কা হয়। কে জানে এ দেশে ডাস্টবিন থেকে কিছু তুলে নেয়াটাই অপরাধ কিনা! পাসপোর্টে তার এদেশে থাকবার মেয়াদ দু'মাস লিখে দিয়েছে। বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন অফিসার ছাপ দিয়ে দিয়েছে। এই দু'মাসে কোনো চাকরি নিতে পারবে না, ব্যবসা ফেঁদে বসতে পারবে না। অলিখিত আর কী নিষেধ আছে কে জানে ? দু'মাস পরেই বা সে কী করে থাকবার মেয়াদ বাড়িয়ে নেবে, তা নিয়ে এখুনি তার দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। ডাস্টবিন থেকে কাগজ তুলে নেওয়ার দরুনই যদি এই মুহূর্তে একটা ঝামেলা হয়ে যায় ? তার পরিণামে যদি তাকে বিলেত থেকে বার করে দেয় এরা ? কোথায় ফিরে যাবে সে ? ঢাকায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব। স্বীকার করে তার সাহস নেই, সে কাপুরুষ, সৈন্য দেখলে তার ভয় করে, খিদে সহ্য করতে পারে না, গুজব তাকে অস্থির করে তোলে, ঘুমোতে না পেলে তার ভীষণ মাথা ধরে যায়— এ সব কথা কাউকে বলা যায় না, মাঝে-মাঝে ঢাকায় যে বিস্ফোরণগুলো সে শুনেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে তার চিৎকার করে বলতে হয়েছে— দোহাই আপনাদের এসব বন্ধ করুন, আপনাদের জন্যে আমরা মারা যাব, আমাদের কাউকে ওরা বাঁচাবে না। অথচ আবদুল হাদী মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, আদৌ তা নয়। সেও প্রতিটি বাঙালির মতো চায় মুক্তি, স্বাধীনতা; কিন্তু মুক্তির জন্যে কষ্ট করতে সে ভয় পায়, স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দেবার সম্ভবনায় বিচলিত হয়ে পড়ে। সে যে আশা করে, অথচ প্রকাশ্যে নিজের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করে না যে, রাত পোহালেই স্বাধীনতা এসে 'সুপ্রভাত' বলবে, মন্ত্রবলে মৃতেরা প্রাণ ফিরে পাবে, আবার পথে-পথে ফেরিওয়ালা হেঁকে যাবে, ভবনগুলোর মাথায় বাংলাদেশের পতাকা পত-পত উড়বে, কলেজে ক্লাশ বসবে, লেডিজ ক্লাবে বৌ-ভাতের সামিয়ানা পড়বে, ট্রেন হুইসিল দিয়ে বাংলার গভীরে ছুটে যাবে।

দৈবের নিঃশব্দ মায়াবী একটা হাত আছে বৈকি— নইলে আবদুল হাদী নিকোলার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার যোগাযোগটা ব্যাখ্যা করবে কী করে ? ডাস্টবিন থেকে কাগজখানা তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে-ওলটাতে তার চোখে পড়েছিল সভা-সমিতির কলামে খুব ছোট্ট টাইপে ছাপা একটা বিজ্ঞপ্তি।

> 'আর্লস কোর্টে অবস্থিত ন্যাশনাল পোয়েট্রি সেন্টারে আজ সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় প্রতিবাদী তরুণ কবিদের কাব্যপাঠ। আপনি আমন্ত্রিত। কোনো প্রবেশ মূল্য লাগিবে না।'

পকেটে পয়সা বেশি ছিল না, হয়তো আর্লস কোর্ট পর্যন্ত ভাড়া কুলিয়ে যাবে— কিন্তু ঐ যে 'প্রবেশ মূল্য লাগিবে না', ঐ যে 'সাত ঘটিকায়' সভা অর্থাৎ সময়টা কেটে যাবে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত, ঐ যে 'আপনি আমন্ত্রিত' অর্থাৎ তারও একটা গন্তব্য আছে—তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, দ্বিধার শ্যাওলা খসে পড়ে। আবদুল হাদী একজন পথিককে জিগ্যেস করে কাছেই কোনো টিউব স্টেশন আছে কিনা, আর্লস কোর্টে যেতে চাই।

আবদুল হাদী টেম্পল স্টেশন থেকে আর্লস কোর্টের গাড়ি নেয়। দৈবের মায়াবী হাত তাকে গাড়িতে তুলে দেয়।

খুঁজে পেতে ন্যাশনাল পোয়েট্রি সেন্টার বের করেছিল সে ঠিকই, কিন্তু তখনো সাতটা বাজতে অনেক দেরি। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। তাতে কী ? আপাতত তারও একটা গন্তব্য আছে, সেখানে তার নিমন্ত্রণ আছে; তাই আর্লস কোর্টের বড় সড়কে দোকানগুলোর

জানালায়-জানালায় সাজানো জিনিশপত্র বারবার ঘুরে ফিরে দেখতে, ভিড়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে ঘণ্টাখানেক একই রাস্তায় পায়চারি করতে তার এতটুকু খারাপ লাগল না।

সভাঘরে ঢুকে এক কোণায় বসেছিল সে, একেবারে পেছনের দিকে। জনা বিশেক তরুণী এসে হাজির হয়েছে। সবাই বসেছে লাইব্রেরি ঘরে কার্পেটের ওপর গোল হয়ে। বড় ভালো লেগেছিল আবদুল হাদীর। মেঝের ওপর বসবার ব্যবস্থা তাকে দেশের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, তাই তো আরো আপন মনে হয়েছিল পরিবেশ।

হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল লাইন করে সাজিয়ে রাখা আলমারিগুলোর মাথায় রবীন্দ্রনাথের কালো পাথরে খোদাই করা আবক্ষমূর্তি। বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেছিল সে। আজ সন্ধ্যায় তার কেবল গন্তব্যই আছে তা নয়, উদ্দেশ্য সেটাও বড় নয়, তার চেয়ে আরো কিছু আছে, আছে তার অধিকার; রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি সেই অধিকার দিয়ে গেছে তাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় যেন একখণ্ড স্বপ্নের ভেতরে গিয়ে পড়েছিল আবদুল হাদী। সেখানে কেউ তার উপস্থিতিতে ভ্রূকুটি করে না, সেখানে তার সংকুচিত বোধ করবার দরকার হয় না; সেখানে কেউ বিচলিত নয় তার বিত্ত আছে কি নেই তা নিয়ে, সেখানে সেও দমিত নয় যে সকলেরই আপন ঠিকানা আছে কেবল তারই নেই একথা ভেবে।

নিকোলাকে বারবার চোখে পড়ছিল তার। সবার ভেতরে সবচে' বেশি কথা বলছিল সে। প্রতিটি কবিতা পড়া হয়ে যাবার পর সে-ই প্রথম হাত ওঠাচ্ছিল আর হাসতে-হাসতে উঁচু গলায় বলছিল, আমার কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন, শ্রবণ করুন।

তারপর, প্রতিবারই কবির হাত থেকে কবিতার কাগজটি প্রায় কেড়ে নিয়ে নিকোলা এই ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছিল— ইহা উত্তম, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে, আমার আত্মা স্পর্শ করিয়াছে। তবে....। কিন্তু এই 'তবে'-র পরে এগুনো সহজ হয় না। প্রতিবারই নিকোলা 'তবে'-র পরে হাসতে-হাসতে মাথা দোলায়, চোখ নিচু করে কবিতাটি দেখে নেয়, দু-একটা ভাঙা-ভাঙা মন্তব্যসূচক শব্দ উচ্চারণ করে, তারপর হাসতে-হাসতে হাল ছেড়ে দিয়ে কবির হাতে কবিতা ফেরত দিয়ে বলে— ইহা উত্তম হইয়াছে। দ্বিতীয় কবিতার পর থেকেই হাসির রোল পড়ে যায় নিকোলা 'ইহা উত্তম হইয়াছে' বলবার সঙ্গে সঙ্গে, সে হাসি ছড়িয়ে যায় শ্রোতাদের ভেতরে, আবদুল হাদীও অচিরে যোগ দেয়। শেষ দিকে এমন হয় যে কয়েকজন তরুণ-তরুণী কবিতা পড়েই তা চট করে লুকিয়ে ফেলে, নিকোলা মেঝের ওপর হামা দিয়ে কবির সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে কাগজ নেবার জন্যে, আর হাসির তরঙ্গে ভেসে যায় সারা ঘর।

ঢাকার কথা, বাহাউদ্দিন-রোজির কথা, বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আপিসের কথা, দিনটি বড় বিচ্ছিরি গেছে সে কথা— কিছুই আর মনে পড়ে না তার। যে মায়াবী জলে স্নান করে উঠলে মানুষ তার অতীত ভুলে যায়, সেই জলের স্পর্শ আবদুল হাদী তার অস্তিত্বের ওপর অনুভব করতে থাকে।

সভা শেষ হয়ে যাবার পর সবাই এ ওর হাত ধরে, জটলা করে, কথায় তারাবাতি জ্বেলে বেরিয়ে যেতে থাকে। আবদুল হাদী দরোজার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে পথ ছেড়ে দিয়ে; সবার পরে সে বেরুবে। তার বড় ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে যেতে। তার খেদ হয় এত তাড়াতাড়ি সভা ভেঙে গেল বলে।

ঠিক তখন নিকোলা আর লিসবেট বেরিয়ে যাচ্ছিল। আবদুল হাদী নিকোলাকে শেষ বারের

মতো দেখে নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে সহাস্য মুখে— হাসিটা সেই কাব্য পাঠের মাঝামাঝি থেকেই তার ঠোঁটে লেগে আছে— তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে যায়। দরোজার বাইরে একটা পা রেখেও ফিরে আসে নিকোলা।

আবদুল হাদী প্রথমে বুঝতেই পারে না যে নিকোলা তাকেই কিছু বলছে।

আমি এখানে তোমাকে পূর্বে দেখি নাই। কে তুমি ?

নাম বলবে নিজের ? বিদেশিনীর কাছে কী অর্থ আছে অপরিচিত দুটি শব্দ উচ্চারণ করে ?

আবদুল হাদী উত্তর দিয়েছিল, আমি আগন্তুক।

যেন ভীষণ মজা পেয়ে গিয়েছিল নিকোলা. লিবসেটের দিকে হাসির ঝলক ছুঁড়ে দিয়ে আবদুল হাদীকে বলেছিল, আমরাও আগন্তুক ভিন্ন আর কী ?

তখন আবদুল হাদী ঘরের ভেতরে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তিটির দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, আমি ঐ কবির স্বদেশবাসী।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে নিকোলা বলেছিল, উহার নাম কী ?

এবার বিস্মিত হবার পালা আবদুল হাদীর।

সত্যই উহার নাম তুমি জান না ?

তুমি বলিয়া দাও না কেন ? —হাঁ লিসবেট, উহা আশ্চর্য বটে, মূর্তিটি কাহার এ প্রশ্ন মনে কখনো ওঠে নাই। আগন্তুক, উনি কে বটেন ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তোমরা টাগোর উচ্চারণ করিয়া থাক।

হাঁ, হাঁ, ঈষৎ স্মরণ হইতেছে।

তেরো সালে কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

লিসবেট, ইহা আশ্চর্য এই কবি সম্পর্কে আমরা কখনোই কৌতূহলী হই নাই। নিশ্চয়ই নোবেল পুরস্কার পাইবার পর এই মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। আশ্চর্য, কোনো কবিকেও ইহার সম্পর্কে কখনো কিছু বলিতে শুনি নাই। আগন্তুক, তোমার কি এই মুহূর্তে ফিরিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ?

না, তাহা নহে।

তবে তোমাকে কিঞ্চিৎ পানের আমন্ত্রণ জানাইতে চাহি। তুমি এই কবি সম্পর্কে আমাদিগকে কিছু বলিবে। তোমার নিজের সম্পর্কেও বলিবে। বলিবে না ?

পোয়েট্রি সেন্টারের পাশেই ছোট্ট একটি আবাসিক হোটেল। তারই পানশালায় তাকে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। সেখানে একটু আগে সভা থেকে আরো কেউ কেউ এসে আসর জমিয়ে বসেছে। প্রথমে আবদুল হাদীর সংকোচ হচ্ছিল কিছুটা; যেন এই এতক্ষণে সে অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছে। কিন্তু পরমূহূর্তেই সেই খিন্নতা তার কেটে গিয়েছিল। অবাক হয়ে সে লক্ষ করেছিল নিকোলা আর লিসবেটের সঙ্গে তার এখানে আসাটাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই নিল না।

সেই প্রথম কোনো পানশালায় ঢুকেছিল সে।

তুমি কি পান করিবে ?

আমি সুরা পান করি না।

হাঁ, ইহা প্রাচ্যদেশীয়র মতো বটে। তুমি কি যোগসাধনা কর ?

যোগের 'ইয়োগা' উচ্চারণ শুনে প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারে নি আবদুল হাদী। কিন্তু তার অজ্ঞতা সে বুঝতে দিতে চায় নি। উত্তরে মৃদু একটু হেসেছিল শুধু।

লাফিয়ে উঠেছিল লিসবেট। এই এতক্ষণ পরে আবদুল হাদীকে সে সরাসরি সম্বোধন করেছিল।

তুমি আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে ? আমি যোগসাধনা করিতে চাহি। আমি ধ্যান করিতে চাহি।

সেদিন অনেক কিছু নিয়েই গল্প হয়েছিল তাদের, কেবল যে রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে পানশালায় যাওয়া সেই তাঁকে নিয়েই কোনো কথা হয় নি।

তিনজন এক সঙ্গে উঠে টিউব স্টেশনে এসেছিল। উল্টো দিকের গাড়ি আবদুল হাদীর। প্ল্যাটফরমে ছাড়াছাড়ি হবার আগে নিকোলা বলেছিল, শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের ফ্ল্যাটে আসিবে ? তারপর অপ্রত্যাশিত একটা হাত তার কাঁধে রেখে যোগ করেছিল— যদি প্রতিজ্ঞা কর উপহার আনিবে না, তাহা হইলে বলি যে ঐ দিবস আমার জন্মতিথি।

৩

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই দেয়ালে শেখ মুজিবের বড় ছবিটা চোখে পড়ল। বিলেতে এখন বাঙালিদের বাড়িতে-বাড়িতে শেখ মুজিবের ছবি. সে ছবি টানানো ঘরে ঢুকতেই প্রথমে দৃষ্টি যায় এমন একটি দেয়ালে। আরো একটি জিনিশ টানানো দেখা যায়— লাল সূর্যের ভেতরে বাংলাদের মানচিত্র আঁকা নিশান, তার ওপরে নিচে লেখা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। অনেকেই আবার বাংলাদেশের ছোট্ট মানচিত্র আঁকাটাই ব্যবহার করেন। এ সবই বাঙালিদের কাছে বিক্রি করে চাঁদা তোলা হয়েছে, এখনো হচ্ছে— স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্যে।

আবদুল হাদী লন্ডনে এসে প্রথম যেদিন এ বাড়িতে পা রেখেছিল, তার সমস্ত চোখ জুড়ে ছিল শেখ মুজিবের ঐ ছবিখানা। ঘরে ঢুকেই মনে হয়েছিল, এখানে বাতাস কী মুক্ত, বর্ণ কী উজ্জ্বল, এখানে স্বাধীনতা আছে, তাই শেখ মুজিবের ছবি আছে। ঢাকা থেকে এসেছে সে, যে ঢাকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেনাবাহিনী, যে ঢাকার দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে সমস্ত শ্লোগান আর প্রতীক, যে ঢাকায় বাঙালিরাই লুকিয়ে ফেলেছে শেখ মুজিবের ছবি, মাটিতে পুঁতে ফেলেছে বাংলাদেশের নিশান, যে ঢাকায় শেখ মুজিবের নাম প্রকাশ্যে আর উচ্চারিত হয় না। তাই দেয়ালে প্রকাশ্যে শেখ মুজিবের এত বড় ছবি দেখে তার বড় বিস্ময় লেগেছিল। মনে হয়েছিল যেন এ মুখ আগে কখনো সে দেখে নি, যেন তার চোখের সমুখে রত্নের গোপন ভাণ্ডার খুলে গেছে।

সেই প্রথম সে বড় ভেতর থেকে অনুভব করেছিল স্বাধীনতা কাকে বলে। সেই প্রথম তার বিশ্বাস হয়েছিল, বাংলাদেশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, তার স্বাধীনতা আসবেই আসবে। সেই প্রথম সে অনুভব করেছিল 'বাংলাদেশ' এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বের শেকড় পর্যন্ত আনন্দে কতখানি শিহরিত হয়ে ওঠে!

কাল সারা রাত শীতের সঙ্গে লড়াই করে, অবসন্ন হয়ে, স্মৃতির ভেতরে উন্মত্ত প্রলয়ে বিধ্বস্ত হয়ে আবদুল হাদীর আশা ছিল না যে আবার সে কোনোদিন জেগে উঠতে পারবে। জেগে উঠেও কয়েক মুহূর্ত তার বিশ্বাস হয় না সে এখনো বেঁচে আছে। তারপর চোখ মেলতেই শেখ মুজিবের ছবি— মুষ্ঠিবদ্ধ একটি হাত তুলে তিনি তাকিয়ে আছেন। আর তক্ষুণি বড় সপ্রাণ মনে হলো ছবিটিকে। আবদুল হাদী রক্তের ভেতরে জীবনের নেশা অনুভব করল সহসা। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, আমি বেঁচে আছি।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে। সারা রাত সে ঘরময় পায়চারি করে বসবার নিচু কুশনগুলো ছড়িয়ে ফেলেছে চারদিকে, ছত্রখান হয়ে রয়েছে পুরনো খবরের কাগজ, পানির গ্লাস উল্টে কার্পেটের অনেকখানি ভিজে গেছে আর শোফার ওপরে চাদরে-বালিশে-কম্বলে খিচুড়ি পাকিয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি সব ঠিকঠাক করে বাথরুমে যাবার পথেই বাহাউদ্দিনের সাড়া পেল সে। সে-কী ? এখনো আপিসে যায় নি ? ঘড়িতে সকাল ন'টা দেখে সে ধরেই নিয়েছিল, ওরা দু'জন এখন আপিসে।

কোনো রকমে হাত-মুখ ধুয়ে রান্না ঘরে চা বানাতে গিয়ে রোজির সঙ্গে দেখা। রুটি টোস্ট করছে সে। আবদুল হাদীকে দেখেই সে বলে উঠল, চা ? আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

রোজির গলায় অপ্রত্যাশিত আন্তরিকতা লক্ষ করে সে অবাক হলো। কৃতজ্ঞ বোধ করল, এতদিন তার ব্যবহারে কেবল উপেক্ষা আর নিস্পৃহতা অনুভব করে সে যে ভুল করেছে! এর জন্যে মনে মনে লজ্জিত হলো সে বারবার। বলল, আমিই করে নিই না ?

আমি করছি। মিষ্টি শাসনের সুর রোজির গলায়।

আচ্ছা, আচ্ছা।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে রোজির আরেকটি অবাক করে দেয়া কথা শুনে দাঁড়াতে হলো তাকে।

আপনার টোস্টে কি শুধু মাখন হবে, না একটু জ্যাম দেব ?

জ্যাম ? জ্যাম কী হবে ? টোস্ট, শুধু টোস্টই বেশ। টোস্ট না হলেও হয়। আমি তো শুধু চা-ই খাই। আচ্ছা, দিন একটু জ্যাম, খুব একটুখানি।

বসবার ঘরে এসে ভেতরের বিস্ময়টাকে প্রশ্রয় দিল আবদুল হাদী। আজ সকালে এমন কী হয়ে গেল যে রোজি তার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করছে ? ঘরে চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল সে, সদ্য কামানো নিজের গালে বার কত হাত ঘষল, উঠে গিয়ে জানালার বাইরে পথের দিকে ভরাচোখে তাকিয়ে দেখল— সবকিছু আগের মতোই আছে, তবু আনকোরা নতুন লাগল সব।

দু'পেয়ালা চা হাতে করে ঘরে ঢুকল বাহাউদ্দিন। আবদুল হাদীর দিকে একটি পেয়ালা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, রাতে ঘুম ভালো হয়েছিল ?

এবারে পুরোমাত্রায় হকচকিয়ে গেল আবদুল হাদী। এ কয়েক সপ্তাহ গেছে, প্রতিদিন দেখা হয়েছে বাহাউদ্দিনের সঙ্গে, একবারও সে তার ঘুমের কুশল শুধোয় নি। ওদের আজ আপিসে না যাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবার কোনা যোগাযোগ আছে কিনা, দ্রুত একবার অনুমান করবার চেষ্টা করে আবদুল হাদী।

কিন্তু বাহাউদ্দিনের প্রশ্নটির উত্তর দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে তড়িঘড়ি বলে, ঘুম ? ঘুমিয়েছি তো। বলবে নাকি শীতে কষ্ট পাবার কথা ? বলেই ফেলে সে, একটু শীত করছিল, এই একটুখানি।

রোজি টোস্ট নিয়ে ঘরে এল।

বাহাউদ্দিন টোস্ট তুলে নিতে-নিতে বলল, শুনেছ, কাল রাতে নাকি শীতে কষ্ট পেয়েছেন খুব।

খুব তো নয়, খুব মোটেই নয়। প্রতিবাদ করে উঠল আবদুল হাদী। ভেতরটা একটু শিরশির করছিল, তাও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। বলেই সে এমন একটা নির্মল হাসি উচ্চারণ করল, যেন বিষয়টির এখানেই সমাপ্তি টানা গেল।

কিন্তু অত সহজে তাকে রেহাই দিল না বাহাউদ্দিন। বলল, আপনি নতুন এসেছেন তো, বুঝতে পারেন নি। ঐ শিরশির করাটা মারাত্মক। ওকে বলে 'চিল'— সি এইচ আই ডবল এল— নতুন এলেই বেশি করে ঠেসে ধরে। ওর ওষুধ হচ্ছে বিচাম পাউডার, এক পুরিয়া পানিতে গুলে খেয়ে নেবেন, গা গরম হয়ে যাবে। আপনার উচিত ছিল আমাদের ডাকা।

না, ও কিছুই নয়। তেমন হলে ডাকতাম। তবে জেনে রাখলাম, বিচাম পাউডার। আজ আপিসে গেলেন না আপনারা ?

ছুটি নিতে হলো। দুপুরে এয়ারপোর্ট যেতে হবে।

কেউ আসছে বুঝি ?

উত্তর দিল রোজি। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার টোস্টে কামড় দিয়ে বসতে-বসতে বলল, আমার শ্বশুর আজ আসছেন।

ভারি উৎফুল্ল গলায় তখন আবদুল হাদী অব্যয়ধ্বনি করে উঠল, বাহ্, তাই তো বলি, নটা বেজে যায়, আপনারা বাড়িতে! কথাগুলো বলতে-বলতেই আবদুল হাদী অনুভব করল তার এ ফুল্লতা কোথায় যেন বেসুরো বাজছে। সে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। বলল, মামা একেবারে হঠাৎ। কখন খবর পেলেন ? হাঁ, এবার সে বুঝতে পেরেছে, কেন বেসুরো ঠেকছিল একটু আগে। বাহাউদ্দিনের বাবা যদি আসছেনই, তো খবরটা আগেই জানা ছিল এবং কাল রাতেও এ-ঘরে সে তাদের সঙ্গে দুপুররাত পর্যন্ত ছিল, তখন তো খবরটা তাকে দেয়া হয় নি ?

কী একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পায় আবদুল হাদী। ভেতর থেকে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করে সে।

বাহাউদ্দিন তাকে নিশ্চিন্ত করল, হাঁ, একেবারেই হঠাৎ। কাল টেলিভিশন দেখে শুতে গেলাম না ? শুয়েই পড়েছি, হঠাৎ টেলিফোন। জিনিভা থেকে আব্বা বললেন, আজ দুপুরে আসছেন, আমি যেন এয়ারপোর্টে যাই এ-ও বললেন। কিছু বুঝতে পারলাম না।

রোজি স্বামীর দিকে কী একটা অর্থ নিয়ে চোখ নাচাল। আবদুল হাদীর হঠাৎ চোখে পড়ে গেল সেই চকিত ভঙ্গি। উদ্বেগ দ্বিগুণ হয়ে তাকে হানা দিল।

রোজিও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আবুদল হাদীর কাছে ধরা পড়ে গেছে তার চোখের ইশারা। সে বলে উঠল, এতে বোঝাবুঝির কী আছে ? বাবা ছেলেকে আসতে বলতে পারে না এয়ারপোর্টে ? তুমিও যেমন! হাইকমিশন থেকে নিশ্চয়ই কেউ যাবে রিসিভ করতে, তুমিও যাবে, উনি সিওর হবার জন্যেই তোমাকে আসতে বলেছেন।

'হাইকমিশন' কথাটা মাথার ভেতর বোঁ-বোঁ করতে লাগল আবদুল হাদীর। সে প্রশ্ন না করে পারল না, হাইকমিশন মানে?

পুরোপুরি লাগাম হাতে নিয়ে নিল রোজি। বলল, দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার খোঁচা দিয়েই সে বলল, আপনার মামা, আপনি কোনো খবর রাখেন না? উনি কী পোস্টে আছেন, জানেন?

বাহাউদ্দিন বাধা দিল, আহ্, না জানাটা দোষের কিছু নয়। তুমি যেভাবে বলছ—

আমি তো ওর দোষের কথা বলছি না। উনি অন্য দেশের কেউ নন, আর পাকিস্তান এখনো আছে। আব্বা যে পাকিস্তানের ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি সকলেই জানে। উনি জানেন না তাই অবাক হচ্ছিলাম। সেক্রেটারি র‍্যাংকের কেউ এলে হাইকমিশন থেকে যায় রিসিভ করতে— এটাও নতুন কিছু নয়।

বড় বিব্রত বোধ করল আবদুল হাদী। সে জানত বাহাউদ্দিনের বাবা বড় চাকরি করেন, কিন্তু তিনি যে ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি এটা একেবারেই নতুন সংবাদ তার কাছে। বাঙালি কেউ ইসলামাবাদে এত বড় পদে আছে এটাও তার জানা ছিল না। এত বড় অজ্ঞতা নিয়ে সে এতদিন এখানে এদের ওপর চেপে বসে আছে?

রোজি শূন্য পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে থমথমে মুখে রান্না ঘরে ফিরে গেল।

আবদুল হাদী খেদের সঙ্গে বলল, মামা যে সেক্রেটারি, আমার কোনো ধারণাই ছিল না। ছি-ছি! তারপর অপরাধটুকু ঢাকবার জন্যে খুব অন্তরঙ্গ গলায় বাহাউদ্দিনের কাছে জানতে চাইল, আচ্ছা মামার কোনো অসুবিধে হয় নি? মানে, উনি বাঙালি তো, পাঞ্জাবিরা ওকে কীভাবে দেখছে এখন— তাই ভাবছিলাম।

বাহাউদ্দিন খুব প্রসন্ন হলো না কথাটা শুনে। বড় দমে গেল আবদুল হাদী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উৎসাহের সঙ্গে সে আবার বলে উঠল, তাহলে তো আপনাকে এখুনি বেরুতে হয়, না কি?

হ্যাঁ, এই বেরুব।

অনেকদিন মামাকে দেখি নি।

বাহাউদ্দিন এর পিঠেও মানানসই কিছু উচ্চারণ করল না। তখন চুপ করে বসে রইল আবদুল হাদী। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যে প্রফুল্লতা সে অর্জন করেছিল এত তাড়াতাড়ি তা খোয়াতে হবে, কে ভেবেছিল?

বাহাউদ্দিন হঠাৎ আবদুল হাদীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, এখানে তো দেখছেন, ঘর মাত্র দুটো। আব্বা হঠাৎ এসে পড়ছেন, মনে হলো হোটেলে এ যাত্রা থাকছেন না, আমার এখানেই উঠবেন। আপনাকে তো আজ রাত থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্য আব্বা না এসে পড়লে আমার তেমন কোনো অসুবিধেই ছিল না।

এতক্ষণে আবদুল হাদী সকালবেলার ভালো ব্যবহারগুলোর একটা অর্থ খুঁজে পায়। শিক্ষিতেরাই জানে যে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। বিদায়ের দিন জ্যাম লাগানো টোস্ট খেলে মনে থাকবে সেটাই।

বাহাউদ্দিন উঠে দাঁড়ালে আবদুল হাদীও উঠে পড়ল। বলল, নিশ্চয়ই, এটা তো খুবই ছোট বাসা। আমি আজই একটা ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

পারবেন তো ? আপনার খুবই অসুবিধে হলো, কিন্তু কী করা!

না, অসুবিধে আর কী ? আমার সুটকেসটা বরং এ বেলা থাক, বিকেলের দিকে নিয়ে যাব।

৪

আজও আকাশ পুরু মেঘে ছেয়ে আছে। কাল সারারাতের বৃষ্টিতে পথ-ঘাট এখনো ভেজা। আর ঠাণ্ডা হাওয়াও বইছে তেমনি। আবদুল হাদী কোটের কলার তুলে দিয়ে টিউব স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। আকস্মিকতার তোড়ে বেরিয়ে এসেছে সে, নইলে ঘর থেকেই শরীফ আলীকে ফোন করা যেত। এই বিপদে শরীফ ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারে। শরীফকে কি এত বেলায় পাওয়া যাবে ?

যা সন্দেহ করা গিয়েছিল তাই হলো। টিউব স্টেশন থেকে ফোন করে শরীফের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যদি লন্ডনের বাইরে গিয়ে থাকে ? বুকের ভেতরটা শীতল হয়ে গেল তার। তাহলে সে কী করবে ?

ট্রেনে উঠে বসল সে। কোথায় যেতে পারে ? এমন কোথাও তাকে যেতে হবে যেখানে চেনা বাঙালির সঙ্গে দেখা হবে। বিবিসি-র বাংলা বিভাগে যেতে পারে, সেখানে মাবুদ খান আছে। প্রথম সাক্ষাতেই লোকটা তাকে পাউন্ড দিয়ে সাহায্য করেছিল; সমস্যাটা তাকে বলা যেতে পারে। আর সে যেতে পারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুমে। সেখানে কয়েকজন বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে তার একবার আলাপ হয়েছিল। তারা কি অন্তত দু' একদিনের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না ?

অবশেষে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আপিসে যাওয়াই সে ঠিক করল। এদেশে এসে পরিচিত হয়েছে এমন কাউকে বলবার আগে শরীফের খোঁজ করাটাই প্রথম দরকার। তার অনুতাপ হলো, প্রথম যখন এসেছিল, শরীফ জিজ্ঞেস করেছিল, উঠছ কোথায় ? অসুবিধে নেই তো ?

কেন যে সে তখন বলতে গিয়েছিল, কিচ্ছু অসুবিধে নেই, আমার মামাতো ভাই বাড়ি কিনেছে, সেখানে যদ্দিন খুশি থাকতে পারি বলেছে।

কথাটা কি সত্যি বলেছিল বাহাউদ্দিন ? ভ্রূ কুঁচকে এখন ভাববার চেষ্টা করল আবদুল হাদী। সম্ভবত বলে নি। ঢাকায় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে লন্ডনে সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবার আনন্দেই সে বাড়িয়ে বলেছিল। শরীফকে যদি সে বলত, কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে তাহলে আজ এই আচমকা অসুবিধেয় পড়তে হতো না।

ভীষণ ক্রোধ হতে লাগল বাহাউদ্দিনের ওপর। মনে হতে লাগল, সে অমানুষ হয়ে গেছে, বিলেত তাকে হৃদয়হীন করে দিয়েছে। দেশের ওই দুর্দিনে তার কি কর্তব্য ছিল না আবদুল হাদীর জন্যে একটু অসুবিধে স্বীকার করে নেওয়া ? আর সে তো অনাত্মীয় নয়। তার মায়ের সৎ বোনের ছেলে; পঁচিশে মার্চের পর মানুষ তাড়া খাওয়া মানুষগুলোর জন্যে, যাদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক দূরে থাকুক, কখনো পরিচয় পর্যন্ত নেই তাদের জন্যে কী-ই না করছে! আর সেখানে বাঙালি হয়ে আশ্রয়হীন একটা বাঙালিকে ঘরের একটা কোণ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারল না বাহাউদ্দিন ? বলতে পারল না, আব্বার জন্যে বিছানা যখন দরকার আপনি

না হয় মেঝেতেই শোবেন।

টিউব থেকে নেমে পাতাল স্টেশন থেকে যখন ওপরে উঠল আবদুল হাদী, দেখল মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এ-রকম তোড় এ দেশে খুব একটা হয় না। কিন্তু আজ তার কপাল মন্দ, তাই হবে না কেন ? তার মতো অনেকেই স্টেশনের ছোট্ট বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে, ভিড়ে ঠাসাঠাসি, বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। হাদীর ভয় হয় আজও আবার না তাকে সেই 'চিল' পেয়ে বসে। কাল রাতের কথা মনে পড়ে যেতেই তার হাড়ের ভেতর কেঁপে উঠল এখন। তার বাবার কথা মনে পড়তে লাগল— যিনি লন্ডনের শীতের কথা সেই ছেলেবেলা থেকে তাকে শোনাতেন। বাবা সেই কবে মারা গেছেন, মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, কিন্তু চোখ কখনো ভিজে ওঠে নি।

এখন সেই বিলেতের মাটিতেই দাঁড়িয়ে তার চোখ ভিজে উঠল। বড় অপ্রতিভ মনে হলো নিজেকে। কেউ যদি দেখে ফেলে, কী ভাববে ? এরা তো কেউ জানে না, আজ রাতে তার থাকবার জায়গা নেই, তার দেশ নেই, চাকরি নেই, পকেটে পয়সা নেই, একজনের দয়া থেকে বেরিয়ে আরেকজনের দয়া সন্ধান করতে চলেছে সে।

কিন্তু এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। ধারা একটু মিইয়ে আসতেই বারান্দার ভিড় পাতলা হয়ে যায়। কেউ ছাতা খুলে, কেউ খবরের কাগজ মাথায় ধরে পথে নেমে পড়ে। আর একটু সময় নেয় আবদুল হাদী। বৃষ্টিতে ভেজা তার কোনোমতেই চলবে না। অচেনা শহরে অসুস্থ হয়ে পড়লে সে মরেই যাবে। চিরকাল সামান্য অসুখেই বড় কাতর হয়ে পড়েছে আবদুল হাদী।

অ্যাকশন কমিটির আপিসে ঢুকতেই শরীফ আলীর উচ্চ কণ্ঠ কানে ভেসে এল তার। আছে ? তাহলে এখানেই আছে শরীফ আলী ? বুকের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়া আশা-ভরসা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

হ্যাঁ, শরীফ আলী আছে, কিন্তু একা নয়; দুটো লোকের সঙ্গে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। এত উত্তেজিত যে আবদুল হাদীকে তার চোখেও পড়ল না।

না, ঠিক এই মুহূর্তে উচিত হবে না তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যে কারণে সে এসেছে তার জন্যে শরীফ আলীকে চাই একা এবং প্রশান্ত। বলা যায় না, উত্তেজনার ঝাঁজ যদি তার ওপরই এসে পড়ে। আবদুল হাদী লক্ষ করে দেখেছে, মানুষের সঙ্গে দিনের প্রথম যে মেজাজে সাক্ষাৎ হয় বেশ অনেকক্ষণ তারই রেশ থেকে যায়।

আবদুল হাদী নিজেকে প্রায় অদৃশ্য করে এক কোণে নীরবে বসে পড়ল।

শরীফ আলী টেবিলের ওপর প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলে উঠল, ইহা বিশ্বাসঘাতকা, ইহা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা ইহা সহ্য করিব না।

লোক দুটো চকিতে একবার চারপাশ দেখে নিয়ে প্রায় একই সঙ্গে এবং নিচু গলায় কী যেন তখন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলবেগে দু'হাত নাড়াতে লাগল শরীফ আলী।

সে দুগ্ধপোষ্য শিশু নহে যে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে না। তাহাকে আমার কিছুকাল যাবৎই সন্দেহ হইতেছিল, এক্ষণে প্রমাণ পাইলাম।

দু'টি লোকের একজন এবার একটু উঁচু গলায় বলল, কিন্তু সে চলিবে কী করিয়া তাহাও তো ভাবিয়া দেখিবেন ?

আপনারা কেন তাহার পক্ষ লইয়া কথা বলিতেছেন ?

ছাত্র বলেই বলছি, শরীফ সাহেব। না খেয়ে তো আর একটা ছেলে থাকতে পারে না।

তাই বলে পাকিস্তান হাইকমিশনে সে যাবে স্কলারশিপের টাকা আনতে, যে পাকিস্তানিরা, জানেন আপনারা, আপনাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে। ইহা কি আপনারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলিতেছে ? না, আপনারা বড় সহজে সব ভুলে যান— এবং আপনার স্বার্থই বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন।

একটু একটু করে ব্যাপারটা খানিক পরিষ্কার হয় আবদুল হাদীর কাছে। কোনো এক বাঙালি ছাত্র বছর খানেক আগে পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে এ-দেশে পড়াশোনা করতে এসেছিল, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর সে লন্ডনের এই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভুমিকা নেয়; সম্ভবত নিজের চলবার মতো কিছু খরচ-পত্রও সে অ্যাকশন কমিটি থেকে পেতে থাকে; লন্ডনের পাকিস্তানি হাইকমিশনের সমুখে বিক্ষোভ জানাতে গিয়েছিল কয়েকজন তরুণ, তারাই হঠাৎ লক্ষ করে যে ঐ ছাত্রটি হাইকমিশন ভবন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে, তাকে হঠাৎ যেন কেউ চিনতে না পারে সে জন্যে নিচু করে রেইন ক্যাপ পরে ছিল সে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন তরুণ তাকে পাকড়াও করে; তখন সে পকেট থেকে টাকা দেখিয়ে বলে যে— আর কোনো মতলবে নয়, বৃত্তির টাকা আনতে সে হাইকমিশনে এসেছিল।

শরীফ আলীর কণ্ঠ আবার উঁচু পর্দায় বেজে উঠল।

সহজ বুদ্ধিও কি আপনাদের নেই ? সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, চিন্তা করুন, উপলব্ধি করুন। পাকিস্তান হাইকমিশন হইতে বৃত্তির টাকা উঠাইতে হইলে লিখিত এই পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয় যে— বাংলাদেশ আন্দোলনের সহিত আমার কোনো সংস্রব নাই, আমি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে-কোনো পরিস্থিতিতে সক্রিয় হইব, আমি পাকিস্তান ও পাকিস্তানের আদর্শের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন দিব— ইহা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি। যে ব্যক্তি এইরূপ পত্রে স্বাক্ষর দিয়া টাকা লইতে পারে এবং অন্যদিকে আমাদের নিকট সংগ্রামের কথা উচ্চারণ করে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিব না তো কাহাকে বলিব ? আমার তো সন্দেহ হইতেছে, বৃত্তির টাকা নহে, সে তাহার বেতন তুলিতে গিয়াছিল ?

বেতন ?

হ্যাঁ, বেতন। আমাদিগের ভিতরকার ক্রিয়াকলাপ, পদক্ষেপ ইত্যাদি যে সে পাকিস্তান হাইকমিশনকে সরবরাহ করিতেছে না, কে বলিতে পারে ? উহারা বৃদ্ধাংগুষ্ঠ চুষিতেছে না— উহারা যে আমাদিগের মধ্যে হইতেই গুপ্তচর নিয়োগ করিবে ইহা তো স্বাভাবিক।

আপনি একটা ছোট ব্যাপারকে বড় করে দেখছেন, শরীফ সাহেব। আমরা তাকে অনেকদিন থেকে জানি। সে সে-রকম ছেলেই নয়। টাকার খুবই দরকার ছিল, পরীক্ষা সামনে, সেইজন্যেই টাকা তুলতে গিয়েছিল। এই বিদেশে তাকে চলতে তো হবে ?

আমরা চলছি না ?

সে ছাত্র মানুষ। চাকরি করে না। তাকে খেতে-পরতে হবে না ? আপনিই বলুন, তার চলে কী করে ?

আবার সেই এক কথা! শরীফ আলীর কণ্ঠ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। কী করিয়া চলিবে,

আমি কী প্রকারে বলিব ? আহার না জুটিলে না খাইয়া থাকিবে, বাসস্থানের ভাড়া দিতে না পারিলে পথে ঘুমাইবে, বাংলাদেশের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ইতিমধ্যেই গিয়াছে, না হয় আরো একজনের যাইবে।

এই শেষ কথাগুলো শুনে আবদুল হাদী বড় বিচলিত হয়ে পড়ল। তাকেও যদি একই কথা বলে দেয় শরীফ আলী ? দেশের মূল ধরে যেখানে টান পড়েছে সেখানে ক্ষুদ্র একটা মানুষের বেঁচে থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না— একথা সে উপলব্ধি করে; কিন্তু একই সঙ্গে এটাও তো আর কাছে সত্য যে— সে স্বাধীনতা চায় কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারবে না, সে স্বাধীনতা চায় কিন্তু পথে ঘুমোতে পারবে না, সে স্বাধীনতা চায় কিন্তু প্রাণ দিতে পারবে না।

সে কি স্বার্থপরের মতো ভাবছে ? নিজের প্রাণটাকেই বড় করে দেখছে ?

বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে তিলমাত্র দেরি হলো না তার। মনের ভেতরে নিজের কণ্ঠ সে স্পষ্ট শুনতে পেল। 'স্বার্থপর সবাই, আমি একা নই। কে না নিজের প্রাণটিকে ভালোবাসে ? কে তার বারান্দা ছেড়ে দিতে চায় ? কে দিয়েছে প্রাণ বাংলাদেশের জন্য ? কেউ দেয় নি। লক্ষ-লক্ষ যে মানুষগুলোর কথা বলা হয়, রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত যাদের গুলি করে মারা হয়েছে, গ্রামের সড়কে-সড়কে তাড়া করে যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা কি সংগ্রামে নেমে প্রাণ দিয়েছে ? ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসে যেমন লক্ষ-লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, তেমনি প্রাণ দিয়েছে পাকিস্তানিদের হাতে। দুয়ের ভেতরে কোনো তফাৎ নেই।'

শরীফ আলীর দিকে তাকিয়ে আবদুল হাদীর মনে হলো, ছ'হাজার মাইল দূরে বসে প্রাণ দেবার কথা কত সহজে বলা যায়! যেতে তুমি বাংলাদেশে, থাকতে তুমি পঁচিশে মার্চে ঢাকায়, তাহলে বুঝতে পারতে প্রাণের মায়া তোমারও আছে কিনা। দেখতাম তখন, শত্রুর মুখোমুখি, তার উদ্যত বন্দুকের সমুখে তুমি বুক পেতে দাঁড়াতে পারতে কিনা।

শরীফ আলীর সমুখে তার ইচ্ছে করে চিৎকার করে বলতে, আমি দেখেছি, আমি হত্যা দেখেছি, মৃত্যু দেখেছি, আগুন দেখেছি; এখন আমি বাঁচতে চাই, আমি বেঁচে থাকতে চাই, আমি তোমাদেরই মতো নির্বিঘ্ন দূরত্ব থেকে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে চাই।

শরীফ আলী হঠাৎ তাকে দেখতে পেল। চোখে চোখ পড়তেই আবদুল হাদীর মনের ভেতর একটু আগে উচ্চারিত কথাগুলো যেন আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ল। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল সে।

আরে, তুমি কখন এলে ? দেখিইনি।

এই তো। তুমি দেখছি ব্যস্ত।

হাঁ, ব্যস্ত একটু। একটা ঝামেলা। সংগ্রামে নামিয়া বহু মানুষকে চিনিতে পারিতেছি।

ভেতরটা কেঁপে উঠল আবদুল হাদীর।

শরীফ আলী লোক দুটোকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, তুমি অপেক্ষা করিবে তো ? আমি বিলম্ব করিব না।

সেই ছাত্রটিকে এখন ওরা কী করবে ? কী শাস্তি দেবে ? আবদুল হাদী ছোট্ট একটা উদ্বেগ বোধ করে। তার কি সহানুভূতি হচ্ছে ? নিজের ভেতরটা হাতড়ে ফেরে আবদুল হাদী। না, সে নিজে পারত না পাকিস্তান হাইকমিশনে গিয়ে বর্তমান সময়ে বৃত্তির টাকা তুলতে।

কক্ষনো না। বিশেষ করে ওরকম একটা পত্রে স্বাক্ষর তো সে দিতেই পারত না। ঢাকায় নিজের চোখে যা দেখে এসেছে, তার পক্ষে সম্ভব হতো না পাকিস্তানের সপক্ষে প্রাণ দেবার শপথ করা।

আচ্ছা, যদি ওরকম শপথ না করতে হতো, যদি স্বাক্ষর না দিতে হতো, যদি গেলেই ওরা বৃত্তির টাকা হাতে তুলে দিত, তাহলে সে কি হাত বাড়িয়ে নিতে পারত ? তার বড় ইচ্ছে হয়, তখনো টাকা না নিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে আসবার; কিন্তু সেটা যে নিছকই তার কল্পনা তাও মনে হলো সঙ্গে-সঙ্গে। নিজের কাছে নিজেই পরাজিত হয়ে মনে-মনে স্বীকার করল, হয়তো সে এরকম পরিস্থিতিতে টাকাটা নিত—স্বাক্ষর তো আর করতে হচ্ছে না।

সে বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, তার মনে হতে লাগল, মনটা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে সে সিদ্ধান্ত করল, থাকবার অনিশ্চয়তাই এর জন্যে দায়ী। তার থাকবার একটা ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেলেই সে আরো বিশ্বাসের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারবে— ছাত্রটি কী জঘন্য কাজ করেছে, বাংলাদেশের জন্যে প্রাণ দেবার দরকার আছে, এবং আমার প্রাণ না-হোক কারো-না-কারো প্রাণ তো যাবেই।

৫

বলি-বলি করেও কথাটা এখন পর্যন্ত বলতে পারল না আবদুল হাদী। বেলা তিনটে বেজে গেল, খাওয়াটা পর্যন্ত হলো না। অন্যান্য দিন শরীফ আলী নিজে থেকেই জিগ্যেস করে— খাওয়া হয়েছে কি না। আজ সে-ও ভারি ব্যস্ত। এর মধ্যে দু'বার বাইরে থেকে ঘুরে এসেছে শরীফ আলী আর প্রতিবারই বলেছে, তুমি কাগজ-টাগজ দ্যাখ না, আমি হাতের কাজগুলো সেরে নিই।

সময় যতই গড়িয়ে চলে আবদুল হাদীর ততই বেশি করে মনে হয়, এখানে সে কর্মহীন, অবাঞ্ছিত। এখানে প্রত্যেকেরই কাজ আছে, তারই নেই, যেন সকলেই পোশাক পরে আছে, সে কেবল উলঙ্গ।

একবার সে ভাবল কাজ নেই শরীফ আলীকে থাকবার জায়গার কথা বলে, বরং সে নিকোলার কাছে যাবে। গল্পে-গল্পে একটু বেশি রাত করে দিতে পারলেই নিকোলা নিশ্চয়ই তাকে বলবে রাতের মতো থেকে যেতে। একটা রাত কেটে যাবে। তারপর কাল আবার দেখা যাবে। কিংবা নিকোলাকেই সে বলবে, তার একটা আশ্রয় চাই-ই চাই। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে না-পারুক, নিকোলা হয়তো তার ফ্ল্যাটেই জায়গা করে দেবে।

সম্ভাবনাটা তাকে মাতিয়ে তুলল। মনে হলো, আরে, এতক্ষণ সে এই আলোটা দেখতে পায় নি কেন ? তার আরো মনে হলো, দেশের চেনা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে না ধরাই ভালো। তার চেয়ে নতুন মানুষের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করাই সুন্দর নয় কি ?

নতুন জীবন ?

কথাটা হঠাৎ তার মাথায় এল কেন ? নিকোলাকে নিয়ে কোনো নতুন জীবন সম্ভব ? তাহলে, মনসুর সাহেবের কথা মতো তারও সেই দশা হলো না-কি— যে, প্রথম মেমের সঙ্গেই প্রেম।

নিকোলাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে ? ভালোবেসে থাকলে বলতে পারবে তাকে—

'ভালোবাসি' ?

সম্ভবত দুপুরে খাওয়া হয় নি বলে খিদের যন্ত্রণা থেকে পালাবার জন্যে সে কল্পনায় মেতে উঠল এখন। দেখতে পেল নিকোলার সঙ্গে তার সংসার। দেখল, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল— ঢাকায় সে আর নিকোলা, বন্ধুদের চোখে ঈর্ষার জ্বালা ধরিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে আছে, আবার গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে— তার গাড়ি ? তবু কল্পনায় সে শাদা ঝকঝকে গাড়ি দেখতে পেল— সে দেখল, নিকোলা সবুজ শাড়ি পরেছে, নিকোলা তার সঙ্গে পাবনায় গেছে, গ্রামের সমস্ত লোক ভিড় করে এসেছে মেম দেখতে; সে দেখতে পেল, ঢাকায় সুন্দর একটা বাড়িতে সে আর নিকোলা, সারা দিন কাজ করে এসে— তার বড় একটা সরকারি চাকরি হয়েছে— নিকোলার সঙ্গে বাগানে বসে চা খাচ্ছে। নিকোলা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। যেন, তার জীবনের সমস্ত কিছুর সোনার চাবি হাতে নিয়ে নিকোলা তাকে ডাকছে। আজ যদি সে না যায় নটিং হিল গেটে, তাহলে সারা জীবন তাকে সিদ্ধেশ্বরীর টিনের ঘরে, কলেজের বাংলা অধ্যাপক থেকে গিয়ে অনুতাপ করতে হবে।

একটা ঘোরের ভেতরে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় বাইরে থেকে তৃতীয়বারের মতো ফিরে এল শরীফ আলী। এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পাশের একজনকে অনুনয় করল, ভাই, একটু চা আনাও না, ভাই। তারপর আবদুল হাদীর দিকে ফিরে বলল, তুমি খাবে তো ?— দু'কাপ আনিও কেমন ?— তুমি কি সেই সকাল থেকে এখানেই বসে আছ। দুঃখিত, আজ বড় ধকল গিয়াছে। তবে, একটি ব্যাপারে অচিন্তনীয় সাফল্যও আজ আসিয়াছে। ইহার গভীর প্রভাব আগামী দুই চারি দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহে লক্ষ করিতে পারিব।

পাশ থেকে একজন ইশারায় জানতে চায়, সেই বিষয়ে কি ? প্রশ্নকর্তা যে আবদুল হাদীর উপস্থিতির জন্যেই সাবধানতা অবলম্বন করে, বিষয়টি গোপন রাখে, তা অনুভব করে সে মিইয়ে গেল। একই সঙ্গে তার একটু ঈর্ষাও হলো ঘরের সবার জন্যে যে, তারা জানে, তারা যা জানে আবদুল হাদী তা জানে না। তার ক্রোধও হলো— সে কি বাঙালি নয় ? সে কি ঐ ছাত্রটির মতো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সংগ্রামের সঙ্গে যে তার কাছে বিষয়টি গোপন রাখা হলো ?

শরীফ আলী সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ, সেই বিষয়টিই বটে। বোধহয় সে নিজেও অনুভব করতে পেরেছিল যে, আবদুল হাদীর উপস্থিতি ঘরের আর সবাই আপন বলে নিতে পারে নি এই মুহূর্তে। সেটা কাটিয়ে দেবার জন্যেই সে এখন বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে উঠল আবদুল হাদীর দিকে।

কী ব্যাপার, তোমার কিছু হয়েছে না-কি ? মুখখানা কেমন শুকনো দেখছি!

জোর করে হাসি ফুটিয়ে আবদুল হাদী টেনে বলল, নাহ্। তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করল, তোমার সময় থাকলে একটা কথা বলবার ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমুখে ঝুঁকে পড়ে কান পেতে ধরল শরীফ আলী। সব সময় তাকে শত জনের কথা শুনতে হয়, পরামর্শ করতে হয়, ভঙ্গিটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। তার বক্তব্য শোনবার জন্যে এতখানি গুরুত্ব দেওয়াতে আবদুল হাদী কিছু বিব্রতই হয়ে পড়ল।

বলল, কথাটা খুবই সামান্য।

হাত খালি ?

তাতো খালিই। আজ থেকে বাহাউদ্দিনের ওখানে আমার আর থাকা হচ্ছে না।

কেন ? কেন ? দিব্যি তো ছিলে।

দিব্যি মানে, ছিলাম আর কী। রাতে কেবল শুতাম, এই পর্যন্ত। তা মামা, মানে ওর আব্বা আজ লন্ডনে আসছেন। বোধহয় এতক্ষণ এসেই গেছেন। আমার আর জায়গা হচ্ছে না।

হু। শরীফ আলী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

প্রধানত সেই নিঃস্তব্ধতা দূর করে প্রসঙ্গটা চাঙ্গা রাখবার জন্যেই আবদুল হাদী বলল, বাহাউদ্দিনের বাবা আসছেন জিনিভা থেকে, একেবারে হঠাৎ।

কেন, জিনিভা থেকে কেন ? অর্থাৎ শরীফ আলী জানতে চাইছিল বাঙালি কারো তো দেশ থেকে, মানে, ঢাকা থেকেই আসবার কথা। জিনিভা উল্লেখে কীসের একটা গন্ধ পেয়ে চোখ সরু করে প্রশ্নটা সে করল।

সে কী করে বলব! বড় সরকারি কর্মকর্তা। পাকিস্তান গভমেন্টের ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি...

কে ? বাহাউদ্দিন, আমাদের বাহাউদ্দিনের বাবা ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি ? চেয়ারে খাড়া হয়ে বসল শরীফ আলী। জানতাম নাতো। কী নাম ?

সালাহউদ্দিন মুস্তাফা।

শিস দিয়ে উঠল শরীফ আলী। প্রতিধ্বনি করল— সালাহউদ্দিন মুস্তাফা। ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি।

আমিও জানতাম না। আজই শুনলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল শরীফ আলী। মুহূর্তে তার চোখের সমুখ থেকে যেন অন্তর্নির্হিত হয়ে গেল আবদুল হাদী। সে একের পর এক টেলিফোন করতে লাগল চতুর্দিকে— শুনেছ, খবর শুনেছ, পাকিস্তানের ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি মি. মুস্তাফা আজ লন্ডনে কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছেন!... হাঁ, হাঁ, বাঙালি... জিনিভা থেকে... কতদিন থাকবেন জানি না... লোক লাগিয়েছি... লোক আমি ইতিমধ্যেই লাগাইয়া দিয়াছি— হাঁ, হাঁ... তাহার পুত্র লন্ডনে বাস করে।...

হতভম্ব হয়ে গেল আবদুল হাদী। এ খবরটা যে এতখানি মূল্যবান, তার ধারণাই ছিল না। কেন মূল্যবান, কেন এই উত্তেজনা, তাও ভালো করে বুঝতে পারল না সে। ঐ লোক লাগাবার কথাটাও বড় রহস্যময় মনে হলো তার কাছে। আর কেবলি তার আশঙ্কা বেড়ে উঠতে লাগল যে, তার নিজের ব্যাপারটা, থাকবার জায়গার সমস্যাটা বুঝি একেবারেই তলিয়ে গেল। ক্ষীণভাবে সে দু'একবার বলতে চেষ্টা করল। শরীফ আলীর অবিরাম ফোন করে যাবার ফাঁকে-ফাঁকে, মরিয়া হয়ে, যে— 'আমার কিন্তু আজ রাতেই জায়গা নেই'; 'বিকেলেই আমার সুটকেস নিয়ে আসবার কথা'; 'কোথাও কোনো মেঝে হলেই আমার চলে যাবে'— কিন্তু সেসব কোনো দাগই কাটল না। টেলিফোনে অবিরাম কথা বলে চলল শরীফ আলী।

হাঁ স্যার, সংবাদ সঠিক।... আজ আসিয়াছেন।... সংবাদ পাইবা মাত্র আমি ব্যবস্থা লইয়াছি।... আপনাকে পরে জানাইব।

ব্যবস্থা নিয়েছি মানে ? বাঙালি হয়ে এখনো পাকিস্তানের চাকরি করছেন— এ কারণে মি. মুস্তফাকে প্রাণে মেরে ফেলবে নাকি এরা ?

চুলোয় যাকগে। তার কীসের মাথা ব্যথা ? এতে তো তার সমস্যার সমাধান হবে না। আরেকবার টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতেই আবদুল হাদী হাত চেপে ধরল শরীফ আলীর।

শরীফ, আমার কিন্তু আজ রাতে সত্যিই থাকবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবদুল হাদীর হাতে চাপড় দিয়ে সে আশ্বাস দিল, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? তোমার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। আরে, লন্ডনে আছ তুমি। জঙ্গলে পথ হারাও নি। আমার সঙ্গে চল তো।

আবদুল হাদী ভাবল তাকে নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করতেই বুঝি শরীফ আলী বেরুল। কিন্তু না, তাকে নিয়ে সে বসল এক পানশালায়।

আগে গলা ভিজিয়ে নেয়া যাক। কী খাবে ?

জানই তো, আমি খাই না। সিগারেট পর্যন্ত না।

বহু লোক আছে সিগারেট খায় না কিন্তু সুরা পান করে। পান করিলে দেহে স্ফূর্তি আসিবে, মন নির্মল হইবে দুশ্চিন্তার গোড়ায় ঝাঁটা পড়িবে। বল, কী পান করিবে ?

শেষ পর্যন্ত একটা শেরি ধরিয়ে দিল তাকে।

ইহা প্রধানত রমণী ও সাহিত্যিকদের প্রিয় পানীয়। কিছুটা মিষ্ট। প্রথম আন্দাজে ভালো লাগিবে। ভড়কাইবে না। উল্লাস, উল্লাস।

তার অনুকরণে আবদুল হাদীও 'উল্লাস' বলে জীবনে এই প্রথম সুরায় ঠোঁট ছোঁয়াল।

শরীফ আলী বলল, যে শীত পড়িয়াছে, সুরা পান না করিলে গরম বোধ করিবে না।

বিচাম পাউডারেও তো শরীর গরম রাখে।

হো-হো করে হেসে উঠল শরীফ আলী। নিশ্চয়ই কেমিস্টের দোকানে বিজ্ঞাপন দেখেছ ?

না, বাহাউদ্দিন বলেছে।

ডার্টি বাহাউদ্দিন।

ডার্টি কেন ?

আমরা তো ঐ বলেই ডাকি। আমাদের কারো সঙ্গে বনে না, আমাদের কারো সঙ্গে তার ওঠা-বসা নেই। সে হয় স্বার্থপর, উন্নাসিক এবং বাঙালিবিদ্বেষী।

তুমি আগে বল নি তো!

বলি নি, তোমার আত্মীয়, তাছাড়া তোমায় থাকতে দিচ্ছে। এখন দেখছি ভালোই হয়েছে।

কী ভালো ?

আমরা সংবাদটি পাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মি. মুস্তাফার আসিবার সংবাদ গোপন রাখাই বাহাউদ্দিনের উদ্দেশ্য ছিল। তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।

কী কাজ ?

দুটো খবর নেবে। কতদিন উনি থাকবেন, আর কী কারণে হঠাৎ এসেছেন। অবশ্য,

আমরাও গিয়ে উপস্থিত হতে পারি, সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি। গেলে মজাও হয়, যদি পাকিস্তান হাইকমিশনের কেউ হাজির থাকে। আমাদের দেখলেই সন্দেহ হবে— হয়তো মি. মুস্তাফা গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, আমরা কিচ্ছুটি না বলে নীরবে এমন ভাব করতে পারি যে সেটাই প্রমাণ হয়ে যায়; তাহলেই এক কাণ্ড হয়ে যায়, বুঝলে না ? কিন্তু আমরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন কবির। সাঁকো নাড়া দিব না। তোমার মারফৎ সংবাদ জানিয়া লইব, তারপর যথবিহিত করিব।

কী করবে ? কী করতে চাও তোমরা ? আবদুল হাদীর কণ্ঠে মি. মুস্তাফার জন্যে উদ্বেগ ফুটে বেরুল।

বুঝতে পেরে শরীর নাচিয়ে হেসে উঠল শরীফ আলী। বলল, আরে না, না, ভয়ের কিছু নেই। আমরা চেষ্টা করব পাকিস্তান থেকে তাকে ভাগিয়ে আনতে। বুঝতে পারছ না, এতবড় একজন সিভিল সার্ভেন্ট, তাঁকে যদি ডিফেক্ট করানো যায়, তাহলে আমাদের কত বড় একটা সাকসেস ? আমি অবশ্য একটা ভুল করে ফেলেছি।

কী ?

তোমার কাছে খবরটা পেয়েই চারদিকে জানানোটা ঠিক হয় নি।

আমিও তাই ভাবছিলাম— তুমি যেভাবে ছড়ালে।

আবদুল হাদী কিন্তু শরীফ আলীর মনের কথাটা আদৌ বুঝতে পারে নি। সেটা এই যে, খবরটা না ছড়িয়ে নিজের কাছেই জমা রেখে শরীফ আলী যদি মি. মুস্তাফাকে আনুগত্য বদলে রাজি করতে পারত, তাহলে কৃতিত্বটা সে পেত পুরো মাত্রায়। এখন কে কোথায় আগেই গিয়ে হাত লাগায় কে জানে!

চুক-চুক শব্দ করে কিছুক্ষণ মাথা নাড়াল শরীফ আলী। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, তোমার থাকবার জায়গা। চল দেখি। নটিং হিল গেটে আমার চেনা এক দেশী রেস্তোরাঁ আছে, তার ওপর তলায় একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে মনে হয়।

সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে শরীফ আলীর আরেক পরিচয় সে পেল— চমৎকার সিলেটি বলতে পারে। সিলেটিতে রেস্তোরাঁর মালিককে সে যা বলল তার থেকে এটুকু আবদুল হাদী বুঝতে পারল যে তার সম্পর্কে বাড়িয়ে-বানিয়ে অনেক কিছু বলা হলো। যেমন, সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, দেশ থেকে সদ্য এসেছে, বিশেষ একটা কাজ আছে তার এখানে, কিছুদিন থাকতে হবে।

দোকানের মালিক কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখল ঘন-ঘন, সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল, এমনকি এক্ষুণি কিছু খেয়ে নেবার জন্যে ভারি অনুরোধ করতে লাগল সে। বলতে লাগল, আপনাকে তো এদিক মাড়াতেই দেখি না, এসেছেন যখন দাওয়াত নিতেই হবে।

খিদেটা পাক দিয়ে উঠল আবদুল হাদীর পেটের ভেতরে। এই কিছুক্ষণ আগে শেরী খেয়েছে, তারপর সারা দিনের না খাওয়ার মাথায় এখানে ঢুকেই রান্নার ঘ্রাণ পেয়েছে— সে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, শরীফ আলী যেন দাওয়াতটা কবুল করে।

কবুল করল শরীফ আলী।

রেস্তোরাঁর মালিক চোখের আড়াল হতেই শরীফ আলী বলল, আজ রাত থেকেই থাকতে পারবে। এরা আমাদের জন্যে যা করছে, তার তুলনা হয় না। বলে দিলাম— খাবার চিন্তাও

তোমাকে করতে হবে না। এরাই দেখো তোমাকে খাবার জন্যেও ডাকবে।

আবদুল হাদী বলল, সে না হয় হলো; তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন?

বলতে হয়, বলতে হয়।

তাই বলে বলবে আমি মুক্তিযোদ্ধা?

তখন গলা খাটো করে শরীফ আলী তিরস্কার করে উঠল, ও কথা না বলিলে আশ্রয় মিলিত না। কেন সে তোমাকে আশ্রয় দিবে? তোমার ব্যবস্থা হইয়াছে, চুপ করিয়া থাক, জিহ্বা দোলাইও না।

হঠাৎ ভীষণ গ্লানি বোধ হলো আবদুল হাদীর।

ঠাণ্ডা দুটো কোকোকোলা এনে মালিক যখন সমুখে রাখল, তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল সে। সে মুখে বাংলার গ্রাম সে প্রত্যক্ষ করল। সে বলল, শরীফ, ড্রিংক করে এখন মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে সব।

৬

অথচ সে নিজেই তো এই সেদিন একজন মুক্তিযোদ্ধার অভিনয় করেছিল এবং এই লন্ডনেই। তখন তো তার গ্লানি বোধ হয় নি? এমন বমি হয়ে সব বেরিয়ে যায় নি? সে বরং নিকোলার ঘরে নীল কুশনের ওপর হেলান দিয়ে কল্পনায় দেখেছিল নিজেকে— যুদ্ধ শেষ, দেশ স্বাধীন, লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে সে, খাকি-সবুজ বুশ-শার্ট ট্রাউজার পরে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে সে, মাথায় তার চেগুয়েভারার মতো কালি-নীল টুপি।

ঐ টুপিটা সে তাৎক্ষণিক যোগ করেছিল নিকোলার গুয়েভারার পোস্টার দেখে।

তার মনে হচ্ছিল সে তার বাহুবলে দেশ স্বাধীন করে ফিরছে।

নিকোলা তাকে তার জন্মদিনে ডেকেছিল। বাহাউদ্দিনের ঘরে লন্ডন নগরীর মানচিত্র-বই দেখে সে নোট করে নিয়েছিল কোন ট্রেন ধরে কোন স্টেশনে নামতে হবে, স্টেশনের কোন দরোজা দিয়ে বেরিয়ে কোন হাতে মোড় নিয়ে কোন কোন সড়ক ঘুরে পৌঁছুতে হবে ঠিকানায়।

এমনই কপাল, আসবার সময় সেই নোটখানাই ভুলে ফেলে এসেছিল সে। এদিকে, স্টেশন থেকে বেরুতেই বৃষ্টি নেমেছিল অঝোর ধারায়। ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিল আবদুল হাদী। তার কেবলি সংকোচ হচ্ছিল, ভূতের মতো এই চেহারা নিয়ে হাজির হবে কী করে? ইতস্তত করতে করতেও কীসের এক প্রবল টানে ব্যাকুল হয়ে বৃষ্টিতে ত্রস্ত পথিকদের জিগ্যেস করছিল, এই ঠিকানায় যাব কী করে। এক আফ্রিকান ছোকরা তো তার মূর্তি দেখে পেটে ঘুসি মেরে বলেছিল, মানুষ, তুমি ভিজে বালিশ!

অনেক কষ্ট হয়েছিল সে রাতে ঠিকানা খুঁজে বের করতে। নিকোলা তাকে দেখেই বলে উঠেছিল, তুমি অবশ্যই তোমার মনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছ। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত স্টেশনে তোমার অপেক্ষা করা কর্তব্য ছিল।

হাঁ, সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে।

শীঘ্র আইস।

নিকোলা তাকে সোজা নিয়ে গিয়েছিল নিজের ঘরে। যাবার সময় টের পেয়েছিল সে বসবার ঘরে অতিথিদের উপস্থিতি। বন্ধ দরোজার ওপার থেকে ভেসে আসছিল সপ্রাণ কলরব। আর তুলনায় করিডর কী নির্জন গা ছমছম করা মনে হচ্ছিল তার।

নিকোলা তাকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে বিজলি-হিটার চালিয়ে দিয়ে বলেছিল, পোশাক ছাড়িয়া শুকাইয়া লও। তোয়ালে রহিল, মাথা ভালো করিয়া মুছিবে। তোমাকে একটা নির্জলা হুইস্কি দিব কি ? চাঙ্গা হইয়া উঠিবে।

আমি পান করি না।

হাঁ, ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যখন প্রস্তুত হইবে, পাশের ঘরে আসিবে।

দরোজা বন্ধ করে নিকোলা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল আবদুল হাদী, স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল তার। এ কি সম্ভব, সে এখন একজন অবিবাহিতা যুবতী শ্বেতাঙ্গিনীর শোবার ঘরে, তারই অন্তরঙ্গ শরীর ছোঁয়া তোয়ালে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ?

ঘরে কেউ নেই, দরোজা বন্ধ, তবু তার শরীর শিউরে উঠছিল ট্রাউজার খুলতে গিয়ে। পা টিপেটিপে এগিয়ে গিয়ে দরোজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল সে। তারপর বোতাম খুলতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছিল স্মৃতি, ঘ্রাণ কিংবা উত্তাপ তাকে স্ফীত করে তুলেছে। বিছানার পাশে টুলের ওপর নিকোলার ছবি— উজ্জ্বল রোদের ভেতরে ঠোঁট বিযুক্ত করে সে হাসছে। সেই ছবির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে আবদুল হাদী, লন্ডনে আসবার পর এই প্রথম, নিজেকে ক্ষিপ্ত দ্রুত হাতে বইয়ে দিয়েছিল।

কাপড় শুকিয়ে, মাথা মুছে, ঘরের মেঝেতে কোথাও ফোঁটা পড়েছে কি না আরো একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে যখন সে পাশের ঘরে এসেছিল তখন তার মনে হচ্ছিল— বড় সুখী, বড় সমর্থ সে এবং পৃথিবীতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রঙিন ফেটি বাঁধা এক তরুণ বলে উঠেছিল, হাঁ, ইনিই তবে তিনি!

তার মানে ?

বোঝা গেল তরুণটির পরের কথাতেই।

ইনিই সেই বীর যিনি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করিতেছেন ?

টিম, তুমি কি তোমার অলস নিতম্বকে ঢাকিবার নিমিত্তই এ-রূপ আক্রমণ করিতেছ ?

আমি আদপেই আক্রমণ করিতেছি না। আমি একটি তথ্যের সমর্থন চাহিতেছি মাত্র। তুমিই বলিয়াছিলে নিকি, তুমি এমন একজনকে আজ উপস্থিত করিবে যাহার জীবনবোধ পাশ্চাত্যের আমাদিগের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবসম্পৃক্ত। আমি অবশ্য প্রাচ্যদেশীয়দের সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করি।

টিমের কথায় সায় দিয়ে পল কোলিয়ার বলল, আমারও ভিন্নমত রহিয়াছে। তবে এ কথা বলিব, তোমার এ-বছরের জন্মতিথি পাটল বর্ণের স্পর্শে স্মরণীয় হইয়া রহিল।

তোমরা চুপ করিবে ? ধমক দিয়ে উঠেছিল নিকোলা কিন্তু হাসতে হাসতে, কারণ টিম আর পল দুজনেই তাদের উক্তিগুলো করছিল অত্যন্ত লঘুভাবে। যেন গোটা ব্যাপারটাই খুব হাসির একটা কিছু।

আবদুল হাদী কিন্তু ভারি মুষড়ে পড়েছিল শুরুতেই এ ধরনের কথা শুনে। কিছুক্ষণ আগে যে সুখের আলো তার শরীরে অনুভব করছিল সেটা কে যেন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গেল। সারাক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল, এক কোণে; মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি সৃষ্টি করে রাখল, যেন নিকোলা মনে না করে তার জন্মদিনের উৎসবে সে অংশ নিচ্ছে না। সারাক্ষণ তার মনে পড়তে লাগল দেশের কথা, বাড়ির কথা, কানে বাজতে লাগল গুলির শব্দ; সাইরেনের শিস— মাঝে-মাঝেই তার মনে হতে থাকল যে, সে সত্যি-সত্যি রক্ত মাংসের এদের ভেতরে বসে নেই, ছবিঘরে একটা ইংরেজি ছবি দেখছে সে।

সে যদি সত্যি-সত্যি যোদ্ধা হতো, গেরিলা হতো, বন্দুক হাতে নিয়ে থাকত, তাহলে মুখের ওপর জবাব দিতে পারত সে টিমকে, পলকে। তাহলে এরাই তার ছবি পোস্টার করে টানিয়ে রাখত ঘরের দেয়ালে— যেমন গুয়েভারার রেখেছে। কী সম্পর্ক এদের গুয়েভারার সঙ্গে ? তারই বা কী সম্পর্ক এদের সঙ্গে ? এরা পথে গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে ? সে দেখেছে। এরা মানুষকে প্রাণের ভয়ে পালাতে দেখেছে ? সে দেখেছে। এরা জনপদ পুড়ে যেতে দেখেছে ? সে দেখেছে। দেখেছে এরা অত্যাচার, দেখেছে এরা ত্রাস, দেখেছে এরা হানাদার ? দেখেছে ? দেখেছে ? দেখেছে ? সে দেখেছে।

খাবার সময়, ভিড়ের ভেতরে নিকোলা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, তুমি নীরব রহিয়াছ ? তোমার কি ভালো লাগিতেছে না ?

হ্যাঁ, আমি ঠিক রহিয়াছি।

একটু চুপ করে থেকে নিকোলা স্নিগ্ধ গলায় বলল, উহাদের কথায় কিছু মনে কর নাই তো ?

না, না, মনে করিব কী ?

তুমি সত্যই কষ্ট পাইয়াছ।

আমাদিগের ওপর দিয়া যাহা গিয়াছে, তাহার পর কোনো কষ্টই আর কষ্ট নহে।

হ্যাঁ, বল। তোমাকে এইসব বলিতে হইবে। ইহারা কিছুই জানে না, ইহাদের কোনো ধারণা নাই। ইহারা পোশাকের বিপ্লব সাধন করিয়া মনে করে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হইল। সৌখিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া মনে করে দারিদ্র্যের সহিত একাত্ম হইলাম। অপরের শূন্য ভবনে জোরপূর্বক বাস করাকেই ইহারা গেরিলা যুদ্ধের চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করে। তোমার কাহিনী আজই শুনাইবে, আমরা শুনিব; তোমাদের যুদ্ধের কথা বলিবে, আমরা শ্রবণ করিব। তোমাকে বলিতেই হইবে।

খাবার পর সবাই কফি নিয়ে গোল হয়ে বসে, সত্যি-সত্যি নিকোলা ঘোষণা করল, বাংলাদেশ হইতে আগত আমার এই বন্ধুর নিকটে এবার কিছু শোনা যাউক।

আমি কী বলিব ? আমার কিছু বলিবার নাই।

অবশ্যই তোমার বলিবার আছে। আমরা পত্রিকায় তোমার দেশের কথা পড়িয়াছি। তোমাদের নেতা রহমানের নাম শুনিয়াছি। গণহত্যার মর্মন্তুদ সংবাদ সকল পাঠ করিয়াছি। তোমরা যুদ্ধ করিতেছ। বল কী, তোমার বলিবার কিছু নাই ? সকলে মনোযোগ দাও, আমার বন্ধু কিছু বলিবে।

প্রায় জনাপনেরো মানুষে ঘর ঠাসাঠাসি। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের ভেতরে কথা বলছে, হাসছে, এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে— নিকোলার প্রস্তাবে তারা বরং গজগজ

করে উঠল।

কে একজন দূর থেকে বলল, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা অল্প বিস্তর সকলেই অবগত আছি। সেখানকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রহিয়াছে। বক্তৃতার আবশ্যক কী?

নিকোলার যেন জেদ চেপে গিয়েছিল।

আবশ্যকতা আছে। সে বলিবে।

তখন পল বলেছিল, মি. কী যেন উহার নাম, যখন এত অনুরোধেও শুরু করিতেছেন না, তখন আমিই না হয় একটি প্রশ্ন করি, তিনি তাহার উত্তর দিউন। তাহার দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলিতেছে, তিনি এখানে বসিয়া কী করিতেছেন? আমাদিগের নিকট তাহার দেশের সংগ্রামের কথা বলিয়া কী লাভ? তিনি দেশে গিয়া সংগ্রাম করুন।

মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল আবদুল হাদীর।

নিকোলা এবার বাস্তবিকই গম্ভীর গলায় শাসন করেছিল, পল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ। আমি জানিতে চাহি কে তোমাকে এত সুরা পান করাইয়াছে?

সঙ্গে সঙ্গে পলের উত্তর হয়েছিল, নিকি, নেশা করিয়াছ তুমি। তৃতীয় বিশ্ব হইতে আমদানিকৃত এই নেশাটি বেশ কড়া বলিয়াই মনে হইতেছে।

হো-হো করে হেসে উঠেছিল সবাই। নিকোলা তখন আবদুল হাদীর হাত দু'হাতের ভেতর নিয়ে বলেছিল, আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত, আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম।

হাতের সেই বিদ্যুৎস্পর্শ, অনেকক্ষণ সেই হাতের ভেতরে হাত রাখা— ঠিক তখন আবদুল হাদীর কল্পনা জ্বলে উঠেছিল, সে কল্পনা নিকোলাকে নিয়ে নয়, তার নিজেকে নিয়ে। নিজেকে সে সেই মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

নিকোলার হাতের ভেতরে হাত রেখে তার নিজেকে তখন সহসা বড় জ্যোতির্ময় বলে বোধ হয়েছিল। তার ইচ্ছে হয়েছিল সবার উদ্দেশে চিৎকার করে বলে, কিন্তু কেবল নিকোলাকেই সে ফিসফিস করে বলতে পেরেছিল, তুমি দুঃখিত হইও না, নিকি। আমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়াছি, আমি মৃত্যু দেখিয়াছি; কাহারো পরিহাস আমাকে কাবু করিতে পারিবে না। যে হাত তুমি স্পর্শ করিয়া আছ, আমি সেই হাতে বন্দুক ধরিয়াছি। দেয়ালে যে যোদ্ধার চিত্র রাখিয়াছ, সেই যোদ্ধা আমার ভাই। আমি কোনো বিশেষ কার্যভার লইয়া এদেশে আসিয়াছি। তুমি নিশ্চয়ই জান বর্তমানকালে যুদ্ধের সাফল্য কেবল রণক্ষেত্রের হতাহতের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। গোপনীয়তার খাতিরেই প্রকাশ্যে উত্তর দিতে পারিলাম না যে, কেন আমি রণক্ষেত্র হইতে দূরে আছি। পরে তোমাকে বলিব, সব বলিব। না, হাত সরাইয়া লইও না। বন্দুক ধরিতে ধরিতে মানুষের স্পর্শ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি স্মরণ করাইয়া দিলে।

৭

সুটকেস আনতে বাহাউদ্দিনের ওখানে আজ আর যেতে ইচ্ছে করল না আবদুল হাদীর। খাবার আগেই এক ঝলক বমি হয়ে গেছে, শুধু নোনা পানি উঠেছে; এখন পর্যন্ত মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে তার। শুয়ে পড়তে পারলে ভালো লাগত। এমন একটা ইচ্ছেও তার মনের ভেতরে অস্পষ্ট খেলা করছিল যে, এই নটিং হিল গেটেই যখন নিকোলা থাকে—

রেস্তোরাঁ থেকে খুব কি দূরে হবে ? একবার দেখা করলে হয়।

এত বড় লন্ডন শহরে আর কোথাও নয়, নটিং হিল গেটেই যে শরীফ আলী তাকে থাকবার জায়গা খুঁজে দিয়েছে এটাও আবদুল হাদীর কাছে দৈবের মায়াবী হাতের আরেকটি লেখা বলে ধারণা হয়। তার বিশ্বাস হয় যে নিকোলার সঙ্গেই তার ভবিষ্যতের কোনো গূঢ় বন্ধন নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

কিন্তু শরীফ আলী নাছোড়বান্দা। খাওয়া শেষে রেস্তোরাঁর ওপর তলায় থাকবার ঘরটা এক পলক দেখিয়ে এনেই আবদুল হাদীকে বলল, এক ঘরে তিনজন, খুব একটা অসুবিধে হবে না। তোমাকে ভালো বিছানাটাই দেবে, বলে দিয়েছি। তুমি যাও, সুটকেস নিয়ে এস। যাও, যাও, বেরিয়ে পড়। নইলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

রাত তো হয়েই গেছে। গলায় ক্লেশ সৃষ্টি করে আবদুল হাদী ক্ষীণ স্বরে উচ্চারণ করল, কাল খুব ভোরে না হয় সুটকেসটা...

না! না, ভোরে আবার কেন ? বুঝতে পারছ না, মি. মুস্তাফার খবরটা কত জরুরি ? ভালো করে জেনে আসবে, কেন এসেছেন, কী বৃত্তান্ত। এটা আমাদের আজ রাতের মিশন। যত রাতই হোক, তুমি ফোন করে আমাকে সব জানাবে। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষা করিব।

অগত্যা বেরুতেই হলো। সারাটা পথ কেবলি তার মনে হতে লাগল, মি. মুস্তাফাকে বড় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে শরীফ আলী। তিনি আনুগত্য বদল করলেই কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এগিয়ে আসবে ? একটা রাত অপেক্ষা করা যেত না ? কী হয়, এখন যদি সে ফিরে যায়, ফিরে হয় শুয়ে থাকে কিংবা নিকোলার ওখানে যায়— কী এমন ক্ষতি হবে তাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ?

মানুষ, তোমার আগুন আছে ?

চমকে উঠল আবদুল হাদী। প্রশ্নটা বুঝতে পারল না। কীসের আগুনের কথা জানতে চাইছে এই তরুণ আফ্রিকান ? লক্ষ করে দেখল, ট্রেনের কামরা কখন ফাঁকা হয়ে গেছে; এদিকটায় সে আর এই আফ্রিকান ছাড়া আর কেউ নেই।

তোমার আগুন আছে ? ম্যাজিক দেখাবার মতো হাতের ভেতর থেকে সিগারেট বের করে আনল আফ্রিকানটি।

আবদুল হাদী মাথা ঝাঁকাল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। হঠাৎ তাকে আবার চমকে উঠতে হলো একটা ধ্বনি প্রবাহ শুনে। শূন্যগর্ভ বলের মতো ধ্বনির অংশগুলো একে অপরের গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে গড়িয়ে চলেছে। আফ্রিকানটি হাসছে।

চোখে চোখ পড়তেই সে নির্মল উচ্চ কণ্ঠে বলল, মানুষ, ইহা আশ্চর্য। যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আগুন নাই। বিশ্ব কি ধূমপান ত্যাগ করিল ?

তার কৃত্রিম খেদ শুনে আবদুল হাদী অস্পষ্ট একটু হাসল। তরুণটির মতো হৃদয়ে তার এখন রোদ নেই বলে সে একই সঙ্গে এক প্রকার দূরত্ব এবং ঈর্ষা বোধ করতে লাগল।

তরুণটি প্রশ্ন করল, মানুষ, আমরা ধূমপান না করিতে পারি, কথা কহিতে পারি তো ? তুমি ভারতীয় ?

মাথা নাড়াল আবদুল হাদী।

পাকিস্তানি?

কোন দিকে মাথা নাড়বে স্থির করতে পারল না সে। নিজেকে পাকিস্তানি বলে স্বীকার করতে পারে না সে, আবার অস্বীকার করবার মতো জোর পায় না। কিন্তু একটা কিছু উত্তর দেওয়া দরকার। তরুণটি উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে, উত্তরের অপেক্ষা করছে।

তখন আবদুল হাদী হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে না-সূচক মাথা নাড়ল।

তরুণটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মানুষ, আমি তোমার বন্ধু। এখানে পাকিস্তানিরা পিটুনি খাইয়াছে বলিয়া পরিচয় দিতে ইতস্তত করে। মানুষ, আমি তোমাকে আঘাত করিব না। প্রশস্ত দু'টি বাহু সে সমুখে মেলে ধরল— লক্ষ কর, এই হাত আঘাত করিবার জন্য নহে, আলিঙ্গন করিবার জন্য।

আবদুল হাদী নিঃশব্দে হাসল তার উত্তরে। কিন্তু তার মনের ভেতরে ঘুরতে লাগল ঐ কথাটি যে, পাকিস্তানি সে নয়, বলতে ইতস্তত করল কেন? কই, তার মনের ভেতরে কোথাও তো পাকিস্তানের জন্যে এতটুকু আত্মীয়তা নেই, তবু কেন কঠিন হলো বলা? বাংলাদেশের জন্যে সে কিছু করতে না পারে, সে যুদ্ধে না গিয়ে থাকতে পারে, কোনোভাবেই সক্রিয় না হয়ে থাকতে পারে, সবই হতে পারে— কিন্তু সে তো বাঙালি? সে তো বাংলাদেশে বিশ্বাসী? সে তো চায় বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। পাকিস্তানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু কেন অস্বীকার করতে ইতস্তত করল সে?

যেন প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই সে হঠাৎ এবং এই প্রথমবারের মতো, অনুভব করে উঠল তার এই যাত্রার গুরুত্ব। মি. মুস্তাফা পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তিনি বাঙালি, তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসতে পারলে সংগ্রাম আরো খানিক জোরালো হয়। আর আবদুল হাদী তার আত্মীয় বলে এই কাজটা তাকে দিয়েই সহজে হতে পারবে, বরং তারই এটা কর্তব্য মি. মুস্তাফার মনোভাব জানা, তার আনুগত্য বদল করানো। আবদুল হাদী উন্নত বোধ করল; শরীফ আলীর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো যে এই দায়িত্ব আর কাউকে নয় তাকেই সে দিয়েছে।

বেল বাজাবার বেশ কিছুক্ষণ পর দরোজা খুলল। প্রায় মনে হতে যাচ্ছিল যে বাড়িতে কেউ নেই, তখন বাহাউদ্দিন দরোজা খুলল।

খুলেই সে আবদুল হাদীর পেছনে রাস্তার ডান-বাম দেখে নিল, কী একটা লক্ষ করে ভ্রূকুঞ্চিত হলো তার। দরোজা না ছেড়েই সে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে কেউ আছে নাকি?

না কেউ নেই তো। অবাক হলো আবদুল হাদী। সে নিজেও পেছনে একবার দেখে নিল।

কেউ নেই। সড়ক ভিজিয়ে তীব্র শাদা আলো জ্বলছে শুধু। বাহাউদ্দিন দরোজা ছেড়ে দাঁড়াল, তাকে ভেতরে আসতে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে বলল, আব্বার জন্যে একটু সাবধান থাকতে হচ্ছে। উনি বাঙালি কারো সঙ্গে ঠিক এই মুহূর্তে দেখা করতে চান না। মানে, বাঙালি যারা জড়িত আছে, তাদের সঙ্গে। আপনি তো সুটকেস নেবেন?

হাঁ, একটা জায়গা পেয়েছি।

নিচের তলার ফ্ল্যাটের মালিক এক আইরিশ দম্পতি। দোতলায় বাহাউদ্দিনের ফ্ল্যাটে যাবার সিঁড়ি দু'পাশে দেয়াল ঘেরা; যেমন সংকীর্ণ তেমিন ঠাণ্ডা আর ভূতুড়ে। সব মিলিয়ে আবদুল হাদীর ভেতরটা কেমন গুমগুম করে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাহউদ্দিন বলল, বোঝেন তো, বলা যায় না, পাকিস্তানিরা হয়তো নজর রাখছে, কে আসে না আসে।

আবদুল হাদীর ভয় ভয় লাগল। সে বলল, তা তো বটেই। লন্ডন তো একটা ঘাঁটি। ওরা তা জানে।

বসবার ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেল তার মামা মি. সালাউদ্দিন মুস্তাফা বিছানা পেতে সোফার ওপর বসে, খোপ কাটা পাতলা একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিবিষ্ট মনে টেলিভিশন দেখছেন। সে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে যে দ্রুততার সঙ্গে তিনি চোখ তুলে আবদুল হাদীকে দেখে নিলেন তাতে বোঝা যায়— তিনি টেলিভিশন দেখার ভান করছিলেন মাত্র, আসলে তার মন শংকিত হয়ে ছিল কে এসেছে জানবার জন্যে।

আবদুল হাদীকে দেখে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। উদ্বিগ্ন চোখে ছেলের দিকে তাকালেন।

বাহাউদ্দিন বলল, নসু ফুফুর ছেলে।

মি. মুস্তাফা নিশ্চিন্ত বোধ করবেন কি না, ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না।

আবদুল হাদী তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

ঠিক তখন তার চোখ পড়ল দেয়ালের দিকে। সে দেয়াল ফাঁকা। এ ক'দিন দেয়ালের ঠিক যেখানে সে শেখ মুজিবের বিরাট ছবি আর তার পাশে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সেই জায়গাটা হা হা করছে এখন।

বাহাউদ্দিনও লক্ষ করেছিল আবদুল হাদীর দৃষ্টি কোথায় গেছে। সে অস্বস্তি বোধ করল দৃশ্যতই। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে নকল উৎফুল্ল গলায় বলল, আব্বা, উনি আমাদের এখানেই ছিলেন। বলছিলেন, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

মি. মুস্তাফা বললেন. হাঁ, সেই কবে দেখেছিলাম। প্রথমে তোমাকে চিনতেই পারি নি বাবা।

শেখ মুজিবের ছবিটা নেই কেন?

আবার তার, আবদুল হাদীর দৃষ্টি চলে যায় দেয়ালের ওপর। কিছুতেই সে এড়াতে পারে না, অথচ সে এটাও বোঝে, ওদিকে তার না তাকানোই উচিত।

আবদুল হাদী লৌকিক প্রশ্ন করল, আপনি কখন এলেন, মামা?

কখন এলাম? মি. মুস্তাফা ছেলের দিকে তাকালেন।

দুটো পঁয়ত্রিশে না?

তারপর নীরব হয়ে গেল ঘর। মি. মুস্তাফা টেলিভিশনের দিকে মনোযোগ দিলেন, বাহাউদ্দিন দাঁড়িয়েই রইল, আর ঘরের কোণে তার সুটকেস দেখতে পেল আবদুল হাদী; এখন সুটকেস হাতে নিয়ে সে উঠে পড়ুক— বাহাউদ্দিন এটাই আশা করছে। কিন্তু আবদুল হাদীকে যে জানতে হবে, মি. মুস্তাফা কেন লন্ডনে এসেছেন, কতদিন এখানে থাকবেন, বাংলাদেশের প্রতি তার মনোভাব কী?— সে ভেবে পায় না কোন উপায়ে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকা যায়।

রোজি এসে ঘরে ঢুকল। আবদুল হাদীর দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখল না।

আব্বা, আপনি এখন খাবেন তো? সব তৈরি।

হাঁ, খাব। তুমি খেয়েছ তো— কী যেন তোমার নাম?

হাদী।

রোজি এবং বাহাউদ্দিন দুজনেই উসখুস করে উঠল— আবদুল হাদী জোর করে তা উপেক্ষা করে, ঘণ্টাখানেক আগে রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেওয়া সত্ত্বেও বলল, না, এখনো খাই নি। আবদুল হাদীর এখন আর আবশ্যকতা নেই এ বাড়িতে সংকোচ বোধ করবার। তার থাকবার ব্যবস্থা অন্য জায়গায় হয়ে গেছে, শরীফ তাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছে, আজ রাতে তার একটা উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে। নিমন্ত্রণটা নিলে অন্তত আরো কিছুক্ষণ সে থাকতে পারবে এখানে।

খেতে বসবার আগে বাথরুমে হাত ধুতে গিয়ে আবিষ্কার করল, দরোজার বাইরে কাবার্ডের দরোজাটা ঠিক মতো লাগে নি, দরোজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে ফটো ফ্রেমের একটুখানি। ফ্রেমটা বড় বলেই কাবার্ডে আঁটে নি। ওল্টানো থাকলেও আবদুল হাদীর বুঝতে কষ্ট হয় না, এটাই শেখ মুজিবের ছবি।

খেতে খেতে, যা আশা করেছিল আবদুল হাদী, মি. মুস্তাফার সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠল; প্রথম সাক্ষাতের বরফ গলে যেতে লাগল দ্রুত। আবদুল হাদী উপভোগ করতে লাগল রোজি আর বাহাউদ্দিনের গভীর অস্বস্তি। তারা এটা-ওটা এগিয়ে দেওয়া আর সাধারণ দু'একটা মন্তব্য করা ছাড়া কিছুই উচ্চারণ করল না।

মি. মুস্তাফা জানতে চাইলেন, তা তুমি লন্ডনে কী করছ, বাবা?

ঠিক কিছু করছি না। ঢাকা থেকে এসেছি।

কবে এসেছ?

এক মাসও হয় নি।

তোমার মা ভালো আছেন?

আছেন। মা আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

হুঁ!

বাহাউদ্দিন বলল, আব্বা, তুমি কি একটুখানি খাচ্ছ? রোজি দ্যাখ না?

না, আর না। ব্যাস! আজকাল আর আগের মতো খেতে পারি না।

সেই দুপুর থেকে কিচ্ছু তো খাও নি।

কেন? হাইকমিশনে স্যান্ডুইচ খেলাম। কফি খেলাম। এখানে আরেক প্রস্থ কেক, বিস্কুট, চা। যথেষ্ট খেয়েছি।

প্লেট সমুখে ঠেলে দিয়ে মি. মুস্তাফা বললেন, আমি তাহলে উঠি।

নীরবতার ভেতরে আবদুল হাদী খেয়ে চলল। রোজিও উঠে গেল একটু পরে। তখন বাহাউদ্দিনকে সে জিগ্যেস করল, শেখ মুজিবের ছবিটা নামিয়ে নিয়েছেন বুঝি?

যতটা না জানবার জন্যে, তার চেয়ে বেশি আঘাত করবার জন্যেই সে প্রশ্নটা করল। সে ভালো করেই জানে, প্রশ্নটা মোটেই খুশি করবে না বাহাউদ্দিনকে। না করুক, সে কি কম

উপেক্ষা পেয়েছে এ-বাড়িতে ? তাকে কি পাঁচ মিনিটের নোটিশে চলে যেতে বলা হয় নি ? একবার বাহাউদ্দিন ভেবে দেখেছে, লন্ডনে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে ?

আবদুল হাদী বাহাউদ্দিনের নীরবতার ফাঁক ভরিয়ে আবার বলল, দেখলাম কাবার্ডে রেখে দিয়েছেন। বাহাউদ্দিন পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। আবদুল হাদী আবার বলল, মামা বোধহয় পছন্দ করেন না ? না ?

এবার মুখ খুলল বাহাউদ্দিন। উঁহু। আব্বার কিছু না। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা হাইকমিশনে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে বাড়ি এলেন, সঙ্গে হাইকমিশনের লোক ছিল।

হু. বিপজ্জনক। আবদুল হাদী নকল সহানুভূতি জানাল।

হাইকমিশনে যখনি টের পেলাম ওরা আব্বার সঙ্গে এখানে আসবে, রোজিকে ফোন করে দিয়েছিলাম ছবিটা সরিয়ে ফেলতে। সকালেই আবার লাগিয়ে দেব। একটু সাবধান হতে হলো আর কী ?

আবদুল হাদী টের পেল, বাহাউদ্দিন ক্রমশ রেগে যাচ্ছে এই কৈফিয়ৎ দিতে দিতে। বোঝা গেল, যখন সে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, বলছিলেন, লন্ডনে চেনা কেউ নেই। চট করেই তো থাকবার জায়গা পেয়ে গেলেন দেখছি।

হ্যাঁ, পেলাম। তারপর কী ভেবে সে যোগ করল, অ্যাকশন কমিটি থেকে ব্যবস্থা করে দিল।

উদ্বিগ্ন হয়ে বাহাউদ্দিন জিজ্ঞেস করল, ওদের বলেছেন না-কি আব্বার কথা ?

মিথ্যে উত্তর দিল আবদুল হাদী, না, বলি নি। আমি কি আর এটুকু বুঝি না ? খামোখা একটা ঝামেলায় মামাকে ফেলব কেন ?

বসবার ঘরে এসে দেখল মি. মুস্তাফা আবার টেলিভিশন দেখছেন।

নীরবে তার কাছ ঘেঁষে বসে পড়ল আবদুল হাদী।

বাহাউদ্দিন এসে বসে পড়ল রোজির পাশে। বসতে বসতে সে বলল আব্দুল হাদীকে, আপনার তো আবার রাত হয়ে যাচ্ছে।

না, আমি ঠিক চলে যাব।

তুমি থাক কোথায় ? মি. মুস্তাফা প্রশ্ন করলেন।

নটিং হিল গেটে।

খুব দূরে ?

না, দূর ঠিক না। এখানে আর দূর কী ? ট্রেনে চাপলেই হয়।

মি. মুস্তাফা বাহাউদ্দিনের দিকে ফিরে বললেন, টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলি না এখনো ?

কান খাড়া হয়ে উঠল আবদুল হাদীর। কীসের টেলিগ্রাম ? কাকে টেলিগ্রাম ?

হাঁ, দিচ্ছি।

বাহাউদ্দিন উঠে গিয়ে টেলিফোনটা করিডর থেকে ঘরে নিয়ে এল।

রোজি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, আহ, এ-ঘরে আনলে কেন ? এখানে টেলিভিশনের জন্যে কি কথা বলতে পারবে ?

আবদুল হাদীর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে টেলিভিশন নয়, তার জন্যেই রোজি স্বামীকে

এই তিরস্কার করল। কিন্তু বাহাউদ্দিন তা গ্রাহ্য করল না। সে ডায়াল করে অপারেটরের অপেক্ষা করতে লাগল।

মি. মুস্তাফা আবদুল হাদীকে বললেন, তোমার মামীকে আসতে বলছি।

উনি কোথায় ?

ইসলামাবাদে। ওকেই টেলিগ্রাম করছি। আমার শরীরটা ভালো নেই।

কেন, কী হয়েছে ?

সেই একটা পুরনো পেইন। আরো অনেক কমপ্লিকেশন আছে। তাছাড়া তোমার মামীও অনেক দিন বাইরে বেরোয় নি।

রোজি টেলিভিশনের দিকে চোখ রেখে বসে রইল যেন এ সব কিছুই তার কানে যাচ্ছে না, কিন্তু আবদুল হাদী জানে সে প্রতিটি শব্দ সতর্কভাবে শুনছে।

কিছুদিন তাহলে আপনাকে লন্ডনে থাকতে হবে ? আবদুল হাদী জিগ্যেস করল।

দেখি, ডাক্তার কী বলে। সময় লাগবে মনে হয়।

আবদুল হাদীর সন্দেহ হয়, তিনি অসুখ বলে থাকতে চাইছেন, তা নয়; আসলেই তিনি কিছুদিন লন্ডনে থাকতে চাইছেন। সন্দেহটা আরো পাকা হয় ইসলামাবাদে টেলিগ্রাম পাঠাতে দেখে। তার যেন মনে হয়, সপরিবারে তিনি নিরাপত্তা খুঁজছেন।

টেলিগ্রাম পাঠানো শেষ করে বাহাউদ্দিন বাবাকে বলল, তুমি কি একটু রেস্ট নেবে ? ঘুমিয়ে পড় না ? জার্নি করে এসেছ। টেলিগ্রাম কালই পৌঁছে যাবে, তুমি চিন্তা কোরো না।

আর বসে থাকা যায় না। আবদুল হাদী বিদায় নেবার উদ্যোগ করল। অন্তত এটুকু খবর সে পেয়ে গেছে যে, মি. মুস্তাফা আপাতত লন্ডনেই থেকে যেতে চান।

সে উঠে দাঁড়াতেই বাহাউদ্দিন তার সুটকেস ঘরের কোণ থেকে সমুখে এনে রাখল।

মি. মুস্তাফা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এ কার সুটকেস ?

আমার। নিয়ে যাচ্ছি।

এত রাতে এত বড় একটা সুটকেস নিয়ে কোথায় যাবে ? যেতে পারবে তো ?

অন্তত ছেলের চেয়ে কিছুটা তার হৃদয় আছে, আত্মীয় বলে তার ভালোমন্দ নিয়ে এতটুকু যে উদ্বেগ আছে, এটা লক্ষ করে আবদুল হাদীর ভেতরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। পাকিস্তান সরকারের বড় কর্মকর্তা নয়, মানুষ হিসেবে এই প্রথম তাকে দেখতে পেল।

মি. মুস্তাফা বললেন, আমি ভেবেছিলাম, তোমার কাছে ঢাকার কিছু কথা শুনব।

কী আর শুনবেন ? খুব খরাপ অবস্থা। আবদুল হাদী মমতা নিয়েই বলল। ঢাকার খবর বলে এই মানুষটিকে বিচলিত করতে সত্যি সত্যি তার কুণ্ঠা হলো।

না, না, তুমি বস। শুনি, তোমার কাছে তবু শুনি। অনেক কিছুই তো শুনি। তুমি কবে যেন এসেছ বললে ?

এই মাসখানেক।

রোজি বলল, ওর কিন্তু সত্যি দেরি হয়ে যাবে, আব্বা।

বাহাউদ্দিন দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, পাব বন্ধ হয়ে যাবে আর একটু পরেই, সব মাতাল-

টাতাল বেরুবে, নতুন লোক আবার বিপদে পড়ে যাবেন। আমরাও রাত দশটা সাড়ে দশটার পর ঠিক বেরোই না।

তাহলে এখানেই ঘুমিয়ে থাকবে। মি. মুস্তাফা বললেন, আজ রাতে না-ই বা গেল।

৮

পঁচিশে মার্চ রাত থেকে শুরু করে ঢাকার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলেন মি. মুস্তাফা। বাহাউদ্দিন মাঝে মাঝে শুধু বলে গেল যে, হাঁ, এখানে কাগজে বেরিয়েছে; হাঁ, আমরা শুনেছি, কিন্তু একটা কথাও বললেন না মি. মুস্তাফা, কেবল চুপ করে শুনে গেলেন।

সবশেষে আবদুল হাদী বলল, মামা, সারাদেশ এখন থম থম করছে। মানুষ যে কী করে বেঁচে আছে, সে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনি ধারণা করতে পারেন, যে বাঙালি বন্দুকের আওয়াজ শুনলে ভয়ে মরে যেত, সেই বাঙালি এখন কোথাও যদি বন্দুকের শব্দ শোনে, হাতবোমার আওয়াজ পায়, খুশি হয়ে ওঠে। মনে করে, এই বুঝি মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা পাকিস্তানিদের আক্রমণ করল! ঢাকার ফার্মগেটের মতো প্রকাশ্য মোড়ে, ইন্টারকন্টিনেন্টালের মতো হোটেলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অপারেশন করছে, আপনি জানেন? দেশের লোক এখন হাত তুলে দোয়া করছে, মুক্তিবাহিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। কী করেছে পাকিস্তানিরা, হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে, মেয়েদের ধরে ধরে বেইজ্জত করেছে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন মি. মুস্তাফা। যেন একটা নতুন মানুষকে প্রত্যক্ষ করল আবদুল হাদী।

তিনি বললেন, বাঙালির একটা বড় দোষ কি জান? অতিরঞ্জন। সব কিছুই বাড়িয়ে বলে। তুমি ঢাকায় থেকে কতটুকু দেখেছ, বড়জোর তোমার পাড়ার খবর জান। বল, তোমার পাড়ায় ক'জন মারা গেছে, ক'জন ধর্ষিত হয়েছে, ক'টা বাড়ি পুড়েছে? সব ইন্ডিয়ার প্রপাগান্ডা। ভারত হয় আমাদের শত্রু ভারত এই গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত। ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ভারত জন্মলগ্ন হইতেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে, এখনো করিতেছে। আমরা বাঙালিরা তাহাদের খপ্পরে পড়িয়াছি। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবে, আমাদিগকে হিন্দুর দাসত্ব করিতে হইবে।

কী একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল আবদুল হাদী, মি. মুস্তাফা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি কী বলিবে আমি জানি। পাকিস্তান সরকারের চাকরি করি বলে এ সব বলছি, মোটেও তা নয়। যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি। তোমরা তরুণ, রাজনীতির অনেক কিছুই তোমাদের অজ্ঞাত। ঐ যে বলিলে, ঢাকায় মুক্তিবাহিনী তৎপর হইয়াছে, উহারা ছদ্মবেশী ভারতীয় সৈন্য বৈ অন্য কেহ হইতে পারে না। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা ইহাও জানি যে, বাঙালি নেতারা গোপনে ভারতের সহিত হাত মিলাইয়াছে, এবং বহু পূর্বেই মিলাইয়াছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র আসলেই হইয়াছিল।

তাহলে সে মামলা তুলে নেওয়া হলো কেন?

দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। মামলাটি তুলিয়া লাইবার অর্থ মামলা মিথ্যা স্বীকার করা নহে। মি. মুস্তাফা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাঙালিদিগকে ইহার মাশুল দিতে হইবে। বাঙালি এই

যে ভুল করিল, অন্তত পঁচিশ বছর বাঙালি পিছাইয়া গেল।

আব্দুল হাদী বলতে চেষ্টা করল, যে অন্যায় করা হয়েছে, বাঙালি তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কত মার খাব আমরা ? ওরা বন্দুক ব্যবহার করিয়াছে বলিয়াই আমাদিগকে বন্দুক হাতে লইতে হইয়াছে।

কোথায় বন্দুক হাতে নিয়েছ ? তোমার মতো তরুণ লন্ডনে বসে আছ। তোমরা সকলেই সরে পড়েছ।

অপ্রতিভ হয়ে আব্দুল হাদী বলল, আমার কথা নয়। মুক্তিবাহিনী কিন্তু আছে, আমাদের ছেলেরাই যুদ্ধ করছে, মামা।

বিশ্বাস করি না। বন্দুক ধরিবার ঐতিহ্য আমাদের নাই।

মার খেলেই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।

এই মার বাঙালির প্রাপ্য ছিল। এমন কীইবা মার দেওয়া হয়েছে ? তোমরা ষড়যন্ত্র করবে, বিদ্রোহ করবে, আর্মিতে আনুগত্য ভাঙাইবার চেষ্টা লইবে, সরকার বসিয়া থাকিবে ? বরং অপরাধের তুলনায় অনেকখানি কম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাণ লওয়া হইয়া থাকিলে ভারতীয় দালালগণেরই প্রাণ লওয়া হইয়াছে। কেহ বলিতে পারিবে না, বিনা দোষে শাস্তি পাইয়াছে। বাঙালি কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়াই নারী ধর্ষণ, লুটপাটের কথা ছড়াইতেছে। না, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী বাড়াবাড়ি করে নাই। তাহারা আইন-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্যে, এবং বৈধ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তাহাই করিয়াছে। বর্তমানে যদি অস্ত্র ব্যবহারের কোনো সংবাদ শুনিয়া থাক তো জানিয়া রাখ, অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে সে অস্ত্র ধরা হইতেছে। আমি সংবাদ পাইয়াছি, পূর্ব পাকিস্তানে সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক চলিতেছে, লোকে আপিসে যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে, সংসার করিতেছে, সিনেমা চলিতেছে, ট্রেন চলিতেছে, এমনকি লোকে পুত্র কন্যার বিবাহ পর্যন্ত দিতেছে। বল, সত্যি কিনা ?

একটানা এতদূর বলে মি. মুস্তাফা হাঁপিয়ে পড়েছিলেন সম্ভবত। তিনি বললেন, রোজি, একটু কফি দিতে পার মা ? বিদেশে এই এক সুখ তোমাদের, চমৎকার কফি পাওয়া যায়। আমাদের ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট হাউসে অবশ্য কফিটা এক নম্বর।

আবদুল হাদীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি। হঠাৎ তার মনে হলো ছেলেটিকে তিনি বেশ ক্ষুণ্ন করে ফেলেছেন। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হ্যামলেট নাটকখানা পড়া আছে তো ? সেখানে আছে, কার যেন সংলাপ— মমতার খাতিরেই নিষ্ঠুর হইতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে যে নিষ্ঠুরতার কথা এতক্ষণ বললে, আর আমরাও যে বিদেশের কাগজ-পত্তরে পড়েছি— ইতিহাসের তরঙ্গ শান্ত হইয়া গেলে উপলব্ধি করিবে যে, দেশের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তই কঠোর হইতে হইয়াছিল।

চুপ করে রইল আবদুল হাদী। কিছুক্ষণ আগেও তার মনে হচ্ছিল মি. মুস্তাফা লন্ডনে কিছুদিন থেকে যেতে চান, কারণ পাকিস্তানে আর ফিরে যেতে চান না। তার আশা হয়েছিল, তিনি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। এখন এই বক্তৃতা শুনে মুষড়ে পড়ল সে। একবার ভাবল, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়বে কি না। কিন্তু ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই সে ভাবনা মুছে ফেলল সে। রাত প্রায় বারোটা।

রোজি কফি দিল না।

আব্বা, রাত অনেক হয়েছে। এখন কফি খেলে আর ঘুমোতে পারবেন না।

বাহউদ্দিন বলল, আপনার তো ভোরে আবার বেরুতে হবে।

হাঁ, হাইকমিশনে যেতে হবে।

ওরা কিন্তু আটটার মধ্যেই গাড়ি পাঠাবে।

হঠাৎ আবদুল হাদীর দিকে তাকিয়ে মি. মুস্তাফা বললেন, তোমরা কী যে সব কাণ্ড বাঁধালে, এখন ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। ঠিক আগের মতো আর বিশ্বাস করে না। ওদেরই বা কী দোষ দেব? শেখ মুজিবের জন্যেই বাঙালি পঁচিশ বছর, অন্তত পঁচিশ বছর পিছিয়ে গেল। হাঁ, শুয়ে পড়া যাক।

বাহাউদ্দিন নিজের ঘরে বাবার শোবার ব্যবস্থা করেছিল, ভেবেছিল স্বামী-স্ত্রী তারা শোবে বসবার ঘরে— মি. মুস্তাফা নাকচ করে দিলেন।

না, না, তোমরা যেখানে আছ থাক। কষ্ট করা আমার অভ্যেস আছে। আমিও তো ছাত্র বয়সে এই লন্ডনে ছিলাম। জুতোর বাক্সের মতো ছোট্ট ঘরে থেকেছি। আমার এই সোফাতেই বেশ চলে যাবে।

অগত্যা সোফাটিকেই পেছনের পিঠ খুলে চওড়া করা হলো, বিছানা পেতে দেওয়া হলো। আবদুল হাদী মেঝেতে আশ্রয় নিল। গায়ের জ্যাকেটটা খুলে কম্বল টেনে একটা কুশন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। রোজি আজ প্যারাফিন হিটার জ্বেলে রেখে গেল এ ঘরে। নিশ্চিন্ত হলো সে। অন্তত গত রাতের মতো শীত তাকে তাড়া করবে না।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল আবদুল হাদীর। কী একটা কাতর ধ্বনি শুনে তার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার যেন মনে হলো সে ঢাকায় আছে; রাতের অন্ধকারে বাইরে কোথাও গুলিগোলা হয়েছে, কেউ আহত হয়ে কাতরাচ্ছে।

লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। কুকুরের মতো হামা দিয়ে বসে থাকল খানিক। ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করল, কোথায় সে আছে।

এটা লন্ডন, এটা বাহাউদ্দিনের বসবার ঘর।

তখন সে আবিষ্কার করল, মি. মুস্তাফা সোফার ওপর শুয়ে অনবরত এপাশ-ওপাশ করছেন আর ঘড়ঘড় গলায় কাতর শব্দ করছেন।

আস্তে করে সে ডাকল, মামা, মামা।

ধ্বনিটা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এপাশ-ওপাশ করে চললেন মি. মুস্তাফা। শরীর ভালো নয় শুনেছিল আবদুল হাদী, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন না তো?

সে আবার ডাক দিল, মামা, আপনার খারাপ লাগছে?

অ্যাঁ?

মামা, আমি হাদী, আপনার কী হয়েছে?

ও তুমি। না, কিছু না।

স্থির হয়ে শুলেন মি. মুস্তাফা। আবদুল হাদী অন্ধকারে অনেকক্ষণ কান পেতে রাখল, আবার যদি কাতর ধ্বনি করে ওঠেন।

যখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোখ বুজতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন মি. মুস্তাফা বলে উঠলেন, মেঝেয় শুয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ?

না, মামা, কষ্ট কী ?

তোমার ঘুম হচ্ছে ?

হাঁ, আমি ঠিক আছি। আপনি ঘুমোন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার মি. মুস্তাফার গলা পাওয়া গেল।

এত ছোট বাড়ি। ঘরগুলোও ছোট ছোট।

লন্ডনে তো এই রকমই।

হাঁ। আমাদের দেশের মতো নয়। কী বল ? দেশের একেক খানা ঘর এদের একটা বাড়ির সমান। নানা বাড়ি গেছ তো তুমি ?

হাঁ, এই তো, বছরখানেক আগেও মাকে নিয়ে গেছিলাম।

আমাদের বাংলা ঘরটা, বল একখানা ঘর কি না। আমার বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরখানা তুলেছিলেন, কী সব বাহারী নকশা ছিল! কাঠের কাজ করা একটা জলচৌকি ছিল, বুঝলে ? বাবা নামাজ পড়তেন, আছে সে খানা ?

মনে করতে চেষ্টা করল আবদুল হাদী। তার মনে পড়ল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার তার মনে হলো মি. মুস্তাফা ঘুমিয়ে পড়ছেন। সেও ঘুমোতে চেষ্টা করল।

ঘুমিয়ে গেলে না-কি ?

না, না। মামা।

উঠে বসল আবদুল হাদী।

আপনার কিছু লাগবে ?

না, না। তুমি উঠে পড়লে কেন ? শুয়ে পড়। শুয়ে পড়। রাতে আমার কখনো কিছু দরকার হয় না।

আবদুল হাদী আর ঘুমোতে পারল না। সে জানে, মি. মুস্তাফা আবার কথা বলবেন।

তার অনুমান মিথ্যে হলো না।

তুমি তো গ্রামে ট্রামে যাও নি ?

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সে।

না-কি ঢাকাতেই ছিলে এখানে আসা পর্যন্ত ?

এবার বুঝতে পারে আবদুল হাদী। একটু অবাক হয় সে। যে মানুষ দেশে কিছু হয় নি বলে এই ঘণ্টাখানেক আগেও বক্তৃতা করলেন, তিনি হঠাৎ এমন প্রশ্ন করছেন দেখে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

মার্চের সাতাশ তারিখে ঢাকা ছেড়ে গিয়েছিলাম, আবার সপ্তাহ দুয়েক পরে ফিরি।

ফেরার মতো অবস্থা তখন ছিল, কি বল ?

তা ঠিক নয়, মামা। গ্রামে গেলাম, সেখানেও এক সপ্তাহের মধ্যে সৈন্যরা এসে গেল, গ্রাম ছেড়ে আবার সকলে পালাতে লাগল। আমি ঢাকাতেই ফিরে এলাম।

ও। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তুমি তো বিয়ে কর নি?

না. মামা।

তাহলে তোমার তো ঝাড়া হাত-পা।

না, মা আছেন. বোনেরা আছে, ওদের তো ফেলে রেখে পালাতে পারি না।

এখন কোথায় নসু? তোমার মা?

পাবনাতেই।

তুমি তো আবার কলেজে পড়াও। তোমাদের কলেজের কোনো প্রফেসর...। প্রশ্নটা তিনি শেষ না করলেও আবদুল হাদী বুঝতে পারে।

না, আমাদের কলেজের কেউ মারা যায় নি। তবে ইউনিভার্সিটিতে... আবদুল হাদীও উহ্য রাখে।

ও।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার মি. মুস্তাফা প্রশ্ন করেন, স্বাধীন বাংলা রেডিও নাকি হয়েছে?

হাঁ, অনেকদিন থেকে।

তুমি শুনেছ?

হাঁ, মামা।

মানে, নিজে কানে শুনেছ?

হাঁ, রোজই শুনতাম।

ও।

প্রথম দিকে ভালো স্পষ্ট শোনা যেত না, এখন চমৎকার ধরা যায়। লোকে অবশ্য ভয়ে জোরে ছাড়ে না. কানের কাছে লাগিয়ে শোনে।

ও।

মুক্তি বাহিনীর খবর তো আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকেই পাই। বিশ্বাস করবেন না মামা, ঢাকায় একটা এ্যাকশন হয়ে গেল, তার দু'ঘণ্টার ভেতরে স্বাধীন বাংলা থেকে খবর। বিবিসিও খুব নগদ খবর দেয়।

লন্ডনে তোমাদের বেশ বড় ঘাঁটি না?

এখানে খুব জোর কাজ হচ্ছে।

হুঁ। জাস্টিস সাহেবের কথা শুনেছি। তাঁকে নাকি খুব ধরাধরি করে আন্দোলনে নামাতে হয়েছিল? শুনলাম দেশ স্বাধীন হলে তাঁকে নাকি বড় পোস্ট দেওয়া হবে, সেই লোভ তোমরা দেখিয়েছ?

আবদুল হাদীর সন্দেহ হয়, মি. মুস্তাফা হয়তো নিজের কথা ভাবছেন। হয়তো বুঝতে চাইছেন বাংলাদেশের পক্ষে এলে তার লাভ কতটা। আবদুল হাদী উত্তর দিল, আমি ঠিক

জানি না, মামা। আমি ঠিক জড়িত নই।

কেন? শুনি যে তোমাদের মতো ছেলেরাই সব আন্দোলন করছে, বন্দুক চালাচ্ছে, তুমি যোগ দাও নি?

আবদুল হাদী চুপ করে রইল।

মি. মুস্তাফা তখন বললেন, নাকি আসলেই কিছু না। সব প্রপাগান্ডা?

না মামা, প্রপাগান্ডা না। আপনি জানেন না কত ছেলে ভারতে ট্রেনিং নিচ্ছে, সব জায়গায়-জায়গায় কী রকম তারা সব অপারেশন করছে!

সে করতে পারে, আমার মনে হয় না, তোমরা সাক্সেসফুল হতে পারবে। একটা রেগুলার সেনা বাহিনীর সঙ্গে দু'চারটে হাতবোমা আর অর্ডিনারী বন্দুক নিয়ে লড়াই করা যায় না। তোমরা তো সব ছেলেমানুষ, বোঝ না। জান পাকিস্তানের সৈন্যবল-অস্ত্রবল কতখানি? আমি তো এটা বদ্ধ পাগলামো বলে মনে করি।

আবার মি. মুস্তাফা আগের চেহারায় ফিরে যান। আবার তিনি বাঙালির বিপথগামিতার কথা বলেন, ভারতের চক্রান্তের কথা বলেন। কিন্তু আগের মতো দৃপ্ত আর মনে হয় না তার কণ্ঠস্বর। যেন এক প্রকার খেদ তার গলায় খেলা করে। যেন বাঙালির বাহুবল-অস্ত্রবল যথেষ্ট নেই বলে তিনি দুঃখিত বোধ করতে থাকেন অন্তশীলভাবে। তিনি বলে চলেন, তাহলে বুঝতে পারছ, তোমাদের অবস্থাটা কী?

আবদুল হাদীর কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি প্রথমত মনে করেন সে চিন্তিত হয়ে এখন নীরব। তাই আবার তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি তো সদ্য দেশ থেকে এসেছ, বুকে হাত দিয়ে তুমিই বল দেখি, তোমরা জিততে পারবে?

আবদুল হাদীর কাছ থেকে উত্তর আসে না।

ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

আবদুল হাদী জেগেই ছিল, কিন্তু কোনো সাড়া দিল না। মি. মুস্তাফা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবদুল হাদী আবার শুনতে পেল তিনি অনবরত এপাশ-ওপাশ করছেন, আর প্রায় শোনা যায় না এত নিচু পর্দার একটা কাতরধ্বনি তার কণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে।

৯

পাকিস্তান হাইকমিশনের গাড়ি ভোরে এসে পৌঁছুবার আগেই বাহাউদ্দিন তাকে ঘুম থেকে তুলে দিল।

বোঝেন তো, বাইরের কাউকে দেখে যদি ওরা সন্দেহ করে তাহলে আব্বার একটু মুশকিল হবে।

সে তো বুঝি, সে তো বুঝি।

বিব্রত হয়ে প্রায় হাত মুখ না ধুয়েই সুটকেস হাতে নিয়ে রাস্তায় নামল আবদুল হাদী। স্টেশনে এসে ফোন করল শরীফ আলীকে।

তার গলার আওয়াজ পেয়েই শরীফ আলী ফেটে পড়ল, জান, তোমার ফোনের অপেক্ষায়

আমি কাল সারা রাত ঘুমোই নি ?

আবদুল হাদী কোনো রকমে জানাতে পারল যে, কাল রাতে তাকে বাহাউদ্দিনের বাসাতেই থেকে যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে ফোন করবার সুযোগ ছিল না। ওদের সমুখে তাকে ফোন করে কী করে ?

এখন কোত্থেকে বলছ ?

স্টেশন থেকে।

খবর কিছু বের করতে পেরেছ ?

শরীফ আলীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যেই সে বাড়িয়ে বলল, হাঁ, অনেক খবর আছে। রাতে থেকে গিয়ে খুব কাজের কাজ হয়েছে।

সোজা চলে এস অ্যাকশন কমিটিতে।

নটিং হিল গেট হয়ে আসি ?

কেন, ওখানে আবার কী ?

সঙ্গে সুটকেস রয়েছে যে।

রাখ তোমার সুটকেস। দেশের চেয়ে তোমার সুটকেস বড় হলো ? আসবার পথে কিং ক্রস স্টেশনে রেখে এস। ওখানে লকার আছে।

বড় ঝামেলা হলো তার এই সুটকেস নিয়ে। অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে কেন যে সে এই গোদাভারি জিনিসটা দেশ থেকে টেনে আনতে গিয়েছিল ?

আর কিং ক্রস স্টেশন কি একটুখানি ? কোথায় লকার, কীভাবে জমা রাখতে হয়— অত গোলমালের ভেতর না গিয়ে সুটকেস হাতে করেই সোজা সে চলে এল।

শরীফ আলী তার আগে এসেই অপেক্ষা করছে। বসে বসে অধৈর্য হয়ে পা দোলাচ্ছে সে। সুটকেস দেখেই সে বলে উঠল, এটার মায়া আর ছাড়তে পারলে না ? লোকে দেশ থেকেই বেরুতে পারে না, আর তুমি একখানা পোর্টেবল ঘর নিয়ে বেরিয়েছ।

বড় লজ্জিত হয়ে আবদুল হাদী সুটকেসটা এক কোণে রেখে দিল। বসেও শান্তি পেল না; তার কেবলি ভয় হতে লাগল, কেউ আবার না হোঁচট খেয়ে পড়ে।

বল কী খবর মি. মুস্তাফার ? কেন এসেছেন জিনিভায় ? লন্ডনে কেন ? দালালি করতে পাঠিয়েছে বুঝি পাকিস্তান ?

তা ঠিক মনে হলো না।

তবে কি এ সময় একজন বাঙালি সিএসপিকে হাওয়া খেতে পাঠিয়েছে ?

শরীরটা ভালো মনে হলো না। যে যে কথা হয়েছিল, আবদুল হাদী সব খুলে বলল।

সব শুনে শরীফ আলী সংক্ষেপে একটা মত প্রকাশ করল।

শালা খেলতে চাইছে।

হাজার হোক মি. মুস্তাফা তার মামা, তাকে শালা সম্বোধন করাতে সে ঠিক খুশি হতে পারল না। মৃদু প্রতিবাদ করে সে বলল, খেলা আবার কী ? খেলার কী আছে ?

আছে, আছে। ঐ যে জাস্টিস সাহেবের কথা তুললেন বুঝতে পারলে না ? একটু বাজিয়ে

দেখলেন। হাদী, আমলাদিগকে তুমি চেন না। তুমি কি জ্ঞাত আছ যে, সারমেয় সম্প্রদায় আমলাদিগকে ঈর্ষা করিয়া থাকে ?

আবদুল হাদী হা করে তাকিয়ে রইল।

কেন ঈর্ষা করে ? তাহাদিগের প্রভুভক্তির বহর দেখিয়া ঈর্ষা করে।

হেসে ফেলল আবদুল হাদী।

তুমি হাসিতেছ ? হাঁ, ইহা সত্য। বিশেষত বাঙালি আমলাদিগকে প্রভুর পদতলে সর্বাগ্রে পাইবে।

আবদুল হাদীর সুটকেসে ঠিক তখন কে একজন হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে আরেকটু সরিয়ে রাখতেই লোকটা তার দিকে ক্রুদ্ধ বিরক্ত দৃষ্টিপাত করল।

শরীফ আলী লোকটির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে উঠল, সুটকেসটিকে সমীহ্ করিও হে। ইহার ভেতরে অতিশয় স্পর্শকাতর বিস্ফোরক রহিয়াছে। বালকদিগকে পাঠাইতেছি।

লোকটা প্রথমত অনুমান করবার চেষ্টা করল, শরীফ আলী রসিকতা করছে কি-না। তার মুখে হাসি দেখে নিশ্চিত হলো সে। কী একটা মন্তব্য ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল, কী ভেবে উচ্চারণ করল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আবদুল হাদী বিব্রত হয়ে বলল, কী যে ঠাট্টা তোমার! সুটকেসটা রেখে আসাই ভালো ছিল দেখছি।

এই তো, কিছু মনে করলে না-কি ?

না।

তোমাকে কিছু নয়, ঐ লোকটিকে— সে মনে করে গুরুত্বপূর্ণ সকল কিছুই সে একা করিতেছে, বাকি ব্যক্তিসকল আলু ভাজিতেছে। তাই ঠাট্টা করিলাম।

আবদুল হাদী একটু চুপ করে থেকে বলল, তা এখন কী করবে ?

কী বিষয়ে ?

মি, মুস্তাফার কথা বলছি।

ভাবিতেছি, ভাবিতে দাও।

আমার কিন্তু মনে হলো, মুখে যা-ই বলুন ভেতরে-ভেতরে বাংলাদেশের জন্যে টান আছে।

ইহাদের মনোভাব শয়তানেও বুঝিতে অক্ষম।

তবু বাঙালি যখন— বাংলাদেশের জন্যে টান একটা আছে তো।

ইহারা অতিশয় ধড়িবাজ। আন্দোলনে নামিয়া বহু আমলা দেখিলাম। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল শরীফ আলী। বলল, চল দেখি বিবিসি-তে, দেখি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। এত আকস্মিকভাবে এবং মি. মুস্তাফার মতো গুরুত্বপূর্ণ লোক ছেড়ে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে শরীফ আলী— সে হকচকিয়ে যায়।

পরক্ষণেই তাড়া খায় সে।

ওঠ দেখি, ওঠ। কমলদা আছেন, সিরাজ ভাই আছেন, বিবিসি-তে অনুবাদ-টনুবাদ করে

দুচারটে পাউন্ড তোমার হয়ে যাবে। থাকা খাওয়ার তো আপাতত কোনো চিন্তা নেই।

উঠল আবদুল হাদী। সুটকেসটা নেবে কি না সঙ্গে, একবার ইতস্তত করল সে।

শরীফ আলী অসহিষ্ণু গলায় বলল, আহ, ওটা থাক না। কেউ নেবে না।

বিবিসি-তে এসে তার কাজ জুটিয়ে দেবার ধারে-কাছেও গেল না শরীফ আলী। সে যে কেন এল এখানে, তা কিছুই বোঝা গেল না। বাংলা বিভাগের দরোজার কাছে আসতে আসতেই আবদুল হাদীর উপস্থিতি যেন সে বেমালুম ভুলেই গেল। সোজা ভেতরে ঢুকে গেল তাকে ফেলে।

বাংলা বিভাগের সবেমাত্র একখানা কামরা, তাও সরু, এক চিলতে। না দেখলে বিশ্বাস হয় না এরই ভেতরে গোটা তিন-চার টেবিল, দুটো আলমারি, খানপাঁচেক চেয়ার, এত সব ধরেছে কী করে ? আর কী করেই বা জনা ছয়েক লোক দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে ?

দরোজার বাইরে করিডোরেই দাঁড়িয়ে রইল আবদুল হাদী। ভেতরে, মাবুদ খান পাশ ফিরে কী একটা লিখিছিল মাথা নিচু করে, তার কাঁধে গিয়ে টোকা দিল শরীফ আলী। কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলতে লাগল।

হয়তো তার কথাই বলছে, মাবুদ যেহেতু বিবিসি-তে নিয়মিত চাকরি করে না, কাজেই তার কাছেই হয়তো শরীফ আলী শুধিয়ে দেখছে বাইরের ছুটকো লোকের সুযোগ কতটুকু; আবদুল হাদী প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগল— এই হয়তো তার ডাক পড়বে ভেতরে। কিন্তু না, তাকে হতাশ করে শরীফ আলী একবার পেছন ফিরে বলল, তুমি হিন্দিওয়ালাদের ঘরে গিয়ে বস না, হাদী ? দাঁড়িয়ে থেকো না, জায়গা করে নাও।

হিন্দিওয়ালাদের ঘর মানে বিবিসি হিন্দি সার্ভিসের কামরা। বাংলা বিভাগের পাশেই তাদের বেশ কয়েকটা ঘর, তার ভেতর একটা বেশ বড়সড়। সেখানে একদিন বসেছিল আবদুল হাদী। কিন্তু সেদিন সঙ্গে ছিল মাবুদ খান, শরীফ আলী; আজ একা যেতে কেমন সংকোচ বোধ হলো তার। আবার, শরীফ আলীর কথার পর করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকাটাও সহজ হলো না।

বাংলা বিভাগের দরোজা থেকে এক-পা এক-পা করে সে সরে গেল।

আবার তার নিজেকে অবাঞ্ছিত, উদ্যোগহীন বলে মনে হতে লাগল। সকলেরই কাজ আছে, কেবল তারই নেই। সকলেরই দেখা করবার কেউ আছে, কেবল তারই নেই, তার বন্ধু নেই, আশ্রয় নেই, ভবিষ্যত নেই। যুদ্ধ, আন্দোলন, স্বাধীনতা এ সবই দূরের এবং অন্য কারো প্রসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল তার কাছে। যদি এমন হতো যদি সে এমন কোথাও যেতে পারত যেখানে তার চেনা কেউ নেই, যেখানে তার গায়ের রঙের কোনো মানুষ নেই, তার বোধগম্য ভাষায় যেখানে কেউ কথা বলে না তাহলে নিজেকে এই অনুকম্পা করবার হাত থেকে সে গা বাঁচাতে পারত।

বাহিরে কেন ? আসুন, বসুন।

চমকে তাকিয়ে দেখে, হিন্দিভাষী একজন তাকেই লক্ষ করে কথাগুলো বলছে। লোকটা শেষ দু'টি শব্দ বাংলাতে উচ্চারণ করতে পেরে ভারি খুশি। সেই খুশি আবদুল হাদীকেও স্পর্শ করল।

সে ভেতরে ঢুকল।

সমুখে খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে লোকটি বলল, আপনি বাংলাদেশী ?

আজ কত সহজে স্মিতমুখে সে স্বীকার করতে পারল, সে বাংলাদেশেরই বটে। গতকালও ট্রেনে সে ইতস্তত করেছে আফ্রিকান তরুণটির কাছে নিজেকে বাংলাদেশের লোক বলে পরিচয় দিতে।

আবদুল হাদীর মনে হলো তার চারদিকে স্বাধীনতা, অভ্যর্থনা এবং সুবাতাস খেলা করছে এখন।

চেয়ার টেনে বসল সে।

আপনারা বীর জাতি। আপনারা মহান জাতি। হিন্দি ভদ্রলোকটি উচ্ছ্বসিত গলায় ঘোষণা করলেন।

আবদুল হাদী বড় উন্নত বোধ করতে লাগল, যেন সেই বীরত্ব এবং মহত্ত্বে তারও অংশ আছে। উৎফুল্ল গলায় সে কৈফিয়ৎ দিতে চাইল— বাংলা বিভাগের কক্ষটি বড় অপরিসর। বসিবার সুবিধা হইল না।

তাহাতে কী ? ইহাও আপনাদের কক্ষ। বাঙালিদের অনেকেই আমাদের টেবিলে বসিয়া কাজ করেন। অচিরেই এ অসুবিধা দূর হইবে, দেখিয়া লইবেন।

কী প্রকারে ?

বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে। ইংরাজ চালাক জাতি। বাংলাদেশকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজকে তখন উদ্যোগী হইতে হইবে। বাংলা অনুষ্ঠানের সময় বিবিসি বাড়াইয়া দিবে। বর্তমানের পনেরো মিনিট হইতে আধঘণ্টা তো হইবেই। তখন অধিক লোক এখানে খাটিবে, অতএব লোকের উপযুক্ত জায়গা করিয়া দিতে হইবে। বাংলা বিভাগ প্রশস্ততর কক্ষ পাইবে।

ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে এমনভাবে কথাগুলো বলে গেলেন, যেন বাংলাদেশের স্বাধীন হয়ে যাওয়া কোনো অনিশ্চিত ব্যাপারই নয়, যেন সবই হয়ে গেছে— কেবল একটা আনুষ্ঠানিকতা বাকি।

বড় ভালো লাগল আবদুল হাদীর। তার মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন আকাশে হঠাৎ রোদ বেরিয়ে পড়ল সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম। পাশের দালানের কোনো জানালার কাচ সোনার মতো ঝকমক করে উঠল। আবদুল হাদী আবার নিজেকে দেখতে পেল— ঢাকায় ফিরে গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে বিমান থেকে নামছে সে, তার পরনে সবুজ-খাকি বুশ শার্ট, মাথায় চেগুয়াভারার মতো টুপি।

দূরের এই সুখের ভেতরে সাঁতার কাটতে লাগল সে। তার পকেটে যে পয়সা নেই, এখানে নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই, দেশের বাড়িতে মা-বোনেরা কীভাবে আছে কে জানে— এ-সব তার কাছে খুব তুচ্ছ এবং লঘু বলে বোধ হতে লাগল।

হিন্দি ভদ্রলোকটি তার সমুখে একতাড়া পত্রিকা ঠেলে দিয়ে বললেন, আমাকে একটি রচনা তৈরি করিতে হইবে। আপনি পত্রিকা পাঠ করুন। সিগারেট চলিবে ?

না, আমি পান করি না।

প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল, শরীফ আলী তার কোনো খোঁজ করল না। একবার নিজেই সে

যাবে নাকি বাংলা বিভাগে ? ইতস্তত করতেও বেশ কয়েক মিনিট সময় নিল সে। তারপর আস্তে উঠে দাঁড়াল। হিন্দি ভদ্রলোকটি এক মনে লিখে চলেছেন, তার দিকে তাকিয়ে নীরবে তিনি হাসলেন।

বাংলা বিভাগে এসে বুকটা ধুক করে উঠল তার। শরীফ আলী নেই। তাকে ফেলেই চলে গেল না-কি ? আজ যে আর গোটা পাঁচেক পাউন্ড তার ধার না করলেই নয় ?

ঘরের ভেতর যে তিনজন আছেন, তারা সবাই ঘাড় গুঁজে ইংরেজি থেকে লেখা অনুবাদ করে চলেছেন। মাবুদ খানও যদি থাকত, তাকে না হয় শরীফ আলীর কথা জিগ্যেস করা যেত। কিন্তু তারও কোনো চিহ্ন নেই।

হিন্দি ঘরে গিয়ে বসবে সে আবার ? যদি শরীফ আলী এসে ফিরে যায় ? বরং বাংলা বিভাগে থাকাটাই তার কাছে কর্তব্য মনে হলো। ধীরে ধীরে সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল।

একজন মুখ তুলে দেখল তাকে।

কাউকে খুঁজছেন ?

শরীফ আলী ছিলেন এখানে।

অ্যাকশন-কমিটির শরীফ আলী ? দাদা, দেখেছেন না-কি শরীফ সাহেবকে ? এই ভদ্রলোক খুঁজছেন।

লোকটা যাকে উদ্দেশ করে বলল তিনি বড়-বড় অক্ষরে লেখা একতাড়া কাগজ সারা টেবিলে ছড়িয়ে বিশেষ কোনো একটা পাতার সন্ধান করছিলেন বড় ব্যাকুল হয়ে। প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না, তারপর খুঁজতে খুঁজতেই বললেন, ক্যান্টিনে দেখেছিলাম যেন! ক্যান্টিনে খোঁজ করুন।

ক্যান্টিনটা কোথায়, সেটা জিগ্যেস করতে আর ভরসা হলো না আবদুল হাদীর। এখানে ছুটকো কাজের প্রত্যাশী সে, কাউকে বিরক্ত করে সে বিরাগভাজন হতে চাইল না। বেরিয়ে এল লিফটের কাছে। সেখানে একজনকে জিগ্যেস করে ক্যান্টিনে যখন ঢুকল তখন খাবার ঘ্রাণে তার ভেতরটা পাকিয়ে উঠল হঠাৎ। তার মনে পড়ে গেল, সারা সকাল কিছু খাওয়া হয় নি তার। বড় মুষড়ে পড়ল সে খিদেয়; বড় অসহায় মনে হলো নিজেকে।

কিন্তু কোথায় শরীফ আলী ? মাটির একতলা নিচে বিরাট এই ক্যান্টিনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা একবারে চোখে পড়ে না, ঘরখানা মাঝখানে ঈষৎ বাঁক নিয়েছে, আর দুপুরের খাবার সময়ে ভিড়ও এত যে চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়।

বাঁকটা ঘুরে সে এগিয়ে গেল। তখন তার চোখ পড়ল শরীফ আলীর ওপর। আর সঙ্গে যাকে দেখল, বিস্মিত হয়ে গেল দেখে। বাহাউদ্দিন বসে আছে।

এখানে বাহাউদ্দিন ?

মাবুদ খানকেও দেখা গেল। সে পানি আনতে গিয়েছিল, তিনটে কাগজের গ্লাস সাবধানে এক গোছায় ধরে সে এখন ওদের মাঝখানে বসে পড়ল।

কী বলছে শরীফ বাহাউদ্দিনকে ? বাহাউদ্দিনই বা এত নিবিষ্ট মনে কী শুনে চলেছে ?

আবদুল হাদীর কোনো সংশয় থাকে না যে, আলাপটা হচ্ছে মি. মুস্তাফাকে নিয়েই। ঠিক এই সময়ে সেখানে হাজির হওয়া, হয়তো তাকে দেখে বাহাউদ্দিন নিজেকে গুটিয়ে নেবে—

বিঘ্ন ঘটায় শরীফ হয়তো চটে যাবে, আবদুল হাদী কী করবে ভেবে পেল না।

তখন মাবুদ খান তাকে দেখে ফেলল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে শরীফকে সে কিছু বলল আর শরীফ তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে প্রায় আধো উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে ডাকতে লাগল আবদুল হাদীকে।

কাছে আসতেই বলল, আরে ভাই, তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি হই অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি তো এখনো খাও নি? যাও, খাবার নিয়ে এস। বলেই শরীফ আলী পকেট থেকে এক পাউন্ড বের করল।

না, না, এখন খাব না। আছে, আমার কাছে পয়সা আছে। তোমাকে না দেখে ভাবলাম, চলে গেলে কি-না।

আসলে প্রচণ্ড খিদে পেলেও বাহাউদ্দিনের সামনে শরীফের কাছ থেকে নগদ টাকা নিতে পারল না সে। তিনজনের সমুখে খাবার ভর্তি প্লেটের দিকে একবারও তাকাবে না সে প্রতিজ্ঞা করল, কিন্তু বারে-বারেই তার চোখ পড়তে লাগল খাবারের ওপর।

বাহাউদ্দিন তাকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। একবার শুধু বলল, আপনি এখানে আসেন না-কি?

হাঁ, আসি।

বাহাউদ্দিন হাতঘড়ি দেখে নিয়ে তখন শরীফকে বলল, ইস, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। আপিসে ফিরিয়া যাইতে হয়।

আবদুল হাদী কৌতুক অনুভব না করে পারল না যে, সেও যেমন বাহাউদ্দিনের সমুখে টাকা নিতে চাইল না, বাহাউদ্দিনও তেমনি তার সমুখে বাবার প্রসঙ্গ আর নাড়াচাড়া করতে চাইছে না।

মাবুদ খান মাংসের একটা হাড় নিপাট করে চুষে প্লেটের কোণায় সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে কনুই দিয়ে বাহাউদ্দিনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বলল, মেনে যাও, দোস্ত; মেনে যাও। শরীফ যা বলছে চুপচাপ মেনে যাও।

হু।

কী হু? মাবুদ খান আরেকটা খোঁচা দিল বাহাউদ্দিনের পাঁজরে। বলল, তুমি ভাবছ, তোমার বাবা ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারবেন? পারবেন না। পাকিস্তান হাইকমিশনের নিজেদের ডাক্তার আছে, পরীক্ষা করাবেই তারা, তখন দেখবে অসুখ-টসুখ কিচ্ছু না, তখন কী করবে?

আব্বা কিন্তু সত্যিই অসুস্থ।

আমরা তো বলছি না, উনি অসুস্থ নন। শরীফ আলী কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় উচ্চারণ করল।

মাবুদ খান খাবার প্লেট শেষ করে টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে মিষ্টির বাটি হাতে নিল। বলল, আমাদের কাছে লুকিয়ো না। অসুখ-ফসুখ কিচ্ছু না। তোমার বাবা চান ক'টা দিন মাথা নিচু করে থাকতে, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজ বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট তোমাকে জোগাড় করে দেওয়া হচ্ছে, তার ওপরে তোমার ঐ পাকিস্তান হাইকমিশনের কাবাব খাওয়া মেড়ো ডাক্তারের কথা চলবে না। জান তো, বাংলাদেশের প্রতি

সহানুভূতিশীল বহু বড়-বড় ইংরাজের ভেতরে চিকিৎসকও রহিয়াছেন; তাঁহারা ইতিমধ্যেই এরূপ দুই-একখানি সার্টিফিকেট যে লিখেন নাই, তাহা নহে। মেনে যাও দোস্ত, মেনে যাও। তাড়াহুড়া নেই। তোমার আব্বাকে বল, বাংলাদেশ হলে বলা যায় না পতাকাশোভিত শকট তাঁহার হইতেও পারে। বলে মাবুদ খান শরীফ আলীর দিকে চোখ টিপল দ্রুত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে যেতে হচ্ছে দোস্ত। বাংলা বেতার প্রচার এক্ষুণি শুরু হইবে।

মাবুদ খান চমৎকার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ভিড়ের ভেতর দিয়ে স্টুডিওর দিকে চলে গেল।

আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি। মাবুদ খান চলে যাবার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বাহাউদ্দিনও উঠে দাঁড়াল।

কফি খাবে না? কফি খেয়ে যাও।

না, না, আপিসে দেরি হয়ে যাবে।

আবদুল হাদীর দিকে না তাকিয়ে, কোনো সম্ভাষণ না করে— যেন সে উপস্থিতই নেই, বাহাউদ্দিন শরীফ আলীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবদুল হাদী বলল, বাহাউদ্দিন এখানে হঠাৎ?

মাবুদকে দিয়ে ফোন করিয়ে ডেকে এনেছিলাম। আমি দেখা করতে চাইলে গাঁই-গুঁই করত। শালা, বোঝ না, শেখ মুজিবের ছবি পর্যন্ত দেয়াল থেকে নামাতে পারে? লন্ডনে বসেও পাকিস্তানিদের ভয়ে পুত-পুত করে। তোমার কথা বল নি বুঝি?

না, পাগল! মাবুদের সঙ্গে তো হেন লোক নেই যার সদ্ভাব নেই। পারেও বটে। দ্যাখ, সেটা কাজেও দিল। মাবুদের সঙ্গে চুপচাপ লাঞ্চ খেতে এসে দ্যাখে— আমি হাজির। দিলাম একটু টাইট।

মানে?

ভয় দেখালাম, বাপু, পাকিস্তানের সঙ্গে আছ ভালো কথা, বুঝে শুনে থেকো। লন্ডনে ওদের হাইকমিশনের মাটির নিচের ঘরে জেলখানা আছে, একটু সন্দেহ হলেই শ্রীঘরে ঢোকাবে।

বল কী? আবদুল হাদী বিস্মিত হয়ে গেল। বলল, এটা তো ইংল্যান্ড, পাকিস্তান নয়। এখানে ওরা বন্দি করবে কী করে? পারে তা?

পারে না-পারে সে তো পরের কথা। কে টের পাচ্ছে? হাইকমিশনের ভেতরে তো আর এ দেশের কোনো হাত নেই। তুমি গেলে তোমাকে যদি পিছমোড় করে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়, তুমি করবেটা কী? এ-রকম হয়েছে। তুমি কি মনে কর মি. মুস্তাফা ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি বলে তাকে রেয়াত করবে? একটু সন্দেহ হলেই গুম করে দেবে।

শুনে ভয় পেয়ে গেল খুব?

পাবে না? বললাম, ধর এই বিবিসিতেই কি লোক নেই? পাকিস্তান হাইকমিশনে গিয়ে যদি বলে যে, দেখে এলাম মি. মুস্তাফার ছেলে বাহাউদ্দিনের সঙ্গে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির শরীফ আলী লাঞ্চ খাচ্ছে, গুজগুজ করছে, তখন?

আর ঐ যে ইংরেজ ডাক্তারের কথা বললে?

হাঁ, বললাম। টোকা দিয়ে দেখলাম, অসুখের কথাটা সত্যি কি-না।

কী মনে হলো তোমার?

অসুখ হয়তো একটা কিছু আছে। বুড়ো মানুষ কার না থাকে ? তারই সুযোগ নিয়ে এ দেশে থাকতে চাচ্ছেন। আমলাদের ধড়িবাজি, কোনো রকমে থেকে যেতে পারলে, পরে গলা উঁচু করে বলতে পারবেন— দ্যাখ, আমি পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেখানে আর ফিরে যাই নি, বাংলাদেশের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি, আগড়ম-বাগড়ম।

আচ্ছা, ইংরেজ ডাক্তারের সার্টিফিকেট কি পাকিস্তান বিশ্বাস করবে ?

দূর, তুমিও ক্ষেপেছ ? তার জন্যে আমাদের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ইংরেজ ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করি যাতে পাকিস্তান তাকে সন্দেহ না করে। ওটা মন পরীক্ষা করবার জন্যে বলেছি। আমরা তো ওকে চুপচাপ থাকতে দিতে চাই না। আমরা ওকে বের করে আনতে চাই।

এতই জরুরি ওঁকে আনা ?

ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি, বোঝ না ?

একটু চুপ করে থেকে আবদুল হাদী না বলে পারল না— তখন একটা পাউন্ড দিতে চাচ্ছিলে, পাঁচটা দিতে পার ? একেবারে কিচ্ছু নেই।

শরীফ আলী মৃদু তিরস্কার করে উঠল তাকে।

তখন বললাম, আমার পুরনো কোট দিয়ে চালিয়ে নাও। তুমি নতুন একটা জ্যাকেট কিনে বসলে। এভাবে কদ্দিন চলবে ? পাঁচটা পাউন্ড বের করে দিয়ে বলল, চল দেখি, স্টুডিওতে যাই। সর্বশেষ সংবাদ শুনিয়া আসি। বেতার সম্প্রচার শেষ হইলেই সিরাজ ভাইকে তোমার কথা বলিব।

এখন বাংলাদেশের সর্বশেষ খবর শোনার চেয়ে কিছু খেয়ে নেবার জন্যেই ব্যাকুলতা তার বেশি। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। আজ দুপুরেও কিছু খাওয়া হলো না তার।

সেদিনই দুটো ইংরেজি কথিকা অনুবাদ করবার কাজ পেয়ে গেল সে। পরের দিন রেকর্ডিং হবে। মাবুদ খান তাকে ভরসা দিয়ে বলল, কোনো দিন রেডিওতে বলেন নি, তাতে কী ? দু'দিনেই দেখবেন কেমন তুখোড় হয়ে গেছেন।

পারব তো ?

পারবেন না কেন ? বিবিসি চলেই তো কাঁচামাল দিয়ে।

তার মানে ?

এখানে তৈরি কথক পাবেন কোথায় ? কেউ ছাত্র, কেউ ঘরের বৌ, এদেরই ধরে ধরে অনুষ্ঠান করাতে হয়, ঘষে-মেজে নিতে হয়। এই বিবিসি-র পয়সায় কেবল লেখাপড়ার খরচাই ওঠায় নি, যাবার সময় দু এক জন গাড়ি ফাড়িও নিয়ে গেছে।

বলেন কী ? এত পয়সা দেয় ?

বেশি আশা করবেন না। একেকটা অনুষ্ঠানে যা দেয় তা দিয়ে ভালো একটা মেয়ের সঙ্গে সন্ধের খরচও কুলোয় না।

বললেন যে গাড়ি নিয়ে গেছে কেউ কেউ।

সে তেমন কিপটেপনা করলে আপনিও পারবেন। দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবেন, কাউকে না-

চা, না-পানি, আত্মাকে কষ্ট দেবেন, আপনিও ও করলে গাড়ি বানাতে পারবেন।

গাড়ি দিয়ে কী করব ? কোনো রকমে খরচটা উঠে গেলেই যথেষ্ট।

আপনাকে দু' একটা শলা দিই। কিছু মনে করবেন না, দেশ থেকে এসেছেন, বাপের দেয়া হাড্ডিগুলো ঠিক রাখতে হবে তো। রোজ আসবেন বিবিসি-তে, কাজ থাক-না-থাক, রোজ এসে চেহারা দেখিয়ে যাবেন। অনেক সময় কাজের লোক দরকার, ফোন করে ডেকে আনার সময় নেই, হাতের কাছে আপনি আছেন, ব্যাস, আপনার দুটো পাউন্ড হয়ে গেল। আবার কেউ হয়তো আসতে পারল না কথা দিয়ে, আপনাকে জুড়ে দেওয়া হলো। একটা কথা বলে রাখি, লজ্জা করবেন না। আপনার দরকার ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবেন।

মাবুদ খান তাকে অনুবাদেও অনেক সাহায্য করল। দেখিয়ে দিল বেতারের জন্য মুখের কথার মতো কীভাবে লিখতে হয়।

ঘাবড়াবেন না, হাদী সাহেব। একবার কায়দাটা ধরতে পারলেই দেখবেন তরতর করে অনুবাদ বেরিয়ে আসছে। ইংরেজি সেনটেনস ধরবেন ল্যাজার দিক থেকে, ধরে মুড়োয় চলে আসবেন। ইংরেজিতে সেনটেনসের শেষে যে কথাটা, বাংলায় দেখবেন ওটাই আমরা প্রথমে বলি।

আবদুল হাদী অবাক হয়ে লক্ষ করল, তাই তো, কথাটা তো মন্দ বলে নি। তার ভারি মজা লেগে গেল, ভীষণ উৎসাহে সে একটা কথিকা অনুবাদ করে উঠল।

আমাকে কিন্তু দেখিয়ে দেবেন মাবুদ ভাই, মাইকের সামনে কী করে বলতে হয়।

দেব, দেব। কাল আপনার ঐ রেকর্ডিংয়ে আমিও আছি। পঁচিশে মার্চ ফেস করেছেন আর মাইক ফেস করতে পারবেন না ?

পর পর কয়েকদিন সে গেল বিবিসি-তে। প্রতিদিনই একটা না একটা কাজ পেল সে। কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা পয়সা দেয় না. কিন্তু তাতে কী ? পয়সা যখন জমা হচ্ছে, আবদুল হাদী বুকে বল নিয়ে ধার চাইতে কোনো বাধা দেখল না।

সেই মাবুদ খানই তাকে হুঁশিয়ার করে দিল। বলল, ভাইরে, আপনার ঠ্যাকা, আপনাকে তো হাত পাততেই হবে। কিন্তু বাঙালির চিরাচরিত অভ্যেসটি ত্যাগ করবেন।

কী রকম ?

ধার নিলে ধার শোধ করবেন।

লজ্জা পেয়ে গেল আবদুল হাদী। মাবুদ খানের কাছেই তার পনেরো পাউন্ড ধার হয়ে গেছে। শরীফ আলীর কাছ থেকেও অনেক নেওয়া হয়ে গেছে।

দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে লাগল সে, সকাল থেকে রাত অবধি কাটাতে লাগল বিবিসি-তে। সেটা কেবল ধার শোধ দেবার জন্যে নয়, পাউন্ড রোজগার করবার জন্যে নয়, বিবিসি-র বাংলা বিভাগে সারাক্ষণ হুল্লোড়, গল্প, মানুষের সঙ্গ তাকে মাতিয়ে রাখল। লন্ডনে হেন বাঙালি নেই যে একবার অন্তত বিবিসিতে ঢুঁ না মেরেছে। আর এখন তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সারাক্ষণ বাঙালিরা আসছে, খবর নিচ্ছে, যারা আসতে পারছে না টেলিফোন করছে। সবারই এক জিজ্ঞাসা, এক প্রসঙ্গ— পাকিস্তানিরা কতখানি ঘায়েল হলো ? মুক্তিযোদ্ধারা কতদূর এগোল ? ভারত কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না ? শেখ মুজিব কি সত্যি-সত্যি বেঁচে আছেন ?

শনিবার দিন এমনিতেই বিবিসি বেশ ফাঁকা থাকে, বড় একটা ভিড় থাকে না, সেদিন শনিবারে আপিসের সবাই কাজ শেষে ক্যান্টিন বা ক্লাবে আর বসল না— কোথায় যেন কী একটা নেমন্তন্ন আছে, সবাই চলে গেল। সে, আবদুল হাদীই, কেবল রইল পেছনে।

বিষণ্ন হয়ে গেল তার মন। এখনো সে বিবিসি-র বাঙালি পরিবারের একজন হয়ে ওঠে নি, এটা উপলব্ধি করে ভারি নিঃসঙ্গ বোধ হলো তার। একটা বড় কথিকা অনুবাদের জন্যে পাওয়া গিয়েছিল, ভাবল বসে বসে সেটা অনুবাদ করে ফেলে। কিন্তু একা আপিসে বসতে তার গা কেমন ছমছম করে উঠল। যেখানে সারাক্ষণ এত কোলাহল সেখানে এই নিস্তব্ধতা বড় অস্বাভাবিক মনে হলো। সে বেরিয়ে পড়ল।

যাবে নাকি একবার অ্যাকশন কমিটির আপিসে। শরীফ আলীর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয় নি, ফোনেও কথা হয় নি। তারই সুবাদে নটিং হিল গেটে 'শাহানশাহ তান্দুরী' রেস্তোরাঁয় থাকবার জায়গা পেয়েছে; একেবারে খোঁজ-খবর না নিলে পাছে তাকে অকৃতজ্ঞ ভেবে বসে ?

সেই সঙ্গে নতুন করে মনে পড়ল তার মামার কথা। তিনি কি ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেলেন ? মামী আসবার কথা ইসলামাবাদ থেকে, এসে গেছেন কি ? মামাকে বাংলাদেশের পক্ষে টেনে আনবার কতদূরই বা কী করল শরীফ আলী ? না হয়, বাহাউদ্দিনের বাড়িতেই সে যাক ? মামার সঙ্গে দেখা করে আসবে। সেই রাতে মামার অনবরত পাশ ফেরা আর কাতর ধ্বনি করা ঘুরে ফিরেই মনে পড়তে লাগল তার।

শেষ পর্যন্ত কোথাও গেল না আবদুল হাদী। প্রধান একটা কারণ, যেতে গেলেই ট্রেন ভাড়া লাগবে; তার চেয়ে শাহানশাহ তান্দুরী রেস্তোরাঁতেই ফেরা যাক। পরশুদিন সে মাসিক একটা টিকিট করে নিয়েছে। ঘরে গিয়ে বরং অনুবাদটা করে ফেলবে সে। রেস্তোরাঁর মালিক মোসলেম মিয়া আজ সকালে বলেও ছিল যে, শনিবার রাতে খদ্দের বেশি হয়, আবদুল হাদী যদি পারে একটু সাহায্য করে যেন বিল বানাতে।

শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল দ্বিতীয় দিনেই; মোসলেম মিয়া আবদুল হাদীকে তাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে বলেছিল। তারই বিনিময়ে আবদুল হাদী নিজে থেকেই বলেছিল, কখনো লেখাপড়ার কিছু দরকার হলে তাকে বলতে যেন ইতস্তত না করে। সেই থেকে প্রায় প্রতিদিনই রাতে, রেস্তোরাঁয় ভিড় যখন পাতলা, আবদুল হাদী ইংরেজি খবর কাগজ থেকে বাংলাদেশের খবরগুলো অনুবাদ করে শুনিয়েছে মোসলেম মিয়াকে, কোনোদিন একটা চিঠি লিখে দিয়েছে, আবার কখনো টেবিল সাজাতেও সাহায্য করেছে।

রেস্তোরাঁর ওপরতলায় থাকবার ব্যবস্থা, সেখানে যেতে হলে রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়েই যেতে হয়। কাচের দরোজা ঠেলে ঢুকতেই আবদুল হাদী বিস্ময়ে খুশিতে স্থাণু হয়ে গেল।

পেছন থেকেও নিকোলাকে চিনতে তার এতটুকু দেরি হলো না। মুখোমুখি যে বসে আছে, আগে তাকে কখনো দেখে নি আবদুল হাদী। মাঝবয়সী শ্বেতাঙ্গ এক ভদ্রলোক। গালের সঙ্গে লাগিয়ে ছাঁটা সোনালি দাড়ি, কপালে স্থায়ী কুঞ্চন, মুখখানা অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর।

দুজনে ঝুঁকে পড়ে মেনু দেখছে।

আবদুল হাদী ভুলেই গিয়েছিল যে, নিকোলা এই নটিং হিল গেটেই থাকে; বাড়ির কাছে কোথাও ভারতীয় খাবার খেতে হলে এখানে আসাটাই স্বাভাবিক।

বিস্ময়টা তাই প্রথমে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেও এখন অতটা বিস্ময়কর মনে হলো না। থাকতে পারত তার খুশিটুকু, কিন্তু গম্ভীর চেহারার ঐ লোকটিকে দেখে তাও উবে গেল।

ইতস্তত করে এগিয়ে গেল সে। নিকোলাকে এড়িয়ে ভেতরে চলে যাবার ইচ্ছে তার নেই, আবার ছুটে গিয়ে সম্ভাষণ করবার উৎসাহও সে আয়ত্ত করতে পারল না।

কাছে গিয়ে ছোট্ট করে ডাকল, নিকোলা।

এক মুহূর্ত তাকে যেন চিনতে পারল না নিকোলা। তারপর উদ্ভাসিত হয়ে বলল, আরে তুমি ? তুমি কোথা হইতে ? ভালোই হইল, তুমি সাহায্য করিতে পারিবে। নৈশভোজ করিতে আসিয়াছ ?

না। এই রেস্তোরাঁর দ্বিতলে বাসা লইয়াছি।

নিকোলা তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, আর আমাকে জানাও নাই। এত নিকটে বাসা লইয়াছ, একবার সাক্ষাৎ কর নাই। মেরভিন, আলাপ করাইয়া দিই।

মেরভিন নামে এই লোকটি তখন দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে মেনু দেখে চলেছে। আবদুল হাদী লক্ষ না করে পারে না যে, তার এই মেনু দেখাটা ভান মাত্র। আসলে সে বিরক্ত বোধ করছে।

নিকোলা ছোঁ দিয়ে মেনুটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল। বলল, দশ মিনিট কাল মেনু দেখিতেছ, মনঃস্থির করিতে পারিতেছ না। আবদুল আমাদিগকে পছন্দ করিতে সাহায্য করিবে। মেরভিন মার্শাল, টেলিভিশন চিত্রপরিচালক। আর আবদুল হাদী— বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে পরিচয় স্বীকার করল মেরভিন, তারপর পাইপ বের করে দেশলাইয়ের জন্যে এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াতে লাগল। মোসলেম মিয়া দ্রুত এসে দেশলাই দিল তাকে। মোসলেম মিয়া দেখে নিক, মেম সাহেবের সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব আছে।

নিকোলা বলল, খাবার পছন্দ করা লইয়া আমাদের বচসা হইতেছে। মেরভিন ভারতীয় রন্ধন পছন্দ করে। কিন্তু যখনি সে রেস্তোরাঁয় আসে, মেনু লইয়া গম্ভীর মুখে পাঠ করে, অন্তিমে সেই একই খাদ্যের অনুরোধ করিয়া থাকে। নানরুটি ও মুর্গি তান্দুরি, কাশমিরি কোরমা ও চিংড়ি দোপিঁয়াজা। আজ বলিয়াছি অন্য কিছু লইতে। ভাবিয়া কূল পাইতেছে না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি পছন্দ করিয়া দিতেছি। ঝোঁকের মাথায় আবদুল হাদী এও বলে ফেলল, আমি তো আহার করিব। আমি নিমন্ত্রণ করিতেছি।

গম্ভীর খসখসে গলায় মেরভিন বলল, আমরা বসিব না। খাবার কিনিয়া বাড়ি যাইব।

একটু উদ্বিগ্ন দেখাল নিকোলাকে। মেরভিনের হাতের ওপর আলতো করে হাত রেখে সে বলল, হাঁ, সেইরূপ কথা ছিল বটে, খাবার লইয়া বাড়িতে খাইব। কিন্তু আবদুল হাদী বলিতেছে।

খাবার কিনিয়া বাড়ি যাইব। মেরভিন নতুন কোনো বাক্য রচনা না করে আগের কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল। ফলে কিছুটা রূঢ় শোনাল তার উক্তি।

তার হাতের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল নিকোলা। সত্যই তুমি রেস্তোরাঁয় আহার করিতে চাও না ?

নিকি, আজই আমাকে চিত্রনাট্য পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। সে কারণেই আমার আসা।

হাঁ, তোমার সময় সংকীর্ণ; আগামীকালই তো প্রযোজককে মতামত জানাইতে হইবে। নয়?

হাঁ।

আবদুল হাদী ভেবে পেল না এরপর নিকোলা আশা করে কিনা যে সে মেনু পছন্দ করে দেবে।

নিকোলা মেরভিনকে বলল, তবে সময় নষ্ট করিয়া কাজ নই। নানতান্দুরি বলিয়া দিই?

মন্দ নহে।

কোরমা বলিব কি?

আজ আমার অতটা ক্ষুধা নাই। তুমি তো জান, কাজের সময় আমি বিশেষ আহার করিতে পারি না।

ঘরেও তো তোমার বিশেষ আহার জুটে না।

মেরভিন চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করল আবদুল হাদীর দিকে। বলল, হাঁ, নরকে আহারের কোনো বন্দোবস্ত ঈশ্বর রাখেন নাই। আহারের বদলে আহার্যে পরিণত হওয়াই নরকবাসের লক্ষণ।

প্রসঙ্গটা ভালো বুঝতে পারল না আবদুল হাদী। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। নিজেও কোনো প্রসঙ্গ তুলতে পারল না। নিকোলার সঙ্গে মেরভিন এমনভাবে কথা বলে চলল যেন আবদুল হাদী সেখানে উপস্থিত নেই।

চিত্রনাট্যের প্রথম দৃশ্যই আমার কাছে দুর্বল মনে হইতেছে। শেষ পর্যন্ত না পড়িয়া অবশ্য কিছুই বলিতে পারিতেছি না। প্রয়োজন হইলে আমি প্রথম দৃশ্যের নতুন একটি খসড়া করিব। তুমি শ্রুতিলিখন লইতে পারিবে তো?

আজ রাত্রেই?

হাঁ। সম্ভবত আজ রাত্রেই। আমার মন দ্রুত কাজ করিতেছে।

তোমাকে ঘরে ফিরিতে হইবে না?

হাঁ, হাঁ, ফিরিতে হইবে।

নিকোলা চুপ করে রইল।

সেই অবসরে আবদুল হাদী বলল, খাবার তৈরি হইতে বিলম্ব হইবে। কোকো-কোলা পান করিবে?

মেরভিন নিঃশব্দে ভ্রূ তুলে রাখল একথা শুনে।

নিকোলা বলল, আমার আপত্তি নাই। মেরভিন হয়তো বিয়ার পছন্দ করিবে।

প্রয়োজন নাই।

আমি তৃষ্ণার্ত। হাদী, আমাকে বরং কিনতে দাও।

না, তাহা হইবে না।

আবদুল হাদী উঠে গিয়ে মোসলেম মিয়াকে পানীয়র কথা বলে এল।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বিয়ার পান করবার পর মেরভিনের হয়তো মনে হলো, আবদুল হাদীর

সঙ্গে আদৌ সে কথা বলে নি। সে এবার তার দিকে মনোযোগ দিল।

আপনি বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছেন ?

হাঁ, মেরভিন, তিনি একটি মিশনে আসিয়াছেন।

আবার ভ্রূ তুলল মেরভিন মার্শাল। এক চুমুকে গ্লাসের বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছে গড়গড়ে গলায় বলল, আপনারা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতেছেন না কেন ?

ভারত ভিন্ন রাষ্ট্র।

সেদিন পর্যন্ত ভিন্ন ছিল না।

হাঁ, ছিল না।

ভারত-ভাগ আমি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। ইতিহাসের ইহা অভিপ্রেত ছিল না। তাই আজ পাকিস্তান ভাঙিয়া যাইতেছে। আগামীকাল ভারতও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে।

যাইতে পারে।

আপনারা একটি মহান সভ্যতাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন।

নিকোলা বলল, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তুমি ফিরাইতে পার না।

নিকোলার কথায় জোর পেল আবদুল হাদী। সে বলল, হাঁ, অবশ্যই। বর্তমান অবস্থা এই— বাঙালি একটি জাতি, বাংলাদেশ সেই জাতির আবাসভূমি, আমরা সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছি।

মেরভিন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল, উগ্র জাতীয়তাবাদ কখনোই কোনো জাতির উপকারে আসে নাই। আমি মনে করি, আপনারা ভুল করিতেছেন। আপনাদের পূজ্য দেবদেবী সংখ্যায় যেরূপ বহু, রাষ্ট্রের সংখ্যাও আপনারা বহু করিতে চাহিতেছেন।

আপনি হিন্দুদের কথা বলিতেছেন। আমরা বাংলাদেশে অধিকাংশই মুসলমান।

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলিয়াই মুসলমানরা বিশ্বে এক রাষ্ট্রে বাস করিতেছে এ-মত নহে।

আপনি কী বলিতে চাহিতেছেন ? স্পষ্ট হইল না।

লক্ষ করিয়া দেখিবেন, অনুন্নত দেশগুলোই ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে। অন্যপক্ষে, উন্নত দেশগুলো ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, কার্যত এক রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে।

হাঁ, অনুন্নত দেশগুলোকে পদানত রাখিবার জন্যই উহারা এক হইতেছে।

তোমরা কী শুরু করিলে বল তো। নিকোলা কোমল গলায় তিরস্কার করে উঠল।

মেরভিন তবু থামল না। নিকোলাকে উপেক্ষা করে সে রুষ্ট হয়ে বলল, এবং অনুন্নত দেশগুলো ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া সেই সুযোগ করিয়া দিতেছে।

ঠিক তখন মোসলেম মিয়া খাবারের প্যাকেট এনে সমুখে ধরল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে নিকোলা বলল, হাদী, কাছেই তো আছ। একবার আসিও।

সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না আবদুল হাদীর চোখে। মেরভিনের রাজনৈতিক মতামত মোটেই তার ঘুম হরণ করে নি, করেছে মেরভিন স্বয়ং। কে এই মেরভিন মার্শাল ?

নিকোলার সঙ্গে কী তার সম্পর্ক ? তখন ঐ যে নিকোলা বলেছিল, ঘরেও তো তোমার বিশেষ আহার জুটে না। আবদুল হাদী নিশ্চিত যে এর ভেতরে গূঢ় একটা ইঙ্গিত আছে। কী সেই ইঙ্গিত ? মেরভিনকে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাতে নিকোলা এত উদ্বিগ্ন কেন ? কেন মেরভিন কী একটা কথা বলবার আগে চকিতে একবার আবদুল হাদীকে দেখে নিয়েছিল ? কেন নিকোলা জোর করে বলতে পারল না, আবদুল হাদীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে রেস্তোরাঁতেই খাবে ?

মেরভীনকে ভীষণ ঈর্ষা করতে করতে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

১০

রোববারে বিবিসি-তে তার কাজ নেই; ঘুম থেকে উঠেই আবদুল হাদী ভাবল, শরীফ আলীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। কাল থেকেই ভাবছিল, আজ ইচ্ছেটাকে কাজে পরিণত করবার উৎসাহ পেল সে।

শরীফ আলীকে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে ধরতেই সে বলল, যাবে না-কি হে মামার সঙ্গে দেখা করতে ?

মানে ?

মামা, তোমার মামা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি হন ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি। মি. সালাউদ্দিন মুস্তাফা। যাইবে ?

তুমি যাচ্ছ না-কি ?

হাঁ।

রাজি হলেন বুঝি ?

বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে ? না বন্ধু, না।

তাহলে যাচ্ছ কেন ?

রগড় দেখবে তো চল। তোমার তো অচলাভক্তি মামার ওপর।

কী যে বল! মামা হন, মামা হন। সাত-আট বছর পরে দেখা।

না, সেদিন আমলাদের কথা বললাম, মনে হলো তুমি স্বীকার করলে না। চল দেখবে ধড়িবাজি কাকে বলে। আমি তোমাকে নিয়েই যেতে চাই।

শরীফ আলীর টাই-বাঁধা মুগ্ধ চোখে দেখল আবদুল হাদী। নাচের মুদ্রায় আঙুলগুলো বাঁকিয়ে, আয়নায় একটুও না দেখে, কী দ্রুত গতিতে টাই বাঁধতে পারে সে! বাঁধা হয়ে গেলে ঝুল ধরে আলতো একটা টান দিয়ে শরীফ আলী যখন এক ঝলক একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিল তখন আবদুল হাদী জানতে চাইল, তোমার সঙ্গে মামার দেখা হয়েছিল ?

না, হয় নি। ফোনে কয়েকবার কথা হয়েছিল। চল, বেরিয়ে পড়ি। হাসানকে তুলে নিতে হবে।

কে হাসান ?

আমাদের একজন। দলেবলে যাচ্ছি, সাক্ষী নিয়েই যাচ্ছি, তোমাকে নিয়ে দুজন হলো, ভালোই হলো।

সাক্ষীটা বুঝতে পারলাম না।

দরোজায় তালা দিয়ে শরীফ আলী বলল, তুমি কী মনে কর, পাকিস্তানের এক দালালের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলতে যাচ্ছি, একা যাব?

আহ, কী যে বল! একা গেলে কি মারধোরের ভয় করছ?

মারধোর নয়, হাদী, মারধোরের কথাই নয়। একা দেখা করতে যাই, পরে সারা লন্ডনে রটে যাক যে শালা শরীফ আলী দু'নৌকায় পা দিয়েছে, তাই না?

অবাক হয়ে গেল আবদুল হাদী।

বল কী? এ-রকম কথা কে বলবে?

আছে, আছে, লোক আছে। বাংলাদেশের নামে সব পাগলই কি এক জাতের পাগল? আমাদের মধ্যেই ডিভিশন আছে হে। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ফোন করে দিয়েছ তো যে আসছ?

শরীফ আলী মৃদু হাসল। খুব উপভোগ করে নীরবে হাসল। তারপর সংক্ষেপে বলল, নাহ্। করি নি। ফোন করলে যদি বলে বেরিয়ে যাচ্ছি, অন্য সময়ে এস।

পাবে তো অতদূর গিয়ে?

রোববারের সকাল তো? নিশ্চয়ই পাব। লন্ডন শহরে বাঙালির অন্তত আরেক বাঙালির বাড়ি ছাড়া যাবার জায়গা নেই। বিশেষ করে রোববারে। মি. মুস্তাফা যে বর্তমান সময়ে বাঙালি পাড়ায় বেড়াইতে উৎসাহ বোধ করিবেন না, তাহা নিশ্চিত। অতএব, তাহাকে গৃহেই পাইব।

হাসান দাঁড়িয়েছিল কিং ক্রস স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। তাকে দেখেই আবদুল হাদীর মনে পড়ল, বিবিসি-তে দু' একদিন দেখেছে। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শরীফ আলী বলল, ভাগনেকেও নিয়ে যাচ্ছি।

ও আপনে তার ভাগনে হন বুঝি?

শরীফ আলী তার মনের কথা আঁচ করতে পেরে অভয় দিল, ভাগনে হলেও মামার পক্ষে নয় হে। মি. মুস্তাফাকে ওর সামনে তুমি 'শালা, শুয়োরের বাচ্চা' বললেও ও কিছু মনে করবে না। তাই বলে তুমি আবার মুখ খুলতে যেও না। ওখানে গিয়ে কথা যা বলবার আমিই বলব। মনে রাখিও, সে অত্যন্ত মুশকিলের মাছ।

আবদুল হাদী ট্রেনে বসেই হাসান আর শরীফের আলাপ থেকে বুঝতে পারল মি. মুস্তাফাকে আজো একবার ধড়িবাজ কেন বলা হয়েছিল। বাহাউদ্দিনের মারফত তিনি প্রথমে খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছিলেন— বড়-বড় অফিসার যারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে, তাদের কী রকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হচ্ছে, তারা মাসিক টাকা পাচ্ছে কি না, পেলে কত করে পাচ্ছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কে কোন পদ পাবে ঠিক হয়ে আছে কি না এইসব। তারপর তিনি নিজেই তার চেনা কিছু বাঙালির কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেন, লন্ডনে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি কি নেহাৎ ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার, না এদের পেছনে বৃটিশ সরকারের সমর্থন আছে? ভারতীয় হাইকমিশনের সমর্থনের কথা তাকে জানানো হলেও তিনি বারবার করে জানতে চান বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

হাসান বলল, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন, বাংলাদেশ পাকিস্তান এ-সব তার কাছে কিছুই না, নিজের স্বার্থটাই বড়। তবু কেন যে এর পেছনে লেগে আছেন ? এইসব লোক নিয়ে আন্দোলনের আরো বারোটা বাজাবেন।

প্রয়োজন আছে হে, প্রয়োজন আছে। যারা আমাদের পক্ষে এসেছে তারাও যে নিজের দিকটা খুব ছোট করে দেখছে, তা নয়।

হাসান তবু গজগজ করতে লাগল। বড় দু' একজনের নাম করে বলল, এঁরা যে আনুগত্য ঘোষণা করেছেন, এঁরা বাংলাদেশে বিশ্বাস করেন না, বলতে চান ? এঁরা সবাই স্বার্থপর ?

শরীফ আলী বলল, ছেলেমানুষ তো, কিচ্ছু বোঝ না। এই যে এঁদের ভাঙিয়ে আনছি আমরা, আমরা কি জানি না— এঁদের দিয়ে কাজ হবে কচু ? যুদ্ধ এঁরা করবে, আর তবে দেশ স্বাধীন হবে ? যুদ্ধ করবে তোমার আমার মতো লোক, এঁদের শুধু সঙ্গে রাখা। সঙ্গে রাখার বড় লাভ এই, দুনিয়ার কাছে পাকিস্তানের মুখ ছোট করা। দুনিয়া দেখবে, পাকিস্তান সরকারের বাঙালি বড় বড় চাঁই একের পর এক বাংলাদেশে যোগ দিচ্ছে। আর দেশের লোকেরাও তো মনের দিক থেকে সেই বৃটিশ আমলের ? দেশের লোক মনে জোর পাবে যে, বড় বড় কর্মকর্তা পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে চলে আসছে। ধর, তোমার এই ডাক্তার জাফরউল্লাহর কথাই ধর, সে যে বিলেতের চাকরি ছেড়ে, গাড়ি বেচে, নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সীমান্তে গেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে বলে, সেই জাফরউল্লার কথা বল— দেশের লোক গুরুত্বই দেবে না। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে একবার ঘোষণা হোক, অমুক দূতাবাসের অমুক তৃতীয় সেক্রেটারি, কি অমুক দপ্তরের অমুক কর্মকর্তা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন, দেশের লোক বলবে— এইবার পাকিস্তান কানা হবে।

মি. মুস্তাফাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। তিনি হিটারের তাপে পা ডুবিয়ে রবিবাসরীয় একতারা খবরের কাগজ নিয়ে বসে ছিলেন।

দরোজা খুলে ওদের দেখেই বাহাউদ্দিন একবার বলতে চেষ্টা করেছিল যে, তার আব্বার শরীর ভালো নয়, শুয়ে আছেন; কিন্তু শরীফ আলীর পা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।— তাই বলে এক পেয়ালা চা খাওয়াবে না ? এতদূর থেকে আমরা এলাম! বলে সে বাহাউদ্দিনকে এক রকম ঠেলেই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

মি. মুস্তাফা শরীফকে চাক্ষুষ দেখেন নি, আর হাসানকে এই প্রথম জানলেন। তাদের পরিচয় পাবার পর দু'জনের কাউকেই কিছু না বলে আবদুল হাদীকে বললেন, আর তো খোঁজ-খবর নিলে না।

এই একটু ব্যস্ত ছিলাম।

হ্যাঁ, লন্ডন তো ব্যস্ত মানুষেরই শহর। এখানে কে বসে আছে ? কার হাতে অফুরন্ত সময় ? নাইটিন হানড্রেড ফিফটি ওয়ানে আমি যখন লন্ডনে ছিলাম, ছিল, লোকের হাতে কিছুটা সময় ছিল, পথেঘাটে দেখা যেত লোকেরা গল্প করছে, এ ওর খোঁজ নিচ্ছে, ইংরেজরাও তখন খোলামেলা ছিল, সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে তো ? যুদ্ধের পর সব আবার এদের তখন সেরে তুলতে হচ্ছিল, তখনো রেশন ছিল— বলতে বলতে তিনি হঠাৎ লক্ষ করেন যে, যুদ্ধের কথা বলছেন, অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল তার, বেখাপ্পা রকমে তিনি থেমে গেলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন, আমার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। তুমি তো দেখেই গেছ, হাদী।

হাঁ, মামা।

তা তোমরা... অনিশ্চিতভাবে বাক্যটাকে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন তিনি।

শরীফ বলল, আমরা আপনার কাছেই এসেছি, স্যার।

'স্যার' সম্বোধনটা প্রীত করল মি. মুস্তাফাকে। ডাকটা বড় পরিচিত মনে হলো। তিনি হঠাৎ সবকিছু তার আয়ত্তে আবার পেয়ে গেছেন এ রকম একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে সবার দিকে তাকালেন।

শরীফ বলে চলল, আমরা বেশিক্ষণ বসব না। আপনারও শরীরটা ভালো নেই, আমরা জানি। কিন্তু আপনার বোধহয় আর দেরি করা ঠিক হবে না।

কীসের দেরি ?

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবার কথা বলছিলাম, স্যার।

ও।

পরিষ্কার বলে ফেলি, স্যার। আপনি পাকিস্তানের ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি ছিলেন--

মি. মুস্তাফার একবার মনে হলো 'ছিলেন' ক্রিয়াপদের এই অতীত রূপটি সংশোধন করে দেবেন নাকি ? কিন্তু কিছু না বলে নড়েচড়ে বসলেন কেবল।

আপনার সবই জানা আছে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে গত এক বছরে কীভাবে মূলধন, যন্ত্রপাতি পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নির্বাচনের পর। তাছাড়া এটাও তো স্যার আমরা জানি, খুব তাড়াহুড়োর সঙ্গে শেষ দিকে পশ্চিম পাকিস্তানকে যথাসম্ভব সর্বাংশে শিল্পায়িত করবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ইহাতে কি প্রমাণ হয় না পাকিস্তান নিজেই আর পাকিস্তানে বিশ্বাস করিত না ? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না, পূর্ব পাকিস্তানকে তাহারা সম্পূর্ণ শ্মশান বানাইবার চক্রান্ত করিয়াছিল ?

তোমাদের কথাটা কী ?

আমাদের কথা স্যার, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন, আপনার যোগ্য সম্মান মর্যাদা আপনাকে আমরা দেব, আপনি সরকারি গোপন তথ্যগুলো হিসেবগুলো প্রকাশ করে দেবেন— এই এতটুকু আপনাকে করতে হবে। স্যার, আপনার চিন্তা কী ? আপনার ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে, মিসেস মুস্তাফাও লন্ডনে চলে আসছেন। আপনার চেয়ে অনেক মুশকিলে থেকে অনেকেই বাংলাদেশে যোগ দিয়েছে। কেন দিয়েছে ? কারণ বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি তাদের একটা কর্তব্য আছে। আপনারও আছে, স্যার। আপনাকে আমরা আর কী বোঝাব, আসলে আপনারাই তো নেতৃত্ব দেবেন, আমরা কাজ করব।

শরীফ আলীর অতি বিনীত ভক্তিভাব দেখে আবদুল হাদীর বেশ মজাই লাগল। কাজ উদ্ধার করবার জন্যে এত চমৎকার অভিনয় সে করতে পারে, আগে তার জানা ছিল না। কৌতুকের সঙ্গে সে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল মি. মুস্তাফার।

নেতৃত্ব দেবার কথাটা যে মি. মুস্তাফাকে বেশ খুশি করেছে তা আবদুল হাদীর দৃষ্টি এড়াল না। শরীফও সেটা লক্ষ করে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে উঠল, আপনি এলে আমরা ভীষণ জোর পাই, স্যার। আপনি তথ্যগুলো দিলে, স্যার, দেখবেন এখানকার সব কাগজে বড় বড় করে ছাপা হবে, আলোচনা হবে, জাতিসংঘে আমাদের দূত রয়েছেন, তিনি সদস্য দেশগুলোকে

আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন, বোঝাবেন— হয়তো স্যার, আপনার জন্যেই আমাদের স্বীকৃতি পাওয়া এগিয়ে আসবে।

জাতিসংঘে তোমাদের দূত আছে না কি ?

আছে, স্যার।

কিছু এগুতে পেরেছে সে ? জাতিসংঘে খুব অভিজ্ঞ লোক দরকার।

স্যার, অভিজ্ঞ লোকেরই তো অভাব আমাদের।

তোমরা একটা সরকার করেছ শুনেছি। আমি অবশ্য অফিসিয়ালি তোমাদের সঙ্গে এ আলোচনা করতে পারি না, তবু দেশের ছেলে তোমরা, দেশকে ভালোবাস, আমিও দেশকে কিছু কম ভালোবাসি না। তা তোমাদের মুখে, এর-ওর-তার মুখে বাঙালিদের একটা সরকার হয়েছে যখন শুনি, খুশিই লাগে। তবে, ক্যাবিনেটেও তো আগে মন্ত্রী ছিল এমন কারো কথা শুনলাম না। তাজুদ্দিন অবশ্য খুব মাথাওয়ালা লোক। একই সঙ্গে পড়তাম। তবে, মন্ত্রীদের অতটা অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলে, আসল কাজ তো আর মন্ত্রীরা করেন না। তারা ভোটে আসছেন, ভোটে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, স্যার।

লন্ডন কি তোমাদের আনঅফিসিয়াল সেকেন্ড ক্যাপিটাল না কি ?

বলতে পারেন স্যার।

তোমাদের সঙ্গে তাজুদ্দিনদের যোগাযোগ আছে তাহলে ?

স্যার, তিনি প্রধানমন্ত্রী। যোগাযোগ থাকবে না কেন ?

আমি অবশ্য জিগ্যেস করছি না যে তোমরা কী অথরিটি নিয়ে কথা বলছ। তোমরা এসে বরং আমাকে একটা ঝুঁকির ভেতরে ফেলে দিয়েছ। আমি পাকিস্তানের একজন সেক্রেটারি এখনো, বুঝতে পারছ তো ?— তোমাদের সঙ্গে কথা বলাটাও আমার বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে, আমি ভাবছি, তোমরা কি পারবে ? কী আছে তোমাদের ? অস্ত্র আছে ? নেই। রেগুলার আর্মি আছে ? নেই। সম্পদ আছে ? নেই। দুনিয়ার কেউ স্বীকৃতি দিয়েছে ? দেয় নি। আমাকে তোমরা কী বোঝাবে ?

স্যার, বোঝাতে আমরা চাই না। আমরা শুধু বাঙালি হিসেবে আপনার কর্তব্যটুকু করতে বলছি। আমরা মনে করি, আপনার উচিত তা করা।

মি. মুস্তাফা চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, এসে তোমরা আমাকে বিপদেই ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শরীফ আলী।

আমরা কি তবে খালি হাতে ফিরে যাব, স্যার ?

যেন কী একটা ভাবছিলেন, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ মি. মুস্তাফা জিগ্যেস করলেন সচকিত হয়ে, কী বললে ?

আমরা কি তবে ফিরে যাব ? হ্যাঁ, না, কিছু বলবেন না ?

আমার একা কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। মিসেস মুস্তাফা আসছেন, তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়। এতদিন একটা বিশ্বাস নিয়ে চললাম, এতদিন একটা চাকরি নিয়ে এতদূরে এলাম,

এতদিন এক সঙ্গে বাস করলাম। দেখি, আলাপ করে দেখি।

মি. মুস্তাফা ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। পেছন থেকে ডাকল শরীফ আলী— স্যার।

থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

শরীফ আলী বলল, স্যার, একটা মুশকিল হয়ে গেল যে! আপনি যে আমাদের পক্ষে চলে আসছেন, কথাটা একটু জানাজানি হয়ে গেছে।

হতভম্ব হয়ে গেলেন মি. মুস্তাফা।

লন্ডনের একটা বাংলা কাগজে খবরটা আজ বেরিয়ে গেছে কি বেরিয়ে যাবে, স্যার।

মি. মুস্তাফা দরোজা ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাইরে বেরিয়েই হাসান জিগ্যেস করল, কোন কাগজে শরীফ ভাই? এটা তো ঠিক হলো না। এসব ব্যাপারে তো সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি যে, ভুয়া খবর ছাপতে দেওয়া হবে না। কে করল এ কাজ?

কেউ করে নি।

তাহলে বললেন যে!

রাম টাইট দিয়ে রাখলাম। পিলেটা কেমন চমকে গেল, দেখলে না? এখন বাঙালি দেখলেও আঁতকে উঠবে, পাকিস্তানি দেখলেও গা ছমছম করবে। শালাকে বেশি ইম্পোর্টান্স দিয়ে ফেলেছি, আর নয়। চল হে, কোথাও বসে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

১১

শুক্রবার দিনও বিবিসি-তে গিয়ে কোনো কাজ পাওয়া গেল না। গতকালও কিছু জোটে নি। নিয়মিত চাকরি নয় আবদুল হাদীর; ডেকে দু'পাতা অনুবাদ করতে দিলে, মাইকের সামনে তা পড়তে পেলে তবে দুটো পয়সা। তবু, গত কয়েকদিন একটানা কাজ পেয়ে যাওয়াতে কেমন যেন মনে হয়েছিল রোজই পাওয়া যাবে। তাই আজও কাজ না পেয়ে বড় দমে গেল সে।

আড্ডাও ভালো লাগল না। বিবিসি-র ক্যান্টিনে দু'তিনটে টেবিলে বিকেলে বাঙালিদের চা খাওয়া চলছিল। বিবিসি-র বাইরেরও অনেক বাঙালি তরুণ এসে জমেছিল সেই চায়ের টেবিলে। সেখানে, টেবিলে টেবিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর যুদ্ধ নিয়ে তুফান বইছিল।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল আবদুল হাদী। স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড়াতেই সে টের পেল আবার সেই শীতল প্রবাহ বইতে শুরু করেছে তুন্দ্রা থেকে। বাতাস কনকন করছে। পথের মানুষ আরো দ্রুত ছুটছে। আবদুল হাদী লক্ষ করে দেখেছে, এ দেশে সবাই খুব জোরে হাঁটে, কী ছেলে কী মেয়ে। এখন তার সন্দেহ থাকে না যে শীত তাড়াবার জন্যেই এরকম দৌড়ে চলতে হয়।

শাহানশাহ রেস্তোরাঁতে ফিরে এল সে। বরং সন্ধেটা এখানেই তার কাটবে ভালো। ভেতরে হিটার আছে, উত্তাপ আছে, গান আছে— ভেতরে যখন ঢুকল আবদুল হাদী, রেকর্ডে আবদুল আলীমের দরাজ গলায় ভাটিয়ালি চলছিল।

শুক্রবার সন্ধে হচ্ছে শনি-রবি এই দু'দিনের ছুটির সূচনা। রেস্তোরাঁয় স্বভাবতই ভিড় বেশি

হয়। আবদুল হাদী বসে রইল না; কাউন্টারে মোসলেম মিয়াকে সাহায্য করতে লাগল।

নাটিংহিল গেট স্টেশনে নেমে তার একবার মনে হয়েছিল, যাবে নাকি নিকোলার কাছে? কিন্তু মেরভিনের চেহারাটা চোখের সমুখে ভেসে উঠতেই ইচ্ছেটা মিলিয়ে যায় তার। এখন রেস্তোরাঁয় বসে সূঁচের মতো কী একটা উদ্বেগ নিয়ে সে বড় অস্থির বোধ করতে থাকে—নিকোলা হয়তো খাবার কিনতে আসবে, এই যে দরোজা ঠেলল, বুঝি নিকোলা এল! নিকোলা কি একা আসবে? মেরভিন কি সঙ্গে থাকবে না? আজ যদি মেরভিনের সঙ্গে দেখা হয়েই যায়, আবদুল হাদী একটা কথাও বলবে না তার সঙ্গে। মেরভিনের কথা মনে হতেই সে এখন বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ বোধ করে ওঠে। শরীফ আলীর মতো সে যদি ইংরেজিটা বলতে পারত, তাহলে সেদিনই মুখের ওপর জবাব দিতে পারত মেরভিনকে। বিবিসি-তে এই কয়েকদিন বসে, নানা জনের কাছে হাজার রকম রাজনৈতিক আলোচনা শুনে, কিছু সংবাদভাষ্য অনুবাদ করে সে এখন রাজনৈতিক জবাব দেবার মতো কিছুটা সক্ষম নিজেকে বোধ করে।

কিন্তু নিকোলা এল না। আসবেই তেমন কথা ছিল না, তবু বড় বিরক্ত বোধ করল আবদুল হাদী।

পরদিন ভোরবেলা থেকেই বারবার সে টেলিফোনের কাছে গেল, বারবারই ফিরে এল; শনিবারের ছুটির সকাল, ঘুম থেকে উঠেছে কি নিকোলা? এখন কি ফোন করবার মতো ভদ্র সময়?

এগারোটার দিকে মরিয়া হয়ে সে ডায়াল করল! লিসবেট ধরেছিল প্রথম, অনেকক্ষণ পরে নিকোলার সাড়া পাওয়া গেল।

নিকোলা তাকে তক্ষুণি চলে আসতে বলল, আজ সারাদিন সে কিছু করছে না।

সারাটা দিন নিকোলার সঙ্গে কাটাতে পারবার সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠল আবদুল হাদী। পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে বেরুবার উদ্যোগ করতেই মোসলেম মিয়া পথ রোধ করে দাঁড়াল।

মোসলেম মিয়া ভেবেছিল তাকে দিয়ে কয়েকটা চিঠি লেখাবে। না, সে পারছে না। তাকে বিবিসি যেতে হচ্ছে। কাল রাতে শুতে যাবার সময় সে তো বলেছিল, আজ তার বিবিসি যাওয়া নেই? দেখলেন না, ফোন করলাম? বিবিসি-তে জরুরি কাজ পড়েছে, যেতে হচ্ছে। বোধহয় দেশের কোনো নতুন খবর হয়েছে। মোসলেম মিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, যুদ্ধ কি তাহলে আসন্ন? হাঁ, তাই মনে হয়। হাঁ, সেই রকমই তো আভাস পাওয়া যাচ্ছে। হাঁ, যুদ্ধ একটা হবেই এবার। দেখি বিবিসি-তে গিয়ে। হাঁ, অবশ্যই, তেমন কোনো খবর থাকলে বিবিসি-তে গিয়েই মোসলেম মিয়াকে ফোন করবে আবদুল হাদী।

দ্রুত বেরিয়ে এল আবদুল হাদী।

নটিং হিল গেট স্টেশনের কাছে ফুল বিক্রি হচ্ছে। কিনবে না-কি সে ফুল নিকোলার জন্যে? তার বড় ইচ্ছে করতে লাগল। আবার সংকোচ হলো। নিকোলার হাতে ফুল তুলে দেবার দুর্মর ইচ্ছে নিয়েও, বারবার ফুলের দোকানের কাছে ঘুরঘুর করেও ফুল কিনতে পারল না সে।

নিকোলাই দরোজা খুলে দিল। দরোজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের উত্তাপ আর সুবাস ঝাঁপিয়ে পড়ল তার চোখে-মুখে। দরোজাটা পেছনে বন্ধ করে নিঃশব্দে সে হাসল যেন এ

বাড়িতেই তার বাসা, দু'দিন কোথাও গিয়েছিল, আজ এই মাত্র ফিরে এল।

সারা বাড়িতে নিকোলা আর লিসবেট ছাড়া কেউ নেই। মরিন তার বন্ধু পল কোলিয়ারের সঙ্গে সপ্তাহান্ত কাটাতে গেছে, ফিরবে সেই রোববার রাতে।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখে, মেঝের ওপর পশমের শাদা রাগের ওপর বসে লিসবেট গীটার নিয়ে টুংটাং করছে। আবদুল হাদীকে দেখে বাঁ হাতের আঙুলগুলো প্রজাপতির মতো নাড়িয়ে সে আবার গীটারে মন দিল।

কার্পেটের ওপরেই বসল সে আর নিকোলা দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কফি খাচ্ছিল সে। মগটা আবার হাতে তুলে নিল। বলল, কফি যদি চাও, রান্নাঘরে যাও।

এখন নহে। আমি গতকাল সন্ধ্যায় তোমার কথা ভাবিতে ছিলাম।

আসিলে না কেন?

হয়তো ব্যস্ত রহিয়াছ, হয়তো কেহ আসিয়াছে— তোমার কোনো বন্ধু।

হাঁ, বন্ধুরা নিকিকে ভুলিয়া গিয়াছে!

আবদুল হাদী এ-কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যে মেরভিনের মুখখানা সে কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছিল না, সেই মেরভিনকে সে করুণা করতে লাগল।

আবদুল হাদী বলল, কে বলিয়াছে? আমি ভুলিয়া যাই নাই।

তাই তো তুমি আসিয়াছ। তুমি কি কফি লইবে না? চল, আমি করিয়া দিতেছি। আজ বড় অলস বোধ করিতেছি। আজ চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে।

নিকোলার পেছনে পেছনে রান্নাঘরে এল আবদুল হাদী। নিকোলার আজ সত্যি মন খারাপ, কণ্ঠ কেমন উদাস, চলা কেমন শ্লথ; আবদুল হাদীর বুকের ভেতরটা ছায়া-ঢাকা হয়ে গেল। আবার এমন একটা বিষণ্ণতার সময়ে নিকোলা যে তাকে সারা দিনের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, আবদুল হাদী কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, তুমি কি নিঃসঙ্গ?

তীক্ষ্ম কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল নিকোলা, না।

কণ্ঠের সেই তীব্রতায় বিব্রত বোধ করল আবদুল হাদী, যেন একটা সেতু রচিত হচ্ছিল, ধসে পড়ল। নিকোলা বলল, নিঃসঙ্গ নহি। হাঁ, একা বলিতে পার। নিঃসঙ্গ এবং একা, এক অর্থ বহন করে না।

শব্দ দুটোর অর্থভেদ আবদুল হাদীর জানা ছিল না। মনোযোগী ছাত্রের মতো সে প্রশ্ন করল, নিঃসঙ্গ তবে কাহাকে বলিব?

যাহার কেহ নাই।

আর একা?

যাহার কেহ আছে কিন্তু নাই।

আবদুল হাদী একটু ইতস্তত করে বলল, আমি নিঃসঙ্গ।

তুমি একা।

কফির পেয়ালা তুলে দিল সে আবদুল হাদীর হাতে। সে, আবদুল হাদী, আশান্বিত হয়ে উঠল। তাহলে কি নিকোলা বলতে চায়, তার ভালোবাসা সে পেয়েছে কিন্তু তাকে এখনো পায় নি বাস্তব অর্থে ?

ভুলটা খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ল, নিকোলা যখন যোগ করল— তোমার লক্ষ্য রহিয়াছে, কর্ম রহিয়াছে, বাংলাদেশকে তুমি মুক্ত করিবে। তুমি কেন নিঃসঙ্গ হইতে যাইবে ?

কফি নিয়ে এসে আবার দুজন পাশাপাশি বসল মেঝের ওপর।

নিকোলা লিসবেটকে বলল, একটি গান গাহিবে না ?

নিকোলার শেষ কথায় আবদুল হাদী সেই যে নরীব হয়ে গিয়েছিল, নিকোলা আর লিসবেটের গান গাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি কিছুই তার কানে গেল না। হঠাৎ সে চমকে উঠল তার হাতের ওপর নিকোলার হাতের স্পর্শ পেয়ে। তার হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়েছে নিকোলা।

আবার যেন তার আশা করে উঠল, নিকোলার ভালোবাসা সে পেয়েছে কিংবা অচিরেই পাবে। অথবা এখন কি এই যথেষ্ট নয়, নিকোলা তাকে স্পর্শ করে আছে, তার একাকিত্বকে সংহার করতে চাইছে আবদুল হাদীর হাত ধরে ?

নিকোলা বলল, লিসবেট গাহিতেছে। লিসবেট, বব ডিলানের সেই গানটি গাহিও। আবদুল, এই গানটি যখনই শুনি অশ্রু ধরিয়া রাখিতে পারি না।

বেশ কিছুক্ষণ টুংটাং করে, নতুন করে তার বেঁধে, লিসবেট ভূমিকা করল, গাহিব, গাহিতে পারি, তবে আবদুল যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে আজ ভারতীয় রান্না করিয়া খাওয়াইবে।

আমি রান্না করিতে জানি না।

তবে আমিও গাহিতে জানি না।

নিকোলা বলল, হাঁ, সে রান্না করিবে। করিবে না, আবদুল ? তার হাতের ওপর চাপ দিল সে। আবদুল হাদী বলল, চেষ্টা করিব।

লিসবেট তখন গাইতে লাগল—

> মানুষকে আর কত পথ চলিতে হইবে
> যে তুমি তাহাকে মানুষ বলিতে পারিবে ?
> হাঁ, এবং শ্বেত পারাবতকে আর কত সাগর পাড়ি দিতে হইবে
> যে বালুকা বেলায় সে ঘুমাইতে পারিবে ?
> হাঁ, এবং আর কতবার কামানের গোলা ছুটিতে হইবে
> যে চিরতরে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে ?
> হে বন্ধু, ইহার উত্তর বাতাসে ভাসিতেছে,
> ইহার উত্তর বাতাসে ভাসিতেছে।

আবদুল হাদী তার কাঁধের পাশে নিকোলার কাঁধ অনুভব করতে পারল। সরে বসবে কি-না একবার ভাবল সে। কিন্তু শরীরের জীবন্ত স্পর্শ সোয়েটার ভেদ করে তার শরীরে প্রবাহিত হয়ে গেল।

লিসবেট গেয়ে চলল—

আর কতবার মানুষকে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে
যে সে আকাশ দেখিতে পারিবে ?
হাঁ, এবং একটি মানুষের শ্রুতিসংখ্যা কত হইতে হইবে
যে সে মানুষের ক্রন্দন শুনিতে পাইবে ?
হাঁ, এবং আর কত মৃত্যুর আবশ্যকতা আছে
যে সে অনেক মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিবে ?
হে বন্ধু, ইহার উত্তর বাতাসে ভাসিতেছে,
ইহার উত্তর বাতাসে ভাসিতেছে।

আবদুল হাদী একটু সরে বসল। যেন সে মন দিয়ে গানই শুনছে, তার শরীর কী করছে, কীভাবে আছে, মোটেই সে জানে না। নিকোলা তখন আবদুল হাদীর কাঁধে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দিল সমুখে এবং একবার স্বপ্নের মতো একটু ম্লান হাসল তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

লিসবেট আবার শুরু করল—

আর কতকাল পর্বতের অস্তিত্ব থাকিবে
যে সাগরে সে বিলীন হইয়া যাইবে ?
হাঁ, এবং কিছু লোক আর কত বৎসর বাঁচিবে
যে তাহারা মুক্তি পাইতে পারিবে ?
হাঁ, এবং আর কতবার মানুষ মুখ ফিরাইয়া রাখিবে
যে সে কিছুই না দেখিবার ভান করিতে পারিবে ?
হে বন্ধু, ইহার উত্তর বাতাসে ভাসিতেছে,
ইহার উত্তর বাতাসে ভাসিতেছে।

আবদুল হাদী তাকিয়ে দেখল, নিকোলার চোখ ছলছল করছে। সে তখন হাত দিয়ে বেষ্টন করল তাকে। নিকোলা তার কাঁধে মাথা রাখল। তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

লিসবেট বলল, এই কারণেই গানটি গাহিতে চাই নাই।

আবদুল হাদী নিকোলাকে শরীরের সমস্ত উত্তাপ এবং সঙ্গে মনে-মনে নিঃশেষে দান করে, অবিরাম এক হাতে তার বাহু ঘষে দিতে-দিতে বলল, আমার দেশের কথা মনে পড়িতেছে। যুদ্ধের কথা মনে পড়িতেছে। গুলিবিদ্ধ মানুষের কথা মনে পড়িতেছে।

আবদুল হাদীকে বিস্মিত করে দিয়ে নিকোলা তখন বলল, আমাকে তোমার দেশে লইয়া যাইবে ?

নিকোলা তার মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইল।

তুমি যাইবে ?

হাঁ যাইব। লইবে না ?

সেখানে দুঃখ।

তাহাতে কী ?

সেখানে দারিদ্র্য।

তাহাতে কী ?

সেখানে মৃত্যু।

তাহাতে কী ?

সহ্য করিতে পারিবে ?

তুমি পারিলে আমি পারিব না কেন ?

আমি তোমাকে লইয়া যাইব।

১২

মিসেস মুস্তাফাকে সালাম করে উঠতেই বিরস মুখে তিনি বললেন, একেবারে খাবার সময় এলে ?

বড় অপ্রস্তুত হয়ে গেল আবদুল হাদী। কিছু বলতে পারল না। সে যে এসেছে, নিজের ইচ্ছেতেও আসে নি। শরীফ আলীর ওপর তার রাগই হলো। মি. মুস্তাফার হাল যদি ছেড়েই দিয়ে থাকে তারা, কেন তাকে দেখতে পাঠানো যে কী অবস্থায় আছেন তিনি ?

শরীফ আলী নিজে দু-একবার এবং অন্যদের দিয়ে কয়েকবার টেলিফোন করেছিল। প্রতিবারই উত্তর এসেছে, মি. মুস্তাফা নেই। কোথায় গেছেন ? বাইরে। কখন ফিরবেন ? বলা যাচ্ছে না। আবার শোনা গেছে, তিনি স্কটল্যান্ডে গেছেন। কবে ফিরবেন ? ঠিক নেই।

দেখে এসো তো, ব্যাপারখানা কী ? তুমি ভাগ্নে, তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে। আমাদের একজন গিয়েছিল, তাকে দরোজা থেকেই বিদায় করে দিয়েছে।

এখনো কি চেষ্টা করছ ওকে সরিয়ে আনবার জন্যে ?

নাহ।

তাহলে আর গিয়ে কী লাভ ?

যাও, যাও, দেখে এসো। তোমার মামা হয় তো। দেখে এসো, ভয়ে কী রকম গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

যদি কিছু জিগ্যেস করেন ?

আমার ফোন নাম্বার দেবে, আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আমি ওঁকে ফোন করব না। ওঁকে ফোন করতে হবে।

আমাকে একটু খুলে বল তো, কেন আমাকে পাঠাচ্ছ ?

কেন পাঠাচ্ছি ? গতকাল বাহাউদ্দিন হঠাৎ দু'শ' পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে।

দু'শ পাউন্ড! বিস্ময়ে আবদুল হাদী হাঁ করে থাকে।

হাঁ, দুশ পাউন্ড। এই প্রথম। অন্যের হাত দিয়ে নগদ পাঠিয়েছে। চেক দেয় নি, হয়তো ভেবেছে লিখিত প্রমাণ রাখবে না। তুমি একটু খোঁজ নেবে, হঠাৎ কেন এই উদারতা ?

তোমার কী মনে হয় ?

বলতে পারছি না। তবে অনুমান করি, মি. মুস্তাফা হয়তো এমন কোনো খবর পেয়েছেন,

হয়তো পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে, যে ঘটনা আমাদের অনুকূলে। আবার এও হতে পারে, বাহাউদ্দিন আমাদের দলে ভিড়তে চায়, আমাদের খবর বের করতে চায়। কার মনে যে কী আছে কোন শালা বলতে পারে?

বল কী, বাঙালি হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে বাহাউদ্দিন?

সাধে কি আর ডার্টি বাহাউদ্দিন ওর নাম? চাঁদা অবশ্য আমরা নিই নি। ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি গেলেই বুঝতে পারবে। শালাকে এক্সপোজ করতে চাই।

সেই আসা। কিন্তু বাহাউদ্দিনের দেখা পাওয়া গেল না। মি. মুস্তাফা লন্ডনে নেই।

মামা তাহলে স্কটল্যান্ডে গেছেন?

হাঁ।

মিসেস মুস্তাফা আগেই ঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন, রোজিও এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দিয়ে চলে গেল। অনেকক্ষণ একা বসে রইল আবদুল হাদী। টেলিভিশনটাও যদি চালিয়ে দিয়ে যেত, না হয় বসে দেখতে পারত।

বসেই বা কী করবে? যে উদ্দেশে তার আসা, যাদের কাছে তার আসা, তারা দুজনেই অনুপস্থিত। আর মামীর ঐ 'একেবারে খাবার সময় এলে' কথাটা তার কান লাল করে দিয়েছে।

হঠাৎ সে লক্ষ করল, দেয়ালে শেখ মুজিবের বড় ছবিটা আবার ঝুলছে। ভুলেই গিয়েছিল সে, মামা আসবার দিন ছবিটা নামিয়ে নিয়েছিল ওরা। আজ আবার ঝোলানো কেন? তাহলে কি মি. মুস্তাফা বাংলাদেশে যোগ দেবেন মনঃস্থির করে ফেলেছেন? পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর আর সম্পর্ক নেই?

আশ্বান্বিত হয়ে উঠল আবদুল হাদী। গতকাল চাঁদা পাঠিয়েছে বাংলাদেশের জন্য, আজ দেয়ালে শেখ মুজিবের ছবি আবার দেখা যাচ্ছে— সে বড় উসখুস বোধ করতে লাগল। যদি একটা ভালো খবর সে পেয়েই যায়, এক্ষুণি সে শরীফ আলীকে গিয়ে বলবে।

মিসেস মুস্তাফা বসবার ঘরে এলেন। বিশ্বের বিরক্তি-জড়ানো সে মুখ। এক মুহূর্তের বেশি সেদিকে তাকাবার প্রবৃত্তি হয় না। অনেকক্ষণ ধরে তিনি আবদুল হাদীকে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর রসকষহীন গলায় বললেন, এখানে কি কাজটাজ কিছু করছ, না ঘুরে বেড়াচ্ছ এখনো?

জ্বি?

দেশ থেকে টাকা পয়সা কিছু এনেছিলে বোধহয়?

না, এক'শ ডলারের মতো।

সে আর কী পয়সা! ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি তো এখানেই উঠেছিলে। বাহার তোমাকে সাহায্য করেছে।

হাঁ, করেছে। মনটা তেতো হয়ে যাবার আগেই প্রসঙ্গ পালটাতে চাইল আবদুল হাদী। বলল, মামা স্কটল্যান্ডে কোথায় গেছেন?

কী যেন জায়গাটার নাম!

আবদুল হাদীর সন্দেহ হলো তিনি জেনেও না জানার ভান করছেন।

বেড়াতে গেছেন বুঝি ?

না। বেড়ানোর অবস্থা কৈ ? বাহারের এক বন্ধু স্কটল্যান্ডে থাকে, তার চেনা এক ভালো ডাক্তার আছে, সেখানে গেছেন— বিশ্রামও হবে, চিকিৎসাও হবে। তোমরা তো একদিন দলেবলে এসেছিলে ?

আবদুল হাদী চুপ করে রইল।

মিসেস মুস্তাফা তীক্ষ্ণ চোখে আবদুল হাদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ওঁর মতো লোকের কাছে আবু সায়ীদ চৌধুরীর নিজের আসা উচিত ছিল। তোমাদের ছেলেমানুষদের কথায় তো উনি কিছু করতে পারেন না।

উনি সে কথা বললেই পারতেন।

কথার বেশ উত্তর দিতে পার দেখছি।

আবদুল হাদীর ইচ্ছে করছিল, তক্ষুণি উঠে আসে। কিন্তু এই মহিলার হিংস্রতায় কেমন একটা সম্মোহন আছে, সে অনুভব করল। অসহায়ের মতো ঠায় বসে রইল সে।

তোমার চলছে কী করে ? বাংলাদেশের নামে চাঁদা তোল তোমরা। সেখান থেকে টাকা পাও নিশ্চয়ই ? কত পাও ? ভালোই পাও মনে হয়। নিজেরাই বোধহয় সব ভাগাভাগি করে নিয়েছ, দেশ স্বাধীন হলে কে কী হবে ? বাঙালিদের আমি চিনি না ? ইসলামাবাদে তোমার মামার পেছনে বাঙালিরাই লেগেছিল। খালি হিংসা আর হিংসা। কেন উনি এত বড় পোস্টে থাকবেন, কেন আমরা এত বড় পোস্ট পেলাম না ? ওরা তো জানে না— তোমার মামা কারো দয়ায় না, নিজের গুণে এত বড় হয়েছেন। আইয়ুব খান তখন প্রেসিডেন্ট, এক পার্টিতে তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন— আপনার স্বামীর মতো এফিসিয়েন্ট লোক সেক্রেটারিয়েটে আর নেই। আইয়ুব খান থাকলে তো তোমার মামা ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নরও হয়ে যেতেন। জান না তোমরা, কথা ঠিক হয়েই ছিল, আমি মনে মনে তৈরি হয়ে রয়েছি, এর মধ্যে তোমরা ঢাকায় মারামারি শুরু করলে— মজিবরকে ছেড়ে দাও, মজিবরকে ছেড়ে দাও। আরে এই যে তোমাদের শেখ মজিব, আমাকে ভাবি বলত জান ?

দেয়ালে শেখ মুজিবের ছবির দিকে তাকালেন মিসেস মুস্তাফা।

আবুদল হাদী হুল ফোটাবার লোভ সামলাতে পারল না। আবার একটু ভয়ও করল। তবু সে বলে ফেলল, আপনি এসে ছবিটা আবার টানিয়েছেন বুঝি ?

তীব্র দৃষ্টি হানলেন মিসেস মুস্তাফা। মুহূর্তের ভেতরে তিনি অনুমান করে নিলেন, ছবি নামাবার ঘটনা আবদুল হাদী জানে। তাই পাল্টা আক্রমণ করলেন, তোমরা শেখ মজিবকে নিয়ে নাচানাচি করতে পার, আমি করি না। আমি তো জানি, তোমরা স্বাধীন-স্বাধীন করছ, সে স্বাধীনতা চায় নি।

এটা ঠিক সত্যি না, মামী।

কেন ? সত্যি না কেন ? তাহলে ইলেকশন করেছিল কেন ? আমি তো বলি, মজিবরকে প্রাইম মিনিস্টার করে দিলে তিন মাসের মধ্যে গদি ছাড়ত। পাকিস্তানে এত প্রবলেম, সে সব তোমার মাঠে বক্তৃতা দেয়া লিডারদের কাজ নয় সলভ করা।

তাহলে সলভ করবে কে ?

যারা ডিপার্টমেন্ট চালায় তারা, তোমার মামার মতো লোকেরা। সারা জীবন তারা একেকটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আছে, কী প্রবলেম, কী সলিউশন, সব জানে। আমি তো বলি, বাঙালি ভুল করেছে। বাঙালির উচিত ছিল পল্টনের মাঠে গলাবাজি না করে গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্টগুলোতে ঢুকে পড়া, কী-পজিশনগুলো ক্যাপচার করা। তাহলেই পাঞ্জাবিরা সুবিধে করতে পারত না। তোমরা তো বাইরে থেকে নাচ, ইসলামাবাদে আমি দেখেছি, বাঙালি যে দু-একজন বড় অফিসার আছেন তাদের কোনো উৎসাহ নেই। মিছামিছি পাঞ্জাবিদের তোমরা গাল দাও। তোমার মামা একা কী করবেন ? মি. মুস্তাফা তো বলেনই, বাঙালি আর একটা ডেডিকেটেড অফিসার পেলে তিনি ইস্ট পাকিস্তানের ইনজাস্টিস নিয়ে ফাইট করতে পারতেন। তাঁর সে দুঃখের কথা শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি; তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন, রাবু, দেশের কথা তো না ভেবে পারি না। তোমরা এখনো সেই ভুল করছ।

আবদুল হাদী ভুলের প্রসঙ্গটা ঠিক শনাক্ত করতে পারল না। মিসেস মুস্তাফা লাফিয়ে লাফিয়ে এত কথা ছুঁয়ে যাচ্ছিলেন যে, বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ছিল কখন কী প্রসঙ্গে বলছেন।

কোন ভুল, মামী ?

এই যে তোমরা সব ছেলে-ছোকরা জুটেছ, ছেলে-ছোকরার হাতে সব ছাড়া আছে।

মামাকে তো আমরা বলেছিলাম।

কী বলেছিলে ? কিছুই বল নি। তাঁর কতদিনের চাকরি জান ? কত টাকা পাবেন রিটায়ার করবার সময়, খোঁজ নিয়ে দেখেছ ? এখন চলবেন কী করে কিছু বলেছ ? তারপর, বাংলাদেশের পক্ষে চলে এলেই তো হলো না। তোমরা তাকে কোথায় রাখবে, কীভাবে রাখবে, কিছুই বল নি। উনি আসবেন, তোমরা পাকা কিছু না বললে কী করে আসেন ? এইজন্যেই তো বলি, সব ছেলে-ছোকরার হাতে গিয়ে পড়েছে। তারপর, একদিন কী এলে না এলে, আর কোনো খবরও নিলে না। তোমাদের ভরসা করেন কী করে ? আমি বলেছি, তুমি স্কটল্যান্ডেই গিয়ে থাক। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তোমাকে ডাকতেই হবে।

আবদুল হাদী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি তাহলে আসি, মামী।

এত তাড়াতাড়ি উঠবে সে, মিসেস মুস্তাফা ঠিক আশা করেন নি। তিনি তাকে তিরস্কার করে মাটি তৈরি করছিলেন এতক্ষণ, এবারে কিছু স্পষ্ট কথা বলতেন, কিন্তু আবদুল হাদী তা ধরতে পারল না। সে উঠেই দাঁড়াল।

আমার আবার একটু কাজ আছে।

বাহার হয়তো একটু পরেই এসে যাবে। ক'দিনের ছুটি নিয়েছে, আপিস থেকে, কেনাকাটা করতে গেছে বাজারে।

পরে দেখা করব।

দরোজার কাছে এসে মিসেস মুস্তাফা আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন একবার। বললেন, তুমি কি বাংলাদেশের ব্যাপারে মামার খোঁজ করছিলে ?

না। নাহ্।

কথাটা বিশ্বাস করলেন না তিনি, কিংবা বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

আবদুল হাদী বেরিয়ে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। রাত নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দিন ছোট হয়ে আসছে। সাড়ে পাঁচটাতেই অন্ধকার হয়ে যায়। আকাশে মেঘ থাকলে তো আরো আগে। বাহাউদ্দিনের বাড়ি থেকে টিউব স্টেশন বেশ কিছুটা দূর। হাঁটা-পথে প্রায় মিনিট দশেক লাগে।

মাঝামাঝি চলে এসেছে আবদুল হাদী, এমন সময় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লন্ডন শহরে এ-রকম একটা আওয়াজ সে আদৌ আশা করে নি। তারপরেই মেশিনগানের গুলির মতো পট-পট করে কিছু শব্দ হলো এবং আবার দুটো বিস্ফোরণ ঘটল কোথাও। শরীর হিম হয়ে গেল তার। পা অবশ হয়ে গেল। দুলে উঠল পৃথিবী তার চোখের সমুখে। এখুনি তার চারদিক থেকে ছুটে আসবে ট্যাংক, নেমে পড়বে সৈন্য, শুরু হয়ে যাবে হত্যাযজ্ঞ। অথচ পথের মানুষগুলোর কোনো বিকার নেই কেন ? তারা শব্দগুলোকে গ্রাহ্য করছে না কেন ? দৌড়ে পালাচ্ছে না কেন ? আবদুল হাদীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। চিৎকার করে সে বলতে চাইল, আমি এই শব্দ চিনি। ওরা আসছে, ওরা অস্ত্র নিয়ে আসছে। পালাও, পালাও। সে নিজেই দৌড়ুতে লাগল। তার প্রস্রাব বেরিয়ে পড়তে লাগল ফোঁটায়-ফোঁটায়। সে একটা মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খেল। লোকটা তাকে অশ্রাব্য গালাগাল দিল। স্টেশনের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল সে এবং অবাক হয়ে গেল, এখানেও কারো কোনো বিকার নেই দেখে। হাঁপাতে হাঁপাতে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে লাগল এবার, চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ হতেই ছিটকে পড়ল সে। এক বুড়ো ইংরেজ ঢলঢলে কোট গায়, বেঢপ জুতো পায়ে, ঘষে ঘষে হেঁটে যাচ্ছিল। আবদুল হাদীর কাণ্ড দেখে সে হেসে উঠল। দাঁতহীন মাড়ি বের করে সে হাসল খানিক। তারপর বলল, উহারা গাই ফকস দিবসের আমোদ করিতেছে। বাজি পোড়াইতেছে। তোমার নিকট চায়ের নিমিত্ত পাঁচটা পেনি হইবে কি ?

আবদুল হাদীর তবু ভয় কাটল না। সারারাত পাঁচই নভেম্বর গাই ফকস দিবসের বাজি আর পটকার শব্দে সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। আত্মার ভেতরে পঁচিশে মার্চের আর্তনাদ ফেটে পড়তে লাগল তার।

১৩

কয়েকদিন থেকেই কেমন একটা চাঞ্চল্যের ভাব সবার ভেতরে। সকলেই যেন কীসের একটা আঁচ পায়, কী একটা অনুমান করতে পারে, কিন্তু ঠিক নিশ্চিত হতে পারে না। বিবিসি-তে শরীফ আলী ঘনঘন আসতে থাকে। বলতে গেলে বিবিসি-তেই সারক্ষণ কাটে তার, এই বেরিয়ে যায়, এই ঘুরে আসে। শুধু শরীফ আলী কেন ?— বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির অনেককেই ঘনঘন দেখা যায়। ঘনঘন টেলিফোন আসে চেনা-অচেনা অনেকের। বিবিসি-র নিউজ রুমে বসে খবর অনুবাদ করাই মুশকিল হয়ে পড়ে রীডারদের; যেখানে এক দেড় ঘণ্টার ভেতর বুলেটিন অনুবাদ শেষ করতে হয়, দম ফেলার সময় থাকে না, সেখানেও বাইরের টেলিফোন গিয়ে হাজির হয়। সকলের মনেই এক প্রশ্ন, কী খবর, খবরটা কী ?

অবশেষে ডিসেম্বরের শুরুতেই খবরটা পাওয়া গেল। প্রথমে একটু গোলমেলে ধরনের খবর, তারপরে দ্রুত পরিষ্কার জানা গেল, দেশে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

বিবিসি উর্দু বিভাগের কেউ কেউ ক্লাবে রীতিমতো গেলাস ঠুকে বলতে লাগল, ভারত আক্রমণ করেছে পাকিস্তানকে।

বাঙালি আর হিন্দিওয়ালারা ঠোঁটে বিয়ারের ফেনা মুছে ফেলতে পর্যন্ত ভুলে গিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, পাকিস্তান তাল সামলাতে না পেরে বাংলাদেশের ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক করে তোলার জন্যে নিজেই রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে।

ভারতই প্রথম যুদ্ধ লাগিয়েছে— এই দলের লোকেরা মিসেস গান্ধীর সাম্প্রতিক ইয়োরোপ সফরকে একটা গূঢ় প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরল।

অন্যদিকে পাকিস্তান প্রথম শুরু করেছে বলে যাদের মত, তারা শীতের মৌসুমে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপকতর তৎপরতা, ফলে পাকিস্তানের সমূহ দুর্দশা এবং যুদ্ধে নেমে পড়া— এই যুক্তি দেখাতে লাগল।

আর এদিকে ছোটাছুটি বেড়ে গেল সংবাদ পাঠকদের। বিবিসি অতিরিক্ত সংবাদ বুলেটিন প্রচার করতে শুরু করল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরপরই; স্থানীয় প্রবাসীদের জন্যে বাংলা আর হিন্দিতে রেডিও লন্ডন প্রতি সন্ধ্যায় সংবাদ প্রচার শুরু করল। হিন্দিওয়ালা-উর্দুওয়ালা-ইংরেজ-অবাঙালি যত সংবাদ পাঠক বিবিসি-র বাঙালি ধরে ধরে জিগ্যেস করতে লাগল, ভাই, জায়গাটার নাম চুয়াডাংগা, না কুয়াডাংগা? যশোর থেকে ঢাকার দূরত্ব তিন শ' তিপ্পান্ন মাইল লেখা হয়েছে— এটা তো সম্ভব মনে হচ্ছে না, কী হবে বলুন তো? মুজিবুর রহমান না মুজিবউর রহমান? যোই বাংলা, না জয় বাংলা?

বাঙালিদের নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল যেন চারদিকে। আবদুল হাদীর মনে হতে লাগল, যুদ্ধের ঢেউ এসে লেগেছে বিবিসি-র বুশ হাউসেও। সারা লন্ডনে এখানেই যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা রণাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে।

যুদ্ধের প্রথম দুদিন শরীফ আলীকে দেখো গেল— বিবিসি-র সংবাদ বুলেটিনে যতটুকু আছে তার চেয়ে অনেক বেশি খবর তার কাছে।

তারপর হঠাৎ লক্ষ করা গেল, বিশেষ করে পঞ্চম দিন থেকে যে, বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারের সময় স্টুডিওর বাইরে কিউবিকলে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে শুধু। নতুন কিছু, অতিরিক্ত কিছু তার বলবার নেই।

আবদুল হাদী জিগ্যেস করল, তোমাদের সূত্র বলে কী? তোমরা সরাসরি কোনো খবর পাচ্ছ না?

পাচ্ছি পাচ্ছি।

বড় অসহিষ্ণু মনে হলো শরীফ আলীকে।

সপ্তম দিন থেকে শরীফ আবার মুখর হয়ে উঠল। এবার নতুন কিছু শোনানো নয়, প্রচারিত এবং প্রকাশিত খবরগুলোর ওপরেই সবিস্তার ব্যাখ্যা পেশ করতে লাগল সে, উষ্ণ কণ্ঠে সবাইকে 'জয় বাংলা' বলে সম্ভাষণ জানাতে লাগল, দরাজ হাতে বিয়ার খাওয়াতে শুরু করল।

মাবুদ খান ঠোঁটকাটা লোক। সে একদিন বিবিসি ক্লাবে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা, যুদ্ধের

আলোচনা এবং নির্জলা হুইস্কি পানের পর বলেই বসল, দোস্ত, স্বীকার কর, যুদ্ধ এখন তোমাদের হাতে নেই।

আলবৎ আমাদের হাতে।

তখন শরীফ আলীর পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে— এই খোঁচা মারাটা তার এক বদভ্যেস— মাবুদ বলল, লন্ডনে বসে যুদ্ধ করছ ? আর হাসিও না, দোস্ত, চেপে যাও। তোমরা বাংলাদেশের জন্যে অনেক কিছু করেছ, কিন্তু এই যে যুদ্ধ, ইহা হয় সত্য, এটা তোমরা করছ না।

করছি না ?

না। চাঁদা তুলে চেগুয়েভারা হওয়া যায় না, দোস্ত।

রসনা সংযত করিও।

এবং জানিয়া রাখ, রণাঙ্গনে নতুন নতুন নায়কের জন্ম হইতেছে, মানুষ প্রাণ দিয়া নতুন নতুন উপকথা রচনা করিতেছে, নতুন আসিবে বলিয়া পুরাতনের ধ্বংসস্তূপ রচিত হইতেছে, আর তোমরা বহু দূরে নিরাপদে বসিয়া সুরা গিলিতে-গিলিতে জয়ধ্বনি করিতেছ, যেন এই গৌরব তোমাদিগেরই বটে।

মাবুদ খানের সঙ্গে শরীফ আলীর হাতাহাতি লেগে যাবার উপক্রম হয়ে গেল।

সুরা তুমি গিলিতেছ না, মাবুদ ?

হাঁ, গিলিতেছি। নিষ্পাপ চিত্তে গিলিতেছি, কারণ বঙ্গবীর বলিয়া নিজেকে দাবি করি নাই।

শরীফ আলী উঠে দাঁড়িয়ে রাগে থরথর কোরে কাঁপতে লাগল।

মাবুদ খান তার হাত ধরে বলল, রাগ করো না, দোস্ত। দেশের এ সময়ে রাগ করতে নেই।

হাত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে নিল শরীফ আলী। আমি চললাম।

পেছন থেকে টিপ্পনি কাটল মাবুদ খান। যাও, তবু ইতিহাসকে ধরতে পারবে না, দোস্ত। ইতিহাস তোমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

আবদুল হাদীর মনে গেঁথে গেল কথাটা— ইতিহাস তোমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

বাংলাদেশ নিয়ে যারাই এ ক'মাস কাজ করেছে, যুদ্ধের এই ক'টা দিনে তাদের বড় কর্মহীন মনে হতে লাগল তার। যেন, এ-যাবৎ মঞ্চে যারা ছিল তারা হঠাৎ ফাঁকা মাঠের ভেতরে নিজেদের আবিষ্কার করে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছে; বিব্রত হয়ে লক্ষ করছে মঞ্চ এখন বহু দূরে। তাদের এখন দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই। এ যুদ্ধের ওপর তাদের কোনো প্রভাব নেই আর।

১৪

ষোলই ডিসেম্বর সন্ধে ছ'টার সময় মাবুদ খান সবাইকে ডেকেছিল বিবিসি বুশ হাউসের কাছেই চার্লস ডিকেন্স পানশালায়।

আগের দিন নিজেই সে হৈ-চৈ করে সবাইকে ঢালাও নেমন্তন্ন করেছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন যতগুলো টেলিফোন সে ধরেছিল, সবাইকে ডেকেছিল, আগামীকাল সন্ধে ছ'টায় চলে আসুন। সেলিব্রেট করছি আমরা।

মাবুদ খানের উদ্যোগ নেবার কারণটা এই যে, তার কণ্ঠেই প্রথম বিবিসি থেকে প্রচারিত হয় যে— জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজি বিনা শর্তে তার বাহিনী নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছেন। ব্যাপারটা ছিল আরো নাটকীয়। মূল সংবাদ-বুলেটিন, যেটা অনুবাদ করে স্টুডিওতে এনেছিল মামুদ খান, তাতে ছিল আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী, তবে এখনো পাকিস্তান বাহিনী সম্মত হচ্ছে না। বুলেটিনের গোড়াতে ঐ সংবাদ পড়েও ছিল সে, তারপর বিশ্বের অন্যান্য খবর যখন পড়ছিল ঠিক তখন নিউজরুম থেকে তিন লাইনের একটা ফ্ল্যাশ এসে পৌঁছায়। সেটা ইংরেজিতে। সেই কাগজখানাই এগিয়ে দেওয়া হয় মাবুদ খানের কাছে। সে অন্য খবর পড়তে পড়তে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় এগিয়ে দেয়া কাগজটার দিকে এবং হাতের খবরটা শেষ করেই সে ঘোষণা করে, আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি যে...। তারপর সরাসরি ইংরেজি থেকে মুখে মুখে অনুবাদ করে বলে যায় ঐতিহাসিক সেই খবর।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসতেই সবাই তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন এইমাত্র নিজে সে রণক্ষেত্র থেকে খবর নিয়ে ফিরে এসেছে।

চার্লস ডিকেন্সে ঢুকেই আবদুল হাদী অবাক হয়ে গেল মি. মুস্তাফাকে দেখে। এক ভিড়ের ভেতরে তিনি। কবে ফিরলেন স্কটল্যান্ড থেকে! একেবারে ভোজবাজির মতো মনে হলো আবদুল হাদীর কাছে।

মাবুদ খানকে সে জিগ্যেস করল, মামা এখানে ?

আরে কাল উনি ফোন করেছিলেন বাংলাদেশের খবর নেবার জন্যে। বললাম, চলে আসুন, আমরা সবাই বসছি।

ছোট্ট আরো এক অবাক কাণ্ড— শরীফ আলী আর মাবুদ খান আবার সেই আগের মতো গা ঠেলাঠেলি করছে, হাসছে, ঠাট্টা করছে, পিঠে থাবড়া মারছে; দু'দিন আগেই যে ক্লাবে দু'জনের ঝগড়া হয়ে গেছে, আজ দেখে কে বলবে ? অনেকে এসেছে। বিবিসি-র বাংলা বিভাগের সকলে তো বটেই, হিন্দিওয়ালা উর্দুওয়ালাও অনেক চোখে পড়ল আবদুল হাদীর। বিবিসি-র ইংরেজি কর্মীও কয়েকজন চিনতে পারল সে। বাইরেরও অনেক বাঙালি এসে হাজির হয়েছে।

ডেকেছিল মাবুদ খান, কিন্তু সকলেই যে তার পয়সায় সুরা পান করছে তা নয়। কেউ নিজে কিনে নিচ্ছে, কেউ নিজেদের ছোট্ট দলের জন্যে কিনছে, আবার মাবুদ খান মাঝে-মাঝেই একেক জনকে বলছে, ভাই, কেবল খেয়ে যেও না, খাইয়ে যেও। তার কথার ভঙ্গিই ঐ। মনে হয় খোঁচা মারছে, কিন্তু মুখ দেখলেই ভেতরের নির্মলতাটুকু স্পষ্ট চোখে পড়ে। ভিড়ের ভেতরে একা দাঁড়িয়ে ছিল আবদুল হাদী। হঠাৎ মাবুদ এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, এ-কী, আপনার হাতে কিছু নেই যে!

আমি তো খাই না, জানেন।

নহে ভ্রাত, নহে। আজ অবশ্যই সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। জোর করে তাকে পুরো এক পাঁইট বিয়ার কিনে দিল মাবুদ খান।

অনেকক্ষণ সেই পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আবদুল হাদী। একে সে সুরা পান করে না, তার ওপর মি. মুস্তাফা রয়েছেন উপস্থিত। সে ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। যতই মি.

মুস্তাফার চোখের আড়াল হতে চায় সে, ততই যেন সে তার সমুখে বেশি করে পড়ে যায়।

মি. মুস্তাফা অনরবত একেকটা জটলার ভেতরে গিয়ে পড়ছেন, আর বলে চলেছেন, ইহা তো জ্ঞাত সত্য যে, মুক্তিযোদ্ধারা মাটির সন্তান, তাহাদের শেষ পর্যন্ত জয় হইবেই। পাকিস্তান যে বিরাট একটা ধাপ্পা, এ আমরা বহু আগেই জানতাম।... আবার কারো পিঠে হাত দিয়ে বলছেন, তোমাদের দান অনস্বীকার্য। ইতিহাসে তোমাদের কথা লেখা থাকবে।... আবার কাউকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে তোমাদের এখন চাপ দেয়া উচিত। তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশ অসম্পূর্ণ।

আবদুল হাদী এবার সত্যি সত্যি তার সমুখে পড়ে গেল। আরে তুমিও আছ দেখছি? তোমাকে বলেছিলাম না, পাকিস্তান জিততে পারবে না? তিনি আবদুল হাদীর হাতে বিয়ারের গ্লাসটাকে গ্রাহ্যই করলেন না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল শরীফ আলী, সে ঘুরে তাকাতেই মি. মুস্তাফা বললেন, তোমাকেও তো বলেছি, এগিয়ে যাও, কর অথবা মর, ভয় কোরো না। আবদুল হাদী আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে যে, শরীফ আলী এ-কথার কোনো প্রতিবাদ করল না আজ, বরং সে আলাপে এসে যোগ দিল। মি. মুস্তাফা বললেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমি জানতাম, তাই অনেক আগেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখি নি। তোমরা তো জানই, হাইকমিশনের লোক আমাকে কীভাবে চোখে-চোখে রাখত, তার ভেতর থেকে আমি পালিয়ে যাই।

আস্তে সেখান থেকে সরে এল আবদুল হাদী।

মাবুদ খান আজ সত্যি মাতিয়ে তুলেছে সবাইকে। প্রত্যেকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে, ঠা-ঠা করে হাসছে, হাতের গ্লাস থেকে সুরা চলকে পড়ছে তার, একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে চলেছে। আর যাকেই দেখছে তাকেই বলছে, তুমি কোন দেশের অ্যাম্বাসেডর হচ্ছ, ভাই?... দেশে গিয়ে মন্ত্রী হয়ে গরীবকে ভুলে যেও না, দোস্ত।... দেশে গেলে তোমার সঙ্গে কিন্তু কার্ড দিয়ে দেখা করতে পারব না, আগেই বলে রাখছি।... তুমি তো ফরেন সেক্রেটারি হবে হে।... ঢাকায় আমাকে এয়ার-কন্ডিশনড কামরায় বসিয়ে ঠাণ্ডা এক গ্লাস বিয়ার খাইও, খুশি হয়ে যাব, আর কিচ্ছুটি চাই না।...

আবদুল হাদীর মনে হতে লাগল, আজ খেয়েই নিক না সে বিয়ার। খাবে? না থাক। সবাই খাচ্ছে, সবাই এত হুল্লোড় করছে, সে-ই শুধু আলাদা হয়ে থাকবে? সে সন্তর্পণে ছোট্ট করে চুমুক দিল।

ভীষণ তেতো মনে হলো, একই সঙ্গে বিয়ারের শীতলতাটুকু বড় ভালো লাগল তার। কিছুক্ষণ পর আরেকটা চুমুক দিল সে। এবার আর অতটা খারাপ লাগল না। সেদিন শেরী খেয়েছিল, বমি হয়ে গিয়েছিল, আজও হয়ে যাবে না তো? ইতস্তত করে খেতে খেতে সে প্রায় পুরো পাঁইটই শেষ করে আনল এক সময়। নিজেই ভারি অবাক হয়ে গেল এই কৃতিত্ব দেখে।

আচমকা পিঠে থাবড়া পড়ল তার।

মাবুদ খান তাকে নিয়ে পড়ল এবার।

এই তো বেশ চুকচুক করে খাচ্ছ দেখছি। এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধন করল সে আবদুল হাদীকে। লক্ষ করে বড় কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। আজ বোধহয় সত্যি সে এদের আপনজন

হয়ে গেছে এতদিন পরে।

মাবুদ খান বলল, বল দেখি ভাই, দেশে গিয়ে তুমি কী হবে?

কিছু না মাবুদ ভাই। আবদুল হাদীও এই প্রথম তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করল। আপনার একটা কথা সেদিন শোনার পর ভুলতে পারি নি।

আমার কথা আবার কে মনে রাখে?

না, না, মনে রাখার মতো কথা।

বল শুনি।

আপনি ক্লাবে বলছিলেন না?— ইতিহাস এগিয়ে গেছে?

দূর, দূর। দাঁড়াও তোমাকে আরেকটা কিনে দিই।

আঁতকে উঠল আবদুল হাদী।

আমি পারব না মাবুদ ভাই, আমি পারব না। একেবারে প্রথম দিনেই...

কোনো ওজর আপত্তি শুনল না মাবুদ খান। তাকে আরো এক পাঁইট ধরিয়ে দিল।

১৫

রাত প্রায় এগারোটা তখন। চার্লস ডিকেন্স থেকে সবার সঙ্গে হৈ চৈ করে বেরিয়ে আবদুল হাদী যখন ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ট্রেনে উঠল তখন সে প্রথম টের পেল— জগৎ দুলে-দুলে উঠছে, মাথার ভেতরে চমৎকার ছোঁ মারছে ছোট ছোট পাখি।

মি. মুস্তাফাকে আজ নিজেই সে 'শালা' সম্বোধন করল। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, 'শালা'। বড় ভালো লাগল ধ্বনিটা। বারবার সে উচ্চারণ করতে লাগল। একবার অস্পষ্টভাবে লক্ষ করল তার পাশেই দু'তরুণ বড় বেশি জায়গা জুড়ে, পা ছড়িয়ে সিগারেট টানছে। অন্যদিন হলে সে আস্তে করে সরে যেত, অন্য আসনে গিয়ে বসত, আজ সে নিজেই পা ছড়িয়ে দিল, যেন শ্বেতাঙ্গ তরুণ দু'টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা স্থাপন করল।

স্কটল্যান্ড থেকে মামা কবে এলেন? আশ্চর্য, সে কোনো খবরই রাখে না! বাংলাদেশ মামাকে নিয়ে নিয়েছে না-কি? কেউকেউ হয়ে যাচ্ছেন তিনি? কিছু বলা যায় না বাবা, শেখ মুজিব মামীকে 'ভাবি' বলেন। মামী নিজেই তাকে বলেছেন সেদিন। জয় বাংলা।

শরীফ যেন কোন দেশের অ্যাম্বাসেডর হবে বলে মাবুদ খান অনবরত বলে যাচ্ছিল?— আর শরীফ বলছিল, যদি হই, তোমাকে আমি হলিডে করাতে নিয়ে যাব। জয় বাংলা।

তার মাথাটা তরুণ একজনের কাঁধে টলে পড়ে যাচ্ছিল; রূঢ় একটা ধাক্কা দিয়ে সে সরিয়ে দিল তাকে।

দুঃখিত।

অপরিচ্ছন্ন শূকর।

তরুণটির মুখে তিরস্কার শুনে সে দুঃখিত হলো। কিছু করবার নেই। পরের স্টেশনে নেমে সে অন্য কামরায় বসবে।

কিন্তু বসে থাকাও সহজ হলো না। তরুণ দুটি থেকে থেকেই তার উদ্দেশে দুর্বোধ্য কী সব

বলে যেতে লাগল। পরের স্টেশন এসে যাবার আগেই ওদের একজন তার গায়ে ধাক্কা মেরে বলল, ভারতীয় ?

আবদুল হাদী প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

না, না, বাংলাদেশ।

হাঃ, সে বলিতেছে, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় তরুণ আবদুল হাদীকে খোঁচা মারল।

সে প্রতিবাদ করে উঠল, আমি কী করিয়াছি ?

মাতৃপ্রেমিক কুক্কুর, তোমরা যুদ্ধ করিবে আর আমাদের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দিনের-পর-দিন জুড়িয়া রাখিবে ? আমরা তোমাদের যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়া কী করিব ?

আমাদের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা স্বাধীন হইয়াছি।

আবার তোমরা যুদ্ধ করিবে। আবার আমাদের সংবাদপত্র জুড়িয়া থাকিবে। করিবে আর যুদ্ধ ? করিবে আর যুদ্ধ ?

দুটো ঘুষি খেল সে দু'পাশে। দ্রুত সে উঠে দাঁড়াল। একজন হঠাৎ পা বাড়িয়ে দিতেই পায়ে লেগে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে নিল সে। কী একটা স্টেশনে ঠিক তখন দরোজা খুলে যেতেই সে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

জোর বাঁচা গেছে, বাবা। জয় বাংলা।

নটিং হিল গেটে নেমেই মনে হলো, নিজের মুখে তো নিকোলাকে সে দেশ স্বাধীন হবার খবরটা দেয় নি। সে গিয়ে বলবে, আজ আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন, আজ আমরা মুক্ত। সে বলবে, নিকি, তুমি যেতে চেয়েছিলে আমাদের দেশে, এখন আমরা যেতে পারি। এসো, আমরা আজ সারারাত সেই যাবার গল্প করি।

নেশার ঘোরে না থাকলে আবদুল হাদী এত রাতে নিকোলার বাড়িতে হানা দেবার কথা ভাবতে পারত না। দেশ তাকে কলকণ্ঠ হয়ে ডাক দিতে লাগল। এতক্ষণ কোথায় ছিল সে ? ওরা কারা ? কেউ ভবিষ্যতের রাষ্ট্রদূত, কেউ মন্ত্রী, কেউ সচিব। কোলাহল, কোলাহল, বিশাল এক সংসার। আবদুল হাদী স্পষ্ট দেখতে পেল আসন্ন সেই ভবিষ্যৎ, সেই রোদ, সেই নীলিমা, তাকে কেউ মন্ত্রী করবে না, সচিব করবে না, রাষ্ট্রদূত করবে না, তাতে কী ? আবদুল হাদী দেখতে পেল, নিকোলাকে সঙ্গে নিয়ে বিমান থেকে সে তরতর করে নামছে, দেখতে পেল, বাংলাদেশে স্বচ্ছল পর্যটকের মতো সে ভ্রমণ করছে।

দরোজা খুলে দিল লিসবেট। প্রথমে খোলে নি, ভেতর থেকে প্রশ্ন করে তার নাম শুনে দরোজা একটুখানি ফাঁক করল লিসবেট।

ঝলমলে গলায় সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাচ্ছিল একটু বেশি রাতে এসে পড়বার জন্যে, তার আগেই লিসবেট নিজের ঠোঁটে তর্জনী ছুঁইয়ে তাকে নীরব হতে ইশারা করল।

আবদুল হাদী বলল, সবাই নিদ্রা যাইতেছে বুঝি ?

ইতস্তত করল লিসবেট।

লিসবেট, আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। জয় বাংলা।

অপ্রতিভ হয়ে একটু হাসল লিসবেট। বলল, নিকোলা বোধহয় ব্যস্ত রহিয়াছে।

কোথায় যেন একটা ধাক্কা অনুভব করল সে হঠাৎ। এই দরোজা ভালো করে না খোলা, এই নিষ্প্রাণ উচ্চারণ, নিকোলাকে এই আড়াল করে রাখা; আবদুল হাদী ব্যাকুল হয়ে উঠল।

দেখা করিতে পারি না ?

কী ভেবে লিসবেট বলল, আচ্ছা, আমি দেখিতেছি।

তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেই দরোজা বন্ধ করে লিসবেট ভেতরে চলে গেল। তখন বড় আহত বোধ করল সে। কত ঊর্ধ্বে ডানা মেলে সে উড়ছিল, বাতাস হঠাৎ দ্রুত পড়ে যেতে লাগল।

লিসবেট বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, নিকোলা জানাইল, আপাতত অসুবিধা রহিয়াছে। পরে কখনো আসিও।

নিকোলা বলিল ? হাহাকারের মতো শোনাল সেই প্রতিধ্বনি।

ইহা আমার বলা উচিত নহে, মেরভিন রহিয়াছে।

মেরভিন মার্শাল ?

সঙ্গে সঙ্গে নিকোলা যেন বহু দূরে চলে গেল আবদুল হাদীর বক্ষ থেকে। বরফশীতল শূন্যতার ভেতরে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লিসবেট বলল, মেরভিন আজ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া একেবারেই চলিয়া আসিয়াছে। বচসা করিয়া কিঞ্চিত বিষ পান করিয়াছিল, নিকোলা এখন তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। নিকোলাকে কিছু বলিতে হইবে ?

ম্লান হাসল আবদুল হাদী। লিসবেটের স্নিগ্ধ ব্যবহার ছোট্ট একটা ফুলের মতো সুবাস দিয়ে গেল। লিসবেটকে আগে কখনো ভালো করে লক্ষ করে নি সে। লিসবেটেকেই সে বলবে কি, চল আমার সঙ্গে ?

আবদুল হাদী বলল, হাঁ, আমিও ব্যস্ত রহিয়াছি। যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে। ঢাকা হইতে জরুরি তলব আসিয়াছে, আমাকে অবিলম্বে এক বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমি দু-একদিনের মধ্যেই দেশে ফিরিয়ে যাইব। নিকোলাকে বলিও, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মতো সময় আর হইল না। মেরভিনের সঙ্গে তাহার বিবাহ উপলক্ষে আগাম শুভেচ্ছা জানাইয়া দিও। দিবে না ?

দরোজা বন্ধ হয়ে গেল।

আবদুল হাদী লন্ডনেই থেকে যাবে। সে ভাবতে লাগল, নিকোলাকে না জানিয়ে লিসবেটের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা যায়।

সৈয়দ শামসুল হক

জন্ম	:	২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫
জন্মস্থান	:	কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ
পিতা	:	ডা: সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন
মাতা	:	সৈয়দা হালিমা খাতুন
শিক্ষাজীবন	:	কুড়িগ্রাম ও ঢাকা মানবিক শাখা, বিজ্ঞান শাখা এবং ইংরেজি ভাষা সাহিত্য
পেশা	:	লেখা
প্রিয়	:	বই ও ভ্রমণ
গ্রন্থসংখ্যা	:	কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ মিলিয়ে প্রায় একশ' পঞ্চাশ
পুরস্কার	:	কবিতায় আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, সমগ্র সাহিত্য কর্মের জন্যে বাংলাদেশের প্রধান পুরস্কার সমূহের মধ্যে– নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, জেবুন্নিসা–মাহবুবউল্লাহ্ স্বর্ণপদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, কবিতালাপ পুরস্কার, পদাবলী পুরস্কার এবং রাষ্ট্রীয় একুশে পদক
স্ত্রী	:	আনোয়ারা সৈয়দ হক
সন্তান	:	বিদিতা সৈয়দ হক দ্বিতীয় সৈয়দ হক
বসবাস	:	ঢাকা ও লন্ডন